# জীবনানন্দ সমগ্র
## প্রথম খণ্ড

# জীবনানন্দ সমগ্র

## প্রথম খণ্ড

সম্পাদক

দে বে শ রা য়



প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা-৭০০০১৩

# নি বে দ ন

জীবনানন্দ দাশ-এর রচনাগুলি
খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশের পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি।
তাঁর গ্রন্থভুক্ত রচনার তুলনায় অপ্রকাশিত রচনার সংখ্যা ও বৈচিত্র্য
অনেক বেশি।
সেই সব রচনাই আমাদের প্রকাশ-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিটি খণ্ডে কবিতা, গল্প, উপন্যাস এ-রকম বিষয়গত ভাগে
রচনাগুলি বিন্যস্ত থাকবে।
সম্পাদকীয় অংশে রচনাসংক্রান্ত ও জীবনীগত তথ্য, পাঠান্তর, কবির
নানা সংশোধন ও প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ সংযোজিত হবে।

এই পরিকল্পনায় এটিই প্রথম খণ্ড। এই খণ্ডে সংকলিত কোনো রচনাই
ইতিপূর্বে গ্রন্থভুক্ত হয় নি। কবিতাগুচ্ছের দুটি ব্যতীত সবই অপ্রকাশিত।

রচনাসমগ্র ছাড়াও তাঁর নানা রচনার বিবিধ সংস্করণ প্রকাশের চেষ্টাও
যে আমরা করছি তার নিদর্শন ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'রূপসী বাংলা
—পাণ্ডুলিপি ও পাঠান্তর সংস্করণ' ( ১৯৫৭ )।

এই সব প্রয়াসের সাফল্য সম্পূর্ণতই আগ্রহী পাঠকদের
সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল।
তাঁদের মতামত ও মন্তব্য জানতে পারলে আমরা বাধিত হব।

প্রকাশক
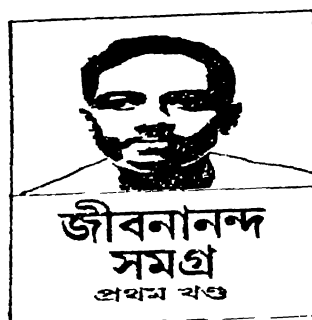
জীবনানন্দ
সমগ্র
প্রথম খণ্ড

# সূচিপত্র

উপন্যাস



গল্প



কবিতা

# উপন্যাস

জ ল পা ই হা টি

'কে, কে, দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে ?' আস্তে বললে জিতেন দাশগুপ্ত। আবার বললে, 'কে ?'

বলে, টেবিলের ওপরকার নীলশেডের বাতিটার আলো খুব বেশি পড়েছে যেখানে, সেখানে, চোখ রাখল বেশ নিবিষ্টভাবে—দলিলপত্রগুলো দেখে নিতে লাগল, দরজায় ধাক্কা পড়ছে, কড়া নাড়া হচ্ছে সেদিকে খেয়াল থাকলেও ঝোঁকটা কাগজপত্রের দিকে বেশি। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই ফাইল দেখছিল দাশগুপ্ত। বললে 'কে ? কলিং বেল টিপলেই হত, কড়া নাড়ছে কে ? ওরে মহিম' —বলতে-বলতে নিজেই দরজা খুলে দিয়ে, সুইচ টিপে ঘরের ভিতরে দু-তিনটে কড়া আলো পটাপট জ্বালিয়ে দিয়ে, বললে, 'কে ? তুমি – '

'হ্যাঁ আমি। চিনতে পারছ ? হয় তো পার নি। এবার অনেক দিন পরে তোমার এখানে এলুম। রাত বারটা বেজে গেছে। বড্ড দেরি হয়ে গেল। নীচে কী করছিলে ? দাশগুপ্ত, তুমি বিয়ে করো নি তো ? করেছ ? একটা গুজব শুনেছিলুম। বিয়ে যদি করে থাকো, তোমার এখানে দু-চার দিনের বেশি থাকব না আমি।'

'কেন ?'

'ওসব মানুষ আমার ধাতে সয় না।'

'তুমি নিজে তো করেছ বিয়ে।'

নিশীথ বললে, 'রাত দশটার সময় ট্রেন শেয়ালদা এসে পৌঁছুল। স্টেশনের কাছেই একটা বোর্ডিঙে খেয়ে নিলুম। তারপর বাসে গড়িয়াহাট ;

সেখান থেকে বাসে ঐ মোড়ে নামিয়ে দিল—কুলি পেলুম না, তবে সঙ্গে জিনিস বেশি নেই—একটা সুটকেশ আর—'

'তোমার পরিবার কোথায়? বাপের বাড়িতে?'

'না, আমার ওখানেই আছে, জলপাইহাটিতে।'

'কলেজ কি বন্ধ হয়ে গেল তোমার?'

'হয় নি এখনও ; এক মাস ছুটি নিয়ে এসেছি। এ ছুটিটা তোমার এখানেই কাটবে, তুমি এ বাড়িতে একা আছো তো? আমি একটু নিরিবিলি চাচ্ছি জিতেন। তুমি এত রাতে নীচে কী করছিলে? দোতলার দক্ষিণদিকের সেই ঘরটায় থাকো না আজকাল?'

'হ্যাঁ। আমি ওপরে শুয়ে পড়েছিলুম। কড়া নাড়ার শব্দে নীচে নেমে এসেছি। এমনিও আসতুম। ঘুম হচ্ছিল না, কয়েকটা দরকারি ফাইল নীচে পড়ে ছিল—ওপরে নিয়ে যেতে হবে।' জিতেন দাশগুপ্ত ফাইলগুলোর দিকে চোখ ফিরিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে বললে, 'কাল সাতটার সময় অফিসে যেতে হবে, এখন রাত একটা। নিরিবিলি চাচ্ছে নিশীথ!'

জিতেন দাশগুপ্তের সমীচীন মুখ বেশ ভাল মানুষের মতন দেখাচ্ছিল। মুখের গাম্ভীর্যর ভিতর থেকে একটু হাসি চলকে উঠল।

'যত মফস্বলের মানুষ কলকাতায় এসে আজকাল [ নিরিবিলি ] খোঁজে—'

নিশীথ সেন বারান্দার থেকে সুটকেশটা টেনে ঘরের ভিতরে এক কিনারে ফেলে রেখে বেডিংটা নিয়ে এল, বললে, 'না না আজকাল নয়, মানুষের সঙ্গে চলব, ফিরব, মিশব, কিন্তু তবুও নিজের মনে নিজে থাকব।'

'হ্যাঁ, তারই মানে তাই। আমার বাড়িটা'—জিতেন দাশগুপ্ত ফাইল উল্টেপাল্টে বললে,—'ভারি গলদ তো, বড্ড irregular। তরফদারের কাজ। কাল অফিসে এলেই ওকে আমি—'

ফাইলগুলো ঠেলে একপাশে সাজিয়ে রেখে নিশীথের দিকে তাকাল দাশগুপ্ত। চোখের থেকে চশমাজোড়া খুলে নিয়ে আধো অন্ধ চোখে নিশীথের দিকে খুব ভরসা ভরে তাকিয়ে জিতেন বললে, 'যা চাও তাই পাবে, আমার বাড়িটা খুব ঠাণ্ডা। লোকজন নেই—আমি আর আমার স্ত্রী।'

'তোমার স্ত্রী!' নিশীথ যেন অন্ধকারে বুকে কিল খেয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে সিধে মুখে বসে রইল নিজের সুটকেশটার দিকে তাকিয়ে। অন্য

কোথাও চলে যাবে কি সে ?

'দাঁতকপাটি মারলে যে নিশীথ। আমি বিয়ে করব না? বয়স আমার সাতচল্লিশ। আজ যদি না করি তো কবে করব আর ? স্ত্রীলোক না হলে চলে পুরুষমানুষের? তুমি নিজে চালাতে পেরেছ?' যে-দরজাটা দিয়ে ঢুকেছে সেটা খোলাই আছে, তাকিয়ে দেখল নিশীথ। টং টং করতে একটা রিকশ চলে যাচ্ছে। মাল চাপিয়ে সেও চলে যাবে নাকি? সাতচল্লিশ বছরে জিতেন দাশগুপ্ত বিয়ে করল। একে-একে সকলেই তো করেছে। বাকি ছিল জিতেন; লেক রোডের এ বাড়িটা জিতেনের। চমৎকার একটা আস্তানা ছিল এটা নিশীথের—কলকাতায় এলেই। জিতেন যে ভাবুক মানুষ নয়, তা নয়—কিন্তু ভাবগ্রাহী বেশি, বুঝদার বেশি; মানুষের কোথায় খোঁচা লেগেছে, কী করে তা ঘুচিয়ে দেওয়া যায়, কী করে সুবিধে করে দেওয়া যায় মানুষকে, জিতেন যেন তাড়াতাড়ি ধরে ফেলতে পারত, নিজেরই গরজে যেন সুব্যবস্থা করে দেবার ক্ষমতা রাখত; কিন্তু জিতেন তো বিয়ে করেছে। নির্মল, সোমেন, রথীন, মুকুটমণি, অনিমেষ ঘটক, বিজয় মিত্তির, পরেশ দত্ত —একে-একে সকলেই তো গেল, সে নিজেও তো প্রায় বছর ত্রিশ আগে। বাকি ছিল জিতেন দাশগুপ্ত।

'কোনো খবর পেলুম না তো। কবে বিয়ে করলে?'

'কাউকেই খবর দিই নি। অফিসে গিয়ে রেজিসটারি করে বিয়ে, এস-সি মুখার্জির মেয়ে। চল, দেখবে এসো—'

হাত ইশারা করে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, 'না, এখন নয়। বড্ড ঘুম পেয়েছে। ভারি ক্লান্ত লাগছে জিতেন, হাত পা না-ছড়িয়ে পারছি না আর। এই যে একটা খাট পড়ে আছে—এটা কার? ভারী চমৎকার নেয়ারের খাট তো; আমি শুয়ে পড়ি।'

জিতেন শান্ত, সেয়ানা মুখে হাসি ছুঁয়ে নিয়ে একে-একে ঘরের কড়া বাতিগুলো নিভিয়ে দিল সব; টেবিলের ওপর নীল শেডের বাতিটা জ্বলছিল। জিতেন চেয়ারে ফিরে এসে বললে, 'যেন আমার স্ত্রী তোমার বিজোড়।'

চশমা খুলে নিয়ে আড়ষ্ট চোখে নিশীথের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে উত্তরের প্রতীক্ষায় হয় তো এমনিই—বসে রইল সে। নিশীথ হোল্ড-অল খুলে বিছানার তোশক বালিশ চাদর বার করে নিয়ে একটা ময়লা কাপড় দিয়ে

ঝেড়ে নিচ্ছিল।

'না বিজোড় হবে কেন? এখানে মশাটশা আছে?'

'আছে।'

'মশারি আনি নি তো—'

'তা হলে ওপরে চলো। রাতে বেশ বাতাস খেলে সেখানে। মশারি না টানালেও চলে।'

নিশীথ খাটের ওপর তোশক পেতে ফেলেছিল—একটা বালিশ খাটের এক কিনারে লক্ষ্যহীনভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জিতেন দাশগুপ্তকে আশ্বস্ত করতে-করতে বললে, 'মশা তো আর বাঘ নয়, কলকাতা তো আর রায়গঞ্জ লক্ষণকাটি নয়, কটা মশাই-বা ফু ফু করবে, উড়বে এখানে। আমরা পদ্মার পারের দেশ থেকে এসেছি। পদ্মার ওপারে ফেলে এসেছি যে-সব, কলকাতায় সে-রকম জানোয়ার থাকে না।' বলতে-বলতে একটা সাদা পাতলা গায়ের চাদর বেশ করে একটু ঝেড়ে, প্রজাপতির মত ছোট সাদা পোকার মরা ডানা ও ডানার গুঁড়ি, উড়িয়ে নিশীথ বললে, 'কাল তোমাকে সকালেই অফিসে যেতে হবে?'

'হ্যাঁ, সাতটার সময়। উঠতে হবে পাঁচটায়। দাড়ি কামিয়ে ল্যাট্রিন সেরে চান করে কফি, আলুভাজা আর ডিমসেদ্ধ খেয়ে বেরিয়ে যেতে হবে—'

কফি আলুভাজা আর ডিমসেদ্ধ। ল্যাট্রিন সেরে। কী সব কথা জিতেন দাশগুপ্তের মুখে। এ-রকম ধরনের কথা, একটা আত্মতুষ্টি জিতেনের নাকে চোখে ঃ এসব কী দেখেছ শুনেছে আগে নিশীথ যখন জিতেনের এখানে আসত?

'কফি আলুভাজা আর ডিমসেদ্ধ?'

'হ্যাঁ।'

'রোজ।'

'হ্যাঁ। যেদিনই সকাল-সকাল অফিস থাকে—'

'রোজই আলুভাজা কেন দাশগুপ্ত সাহেব? রোজই ডিমসেদ্ধ?'

'আমার ভাল লাগে।'

ঢং করে একটা শব্দ হল। পাশের কামরায় বড় ঘড়ি আছে। দেড়টা বেজেছে হয়ত। নিশীথ এক-আধটা মশা টের পাচ্ছিল। পাতলা চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিলেই চলবে। বিশেষ ঘুম হবে না আজ রাতে। কাল

সকালবেলা কোন দিকে যাবে সে? জিতেন তো বেরিয়ে যাবে। নতুন জায়গায় এলে অদ্ভুত অবোলা হরবোলা জিনিসগুলোর ভিতর ঘুম আসতে চায় না তার। পাশের কামরায় দেয়ালে আবার কিন্নরের বাচ্চা আছে, দেড়টা বাজিয়েছে এরপর দুটো আড়াইটে তিনটে সাড়ে তিনটে করে পাঁচটা অব্দি বাজিয়ে যাবে—শুনতে হবে নিশীথকে। খুব সম্ভব পাঁচটার সময় ঘুম আসবে ( জিতেন দাশগুপ্ত বেরিয়ে যাবে তখন )।

পাঁচটায় ঘুমূলে আটটার আগে উঠতে পারবে সে? ওপরে যে-মহিলা আছে জিতেন তাকে কী পরামর্শ দিয়ে যাবে? বারবার নিশীথের নিদালি দেখবার জন্যে ওপরের থেকে নেমে আসবে কি সে? তারপর ঠিক যখন আটটা-সোয়া আটটার সময় জেগে উঠে নিশীথ সুড়সুড় করে বেরিয়ে যাবে পূর্ব দক্ষিণ কলকাতার কোনো ঘাঁটির উদ্দেশে, কিংবা আরো দূরে উত্তর কলকাতার দিকে, তখন কি 'চা হয়েছে, চা হয়েছে, না-খেয়ে যাচ্ছেন? চা এনেছি—' পিছু ডাক শুনতে হবে মেয়েটির?

না, না, তা হবে না। সে সব মেয়ে আজকাল আর নেই, দশ-বার বছর আগে কলকাতায় সে-রকম দু-একজনকে দেখেছিল নিশীথ, আজকালকার এ-সব স্ত্রীলোকেরা আদিমানবের মত রোমাঞ্চে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আগুনের ব্যবহার যারা প্রথম শিখেছিল।

'এস-সি মুখার্জি কে?'

'কে এক মুখুজ্যে'—জিতেন দাশগুপ্ত বললে।

তারপর বললে, 'সলিল মুখুজ্যের স্ত্রী বার্মিজ; ওরা রেঙ্গুনে ছিল অনেক-দিন। সলিলবাবুর স্ত্রীর নাম মা থিন। রং খুব ফর্শা, লম্বা পুরুষের মত দেখতে। আমি ওকে মার্টিন সাহেব বলি।' শুনতে-শুনতে নিশীথের ঘুমের আবেশ কেটে যাচ্ছিল।

'তোমার শাশুড়ি মা-থিন কোথায় আছেন জিতেন দাশগুপ্ত?'

'ওরা আজকাল কলকাতায়ই আছে, পার্ক সার্কাসে থাকে। বড় দাঙ্গাটার সময়েও এখানেই ছিল। হেঁটে বেড়িয়েছে, হামলা দেখেছে; পুলিশের ট্রাকে ছুটে, রেডক্রশের গাড়িতে চড়ে দিনরাত একঠাঁই করে দিয়েছে। ঐ ওদের রকম। মানুষকে মানুষ খুন করেছে, ম্যানহোল থেকে আধকাটা মানুষ টেনে বের করে হাসপাতালে দৌড়নো তাকে বাঁচিয়ে তোলবার জন্যে, মার্টিন মুখুজ্যে

এই তো করেছে দাঙ্গার সময়। মরা মানুষ আধ-মরা মানুষ, ডাক্তার আর হাসপাতাল, টেলিফোন আর ট্রাক চার্টার ; মনে কোনো বিষ নেই, বেকুবি নেই, বজ্জাতি নেই, যারা মারছে তাদের ওপর হামলা নেই, ভয় নেই, লোভ লুট চঞ্চলতা নেই, মার্টিন সাহেব যে আমার শাশুড়ি এ কথা ভেবে মাঝে-মাঝে আমি খুব ঝুম হয়ে থাকি, হ্যাঁ বেশ লাগে।'

নিশীথ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'বেশ ভালো, মহৎ শাশুড়ি পেয়েছ তো। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

জিতেন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'ঘুম পাচ্ছে? তাহলে ঘুমোও।'

সাদা পাতলা চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিশীথ বললে, 'লম্বা ফর্শা তোমার শাশুড়ি? অ্যাংলো ইনডিয়ানের মতন দেখতে? মা-থিন তো রেঙ্গুনের মেয়ে। অথচ মেমের মতন—'

'ওর বাবা খাঁটি বার্মিজ, রেঙ্গুনের খুব বড় ব্যারিস্টার ছিলেন। মা-থিনের মা নরওয়ের মেয়ে—'

'ওঃ!' নিশীথ বললে, 'তোমার স্ত্রী দেখতে কেমন?

'চলো দেখবে।'

'এখন তো রাত দুটো।'

'চলো ওপরে। পাঁচটার সময় অফিসে যেতে হবে। এ তিনঘণ্টা জেগেই কাটিয়ে দিই। চলো, আমার স্ত্রী বাংলা বলতে পারে খাঁটি বাঙালি গিন্নির মতন, তোমার বাংলা লেখাটাও পড়েছে, পোলিটিকসেই উৎসাহ বেশি, তবে—'

জিতেনের ঠোঁট গাল চোয়াল একটু বেঁকে কুঁচকে স্বাভাবিক হয়ে আসতেই সে বললে, 'সাহিত্যেও নজর আছে নমিতার—'

'নমিতার?'

'নমিতার। চলো যাই, তুমি সিগারেট খাও?'

'এক-আধটা, দলে পড়লে।'

'আমারও তাই। ওপরে টিন আছে। শব্দ শুনছ?'

'কোথায়?'

জিতেন দাশগুপ্ত তার একহারা লম্বা কালো শরীরটা কেমন একটা উৎসাহের দুর্দমনীয়তায় আড়ষ্ট কঠিন করে চশমার ফাঁক দিয়ে সিলিঙের দিকে চোখ মেরে বললে, 'ঐ ঐ টক টক ডুক ডুক চক চক—'

'তার মানে ?'

'পাঁয়তাড়া কষছে—'

'কেন ?'

'ঘুম হচ্ছে না, ব্রোমাইড দিয়ে এসেছি।'

'অসুখ ?'

'না, এমনিই—বিছানায় একজন না-থাকলে আর-একজনের ঘুম ফেঁসে যায়। কয়েকটা মাস ধরে এই রকমই হচ্ছে। পরের কয়েকটা বছর হবে।' খুব আশ্বাসের সঙ্গে বললে জিতেন দাশগুপ্ত। নিশীথ আড়চোখে জিতেনের দিকে তাকাল। জিতেন মানুষ খুব স্থির! বলছেও স্থিরতার কথা; কিন্তু কোনোদিনই মেয়েঘেষা ছিল না সে। আগুনের মতন মেয়েদের কাছ থেকেও অনায়াসে কেটে পড়ে অনেক দূরে একটা নির্বিকার গাছের মত আকাশে বাতাসে স্বয়ম্ভূ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার আশ্চর্য সহজশক্তি ছিল। কী বলছে আজ রাতে জিতেন দাশ? কেমন বসন্ত রাতে ধনেশ পাখির মতন দেখাচ্ছে তার চোখ। মাথা ঘেমে না-উঠলে হেসে ফেলত নিশীথ।

'হাসছ? নিশীথ ?'

'ওপরে যাও তুমি দাশগুপ্ত।'

'তুমি যাবে না ?'

'আমি ঘুমে ভেঙে পড়ছি, বসতে পারছি না। এ-রকম অবস্থায় ওপরে গিয়ে দাঁড়ালে সেটা ঠিক হবে না জিতেন।'

নিশীথ বিছানায় শুয়ে পড়ল।

'এক মাস তোমাদের এখানে আছি। কথাবার্তা হবে। খুব জমবে আলাপ।' ঘুমের চোখে জিতেনকে বলল।

'বেশ বেশ। মশারি আনো নি ?'

'না।'

'অবস্থা দেখছি, ওপরের থেকে পাঠিয়ে দিতে পারি কি না—'

'না না এত রাতে আর ওপর-নীচ চলে না।'

'আমি সবই চালু করে রেখেছি, ভাই নিশীথ।'

'আমি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছি। মশারির চেয়ে ঢের ভালো। ভারী আরাম লাগছে। ওপরে যাবার সময় বাতিটা নিভিয়ে দেবে ?'

'পেয়েছি', জিতেন বললে, 'এই যে সঙ্গে-সঙ্গে লম্বা-লম্বা দড়ি। তোমার নেয়ারের খাটের চারিদিকে চারটে লম্বা রড দেখেছ তো, বেঁধে ঠিক করে নাও'—ঘরের এক কোণে একটা মস্ত বড় আলমারি খুলে ধপধপে নেটের মশারিটাকে বড় একলতি সমুদ্রফেনার মত নিশীথের বিছানার দিকে ছুঁড়ে মারল জিতেন।

'তুমি ভেবেছিলে আমার স্ত্রীকে দিয়ে মশারি পাঠিয়ে দেব!'

'এত রাতে মিছেমিছি কাউকে বিরক্ত করা ভাল হত না। ভারি খাসা মশারিটা তো তোমার, চমৎকার লাকসের গন্ধ আসছে—' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জিতেন দাশগুপ্ত। বিয়ে করেছে বলে সে দূরে সরে গিয়েছে—সরে যাচ্ছে—তার অনেকদিনের অন্তরঙ্গ মানুষরাও তাই মনে করে। এক কাপ চা চাইল না নিশীথ, একটা সিগারেট চাইল না। বোর্ডিঙে খেয়ে এসেছে মিথ্যা কথা বলে, না-খেয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে রইল—এর আগে যতবার নিশীথ কলকাতায় এসেছে নিশীথের দাবিদাওয়া মেটাতে গিয়ে ভালবাসার নেবুর কচলানিতে প্রায় তিতো হয়ে উঠত জিতেনের মন। কী রকম অনির্বচন হয়রানির দিন গিয়েছে সে সব। আর এখন?

'কিছু খাবে নিশীথ? এক কাপ চা?'

'তুমি ওপরে যাবে না জিতেন?'

'যাচ্ছি। একটা সিগারেট?'

সিগারেট পেলে হত নিশীথের। কিন্তু সিগারেট চাওয়া মানে জিতেনকে ওপরে পাঠিয়ে দিয়ে রাত দুটোর সময় আমার চক্ষুস্থির, জিতেনের স্ত্রীরও।

'সিগারেট? না এখন খাব না দাশগুপ্ত। দলে পড়ে এক-আধটা খাই। খাওয়ার অভ্যেস নেই তো আমার।'

'মশারিটা টানিয়ে নাও। দিচ্ছি টানিয়ে—'

'আমি নিচ্ছি টানিয়ে।'

'তোমার বিছানার পাশেই সুইচ। বিছানায় শুয়ে হাত বাড়িয়েই পাবে; এ কামরার সব চেয়ে চড়া আলো জ্বলে উঠবে; দিনের মতন দেখাবে ঘরটাকে। নীল শেডের আলো জ্বলুক। দরকার হলে নিভিয়ে দিও। সুইচটা উত্তর দিকের দেয়ালে—ঐ যে হোঁৎকা টিকটিকিটা যেখানে—ঐ যে—আঃ—বাস—পোকাটাকে সাবড়ে দিল—'

'দেখেছি। হিতেন দাশগুপ্ত কলকাতায় ?'

'না।'

'ঋতেন ?'

'না।'

'ওদের স্ত্রীরা কোথায় ?'

'ওরা সব ভাগলপুরে—'

'এখানে তুমি আর নমিতা, আর-কে আছে ?'

জিতেন দাশগুপ্ত চশমা খুলে জন্মান্ধের মত কেমন যেন নির্লিপ্ত নিরালোক চোখের মৃদু ঝলসানিতে নিশীথের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললে, 'ঋতেন শিগগির এখানে আসবে না, তার স্ত্রীও না। হিতেন হয় ত একা একবার আসবে, কিন্তু মাস দেড়েকের আগে না। এখানে রইবে, না তার শ্বশুর বাড়িতে, বলতে পারি না। ওরা আজকাল আমার এখানে বড় একটা থাকে না। কলকাতায় এসে আমার এখানে উঠলেও তারপরে ছিটকে পড়ে।'

ওপরে ঢক-ঢক টাক-টিক ডক-ক্রক শব্দ হচ্ছিল; ওয়াকিসুরে তো বটেই: এক অধীর চেয়ার টানা, দেরাজ খোলা, লাথিয়ে সুটকেশ ঠেলে দেওয়া, দেরাজ বন্ধ করা, ক্যাম্প খাট সরিয়ে ফোল্ডেবল চেয়ার গুটিয়ে মেঝের ওপর দড়াম ফোটানো, নিশীথ ওপরের কোজাগরী আওয়াজগুলোর রকমারি কৈফিয়ত ঠিক করে নিচ্ছিল খুব স্থির দৃষ্টিতে জিতেন দাশগুপ্তের অন্ধ চোখের দিকে, অন্ধকারে মাথার ওপরের বড় বিমটার চারিদিককার স্কাইলাইট-গুলোর দিকে তাকিয়ে। চোখে চশমা আঁটছে, খুলছে, সাঁটছে, খুলছে জিতেন; এইবারে সেঁটে নিল।

'ওপরে যাও জিতেন। রাত এখন আড়াইটে।'

'ঋতেনের তো এইরকম ভাব—' নিরাশায় হাত ঘুরিয়ে শূন্য অন্ধকারের ভিতর ছেড়ে দিয়ে জিতেন বললে, 'আগে তো দাদাই ছিল ওদের সব। এখন দাদাকে মজস্তালি সরকার বানিয়ে বড়-বড় হাতি পাঠিয়ে দিচ্ছে, যেন নিজের পেট ফাঁসিয়ে বেড়ালটা হাসবে আর ওরা হুলো বেড়ালের গল্প পড়ে হাসবে। দুশো মজা হবে, সাতশ হাসি, কী বল হে নিশীথ'—জিতেনের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, 'কিন্তু ঋতেনের ঘানির তেল খেয়ে তো আর রমাচক ঘুরছে না। ঘুরছে নিজের নিয়মে।'

জিতেন দাশগুপ্ত কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললে, 'আমার ভাইদের আমি খুব ভালবাসি, ওরা তা বুঝবে না। আমার মত ভালবাসতে পারবে না। মাঝে-মাঝে কেমন কঠিন হয়ে ওঠে মন ওদের কথা ভাবতে গিয়ে। থাক, মনটা নরম হোক, মৃদু হোক, স্নিগ্ধ হোক। নমিতা খুব সাঁচা মেয়েমানুষ। মশারি টানিয়ে নাও নিশীথ।' নীল শেডের বাতিটা জ্বলছিল। জিতেন দাশগুপ্ত চলে গেছে। নিশীথ দাঁড়াল। ঘরের ভিতর কয়েকবার পায়চারি করে বারান্দার দিকে খোলা দরজাটা বন্ধ করে, এল জিতেনের টেবিলের কাছে। কোথাও বাথরুম আছে কি না জিতেনকে জিজ্ঞেস করা হয় নি। নীচের তলায় কোথাও চাকর-বাকর বা অন্য কেউ আছে কি না বলে যায় নি জিতেন। তাহলে এখন ঘুমোতে হবে। কিন্তু কী করে আসবে ঘুম। জিতেন বিয়ে করেছে শুনেই ঘুমের চটকা ( এসেছিল একসময় ) একেবারেই ভেঙে গেছে। বিয়েই শুধু করে নি। একটা ফিরিঙ্গি মেয়েকে বিয়ে করেছে। এরপর জিতেন দাশগুপ্তকে দিয়ে কিছু আর করে উঠতে পারবে না নিশীথ ঃ ও নাগালের বাইরে চলে গেছে। লেক রোডে বাড়ি ছিল জিতেনের—হৃদয় ছিল মানুষটার—ভারি অন্তরঙ্গতা ছিল নিশীথের সঙ্গে। নিজেদের ভাইদেরও ভালবাসত জিতেন, কিন্তু ওর ভাইয়েরা উচ্চণ্ডে গোছের, দাদার কাছ ঘেঁষতে চায় না। নিজেদের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে গেছে সব অনেকদিন থেকেই। বেশ বড়-বড় চাকরি ব্যবসা করছে তারা।

এ-রকম অবস্থায়—জীবনের শেষ কটা বছর জিতেন দাশগুপ্তের এখানে এসে কাটিয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল নিশীথের। পদ্মার ওপারের দেশটাকে তার খারাপ লাগে না, যেখানে একটা বড় প্রাইভেট কলেজে কাজ করছে সে, এ কাজে ভুয়ো মর্যাদা আছে, টাকাকড়ি নেই ঃ কুড়ি বাইশ বছর কলেজে কাজ করবার পর এখনও দেড়শ টাকা মাইনে।

কলেজের কাজটাকে মজুরির কথা বাদ দিয়ে, এমনি কাজ বা রুচি-রচনার দিক দিয়ে দেখতে গেলে, কোনোদিনই ভাল লাগেনি তার ঃ সঙ্গে-সঙ্গে লাইব্রেরিতে নতুন কিছু-কিছু বই, প্রকৃতিতে এসে পড়ত রৌদ্রের ফোয়ারা, নীল উজ্জ্বল চক্রবাল, আকাশে হরিয়াল , ফিঙে, বক, বড়-বড় সুন্দর ওয়াক পাখি, কলেজের ময়দান পেরিয়ে খানিকটা দূরে গেঁয়ো রাস্তা ঘেঁষে টি টি তেপান্তর, ঝিল, কানসোনা মধুকূপী পরথুপি ঘাস, শরের বন, শনের হোগলার ক্ষেত,

অপরিমেয় কাশ, হঠাৎ এক-আধটি নিখুঁত মুখসৌষ্ঠব, স্ত্রীলোকেরই, আরো দূরে বুনো হাঁসের জলা মাঠ, স্নাইপ, সকালের উড়িসুড়ি নিস্তব্ধতা তখন ভাল লাগত নিশীথের। ভাল লাগত বটে, কিন্তু কলেজের, বিশেষত মফস্বল কলেজের অধ্যাপকের পক্ষে বনের বেড়াল, ভাম, ভোঁদড়, সজারুর চরায়-চরায় ঘুরে বেড়ানো, বালিহাঁস, মরাল, ওয়াক পাখিদের ওড়াউড়ি আসা-যাওয়া, ভালবাসা দেখবার জন্য হাঁটুজল ভেঙে, সারাটা দিন ডুবজল গলাজলের দিকে ভেসে যাওয়া, সমস্তটা শরৎরৌদ্রের—শালিধানের—বরোজের উড়ু-উড়ু পান বনের ঝরঝরে দিনটাকে, রাতের নক্ষত্রনির্ঝরে এসে নিস্তন করে রাখা, এ সব কাজ মোটেই সম্মানজনক নয়, এ সব নিয়ে সচেষ্ট থাকলে অধঃপতিত বিবেচিত হবে সে; কারুরই সায় পাবে না। এ সব কাজ মানুষের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু ওরা বলে অধ্যাপকের কাজ আলাদা, রুচি ভিন্ন, দায়িত্ব আর-এক রকম! অধ্যাপক যে মানুষ নয় তা তো নয়। কিন্তু ছাঁকা মানুষ, পরিস্রুত জলের মত কুঁজো, কলসি বা ওয়াটার কুলারের ভিতর। কী হবে ও-রকম জল হয়ে; নিশীথ হতে চাচ্ছিল নির্ঝরের জল, কিংবা জল, সময়সীমার অব্যক্ত থেকে নিঃসৃত সাগরের। কলেজের কাজ ছেড়ে দেবে সে।

কলকাতার চেয়ে মফস্বলের প্রকৃতিলোক ঢের ভাল লাগে তার। সেই সব মানুষদেরও ভাল লাগে—মফস্বলের গ্রামপ্রান্তর থেকে উপচে পড়ে যে-সব মানুষ—কার্তিকের বিকেলের রোদে, চোত-বোশেখের শেষ রাতের ফটিক জলের মত জ্যোৎস্নায়। এসব মানুষ সব ঋতুতে সব সময়েই ভাল। এদের অসুস্থতা নেই যে তা নয়, অভাব অনেক। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার বিষক্রিয়া অনেকদূর পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছে ওরা। যে-প্রণালীতে রুখেছে তা বিজ্ঞানসম্মত নয়; কিন্তু বিজ্ঞান কত দিনে মানুষকে কত বেশি আর দান করতে? দেহের সুবিধা ছাড়া কিছু কি পারছে আর, দান করতে? পারবে কি কোনোদিন? মানুষের হৃদয়েরও শুভ সংহতির কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। সেটা হবে কি? সেটা হবে বলে মনে হয় না। নিশীথ ঘরের ভিতর পায়চারি করছিল। ঘণ্টাখানেক হল জিতেন দাশগুপ্ত ওপরে চলে গেছে। নিজের মনের—এমন-কি মাঝে-মাঝে পৃথিবীর মনের সমস্যা নিয়ে এমন নিমগ্ন হয়ে পড়ছিল নিশীথ যে ঘরের বাইরের অন্য কোনো দিকেই খেয়াল ছিল না। মশারিটা টানাতে হবে। ঘুম হবে না। রক্তের কোনো কণিকায়ই ঘুম নেই, কিংবা অনুভূতির, কিন্তু

ঘুমুতে পারলে ভাল হত। সঙ্গে ব্রোমাইড থাকলে ভাল হত। বেরিয়ে পড়বে না কি ? কোনো একটা ফার্মাসিতে গিয়ে ঘুমের ওষুধ কিনে আনবে? জলপাই-হাটির ডাক্তার ঘোষের প্রেসক্রিপশনটা আছে সুটকেশের ভিতর ; সেটা দেখিয়ে ওষুধ আনা চলে—এমনি যদি না দিতে চায়। নাঃ শুয়ে পড়া যাক, মশারিটা টানিয়ে নিতে হবে। বেশ মশা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে-মশার কামড় খাচ্ছিল নিশীথ।

জিতেন দাশগুপ্তের দিকে মন ঘুরে গেল তার—ওপরে নমিতা রয়েছে ; মাথার ওপর শাদা ধবধবে কংক্রিটের গাঁথুনি, মোটা বড় বিম দুটোর দিকে তাকাল নিশীথ। টের পেল ঘট ঘট ডক ঠক টাক টকাস শব্দ হচ্ছে এখনো ওপরে। জিতেন কি জেগে আছে এখনও ? কী করছে ? ঘুমিয়েছে জিতেন ? এতক্ষণ তো নিশীথ মফস্বলের কথা, কলেজের কথা, পদ্মার পারের দেশের প্রকৃতি, মানুষ, স্ত্রীলোকের কথা ভাবছিল, ভাবছিল পৃথিবীর রোগের কথা, রোগের উপশম সম্ভব কি না ;—হঠাৎ উপলব্ধি করল নিশীথ যে তার সমস্ত ভাবনার ভিতরেই এই একঘণ্টা-দেড়ঘণ্টা ধরে ওপরের তলার ঠক ঠক ঘট ঘট গিট ঘাট শব্দ শুনে এসেছে সে ; এ শব্দ কমে নি তো কখনও, তবে জোর কমে গিয়েছে, কিন্তু তবুও আছে, রয়ে গেছে এখনও, শব্দ হচ্ছে খুব আওয়াজ করে নয়, কিন্তু কল্কে ফুলের পাপড়ি ঝরার মত হৃদয়গ্রাহিতারও নয়।

নমিতা ছাড়া আর-কেউ আছে কি ওপরে ? জিতেন দাশগুপ্তের বেশি রাতের খিদমৎ চলেছে ? জিতেন তো কোনো দিন সিগারেট বা পানও খেত না। এখন কি গেলাশ ঠুকছে ?

পিপাসা পেয়ে গেল নিশীথের। ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে কোথাও জলের ঘড়া কুঁজো কিছুই দেখতে পেল না। এক গ্লাস জল চাই, খুব ঠাণ্ডা জল ; দু গেলাস, তিন গেলাস, দশ গেলাস—ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা কেমন যেন বোশেখ মাসের পোড়া মাটির মত লাগছে শরীরটাকে, জিভটাকে ; কে যেন ভিয়েনে চড়িয়েছে, আঙুরের মত যত রক্ত ছিল শরীরের ভিতর শুকিয়ে বালি হয়ে যাচ্ছে সব। নিশীথ তাকিয়ে দেখল ঘরের ভিতর দিকের বাফ রঙের খোলা দরজা পেরিয়ে সিঁড়ি ঘুরে বেঁকে দোতলার দিকে চলে গেছে। উঠে গেলেই হল ; দোতলার ঘর-দোর আনাচ-কানাচ সবই তো জানা আছে তার। জানে রেফ্রিজারেটার কোথায় থাকত—রেফ্রিজেটারের ভিতর বড় কাচের গাগরীতে

জল, কমলালেবু, ক্ষীরের সন্দেশ, পুডিং, ফালি করা বাতাবি লেবু, পেঁপে, অরেঞ্জ স্কোয়াশ, লেমন স্কোয়াশ।

কিন্তু তখন তো জিতেন একা ছিল। নিজে সেধে নিশীথকে ফল মিষ্টি-শরবৎ খাওয়াত গরমের রাতে।

নীচের তলায় পায়চারি করতে-করতে নিশীথ মনে-মনে হাসছিল। জল যে ভাল জিনিস—ভারী ঠাণ্ডা—জল আর ঘুম, দোতলার খোলা ঘরের দক্ষিণা বাতাস আর সিলিঙ ফ্যানের হাওয়ার চেয়ে স্নিগ্ধ জিনিস যে পৃথিবীতে কোথাও নারীপ্রেমেও নেই—জিতেন দাশগুপ্ত তা বুঝিয়ে দিয়েছিল একদিন। সেই জিতেনের বাড়িতেই সামান্য এক গ্লাস জলের অভাবে আজ মারা পড়ছে নিশীথ।

মার্টিন সাহেব তো খুব ভাল মানুষ—নমিতা খারাপ মোটেই নয়, কিন্তু তবু একটি নারী যখন একজন পুরুষকে দখল করে বসে, বিয়ে হয় তখন, দুটো ভাল জিনিসের থেকে তাদের অজান্তেই বুঝি বেরিয়ে আসতে থাকে। বিবাহিতেরা সেটা বোঝে না। তারা পরস্পরকে বুকে কোলে টেনে দৈবী স্ফটিকের কাজ করে বহিঃপৃথিবীর নিশীথ অসিত পরভৃৎ প্রভৃতির চোখে, ক্রিস্ট্যালের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে চোখ মুড়োতে থাকে জীবনের মরুভূমিকে চেরাপুঞ্জি বলে ভুল না হলেও। এ না হলে এই গরমের রাতে নিশীথের জন্য এক কুঁজো জলের ব্যবস্থা না-করে ওপরে চলে গেল জিতেন! দু-চারটে সিগারেট পর্যন্ত রেখে গেল না। জিতেনকে বলেছিল বটে নিশীথ যে দলে পড়লে এক-আধটা সিগারেট খায় সে; কিন্তু তার মানে কি তাই? ওপরে সিগারেটের টিন রয়েছে জিতেনের। উচিত ছিল না একটা টিন নীচে নিশীথকে দিয়ে যাওয়া—এ-রকম হাঁপ-ধরা গা-পোড়া রাতে অন্ধকারটাকে পুড়িয়ে-পুড়িয়ে একটু—

'কে?'

নিশীথ খানিকক্ষণ সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রইল। না, কেউ নয়। এত রাতে কে আর আসবে। কর্তা গিন্নি সর্পকুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছে দোতলায়, কয়েকটা ছুঁচো আর ইঁদুর দাঁত খিঁচিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে, নীচে চাকর-বাকর কেউ নেই, কেউই নেই জিতেনের, এখানে যতবার এসেছে, থেকেছে, নিশীথ নীচের তলাটাকে ঘাটিয়ে দেখতে যায়নি একবারও। সবই ছিল তার দোতলায়। নীচে কী আছে, না আছে, জানেও না সে। এ ঘরে কোনো ফ্যানও নেই। নিশীথকে

সারারাত এখানে উঠে, বসে, শুয়ে কাটাতে হবে। অথচ ফ্যানের কোনো ব্যবস্থা নেই। নিশীথ ঘরের কোণে একটা ময়লা নড়বড়ে ড্রেসিং টেবিলের কাছে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে জিতেনের নতুন অদ্ভুত পতঙ্গজীবনের কথা ভাবছিল। না কি পাখা খুঁচিয়ে শুঁয়োপোকা হয়ে গেল? ওপরের থেকে একটা টেবল ফ্যান পাঠানো যেত না? কিন্তু ভেবে লাভ নেই। এ হবেই। একটা ভাল কথা মনে পড়েছে; কলকাতায় আসবার আগে আসামের দিকে গিয়েছিল নিশীথ। হাফলঙে গাড়ি থেমেছিল অনেকক্ষণ; একজন আসামি ভদ্রলোক নেমে গেলেন, চলে যাবার সময় নিশীথকে ধন্যবাদ জানিয়ে, ( কেন যে, ভুলে যাচ্ছে নিশীথ ), তার পকেটে এক প্যাকেট ভাল সিগারেট গুঁজে দিয়ে, চলে গেলেন। সে সিগারেট কোথায় রাখল নিশীথ?

নিশ্চয়ই ফেলে দেয় নি। নিজে খায়নি, কাউকে খেতেও দেয়নি—মনেই ছিল না তার প্যাকেটটার কথা। কিন্তু কোথায় রেখেছে? বার কয়েক পকেট হাতড়ে, বিছানা-বালিশ উলটে-পালটে, হোল্ডঅলটাকে তচনচ করে, দেখল। নেই কোথাও। টস-টস করে ঘাম ঝরে পড়ছে, মাথাটাই ঘামিয়েছে সবচেয়ে বেশি। কেমন গা বমি-বমি করছে। ঘরের জানলাগুলো খুলে দিল। সুটকেসটা খুলে ভাল করে খুঁজে দেখতেই বেরিয়ে পড়ল প্যাকেটটা—

সিগারেট হাতে করে বিছানায় এসে বসল সে। কিন্তু দেশলাই তো নেই, দেশলাই কোথাও নেই এটা হলপ করে বলতে পারে সে। জলপাইহাটি ছাড়ার পর দেশলাইয়ের কোনো রকম প্রয়োজন হয় নি; জলপাইহাটিতে দু মাসের ভিতর দেশলাই ধরেছে সে; দেশলাইয়ের অভাবে তাহলে সিগারেটও খাওয়া যাবে না; অথচ এটা জিতেন দাশগুপ্তের বাড়ি; ওপরের ঘরে জিতেন যদি এ রকম নিঃসাড় হয়ে পড়ে না থাকত তা হলে টেবল ফ্যান, ঠাণ্ডা জল, দেশলাই সবই তো জুটে যেত তার। সিগারেটের প্যাকেটটা জানলার ভিতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে।

ওপরের সে সব শব্দ থেমে গেছে একেবারে; এইবারে চণ্ডীফুলের পাপড়িও ঝরছে না আর; এখন তাহলে লাল ঝুমকোর ঘুম কণ্টিকারীকে বুকে জড়িয়ে। সময় হয়েছে তা হলে, ওপরে চলে যাবে নিশীথ।

জিতেন দাশগুপ্তরা দরজা খোলাই রেখেছে নিশ্চয়ই; একবার উঁকি মেরে দেখে নেবে। তারপর খুঁজে বার করতে হবে মিট সেফ; সেটা যদি বন্ধ থাকে

তা হলে চাবিটা বের করে নিতে হবে, দেখতে হবে রেফ্রিজারেটরে কী কী রয়েছে। নিশ্চয়ই নতুন কিছু আমদানি হয়েছে। পুরনো হালচাল বাতিল হয়েছে কিছু তো বটেই; অদলবদল কতদূর গিয়ে দাঁড়াল দেখা যাক। খুব ঠাণ্ডা জল—বরফ দেওয়া সাধারণ কলের জল। কার্লসবাড সোয়াপ্পের জল পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই, আগে যে-সব জায়গায় এগুলো থাকত, এখনও যদি সেখানেই রাখা হয়, তা হলে অন্ধকারে চোখ বুজে টেনে নেবে বোতলের পর বোতল। এতটা পিপাসা না পেলে, নীচে জলের পাখার ব্যবস্থা থাকলে নমিতা দাশগুপ্তের দোতলার ফ্ল্যাটে ঢোকবার কোনো দরকারই বোধ করত না নিশীথ। কিন্তু জলের তাড়না তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। জলের তেষ্টা মিটলে মিটসেফ খুলে ক্ষিধে মেটাতে হবে।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় গিয়ে দাঁড়াল নিশীথ। যেদিকে তাকায় সেদিকেই কার্পেট—দোতলার আদিগন্ত ভিত্তিচিত্রগুলোকে ঢেকে ফেলে পরিকল্পনা ও রঙের বাহারে নক্সায় অভিভূত করে রেখেছে সব। জয়পুরী গালিচা হয় ত এগুলো? ওগুলো মির্জাপুরী। দোতলায় সিঁড়ির মুখে মস্ত বড় হল ঘরটা। হল ঘরে একটু এগিয়ে পিছিয়ে বাঁ হাতি ডান হাতি করলেই ড্রেসিংরুম, ড্রয়িংরুম, খাবার ঘর, দুটো শোবার ঘর, গোশলখানা সবই চোখ বুলিয়ে দেখে নেয় নিশীথকে। নিশীথও দেখে তাদের। এদের যদি গলা থাকত, কী বলত নিশীথকে? এ সব ঘর দোর তো নিশীথের পোশমানা জিনিস ছিল, তার জীবনের সেই সব বেতালসিদ্ধির দিনে। হলঘরে মাথার ওপরে বেশ একটা প্রকাণ্ড চৌকো সন্দেশের মত বাতি জ্বলছে। বেশ দেখাচ্ছে ঘরটাকে। গালিচার সমারোহ, সোফা, কুশন, এনসাইক্লোপিডিয়া মোটা-মোটা দামি বই-ঠাসা আলমারি—কিন্তু বাতিটা জ্বালিয়ে রাখবার কী দরকার ছিল সারারাত। কেউ দেখবে না, অথচ ঠাটটা জ্বলে যাবে, এই জন্যে? গোটা দুই বড়-বড় ফ্যান রয়েছে এই ঘরে। বাতি নিভিয়ে ফ্যান খুলে নিশীথ তা হলে এবার সোফায় শুয়ে থাকবে?

আগে জল চাই। খাবার ঘরে ঢুকলেই জল, ওয়াটার কুলারে—অঢেল জল। ভাবতে গিয়ে জলের তেষ্টা অনেকটা কমে গেছল নিশীথের। জল খাবে বটে কিন্তু জিতেন দাশগুপ্ত কী করছে? কিন্তু জল খেতে হল। রেফ্রিজারেটরের থেকে বোতল বের করে নয়—এমনিই খাবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল

নিশীথ। ঘরটা খোলাই ছিল, সব দরজাগুলোই খোলা। খোলা সব জানালা, জিতেনের চোরের ভয় নেই—নমিতারও না। জানে না কি কলকাতার জানালা-ভাঙা চোরেরা, যে এখানে শিক ভাঙতে হবে না, কপাট ছুটিয়ে দিতে হবে না, দেয়ালের পাইপ বেয়ে উঠলেই আর-কোনো সমস্যা থাকে না। মাল নিয়ে সারারাত চালানির কারবার চলতে পারে?

হাওয়া খেলছে ঘরে, ফ্যানও ঘুরছে। নিশীথ একেবারে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

গরমের রাতে দরকার বুঝে ব্যবস্থা করেছে তারা। নমিতা অবিশ্যি আমেরিকান স্ল্যাকসটা পরতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ঘুমে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। জিতেন ঝাড়াঝাপটা, শুধু চশমাটা খুলতে ভুলে গেছে। কয়েকটা মদের বোতল আর ডিকান্টার রয়েছে ঘরের একটা ঠাণ্ডা কোণে। জিতেন খায় না এ সব। নমিতাও না। হয় তো নমিতার কোনো-কোনো বন্ধুদের জন্য রাখতে হয়, কিংবা মার্টিন সাহেব এসে খেয়ে যায়। কিংবা মুখুজ্যে সাহেব। নিশীথ এগিয়ে দেখল দামি হুইস্কি, ব্রানডি, শ্যাম্পেনের বোতল সব, নামজাদা বিলিতি ফরাসি জিনিস। কার্লসবাডের জলও রয়েছে ওখানে, সোয়াম্পেরও। আজকাল অবিশ্যি এ সব নামের নেশা নষ্ট হয়ে গেছে। সে সব আগের জিনিস নেই এখন আর। তবুও দুটো জলের বোতল আর একটা গ্লাস নীচে নিয়ে যাবে ভাবছিল নিশীথ।

এত সমৃদ্ধি থাকতে জিতেন দাশগুপ্ত আলু ভাজা খেয়ে মরে। দেখ, কেমন হাঁ করে পড়ে আছে লম্বা থুরকিসা মাছের মত। নাকে চশমা আঁটা, বাকি সমস্তটা—মন নয়, শরীরবৃত্তিও নয়; অচেতন ওষধির মত যেন—রাতের বাতাসে স্নিগ্ধ হচ্ছে। নিশীথ দুটো জলের বোতল তুলে নিল। মদের বোতলগুলোর পাশে, এক গোছা চাবি চকচক করছিল। ঘরের সব দেরাজ বাকস আলমারির চাবি হয় তো এই গোছার ভিতর রয়েছে। অথচ এ-রকম হ্যাঁচকা পড়ে আছে। চাবি হাতে তুলে বোতল দুটো রেখে দিল নিশীথ। কয়েকটা দেরাজ খোলবার পর মনিব্যাগ পাওয়া গেল। তিন-চারটে ওয়ালেট, একশ টাকার সিলমারা নোট সব প্রতিটি ব্যাগেই। দু-একটা টাকা তুলে নেবে সে? টাকার খুব দরকার নিশীথের। কলেজের কাজ ছেড়ে দিতে হবে। কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে পরিবার আনা দরকার। এই লেকপ্রদেশের

দিকেই থাকলে, অথচ চাকরি করবার দরকার নেই। করেছে আজীবন মফস্বলে অধ্যাপনা, কলকাতায় পাবলিক সার্ভিস কমিশন কী করে বড় চাকরি দেবে তাকে? বয়সবৃদ্ধি থাকলেই তো হল না, শিক্ষা-সংস্কৃতিও ভুঁইচাঁপার মত বিমুগ্ধ করে বটে। কিন্তু সুশিক্ষিতকে। অন্যদের কাছেও তো ভুঁইফোঁড় ব্যাঙের ছাতা ছাড়া আর-কিছু নয়। এমনি বিদ্যে থাকলে হবে না, বিলিতি ডিগ্রি কোথায় তার—দিশি-বিলিতি এটা-ওটা টেকনিক্যাল জ্ঞানের অভিজ্ঞান কোথায়, বয়স কোথায় নিশীথের যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে—দাঁড়াতেও যদি অনুমতি দেয় তারা? কী করবে নিশীথ তা হলে? প্রাইভেট কলেজে মাস্টারি? দেড়শ টাকার জায়গায় দুশ বা আড়াইশ টাকা মাইনের? ওকে লেক-কলকাতায় পোষায় না, উত্তর কলকাতায়ও না। তা ছাড়া মাইনের জন্যেই শুধু নয়, অন্য নানা কারণেই কোনো কলেজে কাজ করবে না আর সে। ছেলে, অধ্যাপক, বা গভর্নিং বডিগুলোকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। দোষ বাংলাদেশের বিশ শতকের ভিতরে যে-ধ্বংসের কীট রয়েছে—দিনের পর দিন তার শ্রীবৃদ্ধির। কিন্তু তবুও অদৃষ্টের দোষে নয়—খুব সম্ভব। কিন্তু কী করবে নিশীথ? সে তো ডাক্তারি, আইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, বা কোনো-রকম শিল্প-ব্যবসায়ের দিকেই যায় নি। দেশের ভিতর মাস্টারির চিতে জ্বলছে আজ দিকে-দিকে। মাস্টারদের কোনো বন্ধু নেই আজ আর। ছেলেরা গ্রাহ্য করে না মাস্টারদের: খুব সম্ভব তারা কম মাইনে পায় বলে। গভর্নিং বডি চোখ উল্টে কথা বলে: খুব সম্ভব কম মাইনে দিয়ে এইসব নিরীহ তালকানাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এত সহজ, এত চমৎকার বলে। যারা ধর্মঘট চালিয়ে গরিব মানুষের খাওয়া-পরা-মাইনের সুবিধা করে দিতে চায় তাদের নজর, ফ্যাকটরির মজুর, কিসানদের দিকে। খুব ভাল জিনিস। কিন্তু একজন ওস্তাদ বাবুর্চি বা মোটর ড্রাইভার যে-টাকা পায়, ইউনিভার্সিটির একজন লেক-চারার যদি তার চেয়ে কম পায়, তা হলে সাধারণ স্কুল-কলেজের মাস্টাররা কী পায়, কী খায়, সেদিকে কি নজর পড়বে না মার্ক্সিস্ট বা কংগ্রেসি বিপ্লবীদের—কিংবা, যেখানে বসেই হোক না কেন, দেশের, মানুষের মঙ্গলচিন্তা যাঁরা করেন সেইসব স্বচ্ছ অনুধ্যায়ীদের? সরকারি চাকরিতে যে যেখানে আছে তাদের চাকরির মেয়াদ ও চুক্তি যে-রকমই হোক না কেন, তাদের ছাঁটাই করা চলবে না। খবরের কাগজগুলো এদের সমর্থন করে লিখছে। খুব ভালো কাজ

করছে। কিন্তু এই দারুণ বিশৃঙ্খলার দিনে ইসকুল-কলেজের মাস্টাররা যে ইতস্তত নিক্ষিপ্ত হয়ে চাকরি পাচ্ছে না, অন্ন পাচ্ছে না, বাড়ি পাচ্ছে না, তাদের প্রতিষ্ঠানের কোনো মর্যাদাশীল কেউই যে তাদের রক্ষা করছে না, আশ্রয় দিচ্ছে না এ নিয়ে লিখতে হবে না ?

পে-কমিশনের টাকা পেয়ে গভর্নমেন্টের জোয়ান পেয়াদারা ম্যাগনোলিয়া খাচ্ছে, এগজিবিশনে যাচ্ছে। মেয়েমানুষকে চোরা বাজারের মাল পৌঁছিয়ে দিয়ে, স্ত্রীকে,শেয়ালদার বাজারের মাছ-তরকারি। লাইফ ইনসিওরেন্স করছে, সেভিংস ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলছে। বেশ ভাল কাজ করছে, এরা যদি এখন সমস্ত না-করতে পারে এদের ওপরওয়ালারাই কি বরাবর এ সব করবে ? কিন্তু ছেলেমেয়েদের জন্যে গরু-মহিষের দুধ কিনে দেবার ক্ষমতা নেই, না-খেতে পেয়ে দুধের বোঁটা শুকিয়ে গেছে স্ত্রীদের, ঘর নেই, চাল নেই, কাপড়ের পেছনের দিকে ছিঁড়ে গেছে মাস্টারদের. তাদের স্ত্রীদের, এরা বেসরকারি জীব বলেই এদের জন্যে কোনো কমিশন নেই—এ-রকম হতভাগ্য দেশে কোনো ইসকুল-কলেজ না থাকাই ভাল। সব পুলিশ হয়ে যাক, সেপাই হয়ে যাক।

প্রায় হাজার দশ-পনের টাকা জিতেন দাশগুপ্তের ব্যাগ লুটে সে নিয়ে যেতে পারে। কাল যদি টের পায় জিতেন, নিশীথকে সন্দেহ নাও করতে পারে। সোনার, হীরের গয়নার কতকগুলি বাক্স আছে, এও যদি সরিয়ে নিয়ে যায়, নিশীথ দেরাজগুলো খুলে চাবি ঝুলিয়ে রেখে যায়। তা হলে কাল রাতে যে কলকাতার কালাকারদের হাতে জিতেনের খোয়া গেছে সব, এ বিষয়ে ওদের কারুর মনে কোনো সন্দেহ থাকবে না আর। নিশীথকে সন্দেহ করলেও তাকে ধরতে পারবে না। চাবিও হাওয়া করে দেবে সে, ব্যাগ-ট্যাগ সব। কোথাও হাতের ছাপ রাখতে যাবে না। টাকাকড়ি এখুনি সরিয়ে ফেলবে সে। রসা রোডের দ্বারকা সাঁতরার জিম্মায় রেখে আসবে। সাঁতরা হয়ত এতক্ষণে ঘুম থেকে জেগেও গেছে, সংসারের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। এই তো পনের-কুড়ি মিনিটের পথ এখান থেকে, ভোলা গিরির শিষ্য সাঁতরার বাড়ি। আশ্চর্য রকমের সৎ মানুষ দ্বারকা। তাকে গিয়ে বলবে। দেশের থেকে এলুম, শেয়ালদা থেকে সোজা তোমার এখানে, চাকরি-বাকরি স্ত্রীর গয়না এই গচ্ছিত টাকা-গুলো তোমার কাছে রাখো দাদা। মেসে উঠেছি, আজ-কাল এক সময়ে তোমার কাছে এসে টাকাগুলো নিয়ে যাব। এ সব টাকার কথা কাউকে কিছু বলবে

না। বরং ব্যাঙ্কের লোহার সিন্দুক কথা বলে, কিন্তু দ্বারকা সাঁতরা কখনোও না।

ভাবতে-ভাবতে নিশীথ একশ টাকার নোটের মোটা-মোটা তাড়াগুলো সব কটা মনিব্যাগের ভিতর যেমন ছিল, ভরে ফেলতে লাগল। কী হবে এ সব টাকা নিয়ে? এ সব টাকা দিয়ে কী করবে সে? কলকাতার বাংলাদেশের বেকার মাস্টার গরিব মাস্টার অধ্যাপকদের জন্যে দানসত্র খুলবে? কিন্তু এ ত শিশির বিন্দু, সমুদ্রের প্রয়োজন! কোটি-কোটি টাকার দরকার এ দেশের শিক্ষাকে সম্মান ও শক্তি দিতে হলে, যারা শিক্ষা দেবে প্রাণশক্তি ও মর্যাদায় তাদের স্বাধীন ও সরস সফল করে তুলতে হলে।

জিতেনের টাকা সে নিতে পারে—উটপাখির মত চোখ বুজে নিতান্ত নিজের দরকারে। পৃথিবীর কথা ভাবতে গেলে চলবে না; পৃথিবী এর, ওর, তার, নয় —ইতিহাসের সকলেরই নিজের জিনিস। যে-সূর্য নিভে যাচ্ছে, যে-সময় মানুষকে ধ্বংস করে ফেলবে একদিন—এইসব বড়-বড় ব্যক্তির লীলার জিনিস পৃথিবী। একজন মানুষ. একটা দল, একটা দেশ, বা মহাদেশ কী করে সুনিয়ন্ত্রিত করবার শক্তি পাবে পৃথিবীকে। মানুষের মন উন্নত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু দু-পাঁচ দুশ-পাঁচশ বছরের মধ্যে তো নয়ই, কত সময় লাগবে কে জানে—কিন্তু সে সফলতা নাও লাভ করা যেতে পারে—মানুষের পৃথিবীতে কোনো দিনই। আজকের পৃথিবীর এ-রকম ভয়ঙ্কর বিস্রস্ত প্রস্থানের ভিতর ব্যক্তি নিজের শুভার্থ ছাড়া আর কী কামনা করতে পারে—কী মানে আছে অন্য কোনো কামনার? নিশীথ ভাবছিল, ব্যক্তি সে, অতিস্তনিত সমুদ্রের ভিতর ফেনার গুঁড়ির মতন অনেকটা, প্রতিটি ফেনার গুঁড়িকে যদি দান করা যায় ভেবে দেখবার শক্তি, তা হলে ব্যাপারটা যে-রকম চাঁছাছোলা নিষ্ঠুর হয়, পৃথিবীতে প্রতিটি ব্যক্তির জীবন আজ সেই রকমই তো। এ অবস্থায় কী করতে পারে, ফেনার গুঁড়ির মত মানুষ, প্রতি মুহূর্তেই টালমাটাল সমুদ্রের রাক্ষুসে শক্তির আক্রোশ থেকে নিজেকে নিজের পরিবারকে সামলানো ছাড়া? সেটুকুও কি পারবে মানুষ? কে পারছে? কত কম লোক পারছে? কত কম ব্যক্তি নিজেকে বাঁচাতে, অল্পবিস্তর সুস্থ রাখতে পারছে—পৃথিবীর বা রাষ্ট্রের টাল সামলে সেটাকে সুস্থ করে তোলবার শক্তি তার আছে এ যদি সে মনে করে থাকে তবে মিথ্যে তার মন। কে শুনবে এই বোকা মিথ্যার্থীকে। নিশীথের মনে হচ্ছিল একটা বিষম

শিংশপা সমুদ্রের ঘূর্ণির ভিতর অন্ধকার রাতে ফেনার গুঁড়ির মত উড়ছে যেন সে—এই তো এখনই উড়ছে ; মফস্বলের সেই কলেজের কাজ নেই ( ওটা ছেড়ে দেবে সে, না হয় তাকে ছাড়িয়ে দেবে ) কলকাতায় কোনো কাজের জোগাড় নেই, সম্ভাবনা নেই। নিশীথের একটি মেয়ে কোথায় যে, কেউই তা বলতে পারে না, ঘর ছেড়ে গেছে, না হাওয়া হয়ে গেছে এমনিই নিজেকে নিকেশ করে ফেলার জন্যে, না অন্য কেউ সাবড়ে লাশ গুম করে ফেলল—ষোল বছরের চমৎকার নিরপরাধ অসংসারী মেয়েটি—কেউই কোনো খোঁজ-খবর দিতে পারলে না। অথচ মেয়ে ঘর ছেড়ে গেছে বলে একটা গ্লানি লেগে রয়েছে নিশীথের পরিবারে, মুখে বিশেষ কিছু না-বললেও বলি-বলি চোখ তুলে নিশীথকে আর তার স্ত্রীকে জানিয়ে দিয়ে যায় ব্যাপারটা, যে যখন যে-কোনো কারণেই কিছুটা বিমুখতা বোধ করে, একটু ঠাসবার দরকার বোধ করে নিশীথ আর তার স্ত্রীকে। আর-একটি মেয়ে দেশের বাড়িতে মরছিল ; থাইসিস হয়েছে ; নিশীথ তাকে অনেক হিম্মৎ করে কাঁচড়াপাড়ার হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে কলেজের প্রফেসর মহিমবাবুর মারফৎ ; নিজে যেতে পারে নি, নিউমোনিয়া হয়েছিল তখন নিশীথের। বাইশ বছর বয়স নিশীথের ছেলের ; মানুষ হল না। শক্তি ছিল কিন্তু বি-এ পাশ করে আর পড়ল না, ইয়ারদের সঙ্গেই কাটায় দিন-রাত ; চেনস্মোকিং করে ; সিগারেট ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ধোঁয়া ওড়ায় কিনা জানা নেই ; মাঝে-মাঝে অনেক জায়গা থেকে নালিশ এসেছে যদিও, তা হবে ; নিশীথের চোখে পড়েনি। কিন্তু উত্তেজক জলরস যে খায় হারীত, নিশীথ জানে তা। কী করবে ? উপায় নেই। ছেলের ওপর কোনো হাত নেই এখন আর। যথাসময়ে ছিল ; বেশ ঠিক ভাবেই তো। কিন্তু তাতে ছেলে বিগড়ে গেল কেন, বলতে পারে না নিশীথ। তার নিজের পিতৃপুরুষের দিক দিয়ে ( চারপুরুষ অন্তত—যতদূর জানা আছে তার ) বেগড়াবার কোন ইতিহাস নেই। হারীত প্রায়ই বাড়িতে থাকে না, দেশেই থাকে না। নানা রকম জাতের ইয়ার আছে তার, নানা চক্রের। কিছুদিন থেকে সে একদলের সঙ্গে কলকাতায় আছে, রেভল্যুশনের তোড়জোড় করছে কিন্তু কোথায় আছে জানা নেই। নিশীথের স্ত্রী মফস্বলের বাড়িতে এখন একেবারেই একা ; অবিশ্যি এক-দিকে কলেজের ফিলজফির লেকচারার মহিম ঘোষাল সপরিবারে থাকে। মহিম ঠিক তত্ত্বগ্রাহী নয়। সাংসারিক পলেস্তারায় খুব সম্ভব ভিতরেও সাত্ত্বিক।
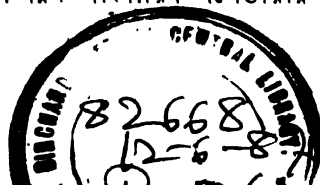
নিশীথের স্ত্রী সুমনা চালিয়ে নিতে পারবে—এই একটা মাস—মহিম ঘোষালের পরিবারকে, অপরূপ সেই অর্চিতা ঘোষালকে, কাছে-কাছে রেখে। খুব শক্ত এনিমিয়া হয়েছে সুমনার। নিশীথের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের বাকি সাতশ টাকা খসিয়েছে; প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে নেই কিছু এখন আর। দেখে এসেছে উকিল প্রকাশ মিত্তিরের ছেলে নরেন ছেলেটা বেশ সুস্থ-সমর্থ, মতি-গতি অবিশ্যি ভালো নয়, খুব সম্ভব সিফিলিস নেই, ডাক্তার মজুমদারের মত স্বচ্ছ ডাক্তারের হাত থেকে বেরিয়ে তবে রক্ত দেওয়া তো. আরো কেউ-কেউ রক্ত দিতে চেয়েছিল, কিন্তু মজুমদারের পরীক্ষায় টেঁকেনি। যে-সব কাজে মাদকতা ও অনাছিষ্টি পরের কেবলই অপকার—মাঝে-মাঝে উপকারও হয়, সে-সব ব্যাপারে নরেনকে পাওয়া যাবে। মফস্বলের বাড়িতে আগুন নেভানো, কলকাতায় এসে হারা-উদ্দেশে দমকল লেলিয়ে দেওয়া, বিনা টিকিটে রেলের ফার্স্ট ক্লাসে চড়া, যেখানে-সেখানে শেকল টেনে-টেনে থামানো, কলেরা-বসন্ত রুগির ডিউটি নেওয়া, চেক জাল করা, টাকা চুরি করা, শহর-গ্রামের ভদ্র-অভদ্র ঘরের ভিত ভাঙা। নরেন দিলদরিয়াই, নারকেলের খুব শক্ত কালো মালায় সিদ্ধির রস, পর্পটির রস, রক্তের রস, সুমনাকে রক্ত দিচ্ছে। কিন্তু নরেনের নামে বিশেষ বদনাম শুনে এসেছে নিশীথ এবার জলপাইহাটির থেকে। রাণুর ব্যাপারে নরেন দাগি। লোকেরা বলছে। সুমনা দেখতে ভাল ছিল, রোগে-রোগে কিছু নেই যদিও এখন, একটু গা-ঝাড়া দিলেই এখনও কেমন একটা ঝিলিক বেরোয়। নরেনের রক্তে কাজ যে না-হচ্ছে তা নয়। তবে পার্নিসাস এনিমিয়ার খুব দীর্ঘ পথ—অনেক বাঁক—নানারকম ছোবল—প্রতিনিয়তই নির্বিষ নির্মল করে রাখার প্রয়োজন। ডাক্তার মজুমদার ও তার কম্পাউণ্ডারকে টাকা দিয়ে এসেছে নিশীথ, মহিম ঘোষাল আর তার গিন্নিকে, দেখবার-শোনবার ভার।

কলেজের একটি ছেলে হিতেনকেও বলে এসেছে রোজ গিয়ে খোঁজ-খবর নিতে। দরকার হলে নিশীথকে লিখে জানাবে ওরা। জিতেন দাশগুপ্তের হাজার বার-চোদ্দ টাকায়—টাকার দিক দিয়ে অন্তত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে কোনো দুশ্চিন্তা থাকে না নিশীথের। ঝড়ের সমুদ্রে একফোঁটা পদার্থের মত এই যে সে ছিটকে-লটকে ফিরছে, তার একটা উপায় হয়। যে-মেয়েটার যক্ষ্মা হয়েছে, কাঁচড়াপাড়ার হাসপাতালে আছে—বাঁচবে না মেয়েটা—তবুও যতদিন বেঁচে থাকে ভানু, তার খরচ পোষাতে পারে, নিশীথ, মাঝে-মাঝে কলকাতার থেকে

ফল ওষুধ নিয়ে ভানুকে দেখে আসতে পারা যায়, স্ত্রীকে আনতে পারা যায় কলকাতায়। হয় ত গিডনি ঝাড়গ্রামেও পাঠানো যেতে পারে কিছুটা সময়ের জন্যে, নিজেও সে কয়েকটা বছর হাঁফ ছেড়ে বসতে পারে—কোনো চাকরি নয়, কিন্তু তবুও টাকা আছে, স্বাধীনতা আছে, মনের স্বস্তি আছে, এমন কোনো ব্যাপারে হাত দিয়ে—ধরো, ইংরেজি-বাংলা প্রবন্ধ লিখে, দরকার হয় গল্প-উপন্যাস লিখে—প্রয়োজন হলে ইংরেজিতে লিখে—ধীরে-সুস্থে সুশৃঙ্খল হয়ে বসবার সময় পায়। ইতিমধ্যে মেয়েটা মরে যাবে খুব সম্ভব; স্ত্রীও মরে যাবে; কিন্তু তাদের মৃত্যু-শয্যাকে খানিকটা স্নিগ্ধ করা যাবে এ টাকা হাতে থাকলে—মনে হচ্ছিল নিশীথের। নিজের ছেলেকে—হারীতকে, ফিরে পাবে না বটে কিছুতেই কোনো-দিনও আর, কিন্তু স্বাধীনভাবে যথেষ্ট রোজগারের উপায় যদি পাকাপাকি করে নিতে পারে, তাহলে চেনাজানা কয়েকটা দুঃস্থ পরিবারকে দাঁড় করিয়ে দেবার পক্ষে যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারে সে। চারটে পরিবারের কথা মনে হচ্ছিল তার, কলকাতার বুকের ওপরে বসেই ধনেপ্রাণে মরছে। এরা কি মরে যাবে? এদের মরতে দেওয়া সহজ। নিশীথ অবিশ্যি এদের খয়রাতির নেশা ধরিয়ে মাথা খেতে যাবে না, কিন্তু সে নিজে যদি শক্ত স্বাধীন হয়ে উঠতে পারে, তাহলে এ পরিবার কটি যাতে ঠিক পথে চলে দাঁড়াতে পারে সে ভাবে ব্যবস্থা করা সহজ হতে পারে—নিশীথের পক্ষে। মফস্বল কলেজটার কাজে নিশীথের ফিরে যাবার কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। সে কাজটার ওপর—সত্যি বলতে কি—যবনিকা পড়ে গেছে। কলেজের প্রিন্সিপাল আর কলেজের গভর্নিঙ বডির সেক্রেটারি হরিলাল বাবুকে নিশীথ বলেছিল: দেড়শ টাকা মাইনের এ চাকরিতে পোষাচ্ছে না তার, অন্তত দুশ পঁচিশ-আড়াইশ না করে দিলে কী করে চালাবে সে? শুনে হরিলালবাবু আর জি-বির কয়েকজন মেম্বার বলেছিল, আপনার যদি কাজ করবার ইচ্ছে না থাকে করবেন না—কলেজের কাজ কসারের হাঁড়ি নয়, এখানে টাকাকড়ির কথা নেই। নিশীথ বলেছিল, 'বাইশ-বছর তো হল সে সব; হয়রান হয়ে পড়েছি। এক মাসের ছুটি নিচ্ছি। দরখাস্ত লিখে দিলাম। কালই—যদি সম্ভব হয় আজ রাতের গাড়িতেই, কলকাতায় যাব।' হরিলালবাবুরা বললে, 'চাইলেই কি ছুটি পাওয়া যায়? কী গ্রাউনডে ছুটি নিচ্ছেন আপনি? আপনার তো কোন অসুখ-বিসুখ নেই, আপনার শরীর তো সুস্থ।' নিশীথ বলেছিল, 'আমার স্ত্রীর এনিমিয়ার জন্যে রক্তের দরকার

হল, আমিই তো রক্ত দিতে চেয়েছিলাম, ডাক্তার মজুমদার আমাকে দেখেশুনে বললেনঃ আপনি যদি রক্ত দেন আপনাকে রক্ত দেবে কে নিশীথবাবু? প্রাণাচার্য অমিয়রতন চট্টখণ্ডী ভালমানুষ—সুস্থ মানুষ—মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়স—তেষ্টা পেয়েছিল—কাঁচের গেলাসে জল খাচ্ছিল—হাতে গেলাস, মুখে জল, মরে গেল। স্ত্রীকে রক্ত দিতে-দিতেই মরে যাবেন আপনি। অবিশ্যি চট্টখণ্ডী মরে ছিল বলে মরবেন না। কিন্তু আপনি অসুস্থ। বিশ্রাম নিন।' হরিলালবাবু বললেন ঃ 'এ তো কোন মেডিকেল সার্টিফিকেট হল না। তা ছাড়া ডাঃ মজুমদারের সার্টিফিকেট আমরা গ্রাহ্য করব না। তিনি সিভিল সার্জেন আছেন। তাতে আমাদের কী? আমাদের স্বাধীন কলেজ। আমাদের নিজেদের ডাক্তার দেখে দেবে আপনাকে—যদি ছুটির দরকার হয়।' কোনো সার্টিফিকেট জুড়ে না-দিয়ে এমনিই দরখাস্ত করে কলকাতায় চলে এসেছে নিশীথ। কলেজের ও কাজ থাকবে না তার। কলেজ কমিটির পরের মিটিঙেই চটকে যাবে। একটা রেজিগনেশন দিয়ে চলে এলেই ভালো হত, কারু মনেই কারু প্রতি কোনো বিষ থাকত না তাতে।

প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে কোনো টাকা নেই আর নিশীথের; হাতে কোনো টাকা নেই, কলকাতায় চাকরি নেই; কলকাতায় চাকরির চেষ্টা অনেকবার হয়েছে; আর এ বয়সে তার মত লোকের জন্যে বাস্তবিকই কোনো সঠিক চাকরি নেই কলকাতায়। চারদিককার তাড়াতাড়ি কাড়াকাড়ির ভিতর অবিলম্বেই কিছু নেই—হয় ত স্থায়ীভাবে কিছুই নেই, কোনো দিনই নেই, অন্ধকার বায়ুভূত সমুদ্রের সেই অচেতন ফেনার গুঁড়িটা ছিটকে পড়ছে; মনে হচ্ছে যেন খুব আনন্দ পাচ্ছে। কিন্তু ওটা ফেনা নয়—মানুষ—ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—পথ চায়, ঘর চায়, ওর যে মন আছে স্থির স্বাধীন হয়ে একান্তে বসে তার ব্যবহার চায়। অনেক দূরে—সৈকতের কী এক বিচিত্র সাধনোচিত ধামে জমানো ফেনার মত স্নিগ্ধ হয়ে মিশে আছে জিতেন দাশগুপ্ত আর তার স্ত্রী; মিশে থাকবে চিরদিন। ওরা পিতৃমাতৃযানের মানুষ লোকায়ত হয়ে রয়েছে এই বিছানায়—ওদের সঙ্গে কারু কথা হয় না। সব নোটের তাল ব্যাগে চলে গেছে—দেরাজে ব্যাগগুলো যেখানে ছিল সেখানে রেখে, দেরাজে চাবি মেরে, মদের বোতলগুলোর একপাশে চাবির গোছা রেখে দিয়ে খালি হাতে বেরিয়ে গেল নিশীথ।

টাকা নেবার খুব দরকার ছিল তার। পঁচিশ-ত্রিশ হাজার সরিয়ে ফেললে,

জিতেনের কিছু এসে যেত না। দেড় হাজার-দু হাজার টাকা মাইনে পায় সে, পরামর্শ দিয়ে আরো হাজার-দুই। এ ছাড়া ঘুষ খেয়ে নেয়, এমনিই অন্য নানা রকম উপার্জন আছে তার, ব্যবসা আছে। জিতেনের ক্ষতি হত না, নিজের খুব উপকার হত। এ বিশৃঙ্খলার যুগে পৃথিবীকে উদ্ধার করা দূরের কথা, সমবায়কে ত্রাণ করাও খুব শক্ত, অন্ধভাবে চালিত হয়ে সমবায়সুদ্ধ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কাজেই ব্যক্তির আত্মত্রাণের পথ খোলা রাখা দরকার। না-হলে সে যেখানে যে-অবস্থায় আছে একেবারে নির্মূল হয়ে যাবে। কিন্তু এত সব সফল মীমাংসার পরেও জিতেনের টাকাটা নিতে পারল না নিশীথ। তবুও মনে হল, টাকা না-নিয়ে ভুল করল সে, ও জিনিসটা চুরি মনে করে ব্যর্থ সংস্কারের প্রশ্রয় দিল। সংস্কারগুলো কিছুতেই মরতে চায় না, কিছুতেই আসতে চায় না সত্য উপলব্ধি, যদি আসেও-বা, কথা ভেবে নিয়ে আলোকিত হয়ে ওঠে মন, তবুও কাজে অগ্রসর হতে গেলে অন্ধকারে অন্ধ সৈনিক আমরা সব যে যাকে মারছি, যে যাকে খাচ্ছি। পথ খুঁজে পাচ্ছি না কোথাও। সব আলো নিভে গেছে।

জিতেনের ঘর থেকে বেরিয়ে একতলায় না-গিয়ে খাবার ঘরে ঢুকল। ক্ষিদে পেয়েছে, বড্ড তেষ্টাও পেয়েছে নতুন করে আবার। খাবার ঘরে ঢুকে ডিনার টেবিলের ওপরেই জিনিস পেল নিশীথ। জিতেনের খাবার ঢাকা আছে, চারটে ডিমসেদ্ধ, অনেকগুলো আলুভাজা। ঠাণ্ডা আলুভাজা খেয়ে যাবে জিতেন। খেতে বসবার সময় ফ্রাইপ্যানে চড়িয়ে গরম করে দেবে মিসেস দাশগুপ্ত? এ সব আলু কাল রাতেই ভাজিয়ে রেখেছে তা হলে; স্বামিনী কি আগে-ভাগে কাজ সেরে রাখতে চায়? জিতেন কি বাসি আলুভাজা চায়? কাঁচাখেকো নাকি জিতেন? কফি তৈরি করে রাখে নি অবিশ্যি। টোমাটো সস রয়েছে। নিশীথ আর দেরি না-করে খেতে আরম্ভ করল। চারটে ডিমই খেল সে। জিতেনের ডিশে ডিমের সঙ্গে মাখন রাখা হয় নি বটে। কিন্তু নিশীথ মাখনের টিন পেড়ে এনে মিলিয়ে নিল, গোটা পাউরুটিটাই শেষ করে ফেলল, শিশিতে মাস্টার্ড ছিল, ঢেলে নিল বেশ ঢালাও হাতে, আলুভাজা, ডিম মাস্টার্ড মিশিয়ে; বেশ ঝাঁঝাল রাই—ক্ষিদের পেটে সবই ভারী চমৎকার লাগছিল নিশীথের। আর কী খাবার আছে? মাখন আছে, পাউরুটি আরো আছে, মর্মালেড আছে, সস আছে, খেল যতটা পারল সব, টিনের মাছ

মাংস আছে, টিন খুলবার হাঙ্গামার মধ্যে গেল না সে। জল খেল। সব জলই বরফ মেশানো যেন। খেতে-খেতে একেবারে অন্তঃস্থল তলিয়ে স্নিগ্ধ হয়ে উঠতে থাকে, কেবলই খেতে ইচ্ছে করে, কেবলই স্নিগ্ধ হয়ে পড়তে। খেল সে, জল খেতে লাগল অতল জলের মত যেন। কারলসবাড, সোয়াপ্পে, বায়রনের জল হয়ে গিয়ে বরফ গালিয়ে। বসন্তের রাতে সাদা বরফে ঢাকা হিমানীর মত লাগল নিজের শরীরটাকে, নিজের অন্তরাত্মাকে।

নীচে চলে গেল নিশীথ। মশারি টানিয়ে শুয়ে পড়ল।

জিতেন পাঁচটার সময় তার ঘুমের মেয়াদ কাটিয়ে উঠল। যেন জেগেই ছিল সে। না তা নয়, খুব বেহুঁশ হয়েই ঘুমুচ্ছিল। কিন্তু এ সব লোককে ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করতে হয়। পাঁচটার সময় ঘুম না-ভেঙে পারে না তার। সাতটার সময় অফিসে যেতে হবে আজ; জিতেন একটা হাই তুলতে না-তুলতেই দেয়ালের ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল। ঘরে মৃদু স্নিগ্ধ সবুজ বাতি জ্বলছে। সমস্ত শরীর বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল জিতেনের। রাত তিনটে-চারটের সময় মখমলের চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিলে হত, কিন্তু ঘুম ভাঙে নি। সমস্ত লম্বা আঁট ঠাণ্ডা শরীরটার দিকে নজর পড়ল। পাশে ছিমছাম দীর্ঘ ফর্শা শরীরটার দিকে তাকিয়ে দেখল।

নাঃ, আর দেরি করা যায় না। স্ত্রীকে জাগানো চলে না। ঘুমুচ্ছে, ঘুমোক। অনেক রাত জেগেছে। ডাইনিং হলে একটা শব্দ হচ্ছে না? ইঁদুর ছোটাছুটি করছে বটে। ইঁদুর মারবার জার্মান মেশিনের কথা ভাবছিল দাশগুপ্ত। ছোটবেলার তার ন-কাকা দুরমুস দিয়ে ইঁদুর সাবাড় করে ফেলত। জিতেনের বাবার চোখে সে সব পড়লে ন-কাকাকে বড্ড নাকাল হতে হত; মাছ-মাংস খেতেন না বাবা, কোনো প্রাণীকেই মৃত্যুব্যথা দিতে রাজি ছিলেন না। মাঝে-মাঝে কেবলমাত্র ছারপোকা মারতেন। তাও নিজের হাতে না। বাবাকে চেয়ার, কুশন, খাট, ক্যাম্পখাটের থেকে ছারপোকা ঝেড়ে ফেলতে দেখলেই জিতেন, হিতেন, ঋতেন গিয়ে হাজির হত সেখানে; এর চেয়ে মজার জিনিস তখনকার জীবনে খুব বেশি ছিল না তাদের; ছারপোকা ঝেড়ে খসিয়ে বার করে দিতেন তিনি, মারার পালা ছেলেদের হাতে।

'খাবারের ঘরে বেড়াল', বললে জিতেন দাশগুপ্ত, তার ঘুমন্ত স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে, 'বেড়াল ছাড়া ও-রকম শব্দ হয় না। ইঁদুরগুলোও খুব ধাড়ি হয়ে গেছে

এ বাড়িতে।'

উঠে দাঁড়াল জিতেন। সোয়া পাঁচটা। বাথরুমে চলে গেল। পৌনে ছ-টার সময় ফিরে এল। ছ-টার ভেতর স্যুট-টাই এঁটে ফিট হয়ে গেছে সে। নমিতা ওঠে নি এখনও; স্ত্রীর স্ল্যাকসটাকে টেনে দিল কোমর অবধি। হঁ্যা ঐ রকম থাক। আশেপাশের বাড়িতে সাধু বাবাজীরাই থাকে। দাশগুপ্তের কামরার জানালা সব খোলা বটে, তবে, নমিতা যেখানে শুয়ে আছে চারদিক-কার কোনো বাড়িরই কোনো দৃষ্টিকোণ এখানে ঠিক মতন কান্নিক মারতে পারে না। যাক গে—দাশগুপ্ত জানালার পর্দাগুলো টেনে দিল। বন্ধ করে দিল দু-একটা জানালা—না হলে রোদ পড়বে নমিতার মুখে। অঘোরে ঘুমুচ্ছে ও। না, জাগিয়ে দেবে না। খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল জিতেন। হাত বাড়িয়ে খেতে গিয়ে দেখল, কোথাও কিছু নেই। বাঃ, টেবিলের ওপরেই ত খাবার ঢাকা থাকে তার। দু-তিনটে ডিশ পড়ে আছে। কিন্তু জিনিস কোথায়? ডিম কোথায়? চারটে ডিম? আলুভাজা কোথায়? ছটা নৈনিতাল কুচিয়ে ভাজা, ঘানির তেলে? ইঁদুর খেয়ে ফেলল সব?

কানাইবাবুর বাড়ির হুলো বেড়ালটা ঢুকেছিল?

টেবিলের উপর এলেমেলো ডিশগুলো ভাল করে সমঝে দেখবার জন্য জিতেন তার ঢ্যাঙা ঢিলে শরীরটা তাড়াতাড়ি নোয়াল। লম্বা-লম্বা ঠ্যাং ও ওপরের ধড়ের মাঝখানে তলপেটের দিকে নব্বই ডিগ্রিই সার্কিট বেশ টাইট করে দেখতে লাগল জিতেন। চশমা-আঁটা মুখ ডিশগুলোর এত কাছে ঘনিয়ে এল, মনে হল ওগুলো শুঁকছে যেন সে। ক্ষীণ চোখ দিয়ে দেখে নিচ্ছিল ডিশগুলোর একেবারে গায়ের ওপর ডিমসেদ্ধ বা আলুভাজার কোনো ছন্নাংশ কোথাও পড়ে আছে কিনা; নেই যদি তাহলে এসব হলুদ দাগ কিসের, এসব লাল দাগ বাদামি দাগ? রাই খেয়েছে কেউ? মর্মালেড খেয়েছে? টোম্যাটো খেয়েছে?

দাশগুপ্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। চশমা খুলে অন্ধচোখে চারিদিকে তাকাল একবার। চশমা এঁটে ঘুরে-ঘুরে খুঁজে পেতে দেখল জোড়া-তাড়া দিয়ে পেটে চালাবার মত কোনো জিনিস কোথাও আছে কিনা।

নেই কিছু। গ্যাসের স্টোভ রয়েছে। কফি তৈরি করবে? না, সময় হয়ে গেছে। সিঁড়ি ভাঙতে লাগল জিতেন। অফিসে গিয়ে খাবার আনিয়ে নেবে। নিশীথ কী করছে? ঘুমুচ্ছে? ভিতরে ঢুকে দেখে এল জিতেন, মশারি

টানিয়ে বেশ আরামে ঘুমুচ্ছে। গ্যারাজ থেকে মোটর বার করে নিজেই চালিয়ে নিয়ে অফিসে চলে গেল জিতেন।

সাড়ে আটটার সময় নিশীথের ঘুম ভাঙল। ঘুম আগেও বারবার ভেঙে যাচ্ছিল অদ্ভুত-উদ্ভুটে স্বপ্ন দেখে। ঘুম ভাঙছিল, ঘুমিয়ে পড়ছিল আবার। ঘুমিয়ে পড়ছিল, ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল আবার। স্বপ্নে জিতেন দাশগুপ্তকে জার্মান সিলভারের কাঁটা-চামচ নেড়ে-চেড়ে মুখভরা শয়তানি ঘনিয়ে তুলে হাসি-হাসি মুখে ডিম খেতে দেখেছে নিশীথ। নিশীথের সমস্ত চালাকি ধরে ফেলেছে জিতেন; জিতেন ডিম খাচ্ছে বটে কিন্তু সব ডিমই নিশীথ খেয়ে ফেলেছে, বোতলের পর বোতল জেলি খেল, মর্মালেড খেল, আচার খেল, কিছুই খাওয়া হল না,বলে প্যাকিং পেপারে আলুভাজাগুলো মুড়ে,পকেটে ফেলে অফিসে চলে গেল। স্ল্যাকস কোমর অব্দি উঠে গেল—খুব টাইট করে পরল, ঢল-ঢল হড়-হড় করে খসে পড়তে লাগল আবার—মেয়েটি কে? শ্যামলী? শ্যামলী স্ল্যাকস পরছে? শ্যামলীই তো। কিন্তু মিসেস দাসগুপ্ত কী করে শ্যামলী হল? কী করে হল, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার তাগিদ নেই স্বপ্নের নিশীথ রাজ্যে, হয়েছে যে তা নিয়ে বিস্ময়ের বাষ্পও নেই; সবই ছায়া, আবছায়া, দিনের আলোর পৃথিবীর কাঠামোটা রেখে দিয়ে তাকে ঢেলে সাজিয়ে নেওয়া খুব ভরা আলোর ভিতরে—আর-এক দেশের, রাত্রির দেয়াল মেঝে ভিত্তিচিত্রের ক্ষেত-মাঠের বধির স্নিগ্ধতার ভিতর দিয়ে, বোশেখের ভরপুর রোদের সিঁড়ি জানালা বাতাস মির্জা-পুরী গালিচার পথ ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে। ‘খোঁপা খসে যাচ্ছে তোমার—খসে যাচ্ছে তোমার, উঠিয়ে নাও নমিতা—কী বলবে দাশগুপ্ত এ রকম দেখলে?’ ‘তুলে নিচ্ছি নিশীথ— এই তো আঁট করে বেঁধেছি—হয় নি? না ঢিলে হয়ে গেল? তুমি কবে এলে নিশীথ? কবে এলে?’ বলছে শ্যামলী। হু হু করে বাতাস বইছে, কেমন অন্ধকার হয়ে গেল যেন সব। কেঁদে উঠছে ভানু। এই কি কাঁচড়াপাড়ার হাসপাতাল—যক্ষ্মার? কাঁচড়াপাড়ার বেড? শোনো বলি, কে বলে দেবে আমায় এটা কাঁচড়াপাড়ার যক্ষ্মার হাসপাতালের বেড? ভানু কোথায়? অন্ধ-কারের মধ্যে দেখছি না তো। ভানু? এই, যে বাবা, আমি এইখানে। ঐখানে। ঐখানে ভানু? কোনখানে? কোন যে সুদূর মেঘ-আঁধারের প্রত্যন্তের থেকে সুর ভেসে এসেছিল ভানুর। কে আপনি? কী চাচ্ছেন? কথা বলবার অবসর নেই মশাই, নাকেদমে দৌড়ুচ্ছি; না না মশাই এটা যাদবপুরের টি-বি

হসপিট্যাল ; এখানে বেড খালি নেই। ভানু ? সে তো কাঁচড়াপাড়ার হাসপাতালে—সে তো মরে গেছে কাল রাতে। ধড়মড়িয়ে জেগে উঠল নিশীথ। কোথায় সে ? জলপাইহাটিতে ? লামডিঙে নেমে ট্রেন ধরেছে যাবার। না ওয়েটিং রুমে শুয়ে আছে ? জলপাইহাটিতে ? সুমনা কোথায় ? নরেন রক্ত দিয়েছিল আজ ? ওঃ, শহর কলকাতায়, লেক রোডে জিতেন দাশগুপ্তের বাড়িতে বুঝি ? ভোর হয়ে গেছে।

ভোর হয়ে গেছে। জিতেন অফিসে চলে গেছে নিশ্চয়। ওর স্ত্রী ঘুমুচ্ছে হয় তো ওপরে। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই তো। কী হবে এখন জেগে উঠে। জিতেন ফিরুক। কিন্তু বারটার আগে ফিরবে কি জিতেন। কিন্তু ফিরুক জিতেন। কিন্তু দুপুরের আগে ফিরবে না তো। কিন্তু না ফিরলে কী করতে পারে নিশীথ ? কোথায় যাবে সে ? দেখা করবার মত লোকজন আত্মীয়-স্বজন বন্ধু আছে কিছু কলকাতায়। মনটা কঠিন হতে থাকলে সংখ্যায় কমে যায় এরা, মনটা নরম হতে থাকলে বেড়ে যায়। কিন্তু মন যখন নরম কঠিন কিছুই নয়—শূন্য আচ্ছন্ন—তখন একটি বা অনেক শূন্যকে অনেক অস্তি দিয়ে পূরণ করে পূরণফলের অফুরন্ত নাস্তিকে কী দিয়ে ধ্বংস করবে মানুষ ? কে আশ্বাস দেবে, সাহায্য করবে, বাস্তব সফলতার নিটোল নিপট ক্ষমতা দিয়ে ধ্বংস করতে দিতে, ভাবছিল নিশীথ।

ওপরে খাবার ঘরে ডিম খুঁজছিল জিতেন। ডিশগুলো ঘেষে ঘেষে নুয়ে, নিছিয়ে, ছেঁদিয়ে, গা ঝাড়া দিয়ে ব্যাপারটা বুঝে দেখতে চেষ্টা করছিল। ডিশের গায়ে এসব হলুদ দাগ কিসের ? গেরুয়া বাদামি বাসন্তী লাল রঙের কিসের পোচড় এসব ঃ ডোরা ফুটকি ? লোকটা দু হাজার টাকা মাইনে পায়, আরো দু হাজার কুড়িয়ে নেয় পরামর্শ দিয়ে। কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে বুঝে নিল ব্যাপারটা ; কিন্তু সে যে বুঝেছে কে তা বুঝবে ? ঠাণ্ডা চোখে নিঃসন্দেহে মেজাজ নীরবতার। জানে সব। বুঝেছে, নিশীথ ঘুমিয়ে পড়েছে আবার। অফিসে যাবার মুখে নিশীথকে দেখে গেল জিতেন ; বললে ঃ 'খুব আরামে ঘুমুচ্ছে নিশীথ।'

কে যেন সিঁড়ির কিনারে দাঁড়িয়ে বলছে ঃ আপনার ঘুম ভাঙলে ওপরে আসুন। ঘুম তখনো ভাঙে নি নিশীথের। আধা ঘুমের ভিতরেই কথা বলছিল, কে যেন অব্যক্ত শীর্ষ থেকে বলছে ঃ আপনার কি ঘুম ভেঙেছে ?

আপনি জেগে উঠেছেন? উনি আপনাকে ওপরে আসতে বলেছেন। কোথায় কোন সিঁড়ির ওপর থেকে কে যেন কথা বলছে। জিনিসটা স্বপ্নের না বাস্তবের তা নিয়ে প্রশ্ন করার মত মনের অবস্থা ছিল না নিশীথের। ঘুম ভাঙে নি তার, স্বপ্ন দেখছে সে, স্বপ্ন যে দেখছে সেটা টের পাচ্ছে, টের পেতে-পেতে ঘুম পাতলা হয়ে আসতেই সিঁড়ির কিনার থেকে কে যেন আবেদন জানাচ্ছে—হয় তো সত্যি পৃথিবীর দেশ থেকে—হয় তো স্বপ্নের নীড় অনীড়ের কুয়াশা থেকে ঠিক করে উপলব্ধি করে নিতে না-নিতেই ঘুমিয়ে পড়ছে নিশীথ আবার। ঘুম বেশ গাঢ় হয়ে গেছে ঃ জমানো বরফের আরো নীচে যে-বরফ জমেছিল গত বছরের শীতে, যে-বরফের মার নেই, যার জন্য দিন নেই, রাত্রির অবসান নেই—তেমনি ভাবে। বরফে ভাঙন দেখা দিচ্ছে, আবার চিড় খাচ্ছে, নড়-নড করে উঠছে চাঙড়। গুঁড়ি-গুঁড়ি বরফের ফোয়ারা ছিটকে পড়ছে, মুখে এসে পড়ছে এপ্রিলের নীল, কোকিল নীলকণ্ঠ, পিউ কাঁহা তড়পানো আকাশ—বড রোদ, মেজো রোদ, ছোট-ছোট ফুটকির রোদ···

ঘুম ভাঙলে আপনি ওপরে চলে আসুন—একেবারে সিঁড়ির নীচের ধাপ থেকে কে যেন বলছে নিশীথকে।

গা ঝাড়া দিয়ে জেগে গেল প্রায়—জেগে-জেগে—ঘুমোতে-ঘুমোতে জেগে উঠল নিশীথ। বাস্তবিকই জেগে উঠল আবার। বেশ খোলা গলায় বড় শব্দ তার কানে এসে পৌঁছেছিল—এই তো এখুনি—মিনিট দুই আগে? নিশীথকে ওপরে যেতে বলেছে। ডেকেছে মিসেস দাশগুপ্ত তা হলে।

নিশীথ উঠে মশারি গুটিয়ে বিছানা ঝেড়ে সাজিয়ে এক-আধ মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল খাটের কাছে। চারিদিকে নিস্তব্ধতা, কোথাও কথা বলেছে, কাউকে আহ্বান করেছে কোনদিনও মনেই হয় না। কেউ যেন নেই এ বাড়িতে। ঐ পেয়ারাগাছের ডালপালা পাতা রোদের ফাঁকে যে-কয়টা চড়ুই ঝাঁপাঝাঁপি করে ধ্বনির ফোয়ারা ফেনা ছুঁড়ে মারছে অনর্গল, এ ছাড়া এ বাড়িতে কোনো প্রাণী আছে বলে মনেই করতে পারছে না নিশীথ। কিন্তু তবুও মানুষের সম্পূর্ণ স্ফুট ভাষার মত এখুনি কে যেন ডেকে গেল নিশীথকে—কানে লেগে আছে—রক্তের বিমের ভিতর ঘুম ভাঙলে আপনি ওপরের কেমন একটা স্ফটিক নির্মলদ্যোতনা নিঃশব্দে সংক্রামিত হয়ে আছে। একতলার গোশলখানায় ঢুকে, হাত-পা-মুখ ধুয়ে, কী ভেবে চান করে নিল, পরিষ্কার কাপড়জামা পরে নিশীথ

সটান ওপরে চলে গেল। নমিতা ড্রয়িংরুমে বসেছিল। চকোলেট রঙের গদি-মোড়া একটা সোফায় গিয়ে বসল নিশীথ—

'আপনাকে ডাকছিলুম—'

'আপনি? কই শুনিনি তো।'

'ঘুমুচ্ছিলেন।'

'নীচে গিয়েছিলেন আপনি মিসেস দাশগুপ্ত?'

'যাচ্ছিলুম। আপনার ঘরেই যেতুম এবার। কয়েকবার সিঁড়ির ওপর থেকে ডেকেছি।'

'সিঁড়ির থেকে?'

'শুনতে পেয়েছিলেন? প্রত্যেকবারই দু-এক ধাপ নেমে, শেষের বার সিঁড়ির একেবারে নীচের ধাপ থেকে ডাকছিলুম। ঘুমুচ্ছিলেন। শোনেন নি। কাল রাতে অনেক জেগেছেন আপনি। উনি বলছিলেন আপনি জেগে উঠলে—'

'কখন গেলেন অফিসে—'

'সাড়ে ছটায়। আমি তখন জেগে উঠতে পারি নি।'

'ও'—নিশীথ বললে।

'গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করে স্টার্ট দিচ্ছেন, ঘুমের ভিতর কানে গেল যেন আওয়াজটা—তবে আমাদের মোটর—না অন্য কারু—কোনো শিখ ড্রাইভার হয়তো গেটের পাশে এসে—কলকাতার ড্রাইভারগুলো বড্ড জ্বালাতন করে; ঘ্যাড়-ড়-ড়-ড়-ড়-ড়—এত সহজেই তাদের গাড়ির কল বিগড়ে যায়—আর শেষ রাতে যখন মানুষ ঘুমুচ্ছে তাদের চড়াও করে ফুঁড়তে-ফাড়তে না পারলে চলে না যেন আর। সাদাওয়ালা পিলাগ—আর—'

'পিলাগ?'

'মানে প্লাগ—সাদা প্লাগ—সাদা প্লাগে কিছু বিগড়েছে আর কি? বেশ তো বাবা বিগড়েছে, আমাদের কান টানছিস কি রে?'

'পি-সি রায়', নিশীথ শুরু করলে 'মাড়োয়ারিদের ঠিক ধরেছিলেন। ঠিকই বলেছিলেন, ঠিকই লিখেছিলেন আচার্য রায়, বাংলাদেশের অনেক কিছুই মাড়োয়ারিদের কবলে চলে গেল। সকলেই নিচ্ছে খাচ্ছে। পুরনো ফিরিস্তি সব। তবে দিনরাত আমাদের বাসে চড়তে হচ্ছে, মাড়োয়ারি-ফাড়োয়ারির চেয়ে এ সব ড্রাইভার-কনডাকটারদের সঙ্গেই ঘেঁষাঘেঁষি। এক-একটা বাসে

পদ্মার ইলিশ সাজিয়ে পাটাতন আটকে দেয়, খণ্ড-খণ্ড নূন বরফ মাখিয়ে চালান দিতে হবে। শক্তের হাতে নরম আমরা—এ-রকম অসাড় ; এ-রকম অসাড় অপদার্থ বলেই দিনের পর দিন ওরা বড্ড বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এর একটা বিহিত করা উচিত।'

নমিতা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। বাংলা খুব ভাল জানে সে। ভাল বাংলা বলতে পারে—ইংরেজির মতনই সহজে, তেমনি তরতর করে। কিন্তু নিশীথ কী বলতে চাচ্ছে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না, বুদ্ধি-অনুভূতি দিয়ে খানিকটা ধারণা করে নিতে চেষ্টা করল। বিশেষ সফল না-হলেও, মোটামুটি বুঝেছে সমর্থন করতে পেরেছে, মনে হচ্ছিল তার। পি-সি রায়কে জানে না নমিতা। অনেকদিন রেঙ্গুনে, ইউ-পি, পাঞ্জাবে থেকেছে। তা ছাড়া আচায রায়ের সূর্য যখন শূন্যে শীর্ষে তখন নমিতার জন্ম হয় নি, আচার্য যখন বাংলাদেশেই আবছা হয়ে পড়েছেন, তখন নমিতা পাঞ্জাবে।

'আপনি ঠিক বলেছেন মিঃ সেন।'

নিশীথ কথা ভাবছিল।

'পি-সি কে ?' নমিতা জিজ্ঞেস করল।

'পি-সি ?' ওঃ, নিশীথ নিবিষ্টভাবে নমিতার দিকে একবার তাকিয়ে বললে, 'ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। না, কেউ নয়।'

'তিনি মাড়োয়ারিদের কথা কী বলেছিলেন ?'

একটু বেকুব মনে হচ্ছিল নিজেকে নিশীথের। সহসা উত্তর দিচ্ছিল না সে। মাথা হেঁট করে মেঝের কার্পেটের দিকে তাকিয়ে ছিল। মাথা তুলতেই দেখল একটা দেশলাই নিয়ে এসেছে নমিতা, এক টিন সিগারেট। 'খান আপনি ?' একটা সিগারেট মুখে নিয়ে নিশীথকে জিজ্ঞেস করল নমিতা। জ্বালিয়ে নিল নিজের সিগারেট। নিশীথের দিকে টিনটা এগিয়ে দিল।

'খান ?' জিজ্ঞেস করল নমিতা।

কোনো কথা না-বলে হাত বাড়িয়ে টিনটা কুড়িয়ে নিল নিশীথ।

'মাড়োয়ারিরা কী করেছিল ?'

নিশীথ সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'না, কিছু করে নি।'

'পি-সি কী বলেছিলেন ওদের কথা ?'

'সে সব কথা ছকে গেছে ; ও অনেক আগের কথা।'

'কিন্তু কী বলছিলেন ?'

'জিতেন কি কোন দিন বলে নি কিছু এ সম্বন্ধে আপনাকে ?'

'না'। নিঃশব্দ নিটোল কারসাজিতে ফিকে নীল অজস্র ধোঁয়া নাক মুখ দিয়ে বের করতে-করতে মিসেস দাশগুপ্ত বললে।

'না। বলে নি তো আমাকে জিতেন।'

নমিতা একটু হেসে নিশীথের দিকে তাকাল। 'বলতে বাধছে আপনার। দেখছি তো। আচ্ছা জিতেনকে জিজ্ঞেস করব। পি-সি···'নমিতা হাসতে-হাসতে বললে, 'পি-সি। জিতেনের এলেকার জিনিস কি পি-সি—'

'অনেকটা। জিতেন তো ব্যবসা পাড়ায়ই ঘোরে-ফেরে—ওর কাজ করে, সদাগরি পরামর্শ দেয়। মাড়োয়ারিদের সঙ্গে তো ওর দিনরাত ঠোকাঠুকি।'

নমিতা উঠে দাঁড়িয়ে কোত্থেকে একখণ্ড চকখড়ি তুলে নিয়ে কালো টিপয়ের উপর লিখল ঃ O P C A D K S O

'এই যে টি-পয়ের ওপর কী লিখেছি বলুন তো।'

'আচ্ছা, ত্রিশ বছর আগের পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে বলব।'

'তার মানে ?'

'সেই চোদ্দ পনের বছরের নিশীথ বলছে, ও পি সি এদিকে এসো।'

'মওকা' নমিতা হাসতে-হাসতে বলছে, 'আচ্ছা, আচ্ছা জিতেন এলেই ধরব তাকে আমি। আমার ভারী কৌতূহল বোধ হচ্ছে', নমিতার সিগারেটটা ফুরিয়ে গিয়েছিল প্রায়। সেটাকে অ্যাশ-ট্রের ভিতর ফেলে দিয়ে নমিতা বললে, 'বাসে চড়েন আপনি খুব নিশীথবাবু ?'

'খুব।'

'জিতেন আর আমি গাড়িতেই বেরুই। অফিস একটা গাড়ি দিয়েছে ওকে ; সব সময়ের জন্যে, অফিসের কাজে অবিশ্যি। সে গাড়িটা আমাদের এখানেই থাকবার কথা। কিন্তু ও একটু বেশি খুঁতখুঁতে, সেটা অফিসেই রেখে দেয়। অফিসে গিয়ে কাজে লাগায়। বাড়ির জন্য একটা আলাদা সানবিম কিনেছে।

নিশীথ শুনছিল। বেশ আত্মতুষ্টভাবে কথা বলছিল নমিতা কিন্তু কথাবার্তায় প্রসাদের স্নিগ্ধতা ততটা ছিল না। কেমন একটা মর্যাদাবোধে ফুলে-ফুলে উঠছিল নমিতার নাকের ফোকা। আকাশ-বাতাসে স্বাধীনতা ও বেশি টাকার বিশেষ মর্যাদা পান করে খুব ভাল লাগছিল যেন মেয়েটির।

ঠিক ছিপছিপে নয়, একটু মুটিয়েছে। তবু বেশ ছিমছাম, গায়ের রং চীনে বা বার্মিজদের মতন হলদে, হলদেটে নয়, ইংরেজ মেয়েদের মত লাগছে। বা দিশি মেয়েদের মত ফর্শা ঠিক নয়, তবে খুব বেশি ফর্শা দিশি মেয়ের মতই যেন, মাঝে-মাঝে বিলিতি বলে ভুল হয়, শীতের দেশে থাকলে ওদেরই মতন হয়ে যেত, সুযিমামার দেশে থাকতে-থাকতে এ-দেশী গৌরী হয়ে যাবে একদিন। নমিতার বেশ লম্বা চুলগুলো, সোনালি প্রায়। নাক খাড়া, মুখে মঙ্গোল ছাঁচ নেই বলেই মনে হয়। যেটুকু আছে, তা বিশেষ একটা সৌষ্ঠব দিয়েছে তার মুখশ্রীকে; যেমন চোখ দুটো ঈষৎ বাঁকাভাবে বসানো নমিতার মুখে—কিন্তু এমনই আর্য-ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে ওর সমস্ত মঙ্গোল ধোঁয়া কেটে, কেমন একটা কুহকে অথচ পরিচ্ছন্নতায় মর্মস্পর্শী হয়ে আছে সমস্ত মুখের ছাঁচ—নাক-মুখের প্রতিভা। কাল রাতে ভাল করে তাকিয়ে দেখে নি নমিতার দিকে নিশীথ। আজ গোড়ার থেকেই—ভোরের আলোর রোদে—দেখছিল; কথা বলছিল কম, দেখে নিচ্ছিল বেশি। দেখা হয়ে গেছে। ব্যবহারের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ভাল জিনিসই পেয়েছে জিতেন; মেয়েটির ভিতরের সার্থকতা কেমন জানা নেই নিশীথের। দু-চারটে কথা বলে এখনো ও কিছু বুঝে উঠতে পারে নি।

'সেই সানবিমটা নিয়ে বেরিয়ে গেল বুঝি আজ সকালে?'

'না। অফিসের গাড়িটা কাল রাতে এনে রেখেছিল—খুব সকাল-সকাল অফিসে যেতে হবে বলে। জিতেনের অফিসে যাবার আগে ওরা গাড়ি পাঠিয়ে দেয়। আমাদের সানবিমটা গ্যারাজে আছে, বেড়াতে যাবেন?'

'এখন?'

'এই তো বেড়াবার সময়।'

'কোন দিকে?'

'চলুন লেকের ও-দিকটায়। তারপর সেখান থেকে ডায়মণ্ডহারবার।'

'ডায়মণ্ডহারবার'—নিশীথ তাকিয়ে বললে, 'জিতেন ফিরবে কটার সময়।'

'আজ?, চারটের আগে না। আমরা দুটো-আড়াইটের মধ্যেই ফিরে আসব। এখন সাড়ে আটটা। সাড়ে দশটা অব্দি এগিয়ে যাব যেখানে গিয়ে পৌঁছুই—বজবজ—ক্যানিং—'

টিনের থেকে একটা সিগারেট বের করে নিয়ে নমিতা বললে, 'যশোর রোডে গিয়েছেন?—ব্যারাকপুরে?'

ট্রেনে ব্যারাকপুরে গিয়েছে নিশীথ, বাসেও। পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছে যশোর রোডে। কয়েক বছর আগে শীতকালে। জাপানিরা তখন কলকাতা আক্রমণ করে-করে। বেশ লাগত একা-একা বেড়াতে। দমদমে এক খুড়তুতো ভাইয়ের বাংলোতে থাকত। খুড়তুতো ভাই অয়্যারলেসে কাজ করত।

'না, মোটরে চেপে বেড়াই নি যশোর রোডে—'

'যাবেন ?'

'জিতেন এসে নিক।'

'জিতেন বেড়াতে যাবে না।'

'কেন ?'

'অফিসের কাজের চাপ বেশি'—নমিতা ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে সিগারেটের দিকে তাকিয়েছিল, জ্বালায় নি এখনো।

'বাড়িতে এসেও অফিস ? সন্ধ্যার সময় বেড়াতে যেতে পারবে না ?'

'এ সাতদিন কাজের চাপ খুব বেশি। অনেক রাত অব্দি জাগতে হবে। চলুন'—নিশীথের দিকে তাকাল নমিতা—'সাড়ে দশটা অব্দি ছুটে তারপর ফিরে আসব, একটা নাগাদ বাড়ি পৌঁছে যাব।'

নিশীথের হাতের সিগারেট নিভে গিয়েছিল—অনেক ক্ষণ। সিগারেটটা হাতেই রয়ে গেছিল তবু। অর্ধেক পুড়েছে শুধু। জ্বালিয়ে নিলে হয়, কিন্তু অ্যাশ-ট্রের ভিতর ফেলে দিয়ে নমিতার দিকে সাত-পাঁচ ভেবে তাকাল নিশীথ। নমিতার চোখে নিরপরাধ প্রাণোচ্ছ্বাসের তাগিদ উপচে পড়ছে, খারাপ লাগল না তার কিন্তু। তবুও একটু ছিটেফোঁটা কিসের বাষ্প খেলে যাচ্ছে যেন, কিংবা নিশীথের নিজের চোখ থেকে প্রতিফলিত হল কি নমিতার চোখে ?

'বাঃ, সিগারেটটা ফুঁকতে না-ফুঁকতেই ফেলে দিলুম। কেমন ভুলো মন আমার—'

টিন এগিয়ে দিল নমিতা। টিনের ঢাকনি এঁটে গিয়েছিল। জোর দিয়ে, মুগ্ধভাবে ঠোঁট কুঁচকে, খুলে দিল।

সিগারেট—সিগারেটের টিনটাও, নিশীথের হাতে রয়ে গেল। তার অন্যমনস্ক হাতে কে যেন গছিয়ে দিয়েছে। নিজের সোফার পাশে রেখে দিল টিনটা। কফি আর কেক নিয়ে দাঁড়াল এসে বাবুর্চি। তিন জনের আন্দাজ জিনিস। নমিতা নিশীথ—আর-কে খাবে ? একটা বড় তেপয়ের ওপর সাজিয়ে দিতে লাগল।

'তিনটে পেয়ালা, জিতেন যদি এসে পড়ে—'

'বলেছিলেন চারটের আগে আসবেন না—'

'তাই তো কথা। তবে বিশেষ বন্ধু কেউ বাড়ি এলে আচমকা উড়ে আসে জিতেন—বন্ধুকে ভালবাসে বলে—'

নমিতা বাবুর্চির দিকে তাকিয়ে বললে—'যাও, আর-কোনো দরকার নেই। বন্ধুকে ভালবাসে বলে। আমাকে দিয়ে হোস্টের কাজ করিয়ে খুশি নয় জিতেন। ও অনেকদিন আইবুড়ো ছিল কিনা, ধাঁচটা রয়ে গেছে—'

মধু ও দুধের মত একটা মধুরতা নড়ছিল নমিতার ঠোঁটের কোণায় যেন—হাসির ; ফোটে নি হাসি ; মাথা এক-আধবার নেড়ে নিল ; কিন্তু আক্ষেপ খুব সম্ভব নয়, এমনিই—একটা সুন্দর মুদ্রাদোষের প্রেরণায়। নমিতাকে দেখাচ্ছিল শোনাচ্ছিল কেমন চমৎকার, যেন আর্যসুষমার কী-একটা রূঢ়তাকে ধুয়ে স্নিগ্ধ করে দিচ্ছে—আকাশের হাওয়া।

'কই, আপনি ওয়াশিং বেসিনে গেলেন না তো !'

'আমি নীচের থেকে হাতমুখ ধুয়ে এসেছি।'

'নীচের থেকে ?' সুন্দর কালো চোখ পাকিয়ে গোল হয়ে গেল ; বিক্ষুব্ধ হয়ে নিশীথের দিকে জবাব দিল নমিতা।

'জিতেন বলে দিয়েছে আমাকে, আপনার ঘুম ভাঙলেই দোতলায় বাথরুমে আপনাকে পাঠিয়ে দিতে। সব ব্যবস্থাই তো করে রেখেছি সেখানে।'

'ব্যবস্থা কখনো মারা যায় না,' নিশীথ বললে, 'আপনার কথা শুনতে-শুনতে গ্রহণ করেছি। আরো একটু পরে আরো স্পষ্টভাবে কাজে লাগাবার দরকার হবে হয় তো। ধন্য হয়েছি। অনেক ধন্যবাদ।'

কফি ঢালতে-ঢালতে একবার নিশীথের দিকে দ্রুত চোখে তাকিয়ে নিয়ে নমিতা বললে, 'নীচের জল ঠাণ্ডা ছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'ভাল লেগেছে ? ডাইনিং রুমে গিয়ে খাবেন ?'

'এখানে অসুবিধে হচ্ছে আপনার ?'

'না। জিতেন আর আমি মাঝে-মাঝে ড্রয়িং রুমে বসেই খাই।'

'কী খেয়ে গেল জিতেন, অফিসে যাবার আগে ?'

'চারটে ডিম—আলু ভাজা—কফিও খেয়েছে নিশ্চয়। আমি উঠবার আগেই

বেরিয়ে গেছে।'

'চারটে ডিম? সেদ্ধ? এত ডিম খায় কেন?'

'আপরুচি খানা। ও নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। খেতে ভাল লাগছে। খাচ্ছে তো কয়েক হপ্তা ধরে। এর পর অরুচি এলে মুখ বদলাবেই। চিনি লাগবে আপনার কফিতে?'

'না।'

'কফি না খেয়ে চা খেতেন হয় তো, কিংবা সরবত—এই গরমে।'

'কফি বেশ জিনিস। বেশ জিনিস।'

'ফ্যানের হাওয়া লাগছে তো ঠিক মত আপনার গায়ে? বড্ড গরম আজ। হাওয়া নেই। লাগছে তো হাওয়া?'

'ঠিক আছে।'

'একটু এগিয়ে বসুন—এই কৌচটায়, এখানে বেশি হাওয়া লাগবে। আমি আপনার কফির পেয়ালা ধরছি, আসুন; হ্যাঁ এইটায়, বেশ লাগছে না হাওয়া? স্পিড বাড়িয়ে দেব আরো?'

কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে চুমুক দিতে যাচ্ছিল নিশীথ, মাথা নেড়ে বললে—'না-না সব ঠিক আছে। এর চেয়ে বেশি হাওয়া—বেশি ভাল কোথাও নেই কলকাতা শহরে।'

নমিতার দিকে না তাকিয়ে, খানিকটা বিভোর অথচ বিচ্ছিন্ন, অন্য বৃত্তান্তের পুরুষ মানুষের মত নমিতার সামনে নিজেকে বসিয়ে রেখে কফি খেতে লাগল নিশীথ—ড্রয়িং রুমের একটা ঘোরানো শেলফের মোটা-মোটা বইগুলোর সোনার জলের দিকে, ঘরের আনাচে-কানাচে রোদে এক-আধটা ফিনফিনে ওড়নার বহতা বাতাসের দিকে তাকিয়ে থেকে।

'জিতেন আজ অফিসে যাবার আগে যাচ্ছেতাই কাণ্ড করেছে।'

'কী করেছে?' ধীরে-ধীরে নমিতার দিকে মুখ ফিরিয়ে সমাহিত ঋষি-পুরুষের গলায় জিজ্ঞেস করল নিশীথ।

আজ ভোরে খাবার ঘরে ঢুকে জিতেন কী করেছে, না-করেছে, নিজের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সবই তো জেনে ফেলেছে নিশীথ। তবুও জিজ্ঞেস করল নমিতাকে, খড়খড়ে গিন্নিবাজের মত নমিতাকে বলল, 'কী করল আবার?'

'পাউরুটি, মাখন, জ্যাম, মর্মালেড়, মিনারেল ওয়াটার, এমন-কি কুঁজোর জল

অব্দি চেঁচে খেয়ে গেছে সব। এতটা হা-পিত্যেশ জিতেনের দেখি নি আমি কোনো দিন। আপনি দেখেছেন?'

বলতে-বলতে তরতাজা কৌতুকে তাকাল নমিতা।

তাকিয়ে দেখছিল নিশীথ—নমিতার দিকে নয়—বিষয়ের এই অপরূপ অবতারণার দিকে; নিশীথই যে খেয়েছে সব, সেটা জানা না-থাকাতে ভারী তাজ্জব বিষয়ই বটে ঃ বোতলকে বোতল জেলি, জ্যাম, আচার উড়িয়ে দিয়ে অফিসে চলে গেছে দাশগুপ্ত!

'বড্ড ক্ষিদে পেয়েছিল তাই খেয়েছে। জলও খেয়েছে বুঝি খুব?'

'খাবার ঘরের সব বোতল খালি করে গেছে। আজ সকালে একটু মিনারেল ওয়াটারের দরকার হয়েছিল আমার। পেলুম না। সব খালি। আপনি কেক খাচ্ছেন না? খান্দদার ভালো কেক, বাবুর্চিকে দিয়ে আনিয়েছি। কফির সঙ্গে কী খাওয়া যায়? এক টুকরো পাউরুটি অব্দি নেই—'

'নেই?'

'নেই।'

'ভারি বিপদ তো। তাই বলে দিনে বাড়ি এলে ওকে বলবেন না কিছু, লজ্জা পাবে। খিদে পেয়েছে, খেয়েছে, চুকে গেছে। তবে, একটা কাজ করতে পারেন—'

কেকের ক্রিম খেতে-খেতে নমিতা তাকাল নিশীথের দিকে।

'আজ রাতে যেন ভালো করে জোলাপ নেয়। তারপর, দু-চার দিন পরে কলেরার ইনজেকশন নিলে ভালো হয়।'

'আজকাল খুব বাড়াবাড়ি শুনেছি কলকাতায় রোগটার।'

'এখনও উঠতির মুখে, বাড়াবাড়ি শুরু হয় নি। কলেরার প্রতিষেধ খুব ভাল কাজ করবে।'

'আপনি নেবেন না টিকে?'

'আমার দরকার নেই।'

নমিতা কফির পেয়ালাটা শেষ করে তেপয়ের ওপর রেখে দিয়ে বললে, 'কলকাতায় এপিডেমিকের ভিতর এসে পড়েছেন, কেন নেবেন না?'

'আমার দরকার নেই।'

'আমি নেব?'

নিশীথ উত্তর দেবার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল। জিতেনের শোবার ঘর দুটো; অফিসের যে-সব কাজ বাড়িতে বসে করা দরকার হয়ে পড়ে, তার জন্য ওরই একটা ঘর আলাদা করে রেখেছে। নীচের তলায়ও অফিসের কাগজ-পত্র মজুত থাকে কিছু। টেলিফোন, দোতলার অফিস ঘরে।

মিনিট পাঁচেক পরে নমিতা ফিরে এসে বললে, 'উনি টেলিফোন করে-ছিলেন।'

'কী হল?'

'অফিসের জরুরি কাজে জামসেদপুর যাচ্ছেন।'

'কবে?'

'আজই—এখনই। চলে গেছেন।'

'জরুরি বটে। কবে ফিরবে?'

'বললেন, চার পাঁচদিন হবে; আপনাকে থাকতে বলেছেন। ফিরে এসে বিশেষ কথা আছে আপনার সঙ্গে, জানাতে বললেন।'

পটে আরো বেশ খানিকটা কফি ছিল। নিশীথের পেয়ালায় ঢেলে দিতে-দিতে বললে, 'কলেরার টিকে কবে দেওয়া হবে?'

'জামসেদপুর থেকে ফিরে এলে।'

'আর আমার?'

'আজই নিয়ে নিন। আপনাদের ডাক্তার কে?'

'চক্রবর্তী।'

'ফোন করে দিন।'

'এখনই!'

'বিকেলের দিকে হলে ভাল হয়'

'আপনি নেবেন না?'

'আপনি নেবেন?'

কী করতে নেবে কলেরার ইনজেকশন নিশীথ? কোনোদিন নেয় নি। নেবেও না কোনোদিন। এ সব রোগ খারাপ বটে, কিন্তু যেমন দূরে তেমনি নিরাকার—নিশীথের ভাবনা-কল্পনায় আঁচড় কাটতে আসে না মৃত্যু, অবান্তর—তার ক্রমশ জীবনবিমুখ নিস্পৃহ মনের কাছে আজ পর্যন্তও।

'কলেরার ইনজেকশন খুব বিশ্রী জিনিস, বড্ড ব্যাথা হয়। সইবে না

নিশীথবাবু আপনার ?'

'হ্যাঁ, বেশ টানাটানি ওঠে নমিতা দেবী। আমার তো হাত ফুলে গিয়েছিল। কেমন বেজ্জৎ করে দেয়।'

'আপনি নিয়েছিলেন? কবে? নমিতা কফির কাপ সরিয়ে রেখে, নিশীথকে নয়—তার ভিতর দিয়ে অন্য কিছুকে, দেয়ালকে আলোকে শূন্যটাকে, যেন পর্যবেক্ষণ করতে-করতে জিজ্ঞেস করল।

'কলকাতায় আসবার আগে, আট-দশদিন হল। আবার ইনজেকশন কী হবে ?'

'না, তাহলে আর-দরকার নেই।'

কোনো কথা নেই মুখে, বসে রইল কিছুক্ষণ। নমিতা নিজের বাঁ হাতের দিকে তাকাচ্ছিল। হাতটা প্রসারিত করে। কিন্তু, হাতের দিকে নয়, অন্য কোথাও তাকিয়ে ছিল যেন তার মন। কোথায়—ধরতে চাচ্ছিল নিশ্চয়। ওকে না-জিজ্ঞেস করে—ওকে না-জানতে দিয়ে ওর মনের লেখন জানতে যাওয়ার ভেতর চৈতন্যের ঘনতা রয়েছে খুব ; অনুভূতিটাকে ঠিক পথে চালিয়ে মাথা ঘাটিয়ে কাজ করতে হয়। কিন্তু তবুও ধরতে ছুঁতে পারা যায় না। আমি চোখ বুঁজে আছি, আমার এই হাতের তাসগুলোর ভিতর থেকে একটা তাস তুলে নাও তুমি—আমি বলে দেব কী নিয়েছ তুমি। কী নিয়েছ ? নিয়েছ হরতনের টেক্কা। তাসের এ খেলায় দিব্যচক্ষু লাভ করেছিল নিশীথ। যা বলে দিত তাই হত। নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে থ হয়ে যেত বড় বড় সজ্ঘর মাসটাররা। কিন্তু তাই বলে সব বিষয়ের দিব্যজ্ঞান লাভ করা কঠিন। নমিতার হাতে চিড়েতন না হরতন? হরতন? হরতনের কোন তাসটা ?

'আমি উঠি নমিতা দেবী।'

'কোথায় চললেন ?'

'এই কাছেই কয়েকটা জায়গায় যাব—ডোভার লেনে, একদালিয়া রোডে, বালিগঞ্জ স্টেশনে। আজ আর উত্তর কলকাতায় যাওয়া হবে না।'

'ফিরবেন কখন ?'

'দুপুরবেলা খেতে ফিরব।'

'কটার সময় ?'

'কটার সময় সুবিধা আপনার ?'

'দেড়টা না পেরুলেই ভাল—'

'আমি সাড়ে বারটার সময় এসে চান করব।'

'আমি পার্কসার্কাসে যাচ্ছি আমাদের গাড়িতে। চলুন আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাই একদালিয়ায় ?'

'বালিগঞ্জ স্টেশনে চলুন। পার্কসার্কাসে কোথায় যাচ্ছেন ?'

'কাজ আছে সেখানে ; নাম শুনেছেন হয় তো, মুখুজ্যে, সলিল মুখুজ্যে।'

নমিতা নিশীথের দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ, জিতেন বলছিল।'

'যাঁর নাম মা-থিন'

নমিতা তার হাতের সিগারেটটা টিনের ভেতর ঢুকিয়ে রাখতে গেল। এখন খাবে না ; খেতে ইচ্ছে করছে না।

'মা এখন ওখানে আছে কি না বলতে পারছি না। একটা মুশকিলের ব্যাপার হয়েছে। বাবা বেশ বড় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন ; অবিশ্যি বিলিতি ডিগ্রি নেই ; কিন্তু এদেশে ট্রেনিং নিয়ে তিনি খুব ঝাড়া ওস্তাদ হয়েছিলেন। অনেক, অনেক রোজগার করেছেন, উড়িয়েছেন। এখন আর কিছু করতে পারেন না। প্যারালিসিসের মত হয়েছে। বিছানায়ই পড়ে থাকতে হয়। নামতেও পারেন না। নড়াচড়াও কঠিন,' নমিতা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমার মা মা-থিন নরওয়েজিয়ান মায়ের মেয়ে। শুনেছেন আপনি ?'

টিনের ভিতর সিগারেটটা ঢুকিয়ে রেখে ঢাকনি এঁটে দিল। তেপয়ের ওপর রেখে দিল টিনটা।

'জিতেন তো তাঁকে মার্টিন সাহেব বলে ডাকে। বাবা নাম রেখেছিলেন মার্জারিন অর্থাৎ মার্জারিণী—কিন্তু সংস্কৃতে তো মার্জারী ? কখনো-কখনো মার্গারিন—মানে আমাদের মাখন—' নমিতা কথা বলতে-বলতে থেমে গিয়ে জানালার বাইরে অনেক দূরে বিশেষ কোনো কিছুর দিকে না-চেয়ে তবুও এমন ঠায় তাকিয়ে রইল যে মনে হচ্ছিল সমস্ত তাকাবার ভার গ্রহণ করেছে তার অন্তশ্চক্ষু ; কী প্রতিফলিত হচ্ছে তাতে—নমিতার বাইরের চোখের দিকে তাকিয়ে নিশীথ তার কোনো কিছু কিনারা করে উঠতে পারল না। নিশীথকে আধ খানা কথা বলে ছেড়ে দিল নমিতা। একটা মুশকিলের ব্যাপার

হয়েছে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কী সে মুশকিল—সলিল মুখুজ্যে সাহেবের প্যারালিসিস। না সেই পক্ষাঘাতটাকে জড়িয়ে আরো কিছু; পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা গেল না কিছুই।

'চলুন আপনাকে বালিগঞ্জ স্টেশনে নামিয়ে দিচ্ছি।'

'চলুন।'

গাড়ি ড্রাইভ করে নিয়ে চলল নমিতা। পথে কোনো কথা হল না। বালিগঞ্জ স্টেশনে নিশীথকে নামিয়ে দিল।

'আপনি সাড়ে বারটায় ফিরবেন?'

'তাই তো ভাবছি।'

চান সেরে যখন খেতে বসল দু-জনে, তখন দেড়টা বেজে গেল। খাওয়া হচ্ছিল খাবার ঘরে। টেবিলটা খুব বড়। বাবুর্চি, ডিশ-গেলাশ কাঁটা চামচ লাগিয়ে, টেবিলের এক পাশে, নমিতার হাতের কাছেই খাবার জিনিসগুলো নামিয়ে গেল সব। বাবুর্চিকে ছুটি দিয়ে দিল নমিতা।

'পার্কসার্কাসে মুখার্জি সাহেব কেমন আছেন?'

'ভাল না।'

'প্যারালিসিস হয়েছে?'

'হ্যাঁ, খুব শক্ত।'

'দেখছে কে?'

'একজন জার্মান ডাক্তার।'

'কেন, জার্মান কেন? দিশি ডাক্তার নেই?'

'উনি স্পেশালিস্ট। রোজেনবুর্গ নাম। জার্মান ইহুদি।

'ইহুদি?'

'উনি ভাল বলছেন না। সুবিধে করতে পারছেন না। বাবার বয়স বেশি নয় তো, মোটে বায়ান্ন। খুব তাগড়া শরীর ছিল—ভেবেছিলুম টপকে যাবেন।'

আজ ডাল-ভাতই রান্না হয়েছিল, চপ ছিল, ফ্রাই ছিল, মুর্গি নয়—কী-একটা পাখির মাংস রান্না হয়েছিল। আলাদা একটা ডিশে টোমাটো শসা পেঁয়াজের

কুচি, কাঁচা লঙ্কা, লেবু সালাদ, মটরশুঁটি ছিল। আজ সকালে নিশীথ বনাম জিতেন দাশগুপ্ত সব সাবাড় করে গেছে বলে আচার, চাটনি, সসের নতুন তিন-চারটে শিশি, আনা হয়েছে। খুলে, টেবিলের ওপর রেখে গেছে বাবুর্চি।
দই-মিষ্টি আনা হয়েছে নিশীথের জন্যে ; খুব সম্ভব জিতেনের পরামর্শে ; ফোনে পাঁচ মিনিটে সব বলে গেছে ; ভাবছিল নিশীথ। কিংবা হতে পারে নমিতা নিজেই সব ঠিক করেছে।
সংস্কারের জট খসাতে সময় লাগে নিশীথের—অথচ নিজেকে সে স্পষ্ট চৈতন্যের মানুষ বলে মনে করে। সচেতন হয়ে পড়ল হঠাৎ যেন তারপর ; এই চেতনাই তার নিজস্ব।
'আপনার মাকে দেখলেন ?'
'পার্কসার্কাসের বাড়িতে ?' অন্যমনস্কভাবে কাঁটা দিয়ে একটা ফ্রাই টেনে নিয়ে একটা ঢোঁক গিলে নমিতা বললে, 'মা-থিন সেখানে নেই।'
'কোথায় গেছেন তা হলে ?'
'কী জানি—বাবা বলতে পারছেন না। মা হচ্ছেন ঝড় কি বাতাসের মেয়ে, একজন প্যারালিটিক রুগির সঙ্গে দু-বছর কাটানো বড্ড শক্ত তার পক্ষে। আমি বুঝেছি তিনি হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। কোথাও তাস খেলতে চলে যান হয় তো। কিংবা এ্যাম্বুলেন্সের কাজে। টহল মারতে খুব ভালবাসেন ; তাতে অনেক লোকের উপকার হয়। ওঁর উদ্দেশ্য অবিশ্যি বাঁই-বাঁই করে ছুটে বেড়ানো রেড ক্রশের গাড়িতে, স্ট্রেচারে মানুষ টেনে। দাঙ্গার সময়, বাপ রে, কী হুজ্জোতি! কাউকে মারা বা বাঁচানো লক্ষ্য নয়, যারা বড-বড় ট্রাক চার্টার করেছে, তাদের সঙ্গে দিক্-বিদিকে ছোটা, রেডক্রশের গাড়িতে নরওয়ে-স্টিমারের মত ছুটে বেড়ানো'—
'আপনি কিছু খাচ্ছেন না মিসেস দাশগুপ্ত।'
'ফ্রাই খাচ্ছি।'
ছুরি-কাঁটা দিয়ে সেই একটা ফ্রাই-ই ছিঁড়ে চিরকুট্টি করছিল নমিতা ; মনটা যেন কেমন জোশ হারিয়ে ফেলেছে, পার্কসার্কাস থেকে ফিরে এসে।
'ভাত নিলেন না ?'
'নিচ্ছি। ভাত খুব কম খাই আমি। এই যে একটু সালাদ খাওয়া যাক। সকালবেলা বলছিলেন পাটাতনের নীচে পদ্মার ইলিশের মত ঠেসে রাখে—

কলকাতার বাস কণ্ডাকটার কলকাতার বাঙালি প্যাসেঞ্জারদের। কেটে কুচিয়ে নুন বরফে চালান দেবার মতলব আর-কি। একটা বিহিত করতে বলছিলেন। সেই থেকে কথাটা ভাবছি আমি।'

নিশীথ কাঁটা চামচ দিয়ে ডালভাত খাচ্ছিল। চামচটা রেখে ছুরি তুলে নিল, কাঁটা দিয়ে মাছের ফ্রাইটা তুলে নিয়ে বললে, 'মনে করে রেখেছেন। অনেকে ভুলে যায়। কিন্তু ওটা তো আমাদের একটা ছোটখাট আপদ। বড়-বড় বিপদগুলো পড়ে রয়েছে।'

'ছোটখাট? আজ মোটরে ঘুরেছি ঘণ্টাখানেক নানা জায়গায়। দেখেছি বাসগুলো খুব ভাল করে নজর দিয়ে। এ যদি ছোটখাট ছিঁচকে হয়, তা হলে আমি নাচার নিশীথবাবু।'

নিশীথের খিদে নেই বেশি আজ? কী খাবে? মাংস খাবে?

'এ কি বালি হাঁসের মাংস মিসেস দাশগুপ্ত?'

'না। ঘুঘুর। খেতে ইচ্ছে করছে না? আপনি মাংস খান না? আচ্ছা দেখুন আজ খেয়ে—'

নিশীথ দেখতে লাগল খেয়ে। রান্না ভাল, মাংস নরম মাখনের মত; স্বাদ আছে। কিন্তু এ জন্যে পাখিটাকে মারা কি ঠিক হয়েছে? একটা কি দুটো ঘুঘুকে মেরে এই মাংস—এই ডিশ—এই রক্তের ফল ঝলসানি খেয়ে তৃপ্তি। এরপর মানুষের জীবনের ছোট-বড় নানারকম অতৃপ্তির কথা পেড়ে নমিতার মুখের দিকে চেয়ে থেকে কেমন যেন অবাস্তবতা এসে পড়ে। মাংস খাচ্ছে নমিতাও। সেও কি এই রকম কথাই ভাবছে? নিশীথ একটু ব্যাহত হয়ে তাকিয়ে দেখল মাংস খেয়ে নমিতার মুখে যে-তৃপ্তি সেটা আশ্চর্যরকমে সৎ। নমিতা মৃত ঘুঘুর কথা ভাবছে না; মাংসটা নির্বিকারভাবে ভোগ করছে। বাস কনডাকটার ও প্যাসেঞ্জারদের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সে খুব নিখুঁত লোকায়ত।

'আপনাদের বড়-বড় বিপদগুলো কী বলবেন নিশীথবাবু?'

'আর-এক সময় বলব।'

দু জনেই খেয়ে চলছিল নিঃশব্দে—কাঁটা চামচ খটখট করে, কাঁটা ছুরি ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ।

'কাল রাতে আপনার ঘুম হয়েছিল নিশীথবাবু?'

'পাঁচটার পর হয়েছিল।'

'ওঃ, এত দেরিতে? জিতেন তো একটা-দুটোর সময় ওপরে এল— পাঁচটা অব্দি জেগেছিলেন নীচে?'

নিশীথকে টোমাটো সসের শিশিটা এগিয়ে দিল নমিতা। শিশিটার দিকে তাকাল একবার নিশীথ।

'নীচে তো ফ্যান ছিল না; মশারি টানাতে হল; ওপরে চলে এলেই পারতেন অত গরমে? জিতেনের খেয়াল হয় নি, মাথায় সব জিনিস সব সময় খেলা করে না। তা হলে ড্রয়িংরুমে বা হলে শোবার জায়গা করে দিত আপনার'—বলতে-বলতে নমিতা ওয়াটার কুলারের জলভর্তি কাঁচের কুঁজোটার দিকে তাকাল একবার। জল খাবে।

জল খাবে। তেষ্টা পেয়েছে বেশ। কিন্তু থাক, এখন না; পরে খাবে। এমনি জল খাবে, না রেফ্রিজারেটারের ভিতর থেকে বার করে এনে স্কোয়াশ খাবে? 'জল খাচ্ছেন না? দু গ্লাস ভর্তি জল রয়েছে। কিন্তু আমরা কেউই ধরছি ছুঁচ্ছি না নিশীথবাবু। কেন এ-রকম?'

'তেষ্টার অভাব হয়েছে আমাদের।'

নমিতার মুখ উজ্জ্বল হয়ে এল হাসিতে; নিশীথের কথা শুনে নয়—এমনিই। হাসলে কেমন একটি ঝিলিক এসে পড়ে নমিতার চোখে—ঠোঁট শানিয়ে ওঠে; ছুরির মতন; কেটে নিশীথের রক্ত বার করে দেবে মনে হয়। কিন্তু তা নয়, বুকে রক্ত উত্তেজিত হয়ে উঠে, স্নিগ্ধ হয়ে থাকে। জল খাবে কি নিশীথ? মাঝে-মাঝে কী এক সংস্পর্শে এসে প্রকৃতির বড়-বড় সনাতন পাথরের আড়ালে তাদের ছায়ার মত যেন মন নিরাশ হয়ে থাকে। শরীরের পিপাসা চাপা পড়ে যায়।

'এই দু গ্লাস জল ওয়াটার কুলারের ভিতরে ছিল।' নমিতা বললে। তুলে নিল একটা গ্লাস সে; ঢক-ঢক করে খেতে লাগল।

'জিতেন জামসেদপুরে পৌঁছে গেছে হয় তো?'

'এইবারে পৌঁছবে।'

'গিয়ে টেলিগ্রাম করবে না?'

'কেন?'

'আপনার মা কি রাতের বেলা ফেরেন?'

'কে ? মা-খিন ? আমার বাবার কাছে ?' নমিতা জল খাবার ছলে গেলাসের ঠাণ্ডা কাচ গালিয়ে খেয়ে ফেলছে যেন, মনে হচ্ছিল। গেলাসটা টেবিলে রেখে একটা উত্তর দিতে গিয়ে চুপ করে গেল।

'ইহুদিদের ভিতর বড় ডাক্তার থাকে ? আমি ভেবেছিলুম ওরা ব্যবসায়েই জমাতে পারে। ওদের মধ্যে অবিশ্যি বড় বিজ্ঞানী সাহিত্যিক রয়েছে।'

'ভারী বিচিত্র একটা জাত ইহুদিরা, বেশ বড় হাতে তৈরি। কী বলেন নমিতা দেবী ?'

'তা ঠিক। কিন্তু ওদের মনের মধ্যে মোচড় রয়েছে, ঘুণ ধরে যায়। ওরা যা হতে পারত, তা হল না। ইহুদিদের ওপর আমি অবিচার করলাম ?' নমিতা জিজ্ঞেস করল।

'না। ইহুদিরা অনেক বড়-বড় জিনিস দিয়েছে। কিন্তু অন্য সব জাতিকে অনেক সাধ্য-সাধনা করে আহরণ করতে হয়েছে সে-সব জিনিস। ইহুদিরা যা দিয়েছে তার অনেক কিছুর ওপরই কেমন একটা বিষণ্ণতা, মৃত্যুর গন্ধ যেন।'

'ভালবাসেন সেটা আপনি ?'

'আমি ভালবাসি। কিন্তু ইতিহাস তা ভালবাসবে কেন ?'

'মৃত্যুকে কী রকম মনে হয় ?'

'এগুচ্ছি মৃত্যুর দিকে। এইবারে আমি জল খাব।'

'অরেঞ্জ স্কোয়াশ আছে রেফ্রিজারেটরে। এনে দিই।'

'আমি নির্ঝরের জল খেতে ভালবাসি।'

'নির্ঝরের ?'

'স্কোয়াশ তো ফ্যাকটরির জিনিস।'

নিশীথ হাত বাড়িয়ে, চোখ বুজে, ঠাণ্ডা কাচ স্পর্শ করে, এক ঢোঁকে গেলাসের সমস্তটা জল খেয়ে ফেলল।

'এটা কি নির্ঝরের জল ?'

'নির্ঝরের খুব কাছে !'

শুনে নমিতা ডিশ, গেলাস, অনুভূতির দিকে তাকিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে নিশীথের কথাটা আন্দাজ করে নিচ্ছিল।

'সেই জার্মান ইহুদি ডাক্তার রোজেনবুর্গ ; তার সঙ্গে কি দেখা হল যখন গিয়েছিলেন মুখুজ্যে সাহেবের বাড়িতে ?'

'না। তিনি রোজ আসেন না।'

'বায়ান্ন বছর মত বয়স আপনার বাবার। জ'াঁদরেল মানুষ। এ রকম শক্ত প্যারালিসিস হল। প্যারালিসিস হয় কেন মানুষের ?'

নমিতা, অনিমেষ, জলে ভর্তি ঠাণ্ডা একটা কাচের গেলাসের দিকে, তাকিয়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে গালে চেপে ধরল। তার পরে আরো ওপরে বাঁ দিকের রগের ডানদিকের রগের ওপরে গেলাসটা চেপে রেখে নির্নিমেষ চোখে নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললে, 'শরীরটাকে বেশি কবুল করলে হয়ে যায়। কিংবা মনটাকে।'

নিশীথ হাত বাড়িয়ে দিল আর-এক গ্লাস জল খাবে বলে। তাকিয়ে দেখল, সব গ্লাসের জল ফুরিয়ে গেছে। নমিতার হাতে জলভর্তি একটা গ্লাস আছে শুধু। নমিতার কপালের ডানদিকের বাঁদিকের রগ স্নিগ্ধ হয়েছে, ঠাণ্ডা হয়েছে কপাল, মাথা ; ঠাণ্ডা জলের গেলাসটা গালে ছুঁইয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিল।

'জল খাবেন আপনি ?'

'আছে জল ঐ গেলাসটায় ?'

'আছে। আপনি তো স্কোয়াশ খাবেন না। এই যে গেলাসটা রাখলুম এটা কি নিঝ'রের জল ?'

'আঃ, কী ঠাণ্ডা।' গেলাসটা হাতে তুলে নিয়ে বললে নিশীথ।

'রেফ্রিজারেটরে ছিল। তবুও এই গেলাসটার ভেতরে অনেকখানি বরফের গুঁড়ি ঢেলে দিয়েছে বাবুর্চি। দেখেছেন কত বরফ—গলে নি বেশি।'

নিশীথ জল শেষ করে গেলাসের বরফের তলানির দিকে তাকিয়ে দেখল।

গেলাসের ভিতরে হাত ডুবিয়ে বরফের টুকরোগুলো তুলে নিল নমিতা ; কপালে রগে ঘষতে-ঘষতে উঠে দাঁড়াল। নাকে-চোখে ঘষতে লাগল। টেলিফোন ডাকছে নাকি ? তাড়াতাড়ি চলে গেল নমিতা। কেমন যেন মনপবনের মাঠে চড়িভাতির মত খাওয়া ওদের হয়ে গেছে।

নিশীথ ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসল, বেসিনে প্রায় মিনিট পনের ধরে ভাল করে হাত-মুখ ধুয়েছে।

নমিতা টেলিফোন ধরতে সেই যে চলে গেছে নিজেদের ঘরের দিকে—তারপর এ দিকে আসে নি।

নরওয়েজীয় কূলকিনারা থেকে নেমে এসেছে নমিতা—ও ঠিক এ দেশী মেয়ের মত নয়—দেখতেও নয়, খুব সম্ভব ভঙ্গি কিংবা অর্থতাৎপর্যেও নয়, যে-গেলাসে মুখ দিয়ে জল খেয়ে ফেলেছে নিশীথ, তার তলানির বরফের কুচিগুলো হাত গলিয়ে তুলে নিল, রগে ঘষল—ঠোঁটে-চোখে রগড়ে নিল। আমাদের দেশের মেয়েরা এ-রকম করত না। যদি করত, তা হলে সে একটা খেলা হত, সে খেলার নাম আছে। কিন্তু নমিতা নিশীথকে কোনো খেলায় আহ্বান করে নিশীথের এঁটো গেলাসের বরফ নিজের চোখে ঠোঁটে ঘষতে যায় নি ; ঘষেছে এমনিই—কানের পাশের রগ দপদপ করছিল বলে। গেলাসে হাত ঢুকিয়ে বরফের গুঁড়ো তুলে নেবার সময় মনেও ছিল না নমিতার যে ওটা এঁটো গেলাস, কিংবা খেয়ালে থাকলেও ও মানে যে বরফ এঁটো হয় না ; কিংবা কোনো জিনিস এঁটো হলেও কিছু হয় না। শিশুর মনে, বালিকার মনে তুলে ঘষে নিয়েছে। রগড়াতে-রগড়াতে ভুলেই গেছে কী করেছে না-করেছে।

নিশীথ ড্রয়িংরুমের ফ্যানটা খুলে দিল। চোতের বাতাস আসছিল বেশ ফুরফুর করে বাইরেব থেকে, কিন্তু কিছু ক্ষণ হল থেমে গেছে ; কেমন গুমোট।

‘আপনাকে খাবারের ঘরে খুঁজছিলুম, কখন এলেন আপনি ?’

‘অনেক ক্ষণ।’

‘খাওয়া না-হতেই টেলিফোন ধরতে উঠে গেলাম আমি।’

‘খাওয়া তো শেষ হয়ে গেছল।’

‘শেষ হয়েছিল ?’ নমিতা দূরে দাঁড়িয়ে বইয়ের শেলফের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বললে, ‘আমি ভেবেছিলুম শেষ না-হতেই উঠে গেলেন আপনি।’

‘কে টেলিফোন করল ?’

‘মা করেছেন’—নমিতা নিশীথের মুখোমুখি খাকি রঙের একটা সোফায় এসে বসল, ‘মা আমাকে দুপুরে নেমন্তন্ন করেছিলেন—’

‘খেতে ? আপনার তো খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে—’

‘না খেতে নয়, তাঁর ওখানে তাস খেলতে যেতে। দুপুর, মানে আড়াইটে-তিনটে’, নিজের হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে নমিতা বললে, ‘এখন দুটো পঁয়ত্রিশ, আপনি তাস খেলতে জানেন ?’

‘খেলি মাঝে-মাঝে।’

নমিতা মাথা কাত করে একটু ভেবে নিয়ে বললে, 'মা ইফতিকারউদ্দিন সাহেবের বাড়িতে আছে।'

'কে ইফতিকারউদ্দিন ?'

'একজন বড় ব্যারিস্টার তিনি। বড় মানে অনেক টাকা আছে। ব্যারিস্টারি করেন না তিনি!'

'দুপুরবেলা তাস খেলেন ?'

'মার নেমন্তন্ন ছিল ওখানে, তাই তাস খেলবার ব্যবস্থা হয়েছে হয় তো ?' বলে ঘরের ঝকঝকে কাঁচের শার্শিগুলোর উপর তাকিয়ে দেখল, গরম উজ্জ্বল দুপুরের সূর্যখণ্ডগুলো এসে পড়েছে সব—পরিচিত আত্মাদের মত যেন, 'মাকে বলে দিয়েছি যে আমি এখন যেতে পারব না, পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটায় যাব। বলেছি জিতেন এখানে নেই, জামশেদপুরে গেছে।—এই যে টিন', বললে নমিতা।

নিশীথ তুলে নিল একটা। হাতের কাছে ছোট তেপয়ের উপর রেখে দিল নমিতা টিনটা, নিজে সিগারেট নিল না। দেশলাই দিল নিশীথকে। শার্টের বুক পকেটে দেশলাইটা রেখে দিল নিশীথ—জ্বালাল না।

'ইফতিকারউদ্দিন সাহেবের বাড়ি গিয়ে তাস খেলব দুপুরবেলা আমি—সে হয় না। যদি কোথাও যাই দুপুরে—বাবার কাছে যাব। দু জন নার্স ঠিক করে দিয়েছি বাবার জন্যে—তারা আছে ওখানে, তবে আমি মাঝে-মাঝে গেলে—বাবা চান যে আমি যাই। আমিও চাই যেতে।'

'যাবেন নাকি আজ দুপুরবেলা ?'

'না।'

'কেন ?'

'এই তো ইয়ুসুফ সাহেবের কাছে টেলিফোন করে এলাম।'

'ইয়ুসুফ কে ?'

'বাবা যে ফ্ল্যাটে থাকেন, পার্কসার্কাসে, তারই আর-এক দিকে থাকে ইয়ুসুফ আর তার স্ত্রী, খুবই ভাল লোক ওরা। কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে আয়েষা। ফোন ধরল ইয়ুসুফ নিজে, বললে, মুখুজ্যে সাহেব ঘুমিয়ে আছেন, বাবা জেগে উঠলে—ওখানে আমার যাবার দরকার হলে, ইয়ুসুফ আমাকে জানাবে।'

'দরকার যে কোনো মুহূর্তে হতে পারে!'

'সে সব তো নার্সদের হাতে। বেশি দরকার হলে ডাক্তার আছেন। ইয়ুসুফের ভাই জুলফিকার তো সারাদিন বাড়িতেই থাকে। বাড়িতেই তার অফিস। দরকার হলে ডাক্তারকে ফোন করে দেবে জুলফিকার। বাবা দুপুর-বেলা আমাকে চান না।'—নমিতা বললে।

বুক পকেট থেকে দেশলাই বার করে সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিল নিশীথ।

'দুপুর বেলা মোটর ড্রাইভ করে তার ওখানে যে আমি যাই সে স্বজ্জোতি মোটেই পছন্দ করেন না তিনি, বলেন এ-রকম করলে তোমার প্যারালিসিস হবে'—বলে বালিকার মত, মুখ-দুষ্ট নির্দোষ যুবতীর মত মুখে, একটু চোখ টিপল, হেসে নিল নমিতা, 'আজ সাড়ে পাঁচটার আগে বেরুব না।'

'কোথায় যাবেন?'

'মার ওখানে তাসের আড্ডা ভেঙে যাবে তখন, না ভাঙলেও তাস খেলব না আমি। ওরা ফ্ল্যাশ খেলে।'

'ফ্ল্যাশ?'

'ফ্ল্যাশ খেলতে শুরু করে মার বার-ফটকা ভাবটা কেটে গেছে খানিকটা। বসে থেকেও যে নেশা করা যায় টের পেয়েছে; পান জর্দা কিমামও খাচ্ছে আজকাল। ইফতিকারউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে বেশি মেলামেশা হচ্ছে—'

নিশীথ খুব আস্তে-আস্তে সিগারেট টানছিল।

'আপনি হলে শোবেন আজ রাত থেকে।'

হলে শোবে আজ রাত থেকে নিশীথ? কী করবে? সিগারেটের ছাই ঝেড়ে উত্তর দিতে যাচ্ছিল। নিশীথ কিছু বলবার আগে নমিতা বুঝিয়ে দিল জিনিসটা তাকে, 'নীচে তো ফ্যান নেই, খুব বাতাস খেলে হলে—ফ্যাকটরির বাতাস নয়—নিঋ'রের।'—বলে হাসল নমিতা, টিনের থেকে একটা সিগারেট বার করে নিল—'আর যদি ফ্যাকটরির জিনিস চান, তা হলে হলের দুটো পাখা খুলে শুয়ে থাকতে পারেন।'

নিশীথ, কথা ভাবছিল।

'আমি ভাবছিলাম আমাদের শোবার ঘরের পাশে যে-ঘরটা আছে সেখানে ঠিক করে দিলে হয়। জিতেন মাঝে-মাঝে ওখানে বাড়ির অফিস করে—রাতে শোয়। ভারি চমৎকার হাওয়া ঐ ঘরে। মাথার উপর ফ্যান—টেবল ফ্যানও আছে। স্কাইলাইট অনেক। দরজা-জানালা বন্ধ করে শুলেও কোনো অসুবিধা

হবে না।'

'বন্ধ করার কী দরকার?'

'আমরা করি না। কিন্তু কেউ-কেউ ভাবে দোর আটকে না-রাখলে চোর আসে—'

'তা আসে বটে। অফিসের দরকারি কাগজপত্র বুঝি সব? টাকা আছে?'—নমিতাকে জিজ্ঞেস করল নিশীথ। নমিতা নিজের পা ঘেঁষে কার্পেটের নক্সার দিকে তাকিয়েছিল, নিশীথের চোখে চোখ পড়ল তার।

'ক্রশড চেক। চেক ছাড়া টাকা কে বাড়িতে রেখে দেয় আজকাল।'

সিগারেটের খানিকটা ছাই অন্যমনস্কভাবে কার্পেটের ওপরই ঝেড়ে ফেলে বললে নিশীথ, 'টাকা তো ব্যাঙ্কে থাকে।'

'কোন ঘরে শোবেন আপনি?'

'হলটা বড্ড বড় হয়ে পড়ে—ল্যাটা মাছকে সাগরে পাঠিয়ে লাভ কী?'

'লাভ আছে বই কি'—হাতের সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিয়ে নমিতা বললে—'সেখানে তার হাঙর হয়ে পড়বার সম্ভাবনা।'

'আমি জিতেনের ওখানেই শোব।'

'জিতেন ফিরে এলে?'

'হলে।'

নমিতা নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, 'তিনটে বেজেছে। আপনার তো বিশ্রাম হল না—'

'ঘুম? ঘুমের সময় আছে, হাত-পা ছড়িয়ে সোফায় বসে আছি, পাখা ঘুরছে, আপনার সঙ্গে কথা বলছি, ড্রয়িংরুমে বসে খুব ভাল লাগছে আমার।'

নমিতা সিগারেটের ধোঁয়া শেষ পর্যন্ত আত্মসাৎ করে কেমন একটা স্তম্ভনের ঘোরে নিশীথের দিকে তাকিয়েছিল।

'ঘুমোতে যাবেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল নিশীথ।

'না। এখন না।'

দু জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। নিভে যাচ্ছিল নিশীথের সিগারেট। কিছু-কিছু ধোঁয়ার ভগ্নাংশ ধীরে-ধীরে বেরুচ্ছিল নমিতার মুখের ভিতর থেকে।

'হানিফকে বলব জিতেনের ও-ঘরটায় আপনার জিনিসপত্তর রেখে দিতে?'

'হানিফ কে?'

'আমাদের বেয়ারার।'

'জিতেনের এ বাড়িতে আর্দালি চাপরাশি তো খুব কম।'

'হানিফ আছে, রফিক আছে, বিশু, মহিম আছে, বাবু-বিবি আছে। আমরা দু জন লোক তো শুধু, আপনার সঙ্গের লাগেজ সবই তো নীচে?'

'এই হানিফ!' ড্রয়িংরুমের জানালার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাক দিল নমিতা।

'হুজুর!' বলতে না-বলতেই দুড়দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে কুড়ি-পঁচিশ বছরের একজন পাঞ্জাবি মুসলমান ছোকরা ড্রয়িংরুমের দরজায় এসে হাজির হল। নিশীথের বিছানা, স্যুটকেস, সাহেবের দুসরি কামরায় রেখে আসতে বলা হল।

'লেকপাডায় দু জন মুসলমান আর্দালি রেখেছে দেখছি জিতেন। কোথাকার মুসলমান?'

'পাঞ্জাবের।'

'বিপদে পড়বে না তো?'

'না, এখন আর কিচ্ছু হবে না।'

'ওদের নিজেদের মনে কোনো ভয়ডর নেই?'

'কিচ্ছু না।' নমিতা বললে, 'একটা কথা আগের থেকে আপনাকে জানিয়ে রাখা দরকার, যে-ঘরে আপনি শোবেন'—দরজায় ছায়া পড়তেই চোখ খুলে তাকাল সে। হানিফ এসে বললে জিনিসপত্তর রেখে দেওয়া হয়েছে বড়-সাহেবের ঘরে। সে একটু পার্কসার্কাস যেতে চাইল ইফতিকারউদ্দিন সাহেবের ওখানে। পাঁচটার সময় ফিরবে।

'কেন? সেখানে কী আছে? সাদি? যিতনা কুছ কোশিশ করো হানিফ—'

'হুজুর, কুছ নেই—লেকিন—হামেশা—'

'আচ্ছা যাও।'

যে-কথা পাডছিল নমিতা, হানিফ এসে পড়াতে ভেঙে গেল, কথাটি যেন পাড়বে না আর নমিতা—মনে হল নিশীথের। জানালার ভিতর দিয়ে অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে আছে সে, কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয় যা-দেখার তা ছাড়া আর-কিছু দেখছে না যেন। কোনো ব্যথা নয়, দুরাশা নয়, ক্লান্তি নয়; কিন্তু নানা রকম কথা বলার অবক্ষয়ে যে-নিস্তব্ধতা এসে পড়ে মানুষের চোখে-মুখে—পৃথিবীর সমস্ত জিনিসেরই অবসান যে-রকম নিস্তব্ধ (হয়তো নিষ্ফল) তেমনি নির্বাণ-

চক্রের মতো তাকিয়েছিল যেন—কোনো জিনিসের দিকে নয়, অফুরন্ত সময়-কণিকাগুলোর দিকে।

'জিতেনের ঘরে শোবেন আপনি আজ রাতে, কিন্তু ঘুমুতে পারবেন তো?'

'কেন কী হবে?'

'সে ঘরে টেলিফোন বাজে!'

'তা বাজতে থাকবে।'

'ধরতে হবে তো।'

'জিতেন জামশেদপুরে আছে—টেলিফোন ধরে কী লাভ?'

'বড় ব্যবসায়ী মানুষের কাছে নানা রকম জরুরি খবর আসে। জিতেন জামশেদপুরে—সবাই কি তা জানে। সাহেব চলে গেলে তার স্ত্রী নেই? সাহেব তো হল। আমার নিজের প্রাইভেট টেলিফোনও আছে; রাতে, অনেক রাতেও আসে।'

'অনেক রাতে যে প্রাইভেট ফোন আসে সেটা আমার ধরা উচিত নয়।'

'সে ফোন আমার অনেক রাতের নিজের জিনিস; যদি অনুচিত হয় আমি নিজে বলে দেব', নমিতা হেসে বললে—

নিশীথ সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'জিতেন ধরে?'

'আমার ফোন?'

'হ্যাঁ।'

'ওর ঘুম বেশি।'

নিশীথ চিমটের মত করে ডান পায়ের আঙুল দিয়ে টেনে তেপয়টা আস্তে-আস্তে নিজের দিকে নিয়ে এল। সিগারেটের কিছুটা ছাই তেপয়ের অ্যাশ-ট্রের ভিতর ঝেড়ে ফেলে তেপয়টা আঙুলে ঠেলে আস্তে-আস্তে সরিয়ে দিল আবার, 'রাত-বিরেতের সমস্ত টেলিফোনই আপনার ধরতে হয়?'

'বেশি রাতে জিতেনের কাছে ফোন আসে না।'

'আমি যদি ধরি আপনার ফোন'—বলে নিশীথ চুপ করল। আরো কিছু বলবে হয় তো সে। কী বলবে, বলে নিক; শোনা যাক। নমিতা নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, নিশীথ কিছু বললে না আর।

'আপনি ফোন ধরে যদি ওদের কথাটা জেনে রাখতে চান ওরা তাতে

ভড়কাবে না।'

'আপনি তখন ঘুমুচ্ছেন?'

'ঘুমুচ্ছি হয় তো—'

'আপনার কানের কথা আমাকে বলবে?'

'শোনার অনুমতি রয়েছে বলেই তো কান পেতে আছেন—জানবে না তারা?'

'কী ভাববে তারা? নমিতা দেবীর সেক্রেটারি?'

'হয় তো জিতেন দাশগুপ্তকে বলছে। কিংবা—'

'কিংবা?'

'নিশীথ সেনকে।'

সিগারেটটা জ্বলে-জ্বলে নিশীথের আঙুল পুড়িয়ে ফেলছিল প্রায়। তবুও সেটাকে ফেলে না দিয়ে আঙুলে আটকে রাখল নিশীথ। বেশি দগ্ধাচ্ছিল বলেই, নাকি অন্যমনস্কতায়, হাতের থেকে খসে পড়ে গেল সিগারেটটা—কার্পেটের উপর। তুলে নিয়ে অ্যাশ-ট্রের ভিতর ধীরে-ধীরে ডুবিয়ে রাখল নিশীথ।

'বেশি রাতে ফোন আসে আপনার—রোজ রাতেই?'

'না, রোজ রাতে নয়—তবে কোনো-কোনো সময় রোজ রাতেই।'

'আপনার ফোন ধরব আমি; জেগে উঠি যদি!'

'ফোন এলেও ঘুমোতে পারবেন?'

'কোনো-কোনো ফোন খুব ভয়কাতুরে—দু-একবার ডেকেই ছেড়ে দেয়।'

'অত রাতে যারা চায় তারা ভয়কাতুরে নয়; আমাকে না পেয়ে তারা ছাড়বে?'

'আপনাকে না পেয়ে? কোথায় আপনি তখন? ঘুমিয়ে তো আছেন—'

'ঘুমিয়ে আছি, কিন্তু কেউ না জাগলেও, আমাকে না-জাগিয়ে ছাড়বে না ওরা।'

নিশীথ ব্যাহত হয়ে বললে, 'এই রকম ডাকসাইটে?'

'কেন দুপুর রাতের ঘুমে এত কী মায়া?'

'মানুষের দুটো নিস্তব্ধতা আছে পৃথিবীতে—মৃত্যু আর ঘুম, এ ছাড়া আর সবই শেষ পর্যন্ত অজ্ঞেয়।'

অনিমেষভাবে চুপ করে থেকে কিছুক্ষণ পরে নমিতা বলল—'নিস্তব্ধতা আছে মানুষের জীবনে। কিন্তু তা ঘুম? মৃত্যু?' ঘরের ভিতর কোথায় যেন শব্দ হল—বেড়ালের? বাতাসের? লোকজনের?—'আমি তা মনে করি না।' নমিতা বললে যেন ঘুমের থেকে জেগে উঠে। তা মনে না-করাই স্বাভাবিক। সাদা সাধারণ পথে চলতে-চলতে সহজ কথাবার্তার ভিতর দিয়েই জটিলতা এসে পড়ে, কথাবার্তা বলতে-বলতে আজ নিবিড়তা এসেও পড়েছিল হয় তো—সোজা সহজ পথে, কিন্তু সব গহনতাই নেশার মতন জিনিস। নেশায় ধরলে মন ব্যক্তিগত হয়ে উঠতে চায়, নিস্তব্ধতা আছে ঘুম আর মৃত্যুর—অগ্রসর হচ্ছে সেই দিকে নিশীথের জীবন। অগ্রসরের সীমানায় পৌঁছুলেই সমাধি, যে-সংস্কৃতি ও বুদ্ধির ভিতর থেকে জেগেছিল নিশীথের জীবন চল্লিশ বছরেরও আগে, নৈষ্ফল্য ভেদ করে সার্থকতায় পৌঁছুবার আশা সে পোষণ করেছিল বারবার। আশাকে সফল করে তুলবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টাও করেছে কতবার সে। কিন্তু কিছুতেই ভেদ করা সম্ভব হল না। কিন্তু নমিতা আর-এক পৃথিবীর। তার সফলতা কিংবা ব্যর্থতা অন্য রকম। ঘুম বা মৃত্যুর বাইরে সে এক অন্য কৈবল্যের স্তর। টাকা রয়েছে সেখানে—টাকাই সব; মিলন রয়েছে সেখানে, মিলনই সব; দেহ রয়েছে—নানা রকম সুধা, ফেনা, সৈন্ধবের স্বাদ উপলব্ধির ভিতরে পৃথিবীর মাটিকে নিকটতমের মত পায় শরীর। আকাশের নক্ষত্রলোকের ব্যক্তির ভিতরে কামশরীরের মত আলোকিত হয়ে ফেরে মন। কেন ঘুমোতে চাইবে ও জগতের মানুষ? কেন মৃত্যু চাইবে? নমিতার মতন জীবন পাওয়া—কিংবা জিতেন দাশগুপ্তের মতন; সম্ভব কি নিশীথের পক্ষে?

'খুব বেশি রাতে আসে টেলিফোন আপনার। হাত বাড়িয়ে বাতি নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারের ভিতর কান পেতে শোনেন? মানুষ মানুষের অন্তরঙ্গ বলেই মেশিনের স্বাদ এত বেশি।'

মেশিনের?

'হ্যাঁ টেলিফোনের'—নিশীথ বললে—'টেলিফোনের ঘরেই শোব আমি।'

'অন্য সব দিক দিয়েই ঘরটা খুব ভাল। বেশ নিরিবিলি ঠাণ্ডা। কলকাতার চারিদিকের হাওয়া এসে কথা বলে যায় যেন; কিন্তু মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দেবার জন্য। জেগে-জেগে ঘুমিয়ে যাবে মানুষ, তার পর সাত ভাই চাঁপার

মত ঘুমিয়ে পড়ে—কেঁচে গণ্ডুষ করে।'

'ও ঘরে জল আছে ?'

'জল রেখে দেব'—বললে নমিতা যেন জলসত্রের মত মূর্তি ধরে।

ঘোমটা নেই, তবুও রয়েছে অনেক দূরে গলা অব্দি ঘোমটা টেনে—রাতের ঠাণ্ডা ভরন্ত নদীর জল—ওর ঐ গলার স্বরের ভিতর, 'জল রেখে দেব বলে' ডাকছে—জোনাকিকে, নক্ষত্রকে।

'যদি বলেন, হানিফকে বলব আপনার ঘরে ওয়াটার কুলারটা রেখে আসতে।'

নিশীথ মাথা নেড়ে বললে, 'কিছু বরফ রেখে দেয় যেন, ওয়াটার কুলারের দরকার নেই।'

'অনেক রাতে টেলিফোন এলে—ঘুম ভেঙে গেলে—বিরক্ত হবেন না তো ?'

'অসময়ে ঘুম ভেঙে দিলে খুব, খুশি হব না, তবে অন্ধকার ঘরে জেগে উঠে পৃথিবীর অন্ধকার, পৃথিবীর হাওয়া, পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকে আবেদন আসছে টের পেয়ে খারাপ লাগবে না।' নিশীথ পায়ের আঙুল দিয়ে কিছুক্ষণ ঠুকল কার্পেট। অ্যাশ-ট্রেটা হাতে তুলে নিয়ে রেখে দিল।

সিগারেটের টিনের ঢাকনি খুলে ভিতরের সিগারেটগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঢাকনি এঁটে বললে নমিতা, 'ভাল কথা খুব ভালভাবে আপনি বলতে পারেন নিশীথবাবু।'

'আমাদের কলেজের জয়মাধববাবু পারতেন, আমি পারি না। আজ সকাল থেকেই মন দিয়ে আপনার কথা শুনছি আমি। এতদিন বাইরে-বাইরে থেকেও নিখুঁত বলে যাচ্ছেন কত সহজে; অনেক বাঙালিও এ-রকম পারে না।' নিশীথ নমিতার দিকে তাকাল।

যেন নিশীথের কথা শোনে নি নমিতা, এমন ভাবে মুখ ফিরিয়ে আছে, সিগারেট জ্বালিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল—'আপনি কোথাও বেরুবেন বিকেল বেলা ?'

'না, কোথাও না।'

'কেন ?'

'আজ সকালে খানিকটা ঘুরে এসেছি। কাল বেরুব। কোনো ভাল বই আছে ?'

'আছে। আমি পছন্দ করে দিয়ে যাব। পড়ে আমাকে বলতে হবে কেমন লাগল। আজকের খবরের কাগজ পড়েছেন ?'

'না।'

'খবর জানবার তাগিদ নেই আপনার, দেখছিলুম আমি। জিতেনের খুব আছে। আমার মাঝে-মাঝে থাকে—মাঝে-মাঝে হারিয়ে ফেলি। পড়বেন খবরের কাগজ ?'

'না'—বললে নিশীথ—'বিকেলবেলা ইফতিকারউদ্দিন সাহেবের বাড়ি বেড়াতে যাবেন ?'

'ভাবছি কী করব', নমিতা বললে, 'দু-একদিন ফ্ল্যাশ খেলেছি ওদের সঙ্গে। ভাল লাগে না, টাকা নষ্ট হয় বলে নয়; ওদের ওখানে কেউ নেই যেন মনে হয়, কিছু নেই যেন; ভারী ফাঁকা লাগে। অথচ খুব হৈ চৈ দিনরাত। আমি শান্তি ভালবাসি কিন্তু বোকার মতো নয়। তার চেয়ে অশান্তি ঢের ভাল। কিন্তু ওদের ওখানে—যারা দিনরাত সরগরম হয়ে থাকতে ভালবাসে তাদের খুব ভাল লাগবে।'

'জিতেন যায় না ইফতিকারউদ্দিন সাহেবের বাড়ি ?'

'না।'

'সলিল মুখুজ্যে সাহেবের ওখানে ?'

'ক্বচিৎ যায়। নানা রকম কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে।'

'খুব বেশি রাতে কারা টেলিফোন করে আপনাকে ?'

'কয়েকটা রাত ধরলেই তো বুঝতে পারবেন।'

'আমি ধরব ? আপনি তো ঘুমিয়ে থাকবেন।'

'আমাকে যা জানাবার আপনাকে তা জানিয়ে দেবে।'

'যেন জানালেই হল, বড় বাজারের মাড়োয়ারিরা নাক রগড়ে কোটেশন জানাচ্ছে; সেই রকম বুঝি ? কিন্তু তা তো নয়—'ভাবছিল নিশীথ।

'নমিতাকে ডাকলে নিশীথ সেন যদি হাজির হয়—'

'তা হলে এক মণ তুলোর থেকে এক মণ লোহা বেশি ভারী হবে বুঝি ?—' নমিতা হাসতে-হাসতে বললে।

বাইরে পড়ন্ত রোদ, সমস্ত ড্রয়িংরুম চৈত্রের বিকেলের বাতাসে ভরে গিয়েছে, দু-একটা খোলা পাতলা বইয়ের পাতা ফরফর করে উড়ছে। মস্ত বড়

দেওয়াল-ক্যালেণ্ডার দুটো উল্টে-পাল্টে শিলাবৃষ্টির মত ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল ছলাৎ-ছলাৎ করে দেওয়ালের উপর। বাইরে পটকা ফলের মত আলোর রং যেন—গাছ, পাখি, আকাশ ছুঁয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ছে; যেন কেউ ছিল না এখানে, তাকে তারা সুজাতার মূর্তি দিয়েছে, অন্যমনস্ক হয়েছিল পুরুষ, তাকে তারা বিপ্রতিভ করে তুলেছে; কনে-দেখা আলোর কণিকা-রাশিকে জ্বালিয়ে জাগিয়ে তুলে বিচলিত করে দিয়ে পুরুষটিকে, নিমেষনিহত করে রেখে নারীকে হু হু করে ছুটে আসছে চৈত্রের অবলাম্বিত বাতাস; ডানার পালক ছিঁড়ে শাদা পায়রার, উড়ন্ত কাকটাকে ধাক্কা দিয়ে কার্নিশে কাত করে, শিমূলের তুলো উড়িয়ে কোথায় ছুটে চলে গেল তারা সব কমলা রঙের ঐ মেঘ—সুমাত্রা, শ্যাম, মালয়ের মত ছেঁড়াফোঁড়া মেঘের আঁশ নিভিয়ে-নিভিয়ে ফেলে।

'না, আজ আর বেরুব না নিশীথবাবু।'

'কী করবেন তা হলে?'

'চলুন আপনাকে সেই বইটা দেব। আমিও একটা বই পড়ব এখানে ড্রয়িং'রুমে বসে।'

বই আনা হল। বাতি জ্বালানো হল। পড়তে বসল দু জনে দুটো সোফায়। খুব কাছাকাছি নয়, দূরে নয়, নেহাত মুখোমুখি নয়, আড়াআড়ি-ভাবে মুখোমুখি।

'ভাগ বসালাম না তো আপনার নিরিবিলি বই পড়ার উপর নিশীথবাবু?'

কোনো উত্তর দিল না নিশীথ। নিঃশব্দে পড়তে লাগল দু জনে, প্রায় দু ঘণ্টা উতরে গেল। হাত বাড়িয়ে সিগারেটের টিন থেকে বের করে নিয়ে সিগারেট জ্বাললে—খেল—মাঝে-মাঝে তাকিয়ে দেখল নীল ধোঁয়ার সরু ফালির দিকে—দেখল, বেড়ে বড় হয়ে শাদা নীল ধোঁয়া মিলিয়ে যাচ্ছে সব। নড়ে-চড়ে বসল তারা—মাথা তুলে তাকিয়ে নেয়; পরের বার চোখাচোখির সময় ক্ষতিপূরণ করে কী যে বীতাশোক তিমিরাতীতভাবে, কিন্তু তার পরের বার চোখকে এড়িয়ে চলে চোখ, কোনো কিছু হয়েছিল স্বীকার করতে-চায় না; উপলব্ধি করেছিল তাদের ভিতর একজন—নাকি দু জনেই তারা? কিন্তু তাও একটা কথাও মুখ দিয়ে বেরল না কারো; নিজের সোফা ছেড়ে দু মুহূর্তের বাইরের সন্ধানেও উঠে গেল না কেউ। কতদূর পড়া হল বই? শিখণ্ডীর মতন নয়

বই, মনীষীদের লেখা ; খুব ভাল জিনিস,—'কিন্তু ভাল জিনিসেরও বেশি খুব ভাল নয়,' বললে নিশীথ অনেক ক্ষণের নিস্তব্ধতা ভেঙে।

তার মানে? হাতের বইটা বন্ধ করে সরিয়ে রাখল নমিতা, ধিকি-ধিকি ভস্মস্নিগ্ধ হাসিতে, বই নয়, কী-যেন অন্য কোনো কিছুর সময় অতীত হয়ে যাচ্ছে অনুভব করে উঠে, ফিরে এল নিজের সোফায় নমিতা, হাতের বইটা বন্ধ করে রাখল নিশীথ।

কলকাতায় আসবার আগে নিশীথের জলপাইহাটিতে কয়েকটা দিন কী রকমভাবে কেটেছিল? জলপাইহাটি ছেড়ে নিশীথের কলকাতায় রওনা হওয়ার আগে সুমনার শরীরের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। জলপাইহাটি কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনছে না নিশীথের—এখানে থেকে গড়িমসি করে লাভ নেই তার—কলেজের কাজ ছেড়ে দেবে ঠিক করেছিল নিশীথ—না-ছেড়ে দিলেও অবিলম্বে ছুটি তো নেবেই, ছুটি না দিলে কলেজে যাবে না সংকল্প করেছিল সে। এ রকম অবস্থায় দেশে পড়ে থেকে লাভ নেই কিছু—নিশীথের মন কলকাতায়—ঘুরে দেখে আসুক নিশীথ ঃ ভাবছিল সুমনা। নিশীথকে সুমনা নিজেই আশা-ভরসার কথা বলে পাঠিয়ে দিতে চাচ্ছিল কলকাতায়। সপরিবারে থাকা কলকাতায় গিয়ে? কোথায় পরিবার নিশীথের? কাঁচড়াপাড়ার হাসপাতালে ভানু বাঁচবে না। ভানুর দিদি বেঁচে মরে আছে কোথাও, কোথায় যে বের করতে পারবে না কোনোদিন। কেউ-কেউ বলে পদ্মা-মেঘনার গ্রাম-জঙ্গলে বকের দ্বীপে, চিলের দ্বীপে মেয়েদের কান্নার সুর শোনা যায়—অনেক গভীর রাতে, কেউ-কেউ আরও দূরের খবর দেয়—করাচিতে, শিয়ালকোটে, পেশোয়ারে, লাহোরে, নিজামের দেশে হায়দ্রাবাদে? কোথায় নিয়ে গেছে রানুকে—অতদূরে নিশ্চয়ই নয়। কে কারা নিয়ে গেছে—তাও তো বলতে পারা যায় না। জলপাইহাটির কোনো চেনাজানা মানুষ সেই সঙ্গে সেই রাত্রে যে সরে পড়েছে তা তো শোনা যায়নি। কলকাতায় তখন দাঙ্গা হচ্ছিল বটে। কিন্তু কলকাতার দাঙ্গা জলপাইহাটিতে ছিটকে পড়ে নি তো; কেউ শোনে নি। মনটা ছটফট করছিল সুমনার; কাঁচড়াপাড়ার ভানুর জন্যে; বাঁচবে না হয় তো; মরবে না হয় তো; কিন্তু ভানু এলাকার ভিতর আছে। মরে গেলেও ছাই হাড়, যে-জায়গাটায় দাহ করা হবে, নাগালের ভিতর চিহ্নের দেশে থেকে যাবে সব। কিন্তু বড়সড় সুন্দর মেয়েটি কেমন সুস্থ

ছিল সূর্যতারার আগুনের মত, তার জন্যে দেশ নেই, সমাজ নেই, কেউ নেই, জীবন নেই তার—মৃত্যু নেই।

কলকাতায় যাবার দু-একদিন আগে নিশীথকে বলেছিল সুমনা, 'তুমি তো যাচ্ছো কলকাতায়, রাণুকে খুঁজে দেখো তো।'

'আচ্ছা দেখব'—বলেছিল নিশীথ। কিন্তু দেখবে না, খুব সমীচীন লোক নিশীথ, খুব আত্মস্থও বটে; মিছিমিছি মসজিদে ঢোকবার লোক নয় সে। ঢুকে কোনো লাভ নেই জানে সে ঃ নিশীথ সত্যই জানে যে রানু নেই।

'আমি কলকাতায় চললাম, সুমনা।'

'কোথায় গিয়ে উঠবে ?'

'জিতেন দাশগুপ্তের বাড়ি।'

'জিতেনবাবু বিয়ে করেছে শুনলাম—'

'কই আমি তো শুনিনি। কার কাছে শুনলে ? ও বিয়ে করবে, আমাকে খবর দেবে না ?'

'আমাকে যতীন হালদার বলেছিল। মগরাহাটির যতীন। কলকাতায় নানা রকম টুকিটাকি কাঁচামালের ব্যবসা করে ; তা ছাড়া আরও কী বলছিল আমাকে'—সুমনা ছড়ানো ডান হাতের উপর কপাল ঠেকিয়ে মাথা হেঁট করে মনে করে নিয়ে বললে—'মনে পড়েছে, বলছিল ব্যাকেলাইটের ব্যবসা করে, ব্যাকেলাইট কী ?'

'ব্যাকেলাইট। জানি না। তো যতীন কী করে জানল জিতেন বিয়ে করেছে ?

'দাশগুপ্ত সাহেবের অফিসে যেতে হয় যতীনকে ব্যবসার কাজে। অফিসের লোকেদের কাছে শুনেছে হয় তো।'

শুনে, নিশীথ নিজেকে কেমন একটু কাবু বোধ করল যেন। কলকাতায় যাবার উৎসাহে একটু পোড় লাগল। জিতেন তা হলে বিয়ে করল—যেন ভরতের বাটুল খেয়ে মাটিতে পড়ে গেছে হনুমান।

'আগে ভাল করে দেখেশুনে নাও।'

'খারাপ খবর কখনো মিথ্যে হয় না, লোকটি বিয়ে করেছে এত দিন পরে, শক্রুর ভালর জন্যে নয় নিশ্চয়ই।'

'সেটা খারাপ খবর হল। ভাল বন্ধুই বটে তুমি জিতেনবাবুর—'

অনেক যুদ্ধ করেছে জীবনে নিশীথ, কোনো যুদ্ধেই জয়ী হতে পারে নি। এখন আর লড়াইয়ে জেতবার আশা নেই তার। আস্থা শেষবারের মতো লড়ে দেখা যাক, এবার না-জিতে ছাড়াছাড়ি নেই। এ রকম কোনো সংকল্প উৎসাহ এখন নিশীথের হৃদয়ে নেই আর। কিন্তু স্বাভাবিক প্রাণোচ্ছ্বাস রয়েছে ; তা রয়েছে, সুযোগ পেলেই উপচে উঠতে চায়। নিশীথ সুমনার কাছে থেকে ঘুঙুর চেয়ে নিল ; রানুর জন্যে কেনা হয়েছিল, রানু যখন ন-দশ বছরের। রানুর ঘুঙুর কোনো রকমে জোড়াতাড়া দিয়ে পায়ে এঁটে নিয়ে নিশীথ, কলকাতার এম্পায়ারে কী এক রাবণনৃত্য দেখেছিল এক-সময়, তেমনি দুর্দমনীয় ভাবে নাচতে-নাচতে বললে : 'সুমনা, যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন।'

'কে, বিলোচন কে ? বিলোচন কে। নিশ্চয় দাশগুপ্ত সাহেব। তাই না ? যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন—দেবে না দেবে না যবে বিবাহে—বিবাহে—চলিলা'...ক্রম ক্রম—চোখ ঘুরিয়ে বাবরি উড়িয়ে রাবণনৃত্যে বাসুকির মাথা না থেঁৎলে ছাড়ছিল না নিশীথ ; কলেজের ফিলজফির প্রফেসর মহিম ঘোষাল এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন। মহিমবাবুর সঙ্গে কথা সেরে এসে দরজা বন্ধ করে আবার নাচতে লাগল নিশীথ। সুমনাকে আচ্ছন্ন হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তে দেখে নাচ থামাল। বললে, 'পারনিসাস এনিমিয়ার রুগি। এদের সঙ্গে ঘর করে মজাও করতে পারা যায় না একটু।'

'মজা কলকাতায় গিয়ে করো, দাশগুপ্ত সাহেবের বৌয়ের কাছে। তোমার এ-রকম নাচ দেখলে আমার মাথা যেন কেমন করে ওঠে।'

'কেমন আছে শরীরটা আজ ?'

'বড় খারাপ লাগছে।'

'খারাপ !'

'খারাপ। মনে হচ্ছে যেন মরে যেতে বাকি নেই বেশি—'

নিশীথের হাত ধরে সুমনা তাকে নিজের বিছানার পাশে টেনে বসাল। খুব অনিচ্ছার সঙ্গে বসল নিশীথ। অনিচ্ছাটাকে অতর্কভাবে চেপে রেখেছে ঠিক—কিন্তু তবুও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নিয়ে স্বামীকে পর্যবেক্ষণ করে বুঝে নিতে পারে কোনো-কোনো স্ত্রী। সুন্দর ছিল বটে সুমনা একদিন—কিন্তু কেমন হাড়-ক্যাকাসে রঙ হয়ে গেছে—শরীরে হাড়গোড় ছাড়া কিচ্ছু নেই আজ তার। নিশীথ পণ্ডিত লোক, কিন্তু তবুও বিলাসী মানুষ, দেহরসিক আরো বেশি।

কী করবে সুমনাকে নিয়ে আজ? স্ত্রীর শরীর একেবারে বাতিল। হাড়ের ভিতর দিয়ে চিঁ চিঁ করে যে-শব্দ বেরয়, নিশীথের মত মানুষের মনের খোরাক মেটাতে গিয়ে জাউয়ের মত কাজ করে তা, ভুসির মত ভুর হয়ে পড়ে থাকে।

'তোমাকে চেঞ্জে যেতে বলেছে ডাক্তার মজুমদার।'

'কোথায় যাব?'

'কোনো শুকনো জায়গায়ঃ কাছেই; দেওঘর, গিরিডি যেতে পারো, মিহিজাম, জামতাড়া, ঝাড়গ্রাম—'

'টাকা আছে চেঞ্জে যাবার?'

'ধার করে নিতে হবে।'

'প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে টাকা নেই?'

'সব নিয়েছি, আর নেই।'

'কার কাছ থেকে ধার করবে?'

নিশীথ একটু ভেবে বললে, 'জিতেনকে বলে দেখব।'

'কিন্তু জিতেনবাবু তো টাকা ধার দেন না।'

সুমনার দিকে খানিকটা সরস বিস্ময়ে তাকিয়ে নিশীথ বললে, 'কে বললে তোমাকে?'

'তুমিই তো বলেছ।'

'আমি বলেছি?' সুমনার মরুঞ্চে শালিখের মতো চোখের ঘোলাটে ভাবটা ভাল লাগছিল না নিশীথের। একটা বেড়াল···ভারী ধবধবে সুন্দর তিব্বতি বেড়ালের মত মোটাসোটা সাদা ফনফনে লোমে লোমাচ্ছন্ন; বেড়ালটা মাদি; অর্জুন গাছের ছায়াকাটা রোদে বসেছিল; বেড়ালটার সুন্দর মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্নিগ্ধ সচকিত তাকিয়ে রইল নিশীথ; মুখটা বেড়ালের, না নারীর ছিল কোনোদিন! জীবনে সৌন্দর্যের প্রবেশ, নারীদের সঙ্গে অলিতে গলিতে ঘেঁষাঘেঁষি, নিশীথের জীবনে যে খুব বেশি ছিল কোনোদিন তা নয়—কিন্তু সম্ভাবনা ছিল, আবহাওয়া ছিল, প্রতিশ্রুতি ছিল।

'জিতেনের কাছে ভাল করে চেয়ে দেখি নি তো আমি কোনোদিন।'

'এবার দেখবে।'

'না দেখে উপায় কী?'

'পাবে ?'

'দেখা যাক, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের আরো সাতশ টাকা তুলে নিয়েছি। আরো তিনশ-চারশ আছে পি-এফ-এ ; রেজিগনেশন না দিলে ও টাকা পাওয়া যাবে না। রিজাইন করলেও পাওয়া যাবে না। কলেজের লোন অফিসে আমার আটশ টাকা ধার আছে সুমনা।'

'সাতশ টাকা তুলেছ ?'

'হ্যা।'

'কোথায় সে টাকা ?'

'তোমাকে দেড়শ দিয়ে যাব। মজুমদার আর তার কম্পাউণ্ডারকে পাঁচশ, আমি পঞ্চাশ টাকা নিয়ে কলকাতায় রওনা দেব।'

'ডাক্তারকে পাঁচশ দিতে হবে।'—কর্ণের চাকার মতো সুমনা আরো যেন বসে গেল খানিকটা মাটির ভিতর। এই চাকাটাকে উদ্ধার করে রথ চালিয়ে নিজেকে রক্ষা করবে নিশীথ ? চারিদিক থেকে সমাজ সময়ের শয়তানরা যা চোখা-চোখা বাণ মারছে ! কয়েকটা হাড়গোড় শুধু, কপালে সিন্দুর : সুমনা জিভ কেটে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক এ-রকম জিনিস খাটে চড়ে আসে ! কত লক্ষবার দেখেছে তো নিশীথ : আগুন জ্বলে ওঠে, সৎকার করে ওরা বাড়ি ফিরে যায়। খাটে বেঁধে নিতে হবে ; আগুন জ্বালতে হবে; দাহ শেষ হলে কলসি-কলসি জল ঢেলে দু-চারটে হাড় কুড়িয়ে এনে চান করে বাড়ি ফিরতে হবে। হাতভরা কাজ পড়ে রয়েছে সব। কিন্তু এ-সবের আগে সেই কাজও রয়েছে ঢের—যাকে বেশি দিন বাঁচালে বেশি টাকা খরচ হবে শুধু কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যাবে না কিছুতেই, তাকে যত দিন সম্ভব বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এটা যে ভুয়ো সংস্কার নিশীথ জানে তা ; কিন্তু তবু এ অসার জিনিসটার কাছে সেও জব্দ হয়ে আছে। রানু, ভানু, হারীত তিন জনেই শেষ করে গেছে সুমনাকে। তারপরে তত্ত্বাবধান করতে রেখে গেছে নিশীথকে। ছেলেমেয়ের বাপ হয়ে নিশীথের আজ বেয়াইবাড়ি গিয়ে দুটো মিষ্টি কথা শুনবার সময় হয়েছিল কি—এদের দিকে না তাকিয়ে, জিতেনের কাছ থেকে ঋণ চাওয়ার ভাবনা মনের ত্রিসীমার থেকে তাড়িয়ে দিয়ে হারীতের রোজগার খাওয়ার সময় হয়েছিল। কোথায় হারীত, কোথায় রানু-ভানুর শ্বশুড়বাড়ির ইসিইয়ার্কি ইষ্টকুটুম্ব সব, যে-পেঁচা ইসট কুটুম ঢুটুম ঢুটুম বলে উড়ে যায় সেই কুয়াশা শ্মশানের ভিতরে।

'তোমার ওষুধপত্র ইনজেকশন ডাক্তারের ভিজিট সমস্তই মজুমদার আর তার কম্পাউণ্ডার জ্যোৎস্না সিকদার ঠিক করে দেবে। জ্যোৎস্না ছেলে ভাল, আমাদের কলেজে আই-এস-সি পড়ছিল, ছেড়ে দিয়ে কম্পাউণ্ডারি করছে। মজুমদার খুব—'

'সাধু মানুষ। ঘোড়েল মানুষও বটে—'

'কেন বলছ সুমনা ?'

'না হলে পাঁচশ টাকা নেয়—'

নিশীথ কাগজ পেন্সিল নিয়ে হিসেব কষে দেখাতে গেল সুমনাকে, পেন্সিল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুমনা বললে,—'কোনো দরকার নেই হিসেবে আমার ? জোচ্চোর যত সব—'

'তা হলে কি, টাকাটা ফিরিয়ে আনব ?'

'দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে—সেই মুখে উল্কি কেটে শেয়ালের মতন ?'

'তা মুখে উল্কি কেটেছি বটে। কী রব ! কলকাতায় যাওয়া বন্ধ করে দিই।'

সুমনা কিছুক্ষণ ঘরের কোণে-কোণে আট-দশ বছর আগের পুরনো শিশি বোতলগুলোর উপর মাকড়সার পাতা জালের রাশি-রাশি নির্লিপ্তির দিকে তাকিয়ে থেকে অবসন্ন হয়ে বললে, 'কলকাতায় না-গিয়ে কী করবে এখানে বসে ? কলেজের কাজে ইস্তফা দিয়েছ না ?'

'না দিইনি এখনো। ছুটি নিয়েছি।'

'নিয়েছ ? মঞ্জুর করেছে ?'

'এখনো জানতে পারিনি কিছু। দরখাস্ত দিয়েছি।'

'তোমাকে ওরা তাড়িয়ে দেবে।'

'দিক।'

'তা হলে এখানে বসে করবে কী ? ভানুকে তো কাঁচড়াপাড়ায় পাঠিয়ে দিলে। সে খরচ পোষাবে কী করে ?'

'টাকা দিয়ে দিয়েছি কিছু। মাসখানেকের ভিতর দরকার হবে বলে মনে হয় না।'

'আমার দেড়শ টাকা আমাকে দাও।'

টাকাটা হাতে নিয়ে একটু হাসি ফুটে উঠল সুমনার মুখে।—'কেন পড়ে থাকবে তুমি জলপাইহাটিতে। মজুমদার ডাক্তার ভাল, বুড়ো মানুষ অসৎ

হবে না। পাঁচশ টাকা পেয়েছে—আমার একটা হিল্লে করবেই। আমার জন্যে ভেবো না। মহিমবাবুর স্ত্রী, ছেলে, ঘোষালমশাই নিজে, জ্যোৎস্না সিকদার, জিতেন সবাই তো রইল, তুমি কলকাতায় চলে যাও কালই। সুবিধে হবে সব দিক দিয়েই দাশগুপ্তের বাড়িতে। ওখানেই উঠো। জিতেন দাশ-গুপ্তকে বলে একটা চাকরি বাগিয়ে নিতে হবে—যত তাড়াতাড়ি পারো। ইচ্ছে করলে ও খুব বড় পোস্টে বসিয়ে দিতে পারে তোমাকে। ওর নিজের অফিসই তো আছে।'

নিশীথ পেটে-পেটে হাসছিল—আজকের পৃথিবীর লোকায়তের বল্গা রুখে তালপাতার সেপাইয়ের এই কথামৃত শুনতে-শুনতে। কিন্তু সম্প্রতি চোখ বুজে স্ত্রীর দিকেই তাকিয়েছিল। বিন্দু-বিন্দু বিষণ্ণ হাসিতে অন্তঃস্থল ঘামিয়ে উঠছিল তার, মৃত্যুশয্যায় মাথা পাতা সাদামাটা এই ঘোর বিশ্বাসী মানুষটির কথা শুনে।

'কলকাতায় গিয়ে আর-একটি কাজ করো তুমি। রানুকে খুঁজে বার করতে হবে'—সুমনা বললে।

রাণু যে কলকাতায় নেই, কোথাও নেই যদিও-বা কোথাও থেকে থাকে সেখানে যে মনপবন ছাড়া আর কারোরই প্রবেশ নেই এ কথা সুমনাকে কী করে বোঝাবে নিশীথ।

'খুঁজে দেখব রানুকে।'

'আমাকে ছুঁয়ে বলো, বাপ যেমন মেয়েকে খোঁজে তেমনি করে খুঁজে বার করবে।'

'ছুঁয়ে বলছি বটে কিন্তু বাপের চেয়ে মায়ের মনই তো ছেলেমেয়েকে খোঁজে বেশি, মা যেমন মেয়েকে খোঁজে তেমনি করে, তোমাকে ছুঁয়ে বলছি, রানুকে খুঁজে দেখব আমি।'

কেমন একটা আশ্চর্য হাসি-হাসির ভিতরে এক-আধছিটে রক্তের কণাও যেন এল সুমনার ফ্যাকাশে মুখে—

'নাখোদা মসজিদে দেখবে।'

'কাকে?'

'রানুকে।'

'কে বললে সে সেখানে আছে?'

অনেকে বলছে'।

নিশীথ মাথা নেড়ে বললে, 'ভুল বলেছে। কথা বলে নেশা জমিয়ে দিতে চায় ওরা। বড় সর্বনেশে লোক। ওদের চেয়ে আমি বেশি জানি।'

'কী জানো তুমি। রানু কোথায় আছে জানো?'

'আমি খুঁজে দেখব।'

সুমনা একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'আমি কিছু জানি না। মেয়েকে হাত ধরে নিয়ে আসতে হবে দেশে। স্টেশন থেকে বেড়িয়ে নিয়ে আসতে তুমি ওকে রোজ সন্ধ্যায়; চোত মাসের মেলার থেকে হাতে ধরে ঝড়-বাতাসের, কু-বাতাসের থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসতে। আমি বলতাম মোমের আলো নাকি যে অত সন্তর্পণ। ও তো চাঁদ—কু-বাতাসে ওর করবে কী—' কিছু ক্ষণ চুপ থেকে সুমনা বলল—'কিছু করেছে বটে কু-বাতাসে। ভানুর খবর কী?'

'এই তো যাচ্ছি কলকাতায়, কাঁচড়াপাড়ায় নামব একবার।'

'শনিবার-শনিবার যেও কিন্তু কাঁচড়াপাডায়। রববারটা থেকে এসো, ওর মামা আছে বটে ওখানে। কিন্তু সে তো কোনোদিন ডেকে জিজ্ঞেস করত না; এখন কি গা দেবে?' নিশীথ চলে গেল একটু বাইরের হাওয়া খেয়ে আসতে। কলেজের ফিলজফি-লজিকের অধ্যাপক মহিম ঘোষাল তার পরিবার নিয়ে নিশীথদের ভাডাটে বাড়িটার একটা অংশে রয়েছে। বাড়িটা এক তলা। ছাদে ওঠার সিঁড়ি আছে। সব নিয়ে ছটা ঘর—দুটো রান্নাঘর, দুটো স্নানের ঘর আছে। রান্না ও স্নানের একটা-একটা ঘরই ছিল। অধ্যাপক দুটি, চাঁদা করে যুদ্ধের আগে সস্তার মরশুমে দুটো বাড়তি ঘর তৈরি করিয়ে নিয়েছিল। বাড়িটার দক্ষিণ দিকের অংশে নিশীথরা দু বছর থাকে—উত্তরের ভিটেয় মহিমরা। দু বছর কেটে গেলে নিশীথদের উত্তরে যেতে হয়, মহিমদের তখন দক্ষিণায়ন।

এমনি করে বার বছর এ-বাড়িতে বেশ অজ্ঞাতবাসে কেটেছে নিশীথের। দিনগুলো মন্দ ছিল না। কলেজের কাজে মাইনে বেশি ছিল না, ঝঞ্ঝাটও তেমন কিছু ছিল না। স্বাধীনতা ছিল এক রকম। মফস্বলের উঠানের—মাঠের ঘাসের মতন একটা সহজ দিবাতা ছিল হৃদয় শরীরের নির্লিপ্তি ও শান্তিকে পরিব্যাপ্ত করে। উত্তেজনা, উৎসব, মহৎ আকাঙ্ক্ষার দূরতায় ভাবুক নিশীথকে দিয়ে কথা ভাবাত, মাঝে-মাঝে দু-চারটে লিপি লিখিয়ে নিত—খুব সংক্ষেপেই।

তারপর লৌকিক পৃথিবীর ব্যক্তিগত তুচ্ছতার মৃত্যু সংঘর্ষের দেশে সে সব বড়-বড় বাতাসের আক্ষেপ কোথাও কিছু আশ্রয় না পেয়ে নষ্ট হয়ে যেত। জলপাইহাটি ছেড়ে কলকাতায় যাবার সময় এই কথাগুলো ভাবছিল নিশীথ। জলপাইহাটিতে আর ফিরে আসা হবে না। সুমনা হয় তো মরে যাবে। রানুকে খুঁজে পাওয়া যাবে না ; ভানুও যে ফুরিয়ে যাবে সেটাও নির্দোষ সত্য-কথনের অপর পিঠের মতনই সত্য ও নির্মল। অথচ জলপাইহাটিতে এদের সকলকে নিয়ে, হারীতকে নিয়ে একটা যুগ—মানুষের জীবনের এক পুরুষ-কালই যেন কেটে গেছে নিশীথের। এরা আজ সকলেই প্রায় বিদায় নিয়েছে—নিচ্ছে ; জলপাইহাটির বাড়িও বিদায় নিয়ে গেল নিশীথের মন থেকে। বিদায়ের ভান করেছিল এর আগে কয়েকবার। কিন্তু সে সব ভান ভেঙে ফেলবার মত তোড়জোড় ছিল তখন চারিদিককার আবহাওয়ায়, জলপাই-হাটিতে, পৃথিবীতে, নিশীথের জীবনের ইতিহাসে। কিন্তু উনিশ শ আটত্রিশ উন-চল্লিশ থেকে ইতিহাস যে-মোড় ধরেছে, চল্লিশ-একচল্লিশ-বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ-ছেচল্লিশে এসে কেমন যেন অস্বাভাবিক দ্রুততায় পুরনো পৃথিবীও স্বভাব শেষ করে দিল সব। রানু যে হারিয়ে গেছে, সুমনা যে মরছে, ভানুর যে এই অবস্থা, হারীত যে অলাতচক্রে ঘুরছে, এগুলো কোনো-একটি বিশেষ পরিবারের বিচিত্র ব্যক্তিসর্বস্ব জিনিস নয়—আকস্মিক ঘটনা নয় এ সব—এ-রকম না হয়ে পারত না। নিশীথের নিজের জীবনদৃষ্টিও গত দু-তিন বছরের ভিতর, সময়ের আগুনের ভিতর নিজেকে ক্ষালন করে নিতে-নিতে অনুভব করেছে পৃথিবীর স্থির সত্যগুলো। স্থির হয় তো, কিন্তু কেবলি নতুন ধারাপ্রপাতের দ্রুততার ভিতর দিয়ে, নিজেদের স্থিরভাবে আবিষ্কার করে নিতে ভালবেসে তারা—দ্রুত বিদ্যুতের চূড়োয়-চূড়োয় আকাশও যে বিদ্যুৎ ও ঝড়—এ-রকম বিভ্রম বিলাস জাগিয়ে তোলে আত্মহারা মানুষের মনে। কিন্তু ঝড়, বিদ্যুৎ, অন্ধকার যখন সমস্ত শেষ করে দিয়ে যাচ্ছে—তখন লক্ষ-লক্ষ মানুষের দিশাভ্রষ্ট হওয়া ছাড়া উপায় নেই—হত, নিহত, নির্বাপিত হওয়া ছাড়া পথ নেই—ইতিহাসের দু-তিন পুরুষ, ছ-পুরুষ, এক-পুরুষ যারা এ-রকমভাবে ক্ষরিত হয়ে যায় তারা ভবিষ্যৎ মানুষের মনে জ্ঞান, হৃদয়ে অনুতাপ, শুদ্ধতা বাড়িয়ে দেয় কিনা বলা কঠিন—কিন্তু নিজেদের জ্ঞান সম্পূর্ণ করে যায় এই জেনে যে মানুষের বিদ্যা বাড়লেও তার জ্ঞান বাড়ে না, বাড়াতে গেলেও তা জ্ঞানপাপে দাঁড়ায় গিয়ে।

মানুষের মন আলোকিত করতে পারে না (দু-একজন সৎ ও মনীষীর মন ছাড়া) মানুষকে আশা, ভরসা, প্রতিশ্রুতি, শান্তি দিতে পারে না কিছুই। এ-রকম উপলব্ধির কোনো যাথার্থ্য আছে বলে মনে করত না দু-চার বছর আগে নিশীথ। কিন্তু এখন করে। এখন সে মানে যে এ যুগে এর চেয়ে যাথার্থ্য আর-কিছু নেই। এ যুগে ক্ষয়িত হওয়াই স্বাভাবিক—মৃত হওয়া, নির্বাপিত হওয়া—অবক্ষয় উত্তীর্ণ করে ক্ষেম সূর্যের মুখ দেখাকে অপর যুগের সুস্থির সত্য বলে গ্রহণ করা চলতে পারে। কিন্তু সেই অপর যুগ কি এমনি-এমনি আসবে? ক জন লোক চেষ্টা করছে সেই যুগকে লাভ করতে? কী প্রণালী তাদের? কোথায় সেই পদ্ধতি একটা শুদ্ধ বড় শতাব্দীকে নিয়ে আসতে হলে, পৃথিবীব্যাপী যে-সাড়া পড়ে যায়। কোথায় সেই আশা ভরসা নিঃস্বার্থতা? আসল বোমাটা এর হাতে আছে বটে, কিন্তু ওর হাতে আছে কিনা এই তাড়নায় তো আজকের পৃথিবী পঙ্গু। শুধু আমেরিকা বা রাশিয়া নয়—এশিয়ায়—আমাদের দেশেও পদ্মানদীর এপারে-ওপারে, রাষ্ট্রে, সমাজে, পরিবারে 'ম'-কে বাহাল করবার কৌশল জানা আছে 'ক'-এর। জানা আছে কি 'খ'-এর-'ক'-কে বেচাল করবার কৌশল শুধু নয় অষ্টসিদ্ধি? মনের তপঃ-শক্তিতে মেশিনকে চালাতে পারত হয় তো মানুষ, কিন্তু মানুষকে ছুটিয়ে চালাল মেশিন, মানুষকেই চালাল সে, যন্ত্রকে ব্যবহার করবার মত সততা ও মনীষা হারিয়ে ফেলেছে মানুষ। এই সবই হবে আজকের পৃথিবীর নিহিত সত্য, কত কাল পর্যন্ত ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে থাকবে কে জানে।

তাই যদি হল তা হলে ইতিহাসে যে-সব আলোড়নের যুগ কেটে গেছে, বিলোড়নের দিনকাল আসবে বলে মনে হয়, সবই শেষ পর্যন্ত মৃত্যু, দ্বেষ ও পতিতের ধর্মেই আবর্তিত হচ্ছে শুধু, তখন ইতিহাসের বিষ ও সোমরসের দিকে তাকিয়ে অতীত বা ভবিষ্যৎ সমাজের অমৃতত্ব ঘোষণা করে কী লাভ? কোনো বড় ঘোষণারই কোনো মানে নেই।

মনীষীরা অবিশ্যি ভাল বই লিখবে, নেতারা বিমিশ্র ভাষার কাঁচা বিবৃতি দেবে—পাকাতে পারবে, কবি-বিজ্ঞানীদের একটা বড় স্বৈরী অংশ সূর্য-স্বপ্ন দেখবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ মরে যাচ্ছে; পৃথিবীর থেকে শেষ বিদায় নেবার আগে হিংসার পরিবর্তে হিংসা ফিরিয়ে দেবার বিজাতীয় লোভে দুর্বল ঠোঁট কেঁপে উঠছে কারু; রিরংসাকেই জীবনে সফল করে ভয়াবহ বৃষ-গর্দানের

দোষে রক্তের চাপে মরে যাচ্ছে কেউ। আশেপাশে, 'এই তো তাকে দেখে ছিলুম, তাকে দেখছি না আর', কারা যেন বলে যাচ্ছে, দিনরাত দেয়ালে অনর্গল ছায়ার চারণায় তোমাকে আমাকে সকলকে মুহূর্তের মধ্যে ছায়ায় দাঁড় করিয়ে আছে, আলো আছে, ইতিহাসে কত বিখ্যাত যুগ কেটে গেছে, উদয় হবে না কি অতীতকে ভালো করে চিনে নিয়ে আরো বিশ্রুত সময়ে আরো ভালো আলোর। কিন্তু আজকের যুগের ইতিহাসের খাতায় যে-অঙ্ক লেখা আছে এর নিরেট সিদ্ধান্তকৌমুদীর পথে গরমিল লাগিয়ে ফূর্তি করতে গেলে, সেটা ফূর্তির ভুল—অঙ্কের ভুল নয়। তাই না কি নিশীথ ?

ঠিক করে অঙ্ক কষেও কে তবু উৎসব আনতে পারবে ? কোথায় সেই মহানুভব দিকনির্ণয়ীরা। সেই শিব অনির্বচনীয় প্রাণঘন আন্দোলন ? কোথাও আছে বলে মনে হচ্ছিল না নিশীথের। কবি সে ; বিক্রোশী মনের অখল উৎসের শ্রী ছাড়া কী আর কবির মন ? নির্ভুলভাবে এ শতাব্দীর এ আবর্তের শোকাবহ অঙ্ক কষে—এরই ভিতর, যে-উৎসব রয়েছে তবুও, তাতে মজা করে জীবনের পথ থেকে একদিন সরে যেতে হবে তাকে।

জলপাইহাটি থেকে চলে যাচ্ছে নিশীথ, এখানে ফেরার কথা নেই আর। জিতেনের ওখানে মাসখানেক থাকবে। জিতেনকে বলে ভাল চাকরি পাওয়া গেলে ভাল ; পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। মোটা রকমের ধার পাওয়া যাবে না। দেখা যাক কী হয়। ডাক্তার মজুমদারের চিকিৎসার মেয়াদ কাটিয়ে সুমনা যদি বেঁচে থাকে তা হলে ফিরে এসে তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। না হলে স্ত্রীর শ্রাদ্ধশান্তির জন্য হয় তো বা জলপাইহাটিতে দু-চারদিনের জন্য আসবে নিশীথ—হয় তো আসবে না।

এ-রকম অন্তিম অবস্থায় স্ত্রীকে ফেলে চলে যাচ্ছে কেন নিশীথ ? এটা কি এ যুগের শোকাবহ অঙ্ক কষবার পথে একটা নিতান্তই ছোটখাট ধাপ নিকেশ করে নির্ভুল একটা যোগ কি বিয়োগ ? ঠিক তাই।

কলকাতায় যাওয়া ছাড়া নিশীথের আর-কোনো উপায় নেই। নিশীথের হাতের সব টাকা ফুরিয়ে গেছে, জলপাইহাটিতে কারু কাছে তেমন কিছু টাকাও ধার পাওয়া যাবে না, পেলেও শোধ করে দেবে কী করে সে ? কলেজের উপর নির্ভর করা চলে না এখন আর। অনেক দিন থেকেই কলেজের কর্তৃপক্ষকে সে কথা সে বলবে ভেবেছিল—কিন্তু দু পক্ষেরই শান্তি ও

মেধাবৃত্তি ভাঙবার ভয়ে কিছুটা অবিচার ও লাঞ্ছনা সহ্য করেও ব্যাপারটা চেপে-চেপে যাচ্ছে—সে কথাটা বাস্তবিকই এত দিন পরে তাদের বলে ফেলেছে সে—হয় তো অতিরিক্ত জোর দিয়ে। বলেছে ও দেড় শ টাকা মাইনেতে পোষাবে না তার, সোয়া দুশ-আড়াইশ, অন্তত দুশ কি দিতে পারবেন ওঁরা? না দিতে পারলে দুঃসময়ে নিজের পথ দেখা ছাড়া কী করবে নিশীথ? নিশীথ ছুটির দরখাস্ত দিয়েছে, কী কারণে দরখাস্ত, পরিষ্কার করে ব্যক্ত করে নি; ডাক্তারের সার্টিফিকেটও জুড়ে দেয়নি। কর্তৃপক্ষ মুখফোঁড় নিশীথকে কোনোকালেই বিশেষ পছন্দ করে না। এবারে নাকচ করে দেবে। দিক। যা করেছে ঠিকই করেছে নিশীথ।

সুমনাকে দেখবার জন্যে রইল ডাক্তার মজুমদার আর তার কম্পাউণ্ডার জ্যোৎস্না। ডাক্তারি করে মোটা টাকা পাচ্ছে বলে নয়, এমনিই ওর মন খুব পরিষ্কার—বেশ প্রশান্ত। ডাক্তারটি নিশীথের নিজের দাদার মত, কম্পাউণ্ডার জ্যোৎস্নার উপর ষোল আনা নির্ভর করতে পারা যায়; মজুমদার প্রায়ই বলে। সুপারিশটাকে নিশীথ খতিয়ে দেখেছে; অনুভব করেছে; হ্যাঁ; এতেই হয়ে যাবে; আর-কী।

মহিম ঘোষাল আর তার পরিবার তো সুমনার সঙ্গেই রইল এ বাড়িতে। মহিমের মাথাটা লজিক—মানে কলেজের লজিক দিয়ে, শানানো—বুদ্ধি দিয়ে নয়; বেকুব নয় তাই বলে মহিম; বিবেচনা শক্তি—মনে হয় যেন আছে বেশ; খুব হাতে-কলমে না থাকলেও; ভিতরটা ভাল—তবুও সেটাকে যেন আরো ভাল করতে চাচ্ছে মহিম; এ জিনিসটা ফিটফাট ভালর চেয়ে ভাল।

মফস্বল কলেজের কর্তৃপক্ষ এ-রকম খানদানি মানুষকে ঠকিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিল—পনের বছরের সার্ভিস; মোটে এক শ তিরিশ টাকা মাইনে। এ সব জিনিসের একটা বিধান হবে না এখনো? মহিমের মত বিবেচনা না-থাকলেও এর চেয়ে বেশি বুদ্ধি আছে মহিমের স্ত্রী অর্চনার (তাকে অর্চিতা ডাকে নিশীথ), বুদ্ধিটা, নিজের স্বার্থকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু তাই বলে পরের ক্ষতি করবার কোনো মতলব নেই; পরের উন্নতি দেখলে তার খারাপ লাগে না। কুঁড়ে মানুষ; মাঝে-মাঝে কেমন গোরু-হরিণের মত চোখ তুলে তাকায়; কেমন একটা বিসদৃশ সাদৃশ্য এসে পড়ে। কিন্তু এটা ঠিক—নিশীথের

মত, গাই-গোরু দেখার ছলে অবিনশ্বর কৌতুকে অর্চিতার দিকে তাকাবার মত লোক এ পৃথিবীতে কেউ নেই—কেউই নেই আর। অর্চিতাকে ভাল করে বলে দিয়েছে নিশীথ সুমনার কথা; সুমনাকে দেখতে-শুনতে বলে দিয়েছে।

'কিন্তু তবুও এ সময়ে তুমি থাকলে ভাল হত নিশীথদা।'

'আমি তো আছিই।'

'কেন, তুমি কলকাতায় যাচ্ছ শুনলাম?'

'তোমরা চিঠি লিখলেই চলে আসব। দরকার হলে মহিম যেন টেলিগ্রাম করে—'

'বলেছ ওঁকে?'

'বলব।'

'কিন্তু কলকাতায় কেন যাচ্ছ?'

'এখানকার কলেজের সঙ্গে বনল না।'

'ছুটি নিয়ে যাচ্ছ?'

'খুব সম্ভব কাজ ছেড়ে দিতে হবে।'

'ছেড়ে দেবে? তা হলে আমাদের কী হবে? জলপাইহাটিতে সুমনাদি, হারীত—তোমরা থাকবে না আর!'

এর উত্তর কী দেবে নিশীথ? এতক্ষণ একটা ধূসর গোরুর, হয় তো হরিণীর সান্নিধ্য অনুভব করছিল; গোরুটা বছরের পর বছর ধূসরতর হয়ে যাবে। নিশীথ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল, অর্চিতার সঙ্গে কথা বলবার সময় তার মুখের দিকে তাকায় নি। মাঠের উপর শুয়ে আছি; শুয়ে আছি চোখ বুজে; কেমন একটা গন্ধ পাওয়াতেই টের পাওয়া গেছে সাদাটে গোরুটা এসেছে—গোলাম কিউব্রিয়ার; কাছের। পুকুরে জল খাচ্ছে; কেমন একটা ফোঁস-ফোঁস শব্দ হচ্ছে; মাঠ-পুকুরে গায়ের গন্ধ শব্দ—সবই যেন একটি মানুষের মধ্যে দানা বেঁধে কাছে দাঁড়িয়ে আছে; ভূতত্ত্বের প্রাণবিজ্ঞানের লক্ষ-কোটি বছরের ইতিহাস সত্ত্বেও জানিয়ে দিচ্ছে; মাটি মাঠ গোরু মানুষ একই জিনিস —একই সূর্যখণ্ডের থেকে জেগে উঠে একই বরফের দেশে লীন হয়ে আছে সব।

'একই জিনিস অর্চিতা।'

'কিসের কথা বলছ?'

'না, এমনিই, আমি ভেবে দেখলাম।'

অর্চনা একটু কাছে এগিয়ে এসে দু-এক পা পিছে সরে গিয়ে বললে,—'কলকাতায় যাওয়া আর না-যাওয়া? একই জিনিস। তা বটে তো। কেন যাচ্ছ তা হলে সে গাঁটকাটার দেশে। চার হাত পায়ে যেতে, ফিরে আসতে, কম-সে-কম পঁচাত্তর তো বটেই।'

'একই তো জিনিস, মাঠ আর গোরু।'

'মাঠ আর গোরু? নতুন শাস্তর বার করলে বুঝি। না, যাও তুমি, কলকাতায় ঘুরে এসো, মাথায় একটু হাওয়া লাগিয়ে এসো।'

অর্চিতার দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠল নিশীথ। এতক্ষণ অন্য-দিকে চোখ ফিরিয়ে ছিল সে, এইবারে মাঠ দেখেছে, গোরু দেখে ফেলেছে। অর্চিতা নিশীথকে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল প্রায়—হাসির হল্লায় দু-তিন পা পিছিয়ে গেল। ভাসা-ভাসা বড় চোখের গবাক্ষ পথ দিয়ে নিশীথের দিকে তাকাল, ঠোঁটের উপর একটু আঁচল টেনে, কি না-টেনে।

'হাসছ যে! হাসবার কথা কী হল। হেসে উড়ে গেলে দেখছি।'

নিশীথের হাসি থেমে গেছল, বললে—'এই মাঠ ঘাট আকাশ বাতাস আর দেখব না; এখানে চল্লিশ বছর ছিলাম। চেনো কি গোলাম কিউব্রিয়াকে অর্চিতা?'

'সে কে?'

'আছে'—বললে নিশীথ, 'আছে একজন মুসলমান মহাজন, পদ্মা-এপারের দেশে সম্প্রতি এসেছে—ওপারের থেকে—'

অর্চিতা নিশীথের কথার ধারা লক্ষ্য করছিল; কী যে বলছে? কী না বলছে! তার অধ্যাপক স্বামীর সঙ্গে অনেক দিন ধরে থাকতে-থাকতে দু-চারটে ইংরেজি কথা সে শিখে ফেলেছে। এমনি অর্চিতা ক্লাশ নাইন অব্দি পড়েছিল। ভাবছিল লেগপুলিং করছে না তো নিশীথ। মহিমের চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখে অর্চিতা।

'কালিজিরা নদীর তীরে একটা মাঠ আছে, মাঠে একটা ধুলো রঙের গোরু থাকে। গোলাম কিউব্রিয়ার গোরু। মাঝে-মাঝে মাঠের উপর একজন মানুষ শুয়ে থাকে'—বলে নিশীথ অর্চিতার দিকে তাকাল। মনে হল, নিশীথের ইঙ্গিত ধরে ফেলেছে যেন এই ক্ষমাহীনভাবে বুদ্ধিমতী মেয়েটি। কিন্তু তবুও

ধরে ফেলেছে কি? গোরু দেখার ছলে সারাৎসার কৌতুকে মাঝে-মাঝে অর্চিতার দিকে তাকায় নিশীথ—আহা, জলপাইহাটির এ একটা কী রকম চমৎকার ফলসানির জিনিস ছিল। অথচ বার মাস এ দেশের আকাশ-বাতাস নদী-নক্ষত্র, কলেজের কাজ, কথাবার্তা বাড়িতে। ফিরে এসে সুমনা রানু ভানুর সঙ্গে আলপাচারি, তারপরে ইংরেজি-ফরাসি বই-নভেল নিয়ে ডেকচেয়ারে পড়ে থাকার সঙ্গে নিখুঁতভাবে বিমিশ্রিত হয়ে। কী অপরূপা, কী অপরূপ গভীর ছিল সব—একই অন্তঃসারের, তবু অনেক। বর্ণালির বারমাসের সব; নিরবচ্ছিন্ন। সারাৎসার। একে একে ছিঁড়ে গেল সব। শুকিয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল। নিশীথ ইচ্ছে করেই ঘটিয়েছে কি সব? না, ইতিহাস ঘটিয়েছে? সময়ের হাতে আঁকিবুকি, অবোলা বাতাস, ধুলোর গুঁড়ো—নিশীথ আর তার পরিবার—সকলের পরিবার সমস্ত ব্যক্তির। সমস্ত পৃথিবীর।

কিন্তু তবুও নিজে যতটা সে লুণ্ঠিত হয়েছে, নির্মূল হয়েছে, আবর্তিত-পরিবর্তিত হয়েছে, মহিম-অর্চিতাদের, বা কলেজের বা বাইরের অন্য সব নর-নারীদের বেলা সময় ততখানি অশ্লীল অস্থিরপনায় সক্রিয় হয়ে ওঠে নি। এখনো যেন আট-দশ বছর আগের পৃথিবীতে পড়ে আছে মহিম; সেই যুদ্ধের আগের জলপাইহাটিটাকে খুঁজে বার করে ঢেলে সাজাচ্ছে অর্চিতা। সাজাবারও দরকার নেই; কোনো প্রয়াসের প্রয়োজন নেই যেন, নেই কোনো উদ্ভাবনা, এমনিই হয়ে যাচ্ছে সব।

নিজে নিশীথ এদের মতন অচেতন থাকলেই তো পারত। কেন দেখতে, বুঝতে, অনুভব করে নিতে গেল। সময়ের আঙুলের নির্দেশে সেই বিম্বিসারের থেকে আজকের স্ট্যালিন-ট্রুম্যানের কবলিত মানুষদের মত পথ থেকে পথান্তরে স্ফুরিত, বিবর্তিত, নীত, নিহত হতে রাজি হয়ে গেল সে—যা নেই, সেই অমৃতের নিরবচ্ছিন্ন বধিরতার বিনিময়ে, ব্যক্তিকে বিক্রি করে, অচেতন অন্ধকার সময়কে মর্যাদা দেবার জন্যে।

'তুমি দাঁড়িয়ে আছো অর্চিতা এখনো। চলে গেছ ভেবেছিলুম।'

'কী যেন ভাবছিলে তুমি।'

'খুব লক্ষ্মী মানুষ তুমি'—নিশীথ বললে, 'আমি কলকাতায় চললুম, সুমনাকে দেখো তুমি আর মহিম। হারীত যদি আসে'—থেমে গেল নিশীথ।

'হারীত আসবে ? কোথায় সে ?'

'কোনো খোঁজখবর পাই নি। যদি আসে এখানেই থাকতে বলো তাকে। সুমনার একটা এসপার-ওসপার কিছু হয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত।' নিশীথ একটু ভেবে বললে, 'অন্তত আমি ফিরে না-আসা পর্যন্ত—'

'কোথায় আছে হারীত ?'

'জানি না। তবে আমি বাড়ির থেকে বেরিয়ে গেলে সে বাড়িতে ফিরবেই এক বার। কত দিন আস্তানা গেড়ে থাকবে বলতে পারছি না। তবে আসবেই —আমি বেরিয়ে গেলে—শীতের শেষে কুমোর পোকার মতো একটা ছ্যাঁদা খুঁজে নিতে এ দেশে। ওকে বলে-কয়ে রেখে দিও তো ওর মার কাছে—' অর্চিতার দিকে তাকিয়ে নিশীথ বললে।

'মার এ-রকম অবস্থা দেখলে এমনিই থাকবে। তুমি চলে না-গেলে ও ঘরে ফিরবে না, বাপে-ছেলেতে এই রকম সম্বন্ধ! আজীবন মাস্টারি করে কী শেখালে—কী হল তোমার ? কী ছেলে তুমি নিশীথদা।'

'এই তো হল, যা দেখছ সব হল।'

শুনে সুবিধার লাগল না অর্চিতার; অর্চিতার দুটো ভুরুর নীচে দুটো ভাসা-ভাসা শরীকৃত পথে চারিদিককার আকাশ-বাতাস, ঝাউ, জারুল, শিশু, শিমূল তুলোর শাদা আকাশযান জ্যামিতির বাধা উপচে পড়া কেশরাশির মত ঘরদোর পুকুরের টলটলানি। চারিদিকে কাকের ডাক, কেবলই হাত থেকে ফসকে দোয়াতের কালি ছিটকে-পড়ার মত নষ্ট দিন। মৃত ভাঁড়ার, নতুন ফসল, সার্থক ঋজু অন্ধ রাত্রি, খেলে যেতে লাগল।

'ভানু কাঁচড়াপাড়ায় কেমন আছে ?'

'নাঃ বিশেষ ভাল না। বেঁচে উঠলেও আশান হওয়া কঠিন, আঠার ঘা লেগে থাকবে। যক্ষ্মারুগি তো।'—নিশীথ কথা বলতে-বলতে আধো হাঁ করে রইল—একটা ভরদুপুরের দাঁড়কাকের মত।

'যক্ষ্মার নতুন-নতুন ওষুধ বেরুচ্ছে, আগের মতন নেই—ও ঠিক হয়ে যাবে সব।'

নিশীথ কোনো কথা বললে না।

'তোমাদের তো কারো এই রোগ ছিল না কোনোদিন। বৌদির বাপের বাড়ি ছিল ?'

'কই জানি না তো।'

'রানুর কোনো খবর পেলে?'

'না।'

ঘাস খেতে-খেতে হঠাৎ চুনাপাথরের মত রঙের এক-একটা গাভী যেমন নাড়ীর টানে চোখ তুলে, মুখ তুলে, দাঁড়ায়, খুঁটোয় টান পড়ে, গলায় টান পড়ে দড়িটা একেবারে টান-টান হয়ে গেছে বলে, অর্চিতা তেমনি কেমন একটা নিস্তব্ধ অব্যক্তভাবে দু-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। গলার দড়িতে টান পড়েছে প্রায়—খুঁটোটা মাটির ভিতরে অনেক দূর ডোবানো, খুব শক্ত; মুহূর্তের মধ্যেই এই বিদঘুটে অস্বস্তির ভাবটা ঢিলে হয়ে গেল—নিজের সহজ সত্তায় ফিরে এসে অর্চিতা বললে, 'আশ্চর্য—একেই বলে হাওয়া হয়ে যাওয়া। তুমি, আমি, কাকের ডানা, ঘাসের শিস কেউ কিছু জানল না, পুলিশে কোনো কিনারা করতে পারল না। জলপাইহাটি থেকে বেরুবার দুটো তো পথ—একটা স্টিমার লাইনে, একটা ট্রেন লাইনে। উনি বলেছেন এ দুটো দিয়ে স্টেশনের কোনো লোকই রানুকে বেরিয়ে যেতে দেখে নি। রানু স্টেশন দিয়ে যদি যায় সে তো দেখার জিনিস; নদীর শুশুকগুলো অব্দি ঝুপঝুপুর করে চোখ পালটে দেখে যায়। কিন্তু কেউ দেখল না—'

'কে জানে গেছে কিনা। গেলে কি আর স্টেশন দিয়ে যাবে। নদীতে ডুবে গেলে কে খোঁজ পাবে তার—'

'উঠবে তো গিয়ে কোথাও দেহটা।'

'কে জানে।'

'আমি অবিশ্যি একটা কথা শুনেছি, কাউকে বলবে না বলো।'

'কার? রানুর কথা? কী শুনেছ?'

'এদিকে এসো—এই করমচা গাছগুলোর জঙ্গলের ভিতর—ঐ দেয়ালটার পিছনে, নিরিবিলি কথা বলবার জায়গা, কেউ দেখবে না।'

সামনে ঝুপসি তেপান্তর—নিশীথ নিস্পৃহ মুখে রোদের বেলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'না গো, কী বলবে এখানেই দাঁড়িয়ে বলো।'

'ওখানে কি কাঁটা ফুটবে। না গোখরো আছে?'

'এখানেই দাঁড়িয়ে বলো—'

'আমার কথা তুমি শুনবে না? কাল তো কলকাতায় যাচ্ছ চলে।

আর-তো—'

দূরে মহিমের ছায়া দেখা গেল, লম্বা-চওড়া, খালি গায়ে, পিঠে পৈতে—লজিক হাতে। মহিম এদিকে আসতেও পারে—নাও আসতে পারে। নিশীথদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে—একটা অদৃশ্য শুঁড় তুলে আছে যেন বাতাসের ভিতর। হাতির কায়দা। দল ছাড়া হাতিও বটে। নিশীথদের গন্ধ নাকে গেলে কী করবে বলা যায় না। তবুও এমনই বেকুব নিশীথ যে করমচা জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে ঘণ্টা দুই কাটিয়ে দেবার কথা ভাবতেও গেল না।

নিশীথ এখানেই দাঁড়িয়ে আছে, মহিম ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে। চমৎকার-চমৎকার স্যাণ্ডউইচের মশলা মনে করতে লাগল অর্চিতা নিজেকে (সুমনা তাকে বছর দুই আগে ডিম-পাউরুটির স্যাণ্ডউইচ বানাতে শিখিয়েছিল)।

জিনিসটাকে খুব ক্ষমার চোখে দেখলে নিজেকে মশলার পুর মনে করে একটা উদ্ভুঞ্চে তামাসা বোধ করা চলে বটে। কিন্তু সে-চোখে সে দেখছে না। সমস্ত দোষ নিশীথেরই। বিষাক্ত চোখে সে নিশীথের দিকে তাকাল। টের পেল নিশীথ।

মহিমের শুঁড়ও গন্ধ পেয়েছে যেন। অর্চনাও শাড়িটা ভাল করে জড়িয়ে-সড়িয়ে সাবধান হয়ে সরে দাঁড়াল।

'যেন তুমি সাপ বৌমা।'—অর্চিতার দিকে তাকিয়ে নিশীথ বললে।

'তার মানে? আমাকে বৌমা বলছ কেন?'

'সাপও তো বলেছি। তার চেয়ে বড় গাল হল বৌমা বলা?'

'সাপ?'

'সাপ। চমকে গিয়ে তেজ বেঁধে সরে দাঁড়ালে তো সাপের মত খুব হুঁশিয়ার হয়ে? যেন ধুলো উড়ে আসছে অনেক দূরের থেকে। মহিম! ও মহিম।'—নিশীথ গলা ছেড়ে ডাক দিল।

কিন্তু অর্চিতা ও নিশীথ কেউই দেখেনি—লজিকের বই হাতে নিয়ে মহিম অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। এই বারে মোড় ঘুরে বিশুদের কুল-তেঁতুলগাছের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল; খুব সম্ভব বনবিহারীবাবুর ছেলেকে লজিক বুঝিয়ে দিতে যাচ্ছে। বনবিহারীবাবু কলেজ কমিটির খুব ঠাঁটারি মেম্বার। তাঁর ছেলেকে লজিক-সিভিকস পড়িয়ে দেবার সুবুদ্ধি মাঝে-মাঝে চেপে বসে মহিমের মাথায়; বিনি পয়সায় পড়ায়। বিনিময়ে সে কোনো পুরস্কার

আশা করে না। পায়ও না। অনেক বছর চাকরির পরে মাইনে এখনে। এক শ ত্রিশ টাকা!

পড়িয়ে তৃপ্তি মহিমের—কলেজ কমিটির ঘোড়েল মেম্বারের ছেলে নিত্যেনকে পড়িয়ে তৃপ্তিটা নাভির ভিতর থেকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, যেন সমস্ত শরীরে অনেকক্ষণ টিঁকে থাকে। বড়লোকেরা কাউকে কিছু দেয় না, জানে নাকি মহিম? তবুও ও-সব মানুষকে নিষ্কাম খোশামোদ করতে খুব ভাল লাগে।

'ওঁকে ও-রকম হাঁকডাক করে ডাকলে যে তুমি?' অর্চিতা বললে।

'তুমি আমি আকাশ বাতাস মহিম-এর ভিতর ডুকরে উঠতে ভাল লাগে ঐ নীল জলজঙ্গলের ডাকপাখিটার মত। শুনেছ সে ডাক; চকচকে রোদে, বেশি রাত্রের নক্ষত্রে? কোথায় গেল মহিম?'

'নিত্যেনদের বাড়ি।'

'লজিক পড়াবে?'

'পড়াবার তারিখ কাল। আজ হয় তো এমনিই গেল। আগের থেকে না জানিয়ে রাখলে নিত্যেন অনেক সময়ে ভুলে যায়, তাই মনে করিয়ে দিতে গেল হয় তো। গেল যখন, দু-এক পাতা পড়িয়েও আসতে পারে। তোমাকে রানুর কথা বলব বলেছিলাম।'

'বলো।'

'রোদ চড়েছে এখানে। চলো, করমচার বনে।'

নিশীথ গড়িমসি করতে লাগল আবার। বললে, 'আচ্ছা, যাচ্ছি। এসো এই ছায়ায় বসা যাক। জাম-তেঁতুলের ছায়া পড়েছে এখানে। লোকজন চলছে-ফিরছে বটে সব চারদিকে—কিন্তু আমাদের কথায় কান দেবার কে আছে। শান-বাঁধানো রোয়াকের উপর বসো তুমি, আমি এই গাছের গুঁড়িটায়—অ্যাঁ—হ্যাঁ।'—বলে, একটা শব্দ করে নিশীথ গুঁড়িটার উপর বসে পড়ল, 'নাও ন-বৌ, এখন বৌনি কর।'

অর্চিতা গোঁজ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।—'ন-বৌ কেন?'

'মহিম তো আমার চেয়ে ছোট। যেন মহিম আমার ছোটভাইয়ের ন-দাদা। তাহলে তুমি ন-বৌ হবে না আমার?'

'ও'—অর্চিতা একটু তেরছা কান্নিক মেরে বললে, 'কিন্তু লোকে দেখলে

তোমাকেই ন-ভাই বলবে বড় দাদার।'—মধুবিষ দৃষ্টিতে অর্চনা তাকাল নিশীথের দিকে।

'কী হয়েছে রানুর। কী শুনেছ তুমি বলো।'

'আমি শুনেছি—'

'চলো করমচা বনেই যাই। ধসা দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘাসের উপর বেশ আরাম করে বসা যাবে। কোথাও কেউ নেই—থমথম থিমথিম করছে তেপান্তর।'

গাছের গুঁড়িরা নিশীথকে বিঁধছিল; নারকোলের গুঁড়ি, খোঁচা-খোঁচা এবড়ো-খেবড়ো, কোথাও এমন একটু জায়গা নেই যেখানে বসে স্বস্তি পাওয়া যায় একটু—

'না, যাব না'—খুব বীতকাম দৃঢ়তায় অর্চিতা বললে।

'কেন যাবে না? চলো যাই'—নিশীথ উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করল।

'সে হয় না। তুমি যেতে পারো, আমি যাব না।' সংকল্পের চেয়ে ওর গলার কঠিনতাটা—নিশীথের মনে হল—এমন অন্তিমে ঠেকেছে যে এবার আঁট শোনপাপড়ির মতো চুর চুর করে ভেঙে পড়বে সব।

গুঁড়িটার উপর একটু সুবিধে করে বসবার চেষ্টা করে নিয়ে নিশীথ বললে, 'বলো দেখি, কার কাছে কী শুনলে?'

'স্টেশন দিয়ে যায় নি। রানুকে ওরা ফুসলেফাসলে গঙ্গাসাগরের মেলায় নিয়ে গেছল। অন্ধকার রাতে গা ঢাকা দিয়ে নৌকোয় বকচরের খাল দিয়ে। বলে পীরবদরের কুদরতিতে পালিয়েছে।'

'ওরা?—ওরা কারা?' নিশীথ চারিদিকে তাকিয়ে অর্চিতার কাছ ঘেঁষে এসে বসল রোয়াকের উপর।

'সেই গঙ্গাসাগরের মেলার থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল কলকাতায়। কলকাতায় তখন দাঙ্গা—বড় দাঙ্গাটা—আগস্ট মাসের। রানু কাটা পড়ে নি। রাজাবাজার জানবাজার বেকবাগান চিৎপুর হয়ে এখন কোথায় আছে তা কেউ জানে না। কিন্তু আছে।'

নিশীথ খানিকটা সরে বসে, হেসে, বললে, 'এ-সব কে বললে তোমাকে?'

'বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'নাম বললে না তো কারো।'

'যে-বলেছে তার নাম দিয়ে কী হবে। কে করেছে দেখ।'

'কে করেছে? কার কথা বলে ওরা?'

অর্চিতা যেন তার দুটো চোখ সামদান করে তাকাল নিশীথের দিকে, বললে, 'বলব তোমাকে। তোমার কাছে তো না-বলার কিছু নেই আমার। জানি তুমি বলবে না কাউকে। কোনো কিছু কূলকিনারা না করে আমলা-হামলা করবার মানুষ তুমি নও। নাম বলছি—চলো করমচাতলায় যাই—বড্ড রোদের হল্কা এখানে।'

দূরে মহিমের ছায়া দেখা দিল—লজিকের বই হাতে নিয়ে ফিরছে। লজিক কী, লজিক কেন, সমস্তই যথাসাধ্য বুঝিয়ে দিয়ে আসবার চেষ্টা করেছে।

'উনি এসে পড়েছেন।'—অর্চিতা পা বাড়িয়েছিল করমচা বনে যাবার জন্যে, ফিরে এল; রোয়াকের উপর বসল।

'উনি এসেছেন তো কী হয়েছে। চলো—'

'না। ওঁর চোখে লাগে।'

'ঐ তো মহিম মোড় ঘুরল দেখছি। বাড়ি এল না। কোথায় যাচ্ছে?'

'মুরলীবাবুর লাল ইঁটের বড়ো দালানটার দিকে যাচ্ছে। তুমিও তো দেখছ। এলাহাবাদ থেকে করালীবাবুর মেয়ে এসেছে—এখানে কাকার বাড়িতে থাকে; প্রাইভেট বি-এ দেবে এবার—'

'তাকে ফিলজফি পড়াতে হবে?'

'তা তো হবে। কিন্তু এটাও খুব সম্ভব অনাহারী; আচ্ছা মানুষই বটে। আমার কপালে আর ওঁর কপালে; একেবারে ধুলোর আটা দিয়ে। কোন খণ্ডন নেই।'

নিশীথ একটু হেসে বললে, 'গঙ্গাসাগরে কে নিয়ে গেছল রানুকে?'

'বরেন মিত্তির।'

'বরেন মিত্তির! নরেনের ভাই?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নরেন মিত্তিরের মেজ ভাই।'

'কোন নরেন মিত্তির? যে সুমনাকে রক্ত দেয়!'

'আস্তে-আস্তে। হ্যাঁ, সেই নরেন। কেউ-কেউ বলে বরেন-টরেন নয়। এ নরেন মিত্তিরের নিজের কাজ।'

নিশীথ হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল। হাঁ-টা বুজে দাঁতে দাঁতে খিল লেগে গেল যেন ; চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠতে লাগল। ঢিলে করে দিতে চাইল চোয়াল, দাঁত। কিন্তু আরো শক্ত আরো সমগ্র হয়ে উঠতে লাগল সব ; সমস্ত শরীর ছেয়ে পড়তে লাগল।

অর্চিতা এসে তার হাত ধরে টেনে বললে, 'কী হল তোমার। আচ্ছা মানুষ তো তুমি, নাও ধুলো ঝেড়ে ওঠো তো এখন।'

'কিছু হয় নি। ঠিক আছে। বসো তুমি।'

'এখনি তুমি কিছু করতে যেও না। এখন রাগ করলে ভেস্তে যাবে সব। পুলিশটুলিশ সব ওদের হাতে। নরেনের বাবা বড় উকিল মানুষ। গভর্নমেণ্টের পি-পি'।

নিশীথ যেন আরেক রাজ্যে চলে গিয়েছে ; ডুবুরির মত সমুদ্রের অনেক নীচের থেকে অন্ধকারের থেকে, যেন বললে, 'পি-পি-পি নয়তো ?

'সে আবার কী ?'

'পারফোরেটেড পাবলিক প্রসিকিউটর।'

জানালার ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে সুমনা বলে 'কারা কথা বলছে গো এতক্ষণ ধরে। যেন টাপুর টুপপুর টুপুর টাপপুর টোপাকুল পড়ছে তো পড়ছেই —পড়ছেই—পড়ছেই, বোস মল্লিকদের খিড়কির পুকুরে। কে গো ? ওঃ তুমি আর অর্চিতা, মহিমবাবু কোথায় ?'

'মহিম পড়াতে গেছে। কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ ?'

'আমি সুমন্ত্রর মার ওখানে গিয়েছিলাম—'

'বাপস, হেঁটে না রণপায় ? নরেনের রক্তের জোর আছে বলতে হবে, কোথায় যাচ্ছ ?'

'চান করতে যাচ্ছি, বিশুবাবুর দিঘিতে। তিনদিন চান করি নি···হাত পিঠ মুখে খড়ি উড়ছে'—চিঁচিয়ে-চিঁচিয়ে বলতে-বলতে চান করতেই বোধ হয় বেরিয়ে গেল সুমনা—উত্তরের দরজা দিয়ে—

নিশীথ গলা ছেড়ে চিৎকার করে বললে, 'দেখো আবার, বিশুবাবুর দিঘির চিংড়ি মাছে খেয়ে না ফেলে যেন।'

অর্চিতা চেঁচিয়ে বলল, 'দেখো সুমনাদি, আবার জলপিপিতে ভাসিয়ে না নিয়ে যায় যেন। আমরা এখানে স্থলপিপির কথা বলছি।'

সুমনা চলে গেছে। এ সব হাঁক-হাঁকড় তার কানে পৌঁচেছে কি না সন্দেহ।

'নরেনের কলকাতার ঠিকানা তোমাকে আমি দিয়ে দেব। কোথায়, ফরডাইস লেনে, না কোথায় থাকত—গিরিবাবুর লেনে গিয়েছে। নাকি আগের জায়গাতেই আছে। আমি টুকে এনেছি সব—নরেনের কালুখুড়োর কাছ থেকে। নরেনের বাপটা যেমন জোচ্চোর—ওর খুড়ো তেমনি ভদ্র ভাল বিশ্বাসী মানুষ—'

'কলকাতায় যাবার আগে দিও নরেনের ঠিকানা আমাকে, কিন্তু কী হবে। যা নয়, তাই অর্চিতা। নরেনরা এর মধ্যে নেই। রানুর আর-কিছু একটা হয়েছে। তাকে ফিরে পাওয়ার কোনো কথা নেই।'

নিশীথের ও-সব বোকা কথা, ভাল কথা শুনবার কোনো প্রয়োজন আছে স্বীকার না-করে অর্চিতা বললে, 'বোশেখ মাসে নরেন কলকাতায় যাচ্ছে। ঠিক কবে যাবে, গিয়ে ক-দিন থাকবে তোমাকে পরে জানাব আমি। কার বাড়িতে উঠবে তুমি কলকাতায় ?'

'আমি খুব সম্ভব বালিগঞ্জে থাকব। জিতেনের ওখানে। মস্ত বড সাহেব তো আজকাল জিতেন। বিয়েও করেছে। জিতেনের বাড়ি ক-দিন থাকা হয় বলতে পারি না।'

'কলকাতায় নরেনের বাড়িতে গিয়ে জিনিসটা নিয়ে কোনো হই-হল্লা করো না। জিতেনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে তোড়জোড় করে লোকজন মোতায়েন রেখে নরেনকে চা খাওয়াতে ডেকে নিয়ে যেও তোমাদের বাড়িতে।'

'কী করা যাবে তারপর ?'

'তার পর কথা বের করে নিতেই হবে—যে-করেই হোক। ও সব জানে, ব্যাটা ছুঁচোর ব্যাটা। হাড় ক-খানা আস্ত থাকতে দেবে না। কথা না-বার করে ছেড়ে দেবে না।'

'আমার সঙ্গে তুমিও কলকাতায় চলো অর্চিতা।'

'চলো করমচাতলায়, উঃ বড্ড রোদ এখানে।'

লজিক হাতে মানুষটি কোনোদিকে নেই তো। না নেই। চারিদিকে ভাল করে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল তারা। নিশীথরা এগিয়ে পড়ছিল ; কিন্তু খানিকটা দূর যেতে না-যেতেই অর্চিতাকে কেটে পড়তে দেখে নিশীথ পিছু ফিরে

তাকিয়ে দেখল জাম, তেঁতুল, সরবতি লেবুর ঝাড়ের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে মহিম ; নিশীথকে দেখে নি, অর্চিতাকে দেখে নি। না [?] দেখবার আগে পাশাপাশি দুটো অর্জুন গাছের পিছনে সরে গেল অর্চিতা। তারপর সময় হলে বেরিয়ে নিরালা পথ দিয়ে সাঁ করে চলে গেল কেমন যেন অপরূপ পিয়াসিনীর মতন। নিশীথ ছাড়া কেউ দেখল না তাকে।

নিশীথ নরেনদের বাড়ির দিকে যাবে কি না ভাবছিল। কলকাতা রওনা হবার আগে রানুর সম্বন্ধে বিশেষ কোনো সন্দেহ মনের মধ্যে দানা বেঁধে না উঠলেই ভাল। এ সম্বন্ধে সে পরিষ্কার হয়ে নিতে চাচ্ছিল। বারবার নিজের মনকে বলেছে সে, তার স্ত্রীকে, আরো দু-চারজন লোককেও বলেছে যে, রানুকে কোথাও পাওয়া যাবে না, এ-রকম উপলব্ধি দিয়ে মনটাকে শক্ত করে বেঁধে নেওয়া ভাল, কারণ, যা নেই তাকে কী করে পাওয়া যাবে। এ পৃথিবীর নিয়মই হচ্ছে এই যে, এখানে ক্ষুরধারে শ্রীছাঁদের মনের সব স্নিগ্ধ জিনিস হারিয়ে যায় ; হারিয়ে গেলে আর আসে না, কোনো সুবলয়িত সৎ প্রশ্নেরই সদুত্তর পাওয়া যায় না মানুষের জীবনে। কেউ বলে উত্তর পাওয়া যাবে সেবায়েতদের কাছ থেকে। কিন্তু এরা বা বিজ্ঞানীরা যে উদ্দেশ্যের ভিতর কাজ করে তার বাইরে অনেক দরকারি নির্দেশের কোনো খোঁজ রাখে না তারা ; বলে জানি না ; অলৌকিকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলে তারা বলে, আমরা নেই। নেই, এই কথাই ঠিক। নেই, কোনো উত্তর নেই। যা চাই তা নেই, যা শুভ্র ও শূন্য তাকে আহ্বান করে নিজের মনকে সুস্থ করে নেওয়া দরকার সুমনার-অর্চিতার ; কিন্তু নিশীথের মনের সুস্থতার দাবি আর-এক রকম। ভাবতে-ভাবতে হাসি পাচ্ছিল নিশীথের। গা ঝাড়া দিয়ে নরেনদের বাড়ির রাস্তা ধরে চলল নিশীথ।

'কে আছে বাড়িতে ? নরেন আছে ?'

'নিশীথবাবু যে। আসুন। আজ কলেজ ছুটি বুঝি ?' নরেনের কাকা কালু মিত্তির নিশীথকে বাড়ির ছোট বৈঠকখানায় নিয়ে গেল। আর-কেউ ছিল না সেখানে, 'কলেজ আজ ছুটি ?'

'জানি না তো আমি। নিজে ছুটি নিয়েছি আমি।'

'ছারপোকার চেয়ারে বসেছেন। বেতের ইজিচেয়ারটায় বসুন। ওটাকে দু দিন ধরে ডিডিটি দিয়ে ঠিক করে নেওয়া হয়েছে।'

'বেশ ফরাশেই বসা যাক না কেন। চমৎকার ধপধপে ফরাশ কালুবাবু, দিব্যি বসেছেন আপনি—'

'বসুন বসুন—তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসুন। ভেবেছিলুম ইজিচেয়ারে বেশি আরাম পাবেন।'

তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসল নিশীথ। এ ভাবে বসবার প্রয়োজন হয় নি কোনো দিন। কেমন একটা নবাবি জমিদারির তেলচিটে ঠেকারের ফেনায়, ফেনিলতায় ফরাশ তাকিয়া উপচে উঠত তার মনে, যখনই এ জিনিসগুলোর উপর দৃষ্টি পড়ত।

'আরাম পাচ্ছেন নিশীথবাবু ?'

'পাচ্ছি। প্রকাশবাবু বাড়ি আছেন ?'

'না। কেন বলুন তো ?'

'পাবলিক প্রসিকিউটার হয়েছেন না তিনি ?'

'সে তো প্রায় দু বছর হতে চলল—'

'বরেন কোথায় ?'

'বরেন বাড়িতে নেই—জলপাইহাটিতেও নেই' গোল্ডফ্লেক টিনের মাথায় দেশলাই চড়িয়ে নিশীথের দিকে এগিয়ে দিয়ে কালুবাবু বিদরির নলটা মুখের কাছে নাড়তে-নাড়তে বললে, 'বরেন মেহেরপুর গেছে দিন দুই হল।'

'কবে ফিরবে ?'

'বলতে পারি না তো।'

'ও তো কলেজে পড়ছিল—'

'হ্যাঁ, বি-এ ফেল করল এবার।'

'কী করে আজকাল ?'

নিশীথের দিকে সুস্থ ধীর চিলের মত চোখে তাকিয়ে এক-আধ মুহূর্ত নল টেনে নিয়ে চুপ করে কথা ভাবল যেন কালুবাবু। 'করে ? হিঁয়াকা মাটি হুঁয়া ফিকো, হুঁয়াকা মাটি হিঁয়া—এই করে আর-কি।'

নিশীথ হেসে বললে 'তা বটে। কলেজে পড়বে না আর ?'

'পড়ে কী করবে ? আপনাদের চোখে ধুলো দিয়ে কত তোড়জোড় করে বি-এ পরীক্ষা দিল। আঙুলের বড়-বড় চওড়া নখে মিনে কেটে প্রশ্নের উত্তর লিখে নিল, ঢাকাই মসলিনের মতন এক রকম কাগজ খুঁজে বের করেছে

কোত্থেকে—হয় তো অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছে—একটা আফিমের গুলির মত পুঁটুলিতে এক মাইল কাগজ আঁটে—তাইতে আপনাদের বি-এ এগজামিনে দরকারি যত শাস্ত্র ঝেঁটিয়ে লিখে নিল—ধরতে পেরেছিলেন আপনারা ?'

নিশীথ অভিনিবিষ্ট হয়ে শুনছিল, জানাশোনা কথা তো সব ; যে-ছেলেরা বছরের পর বছর পরীক্ষা দেয়, বাইশ-চব্বিশ বছর ধরে তাদের তো ঘাঁটিয়ে আসছে নিশীথ, তবুও একেবারে হালে যে-রকম রকমারি বাড়ছে ছেলেদের। 'তারপরে ঘণ্টায় একশ বার করে জল খেতে আর ফেলতে বাইরে গিয়ে নোট আর তোতাপুরী ছুটিয়ে জয়হিন্দ বলে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ত—কী করতে পেরেছিলেন আপনারা। পরীক্ষার সময়ে গার্ড দিয়েছিলেন তো এদের বডিগার্ড হিসেবে।'

কালুবাবু নলটা মুখে নিতে গিয়ে সরিয়ে রেখে বললে, 'আমাকেও গার্ড দিতে হয়েছিল আপনাদের কলেজের বি-এ পরীক্ষায়। আপনাদের প্রিন্সিপাল লিখে পাঠালেন, আসুন একটু পাবলিক সার্ভিস করে যান। টাকা দিতে পারব না। কিন্তু, মিষ্টি খেতে দেব রোজকার ইনভিজিলেশনের পারিশ্রমিক হিসেবে। ওকালতি করে খাই, আজকাল মন্দা পড়ে এসেছে, ভাবলুম যাই-ই, একটু পাবলিক সার্ভিস করে আসি গে। যে-রুমে বরেন পরীক্ষা দিচ্ছিল সেখানেই গার্ড দেবার জন্যে ফেললে আমাকে। মিনিট পঁচিশেক পায়চারি করে দেখছিলুম। দেখলুম, সকলেই টুকছে, সকলেই গাঁট কাটছে, আমাকে দেখে চক্ষুলজ্জার খাতিরে বরেন সুবিধা করতে পারছে না। তবে হ্যাঁ, নখগুলো বার করে দেখছে, ঢাকাই মসলিনও মাঝে মাঝে বেরুচ্ছে।'

'কী করলেন আপনি ?'

'কী আর করব। এক ছোঁয়ে দশ-বারোটা ছেলেকে বার করে দিতে হয়। এদের তাড়িয়ে দিলে বরেনকে বাদ দেওয়া চলে না। ঘরের বারান্দার দিকে দরজার কাছে বেয়ারাকে বললুম চেয়ারটা রেখে দিতে। খবরের কাগজে মুখ ঢেকে চেয়ারে গিয়ে বসলুম'—নিশীথ বিষণ্ণ নিস্তব্ধভাবে কালুবাবুর চোখের নাকের আদলে পরিস্ফুট রোগা রোঁ ঝরা চিলের দিকে তাকিয়ে রইল। যা বল্লেন কালুবাবু নিশীথ জানে সব। জেনে-জেনে এত ঘাগি হয়ে গেছে যে কালুবাবুকেই দেখছিল নিশীথ, তার কথাগুলোকে ততটা আর নয়।

'আপনাদের কলেজের একজন অধ্যাপককে দেওয়া হয়েছিল আমার সহযোগী হিসেবে। তিনিও ঐ রকম জোড়াতাড়া দিয়ে তিন ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন আর কি—'

কালুবাবু নল মুখের থেকে নামিয়ে নিয়ে বললে, 'জানেনই তো নিশীথবাবু, সব। সে ঘরে প্রায় দেড়শ ছেলে ছিল—আমি ঘুরে-ঘুরে দেখলুম, ওদের মধ্যে সত্তর-পঁচাত্তর জনকে বের করে দিতে হয়, সার্জারির কাঁচি দিয়ে কান কেটে পাছার উপর ট্রেইটর লিখে। কে করবে তা? গোবেচারি প্রফেসররা না তাদের প্রিন্সিপাল? তবেই হয়েছে! জানেন না, কী ভীষণ ট্রেড ইউনিয়ন ওদের।'

'ট্রেড ইউনিয়ন?'

'সবচেয়ে দুর্বার ট্রেড ইউনিয়ন। ওদের ব্যাপারে বেশি নাক ডোবাতে গেলে ঘরে-বাইরে রাস্তাঘাটে হায়রান করে ছাড়বে মাস্টারমশাইকে—'

'সেঁটে ঘুষি জমিয়ে দেবে' —একটি বারো-চোদ্দ বছরের ছেলে দোর-গোড়ার থেকে বললে।

'ওরে হরেন'—সেই ছেলেটিকে লক্ষ্য করে কালুবাবু বললে, 'তোর নরেনদা বাড়িতে আছে নাকি রে?'

'না নেই'—ছেলেটি ফেঁসে খসে পড়তে-পড়তে বললে।

'কখন আসবে? কখন ফিরবে বাড়ি?'

নাগালের বাইরে চলে যেতে-যেতে গলা বাজিয়ে হরেন বললে, 'গোরাচাঁদ কখন বাড়ি ফিরবে, শুধোচ্ছে আমাকে। ভকত ভবনের ছাঁদায় পাম্প না ঢুকিয়ে, পেট না ফুলিয়ে ও ফিরছে আর।'

'দেখলেন তো নমুনা'—কালুবাবু বললে।

'প্রকাশবাবুর ছেলে বুঝি?'

'হ্যাঁ পিণ্ডির ছেলে বুঝি। পাম্প ঢোকাবার কথা বলছে।'

'ওর সাহস তো কম নয়। এ বাড়িতে কেউ নেই আর?'

কালুবাবু হাতের নলটার দিকে তরাসে পাখির মত খুব তাড়াতাড়ি তেরছা তীক্ষ্ণ চোখ মেরে বললে, 'আপনি মাস্টার মশাইয়ের মত কথা বললেন নিশীথবাবু। আজীবন ছেলে নিয়ে আপনাদের কারবার, অথচ চিনলেন না ওদের। বরেনের কথা কী বলছিলুম আপনাকে? আপনাদের প্রিন্সিপাল

প্রফেসর—কে পেরেছে তার সঙ্গে ?  হরেন তো তার ভাই—'

নল মুখে টেনে নিয়ে গোল্ডফ্লেকের টিনটা নিশীথের দিকে এগিয়ে দিয়ে কালুবাবু চোখ বুজে নল টানতে লাগল।  টিনের থেকে একটা সিগারেট বের করে নিল নিশীথ।

'এ বাড়িতে আপনি বসে আছেন, প্রফেসর মানুষ।  আমি আছি—তবুও হরেন মুখ খিস্তি করে গেল।  আপনারা যখন ছোট ছিলেন এ-রকম হত ?'

সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিল নিশীথ।  তাদের ছোটবেলাকার কথাই। পৃথিবীতে তখন নানা রকম অভাব-অসঙ্গতি ছিল বটে। কিন্তু মানুষের মন ঢের বেশি স্নিগ্ধ ছিল ;  কুড়ি-পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেকার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল নিশীথের।

'বরেনকে দিয়ে কী দরকার আপনার ?'  —কালুবাবু জিজ্ঞেস করল।'

'বরেন কী করছে সেটা আরো খুলে বলুন কালুবাবু।'

'ঐ তো এখানের মাটি ওখানে রাখছে—'

'মেহেরপুর গেছে কিসের জন্যে ?  কিসের ব্যবসা ওর ?'

'ব্যবসা তা বাবার হোটেলে খাওয়ার।  পাড়ার মেয়ে দেখে বেড়াবার—'

শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠল নিশীথের রক্তের ভিতর।

'মেহেরপুর কেন গেছে  বলতে পারি  না'—কালুবাবু একটা ঢেকুর তুলে বললে।

'পাড়ার মেয়েদের দেখেই কি শুধু ?'

'না, নিরেমিষ দেখে চোখ জুড়োবার দিন নেই এখন বরেনের, নরেনের। সেটা হরেনের এলেম হয়ে আসছে।'

'সিগারেটের ছাই কোথায় ঝাড়ি—অ্যাশ-ট্রে দেখছি না।'

'চোখের সামনেই তো রয়েছে আপনার।'

'কোথায় ?'

'এই যে আমার কলকেটা, এরই ভিতর ছাই ঢেলে দিন।  বরেন মেয়ে দেখতে মেহেরপুর গেছে কিনা আমি বলতে পারি না।  তবে এদের ভাগ্যে নানারকম শিকে ছেঁড়ে বটে—'

'কী রকম ?'

'টাকা পায়, আদর পায়।  হ্যাঁ, উকিল সরকারের ছেলে বলে খানিকটা

বটে। তবে নিজেদেরও কেরামৎ আছে—'

'মেয়েরা ওদের আমল দেয় ?'

কালুবাবু নল টানছিল। কলকেটার দিকে একবার তাকিয়ে খানিকটা মিঠে ধোঁয়া মুখ দিয়ে বার করতে-করতে ফেলে দিল নলটা ফরাশের উপর। সেটা আবার তুলে ধরে বললে, 'পৃথিবীতে সব জিনিসেরই জুড়ি রয়েছে। বিয়ে করবার দরকার নেই, নরেনকে নিয়ে একটু ফুর্তি করবে, এ-রকম মেয়ের অভাব এই জলপাইহাটিতে নেই, কলকাতার কথা ছেড়ে দিন ? সে তো সোনার দেশ। ওরে হুকুম।'

হুকুম করে উঠতেই চাকর এসে হাজির হল। কালুবাবুর দিকে, নিশীথের দিকে কোনোদিকেই তাকালে না সে, নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে কলকেটা খসিয়ে নিয়ে গেল।

'জলপাইহাটিতে নেই ?'

'বাংলাদেশের কোনো গাঁ-মহকুমায় নেই। মেয়ে দরকার আপনার ?'

'হ্যাঁ, স্ত্রী মরছে—এইবারে এক-আধটি দেখে রাখলে হত,' নিশীথ তার নিস্তব্ধ নিস্পৃহ মুখে একটু হাসির আঁচ ফুটিয়ে বললে, 'নরেনের সঙ্গে এই দরকার ছিল—'

'কখন ফিরবে তা তো বলতে পারি না—'

'এ বেলা ফিরবে তো ?'

'সেটা বোতল না দেখলে বলতে পারি না। ড্রাই জিনটিন হলে শীগগিরই ফিরবে, বেশি কিছু হলে দু-একদিন দেরি হতে পারে।'—কালুবাবু বললে, টিনের থেকে একটা সিগারেট বার করে তার সিগারেট জ্বালিয়ে নিতে-নিতে।

'জলপাইহাটিতে আছে ?'

'হ্যাঁ এখানেই।'

হুকুম কলকেটা সাজিয়ে এনে বসিয়ে দিয়ে গেল। সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলে নল টেনে নিয়ে কালুবাবু বললে, 'একটা মোকদ্দমায় আটকে পড়েছে। সই জাল করে একটা মোটা চেক ভাঙিয়ে নেবার চেষ্টায় ছিল—ব্যাঙ্ক ধরে ফেলেছে। কিন্তু বড়লোকের ছেলে। জিনিসটা চাপা পড়ে যাবে। সে ব্যাঙ্কে দাদার প্রায় দু লাখ টাকা আছে। ডিরেক্টারদের মধ্যেও দাদা আছেন, তবুও তো ওকে ধরল ব্যাঙ্কের ছেলেরা। মোকদ্দমা অবধি করল। দাদা রোজগেরে

মানুষ বটে কিন্তু হুঁশিয়ার নন। ওর ছেলেমেয়েরা ওকে নাকানি-চোবানি দিয়ে, একশেষ করল। কখন যে কোনদিকে ঢুঁসি মারবে—ভাবতে-ভাবতে ওর ইউরিন তো অমৃত হয়ে উঠল। ইনসুলিনে কিছু হচ্ছে না—ঘুম হচ্ছে না—রোজ কড়া ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে হয়।'

মুখের সিগারেটটা ফেলে দিল নিশীথ। কালুবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল ভদ্রলোক একটু চিন্তিত। অর্চিতা বলেছে, খুব সৎ, সত্যাশ্রয়ী মানুষ কালুবাবু, সে যাই হোক। এর ভাইপোরা অন্য রকম, প্রকাশবাবুও।

'নরেনকে তো পাওয়া যাবে না এ বেলা—'

'কেন, আপনার স্ত্রীর জন্যে তো? তাকে রক্ত দিচ্ছে নরেন—'

কথাটা ভুলেই গেছল প্রায় নিশীথ, মনে পড়ে গেল। তবুও এমন একটা কী বিশুষ্কতায় মন ভরে গেছে তার—সে রক্তের বদলে নরেন যেন তার স্ত্রীকে রক্তশূন্যতা দিচ্ছে। কেবলই, এমনই একটা অদ্ভুত উপলব্ধিতে মুখটা কেমন যেন দেখাতে লাগল নিশীথের। কালুবাবু তাকিয়ে দেখল।

'হ্যাঁ, রক্ত দিচ্ছে বটে। কিন্তু আপনি কাউকে বলবেন না, দু-একটা কথা জানতে চাই আপনার কাছে—'

'খুব গোপন কথা? এদিকে একটু সরে বসুন। বলুন।'

'নরেনের রক্তে কোনো দোষ নেই তো?'

'সে তো ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছেন। দোষ থাকলেও ওর রক্তে চলল তো। ডাক্তার কে? সিভিল সার্জন? মজুমদার?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি দেখছেন, ঠিক আছে। না দেখেশুনে কিছু করবার মানুষ তিনি নন। তা তো ঠিক। কিন্তু নরেন এত আঘাটা ঘাঁটিয়ে বেড়ায়—ডাক্তার যখন রক্ত পরীক্ষা করে নিয়েছেন তখন আমাদের কিছু বলার নেই।'

'না না রক্তের কথা নয়। কথাটা হচ্ছে কি—নিশীথ একটা সিগারেট বার করে নিয়ে বললে, 'আপনার ভাইপোরা কেমন তালেবর তা আপনার চেয়ে বেশি কে আর জানে। সবই তো জানেন আপনি। কিন্তু তবুও বলছি আপনাকে—নরেনদের সম্বন্ধে এমন অনেক কথা কানে আসে যা সত্যিই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, মেয়েদের ব্যাপার নিয়ে কোনো মোকদ্দমায় জড়িত হয়ে পড়ে নি ওদের কেউ কোনো দিন?'

কালুবাবু নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে 'পড়েছিল।'

'কেন, কী করেছিল ?—'

'খুড়োর কী রটিয়ে বেড়ানো উচিত ভাইপোদের গুখখুরি'—কালুবাবু কিছু বলবে কি না-বলবে ইতস্তত করতে লাগল কিছু ক্ষণ। পরে নিশীথকে এ সব জিনিসের থেকে আলগা গোবেচারি মাস্টার অনুভব করে নিয়ে বললে,— 'গাঁয়ের মেয়েদের নিয়ে ধানক্ষেতে ছেলে কী করছে না-করেছে জানি না। তা নিয়ে মোকদ্দমা হতে পারে নি। গোঁফ চেঁচে পিছলে এসেছে। জলপাই-হাটিতে মেয়েদের অনুমতিতে তাদের সঙ্গে কাজকর্ম করে ওরা, জোর-জবরদস্তি করে না। কাজ শেষ হলে যে যার নিজের ঘর আলো করে বসে থাকে গিয়ে, আত্মীয়-স্বজনেরা, কখনো-কখনো সন্দেহ করে বটে, কিন্তু হাতে-হাতে ধরতে পারে না। এখানকার ভদ্রলোকেরা আজকাল খুব হুঁসিয়ার হয়ে গেছে— প্রায় কোনো বাড়িতেই ঢোকবার উপায় নেই নরেনদের', চোখ তুলে কালুবাবু জিজ্ঞেস করলেন নিশীথকে, 'আপনাদের বাড়িতে যেত ?'

'যেত একসময়'—কিন্তু যখন যেত তখন তো কিছু শুনতে পায় নি নিশীথ। রানুকে ওদের সঙ্গে মিশতে তো দেখে নি কোনোদিন। কী জানি, কলেজের কাজে, লাইব্রেরির নতুন-নতুন বই-জার্নালে, লেখায়-পড়ায়, নিজের মনে-ভাবাবেগে এতই কি বিমুগ্ধ হয়ে ছিল নিশীথ যে কিছু টের পায় নি ? চোখে পড়ে নি তো কিছু ওর কোনো দিন। তা ছাড়া কালুবাবুকে আসল কথা বলতে আসে নি তো নিশীথ। কালুবাবুকে সে জানতে দেবে না, ঠিক কী সে জানতে চায়।

'নরেনরা যেত এক সময়। কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারত না।'

'কেন ?'

'মেয়েরা ভিতরে থাকত। বড্ড লাজুক। ছেলেদের দিকে ঘেঁষত না।'

'ও! দু-একটি মেয়েকে সরিয়ে ফেলবার চার্জে মোকদ্দমা হয়েছিল'— কালুবাবু গর্দানে হাত বুলোতে-বুলোতে আস্তে-আস্তে বললে।

'কবে ?'

'বছ দেড়েক আগে—'

'কোথাকার মেয়ে ?'

'একটি বারুণীপুরের আর একটি জলপাইহাটির'—

'জলপাইহাটির ? শুনি নি তো—'

'শুনবেন যদি তাহলে পাবলিক প্রসিকিউটার আছে কী করতে।'

নিশীথের হাতের সিগারেটের আগুনটুকু নিভে গেল নিশীথ টান দিতেই। দেশলাইটা কুড়িয়ে নিয়ে নিশীথ বললে, 'এই সব চালানির কারবার করে নরেন ?'

'এখন করে কি না জানি না। তবে এক সময় ঐ করে লাল হবার চেষ্টায় ছিল।'

শুনে হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন বসে গেল নিশীথের। কিছু ক্ষণ সে কোনো কথাই বলতে পারল না। ডান হাত তুলে বুকের উপর রেখে চেপে বসে থেকে বাঁ হাতের উপর ভর রেখে কাত হয়ে রইল। কিন্তু এ-রকমে তো চলবে না। শক্তি সঞ্চয় করে নেবার একটা অসাধ্য-সাধন সাঙ্গ করতে-করতে নিশীথ বললে—'গঙ্গাসাগরের চরে গিয়েছিল গত বছর ?'

'নরেনরা ? মনে নেই তো। সব জায়গায়ই তো যায়।'

'কলকাতার বড় দাঙ্গার সময় কোথায় ছিল ?'

'কলকাতায় ছিল।'

হৃদয়টা কেমন করে উঠল যেন আবার, একটু সামলে নিয়ে সে বললে, 'গঙ্গাসাগরের মেলা ছিল না তখন। মেলা হয় কী মাসে ? না, মেলার ভিড়ে নয়, তখন চেনা লোক চোখে পড়ে যেতে পারে। শুনেছি নরেনরা'—নিশীথ চুপ করল। শার্টের পকেট থেকে বের করে একটা ক্যাকটিনা পিল খেল। দু-তিন বছর খায় নি, গত কয়েকদিন থেকে পিলগুলো খেতে হচ্ছে আবার। হার্টে অসুবিধে।

কালুবাবু বললে, 'মাঝে-মাঝে সাগর দ্বীপে নৌকো করে যায় নরেনের দল। সেটা আমি জানি। মেলা থাকে, মেলা থাকে না। খুব হৈ হৈ করে গিয়ে সেখানে গা ঢাকা দিয়ে।'

'গা ঢাকা দেবার খুব ভালো ঘাঁটি বুঝি ?'

'মেয়ে-টেয়ে ছিনিয়ে আনলে কত দ্বীপ আছে—কত ঘাঁটি আছে সমুদ্রে। সেখানে দিনকে রাত করে দেওয়া যায়।'

কালু নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কোনো খোঁজখবর পেলেন ?'

'কিসের ?'

'রানু কোথায় আছে বের করতে পারলেন না এখনো ?'
'কেউই বলতে পারে না।'
'নরেন হয় তো জানতে পারে—'
'আপনাকে কে বললে ?'
'আমি নিজেই অনেক বার ভেবেছি। আপনি নানা দিকে তদবিরে ছিলেন—'
তামাক টানতে লাগল কালুবাবু। কোণঠাসা হয়ে পড়েছে হৃদযন্ত্রটা। নিশীথের সিগারেট খাওয়া ভাল নয়। সিগারেট খাবার কোনো রুচিও নেই তার।
'গভীর জলের মাছ। আবার বেন্দাবনের ঘাটের কচ্ছপজিও বটে নরেন, নরেন-রানুর ব্যাপার নিয়েই অনেকদিন থেকে ওকে প্যাঁচে ফেলবার চেষ্টা করছি। কিছুতেই পারছি না।'
'রানু কি বেঁচে আছে ?'
'আছে হয় তো।'
'কী করে বুঝলেন ?'
'ওকে তো কারু মেরে ফেলবার কথা নয়—'
'ও সেই কথা,' নিশীথ হেসে বললে, 'কিন্তু মানুষ মুখ দিয়ে কথা বলে না আজকাল, চোঙে মুখ রেখে কথা বলে। যারা মেয়েটাকে এ-রকম ভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে, তারা কী না পারে। আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। আমি অনেক আগেই বুঝেছি যে শূন্যকে কোটি কোটি দিয়ে গুণ করে সেই অদ্ভুত শূন্যের ভিতর থেকে কোটিকে ফিরে পেতে চাইছি। কিন্তু শূন্য কী করে কোটিকে দেবে ? সে তো শূন্য।'
মনোযোগ দিয়ে নিশীথের কথা শুনে কালুবাবু বললেন, 'আমি তো এককে কোটি দিয়ে গুণ করছি, কোটিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি এক। নরেনের বাবা কুড়িকে কোটি দিয়ে গুণ করছে কুড়ি কোটিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে কুড়ি। নরেন তো পঞ্চাশকে কোটি দিয়ে গুণ করছে, পঞ্চাশ কোটিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে পঞ্চাশ। শূন্য নয়, এক, দুই, কুড়ি, চল্লিশ, 'আছে' 'হবে', এগুলোকে স্বীকার করে নিয়ে কাজে নামতে হয়। রানুকে পেতে হলে নরেনকে লোভী হতে দিতে হবে। আমি ওকে প্যাঁকালে আটকাব।'
'আমি কলকাতায় যাচ্ছি—'

'কবে ?'

'দু-একদিনের মধ্যেই।'

'কদিন থাকবেন ?'

'সম্প্রতি এক মাস তো বটে—'

কালুবাবু ঠোঁটে নল ছুঁইয়ে রাখল, তামাক টানছিল না, বললে, 'আমি আপনাকে জানাব। দিন পনের-কুড়ির ভিতরেই—'

এক বছরের মধ্যে যে-জিনিসের কোন কূল-কিনারা হল না, পনের-কুড়ি দিনের মধ্যে কালুবাবু তার একটা কিনারা করে ফেলবেন—এ-রকম কত প্রতিশ্রুতি কত মানুষের কাছে পেয়েছে নিশীথ জীবনের কত পথে বাঁকে। প্রতিশ্রুতি পেয়ে ফলের জন্য অপেক্ষা করে-করে টের পেয়েছে ফল আর-এক জিনিস। মানুষের, বড় মানুষের, সৎ মানুষের মুখের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কেন মানুষ এটা করে দেব, সেটা করে দেব, এ-রকম আশ্বাস দেয় মানুষকে ? আশ্চর্য, অনায়াসে, আরামে প্রতিশ্রুতি ভেঙে ফেলে। তাকিয়েও দেখতে যায় না কী বিষম আলাখোলা সরলতায় তারা বসে আছে যারা প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল।

'আমি উঠি কালুবাবু।'

'আচ্ছা আসুন'—নিশীথের দিকে না তাকিয়ে ফরাসের উপর ছড়ানো কতগুলো নথিপত্রের দিকে চোখ রেখে অন্যমনস্কভাবে হাত তুলে নিশীথকে বিদায় দিল কালুবাবু।

বাড়ির দিকে ফিরে যেতে-যেতে নিশীথের মনে হল রানুর সম্পর্কে নরেনকে সন্দেহ করে কথাটা কালুবাবুকে বলে মোটেই ভাল করে নি সে। অর্চিতা বলেছিল, কালুবাবু খুব খাঁটি মানুষ। অর্চিতা নিজেও কি খাঁটি ? এই দুই খাঁটিতে মিলে নিশীথকে কেমন নিভূম নিঝঝুম করে রাখে নি কি—হৃদয়ের ভিতর কোটি দিয়ে গুণ করা শূন্য বললে তাকে।

পথ দিয়ে ফিরতে-ফিরতে মনে হল চোতের বাতাসের মত তাকে বাজন করে চলেছে যেন সমস্ত ব্যক্ত নীলাকাশ; শেফালির জঙ্গলে বড়-বড় বোলতার চাক সোনালি রোদে ছায়ার নক্ষত্রের মত যেন; কত শত পতঙ্গ কেমন মিলে-মিশে প্রেমে, পরিকল্পনায়, সমবেদনায় উৎসারিত হয়ে মানুষের

হাতে চূর্ণ নগরগুলোকে, মানুষের হাতে নিহত মানুষরাশিকে ঠাট্টা করছে। আকাশে ফিঙে উড়ছে, হরিয়ালেরা চলেছে চোখে ঠোঁটে জলের গন্ধ নিয়ে কোনো নিকটতম জলের মহানুভব শান্তির দিকে, যদি না, মানুষের গুলি-গুলতি এসে কাউকে-কাউকে উপড়ে অন্ধকারের দিকে ফেলে দেয়। মাথার উপরের সূর্যের দিকে তাকায় নি নিশীথ কিন্তু দিঘির পাড়ের খই রঙের হাঁসটা চোখ পাঁজলে দেখে নিচ্ছে সূর্যকে ; অপরূপ নারীকামিতার মতো যেন; মস্ত বড় শিমূল গাছের থই থই পাতার ভিতর কতগুলো স্নিগ্ধ নিঃশব্দ কবুতর বসে আছে, হঠাৎ ধপধপে শাদা একটা কবুতর উড়ে গেল। পাখিটার ডানার আলোর ঝিলিক নিশীথের চোখে এসে লাগল—টের পেল সে, মহত্তর সূর্য কোথাও অদৃশ্য থেকে সেবা করে যাচ্ছে, সুধা দিচ্ছে, অমেয়, শালীন আলোক দান করে চলেছে।

'তুমি কোত্থেকে এলে ?' —হাসি মুখে বললে অর্চিতা।

'কালুবাবুর কাছে গিয়েছিলাম।'

'কেন ?'

'রানুর কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম—'

'আর নরেনের ?' অর্চিতা বিরক্ত হয়ে বললে, 'এক্ষুনি জিজ্ঞেস করতে গেলে কেন ?'

'কেন কী হয়েছে ? তুমি না বললে খুব ভালমানুষ কালুবাবু—'

অর্চিতা ভ্রুকুটি করে হেসে বললে, 'তোমার চেয়ে ভালমানুষ তল্লাটে নেই। আচ্ছা যাও, যা-হবার হয়েছে—আমাকে গিয়ে ঠিক করে দিতে হবে। কিছু জানতে পারলে রানুর কথা ?'

'না।'

গোরু, তবে যে সব গাইগোরুর মুখ হরিণীর মত, অর্চিতা অনেকটা সেই রকম। তাকিয়ে দেখছিল নিশীথ, একটা হরিণী সেমিজ পরে মহিষের শরীরের ভিতর দিয়ে, দেওয়ালের ভিতর দিয়ে, অদৃশ্য হয়ে গেল যেন কোথায়। না, অদৃশ্য হয়নি তো, ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে ; হরিণীর শরীরের ভিতর দিয়ে ছল-ছল করে উঠছে জল, নদীর, রাত্রির, যেখানে সূর্য নেই, শুদ্ধ দেশের রাত্রির জল ছল-ছল করে উঠছে—তারার ফাঁকে-ফাঁকে যে-অন্ধকার আছে সেগুলোকে জলোচ্ছ্বাসিত করে—কত শত তারার শরীর, কত শত

অন্ধকার নদীর এলোপাথাড়ির ভিতর জল শুধু এখন, রাত্রি শুধু—শাশ্বত রাত্রি।

নিশীথের কলেজ কমিটির সেক্রেটারি হরিলালবাবুর বাড়িতে কলেজ কমিটির প্রায় সব মেম্বারই এসে জড়ো হয়েছিলেন। কলেজের গভর্নিং বডির কোনো মিটিং নেই আজ। চার-পাঁচদিন পরে মিটিং। হরিলালবাবু এঁদের ডেকে আনেন নি। এমনি সারাদিনের কাজকর্মের পর বেড়াতে-বেড়াতে হরিলালবাবুর বাড়িতে এসে জুটেছেন তাঁরা।

হরিলালবাবুর সুন্দর চালতে ফুলের রঙের নতুন বড় দালানটার দোতলার হল ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। হরিলালবাবু এখানকার বার লাইব্রেরির এক জন বড় বুড়োটে উকিল। যখন এদেশে উকিল-টুকিল বেশি ছিল না, তখন প্র্যাকটিস শুরু করে, সঙ্গে-সঙ্গে নানারকম হোসিয়ারি ব্যবসা চালিয়ে অনেক টাকা কামিয়ে গিয়েছেন। কলকাতায় বাড়ি আছে হরিলালবাবুর, ভুবনেশ্বরে আছে। হরিলালবাবু যদি আজকের দিনে ওকালতি শুরু করতেন তা হলে—লোকে বলে—এঁটোকাঁটাও জুটত না তাঁর, শামলা এঁটে বটতলায় দাঁড়িয়ে দিন কাটিয়ে দিতে হত। কিন্তু যে-লোকটা ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করে গুছিয়ে নিয়ে সকলের ঘাড়ে পা লটকে বেড়াচ্ছে তার সম্বন্ধে ধোঁয়াটে কথা পেড়ে কী লাভ এখন আর।

কলেজ কমিটির সেক্রেটারি হবার কথা কলেজের প্রিন্সিপালের। কিন্তু জলপাইহাটিতে কলেজের প্রিন্সিপাল কালীশঙ্করবাবু এখানকার লোক নন। কিন্তু এখানকার মানী মানুষকে মর্যাদা দেবার জন্যে আগ বাড়িয়ে হাত কচলাবার মতো জুড়ি নেই এ দেশে কালীশঙ্করের। কী করে হরিলালকে একটু সুবিধে করে দেওয়া যায়, কী করে এখন একটু পিছিয়ে থেকে নিজের আখেরের সুবিধা করে নেওয়া যায়, এ-জন্যে সব সময় চোখ-কান খাড়া কালীশঙ্করবাবুর। বছর তিনেক আগে ছ-মাসের জন্যে কলেজ কমিটির সেক্রেটারির কাজ চাপিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু দেখেছিলেন যে কমিটির মিটিঙে গভর্নিং বডির মেম্বারেরা সকলেই প্রায় হরিলালের দোহাই দিয়ে কথা বলে, মুখ চেয়ে থাকে হরিলাল চাটুয্যের। মেম্বাররা সকলেই প্রায় ষাটের কাছাকাছি

—কেউ কেউ সত্তর ঘেঁষে। ইয়ং ব্লাডের অভাববোধ করছিলেন কি কালীশঙ্করবাবু? কী-জানি, এ বিষয়ে তিনি মনে-মনে কিছু স্থির করে উঠতে পারেন নি। ভাবছিলেন হয় তো কমিটিতে উকিল ছোকরারা এলে অবস্থা আরো খারাপ হবে। বাংলাদেশে মফস্বল কলেজ কমিটিতে অন্তত—বরে আনি-চোদ্দ আনি জায়গা উকিলদের ছেড়ে দিতে হবে। তুমি-আমি দিচ্ছি না, এটা অলিখিত চুক্তি অনেক দিনের—কিন্তু কার সঙ্গে? জানা নেই। কিন্তু ছেড়ে দিতে হবে। কে চালাবে দেশ, উকিলরা ছাড়া? উকিলদের মামলা মিটিয়ে কলেজ কমিটির বাকি জায়গাটা মুখ চেনা ডাক্তার বা জমিদারের ঝাড়-বংশের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে। শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপার—কিন্তু শিক্ষাদাতাদের জায়গা কোথায়, কলেজ কমিটিতে? ওদের? ওদের নিয়ে কী হবে? ওরা তো সোয়াশ-দেড়শ টাকার মাস্টার। ওরা আর হোমিওপ্যাথ ডাক্তাররাই তো স্বাধীন ব্যবসা চালাচ্ছে দেশে—সব ঘাটের জল খেয়ে তারপর ছোট শিশির জল ধরেছে। কেউ-কেউ কলেজে ঢুকে পড়ছে।

যখন একা চুপচাপ বসে থাকেন নিজের বাড়িতে দোতলার করিডরে—ইজিচেয়ারে—তখন তাঁর মনে এ-রকম দু-চারটে কথা নড়াচড়া করে বটে, কিন্তু তিনি নিজে তো চারশ টাকা মাইনে পাচ্ছেন—শিগগিরই পাঁচশ, হরিলাল-বাবুকে একটু তাঁবে রাখলে সাড়ে পাঁচশ হয়ে যাবার সম্ভাবনা—সোয়া পাঁচশ হয়ে যাবে এই মে মাসের গভর্নিং বডির বাসন্তী-নিদাঘ বৈঠকে। কথা দিয়েছেন হরিলালবাবু। বোকা হ্যাঁচকা ইশারাগুলোর গলা টিপে শেষ করে ফেলেন কালীশঙ্করবাবু। প্রিন্সিপাল তার নিজের নিরালা কোয়ার্টার্সও পাবেন—মস্ত বড় কলেজ ময়দানের একটেরে—নিম ঝাউ আমলকী জামগাছের ছায়া-রোদের ভিতর বেশ বড়-সড় সুন্দর একটা কাঠের বাংলো বাড়িতে। অ্যাসবেসটসের ছাদ। এক তলা বাড়ি—অনেক উঁচুতে মেঝের পাটাতন। চমৎকার চোঙের মত কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়—যেন সুখী স্বস্তি-কাম শান্তিপ্রাণ শ্রমণ তার নির্জন আশ্রমমন্দিরে প্রবেশ করছে। আঃ আ-হ্-হ্—হা-হা-হা। চোতের বাতাসে পিঠ-বুক জুড়িয়ে নিতে-নিতে ভাব-ছিলাম। কালীবাবু তো এই পদ্মার পারের দেশের লোক নন। তিনি এসেছেন বেহার-বাংলার প্রত্যন্ত থেকে, অথচ এ দেশের লোকের মন মজিয়ে তিনি এদেরই মামা-মেসোর চেয়েও গলায়-গলায় আজ। সব সময়ই জলপাই-

হাটির নিঃশ্রেয়স ( শব্দটি সম্প্রতি কলকাতার তাস-সিগারেট-বই-বুকনির দু-চারজন বৃত্তান্তপণ্ডিতের কাছ থেকে শিখে এসেছেন ) নিঃশ্রেয়সের চিন্তা, মানে ঠিক কল্যাণকামনা করেন। কিছু নয়—বোকা হরিলালকে হাতে রাখতে হয়। একটু তাইয়ে দিলেই টোপ গেলে হরিলাল। টাকা করে নিয়েছিস, এখন তোর বড় কথা হচ্ছে মান। মানী হবি? বেশ তো হ না; কে তোকে বাধা দিচ্ছে হরিলাল? আমি পথ ছেড়ে তোকে কলেজের সেক্রেটারি করে দিয়েছি। তুই যদি নামে 'প্রিন্সিপাল হতে চাস, বেশ তো হবি; আমার কোনো আপত্তি নেই; সপ্তাহে এক-আধ ঘণ্টা এসে হিন্দু-ল পড়িয়ে যাবি ফোর্থ ইয়ারের ছেলেদের; সে ঘণ্টায় আমার ইংরেজির ক্লাসটা আমি বাদ দিয়ে দেব; প্রিন্সিপালের কামরায় ইজিচেয়ারে বসে থাকব—ফ্যান টিপে দিয়ে; আমাকে পাঁচশ টাকা মাসোয়ারা দিলেই হবে।
মান! মানকচুপাতার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে কত মানের কাজই তুমি করেছ হরিলাল! কোন কোন সধবা-বিধবার কোন ছেলেটি-মেয়েটি তোমার, জানা নেই বুঝি আমাদের?
'হ্যাঁ, কালীশঙ্করবাবু—'
'আজ্ঞে বলুন।'
কালীশঙ্কর ভেনেস্তার চেয়ারটা একটু কাছে টেনে নিয়ে, হরিলালের দিকে এগিয়ে, খুব বেশি ঘেঁষে নয়—চেয়ারটাকে পেতে নিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে—কেন ছোট ছেঁদো কাঠের চেয়ারে বসেছেন আপনি। প্রিন্সিপাল মানুষ—আপনার জন্যে একটা কেম্বিসের ডেকচেয়ার জুটল না। মতিলাল! ওরে এই মোতে হারামজাদা!'
'না—না—কিছু দরকার নেই হরিলালবাবু—বেশ ভাল চেয়ার—বিলিতি ভেনেস্তা—'
'ভেনেস্তা আবার দিশি-বিলিতি আছে নাকি—'
'আছে দিশিও এক রকম! পাইন কাঠের মতন; তবে খুব খেলো জিনিস' —জলপাইহাটি কোর্টের হাজার-দেড় হাজার বাদীর উকিল হিমাংশু চক্রবর্তী বললে। হিমাংশুর বয়স পঞ্চাশের নীচে। কলেজ কমিটির মেম্বার হিমাংশু। 'আমার ডেকচেয়ারটা আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি স্যার'—বললে হিমাংশু কালীশঙ্করবাবুকে।

'না না—ঠিক আছে, ঠিক আছে'—কালীশঙ্কর ডান হাতের পাঁচটি আঙুল উঁচিয়ে থামিয়ে দিলেন।

'আমরা সবাই তো সোফা-সেটিতে ইজিচেয়ারে বসেছি হরিলালদা'—উকিল ব্রজমাধববাবু বললেন, 'কালীবাবু কেন ভেনেস্তা বেছে নিলেন'—

'ভেনেস্তা হবার জন্যে—হে-হে-হে'—হরিলাল তার নাক-ঠোঁটের কোণা খামচি খিঁচিয়ে হেসে ফেলে বললেন, 'মতিলাল! ওরে হারামজাদা হারামিকা'—

শিবনলাল এসে বললে—'বাবা বাড়ি নেই, ইস্টিশনে গেছে দাদাবাবুর মাল খালাস করে দিতে'—

'হারামিকা—শিগগির একটা সোফা নিয়ে আয়।' শিবনলাল অন্দরের থেকে সোফা আনতে গেল।

'সোফা-সেটি তো ছিল চারদিকে; আপনি নিজে কেন উটকো চেয়ারে বসতে গেলেন কালীবাবু?'

'বড্ড ছারপোকা কামড়াচ্ছে হরিলালবাবু'—হিমাংশু চক্রবর্তী বললে।

'সত্যি, ছারপোকা হরিলালদা—বসা দায়'—ব্রজমাধব বললেন।

'ঐ নতুন ভেনেস্তা চেয়ারটায় ছারপোকা নেই। কালীবাবু ঠিকই বসেছেন' —হ্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা হাসতে লাগলেন।

'যা ছারপোকা দাদা, কী হবে সোফায় বসে। বেশ আছেন আপনি যা হোক কালীবাবু'—ঘোষমল্লিক স্টেটের উকিল বঙ্কিম দত্ত বললে।

শিবলাল ও পূর্ণ ধরাধরি করে একটা চমৎকার নতুন সোফা হল ঘরে এনে বসাতেই সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে গটগট করে হেঁটে সোফাটার উপর ধপাস করে বসে পড়লেন বারের উকিল, কলেজ কমিটির মেম্বার, ওয়াজেদ আলি সাহেব। কালীশঙ্করবাবু নিজের চেয়ার থেকে উঠে বসতে যাচ্ছিলেন সোফায়। হঠাৎ আলি মিঞাকে চোখে পড়ায় ভেনেস্তায় ফিরে এলেন। সকলে হো হো করে হেসে উঠল!

'কেন কী হল—হাসবার কী হল'—জিজ্ঞেস করলেন ওয়াজেদ আলি।

'কিছু হয় নি।'

শিবলালকে একটা ডেক চেয়ার আনতে বললেন হরিলালবাবু, 'না কি সোফা আছে আরো অন্দরে?' চলে গেল শিবলাল।

'ভাল তো মিঃ ওয়াজেদ আলি ?'

'ভাল, ওয়াজেদ আলি সাহেব ?'

'সেলাম ওয়াজেদ আলি সাহেব, তবিয়ৎ ভাল তো। আজ বার লাইব্রেরিতে দেখলুম না তো আপনাকে—'

'আদাব, মিঃ ওয়াজেদ আলি। মিঃ ইমাম হোসেন বেড়াতে-বেড়াতে আসবেন কি এদিকে এক বার ?'

'এই যে জনাব ওয়াজেদ আলি সাহেব ; আপনার কথাই ভাবছিলাম। আমি গেছলুম কাল আপনার ওখানে। বাড়িতে পেলুম না ; শুনেছিলুম আপনার নিউরালজিক পেন হয়েছে—'

ওয়াজেদ আলি অত্যন্ত আপ্যায়িত বোধ করছিলেন। আপ্যায়িত করে যদিও ব্যতিব্যস্ত করে ফেলছে তাঁকে সব, কিন্তু তবুও খারাপ লাগছিল না তাঁর। তাঁর চারিদিককার এ সব মানুষদের মৌখিক আন্তরিকতা তো খুব নিখুঁত—এই হলেই হল যেন ওয়াজেদ আলি সাহেবের ; ভিতরের আন্তরিকতা অন্ধকারে ভুট্টার মত পুড়িয়ে খায় ভুট্টার ক্ষেতের পাশে বসে সাদামাটা দেহাতি লোকেরা ; উপরের স্তরে এ জিনিসটা খুব কম। উপমাটা প্রকৃতির থেকে নেওয়া—বেহার অঞ্চলের। ওয়াজেদ আলি সাহেব বাঙালি মুসলমান —পদ্মার ওপারের ; কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিন থেকে বেহারের কথা ভাবছিলেন —খুব বেশি। ভুট্টা নয়—জওয়ার জওয়ার—ওয়াজেদ আলি ভাবছিলেন।

'জনাব ইমাম হোসেন সাহেব ? না তিনি আজ এ দিকে আসবেন বলে মনে হয় না। বার লাইব্রেরিতে আমাকে দেখেন নি ? গেছলুম—খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছি। পুলিশ সাহেবের মোটর লঞ্চে একটু ঘুরে বেড়ালুম। খানাপিনা খেয়ে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল'—বললেন আর-একজনকে, 'নিউরালজিক পেন ? হ্যাঁ, বড্ড কষ্ট পেয়েছি চার-পাঁচদিন—দুটো মাড়ির দাঁত—মাড়ির দাঁতে বদ রক্ত জমে টনটনিয়ে উঠেই পেনটা হয়েছিল মনে হয়। কনস্টিপেশনও আছে। ডাক্তার জোলাপ নিতে বলেছিলেন। কিন্তু আজ এ-বাড়িতে ম্যাজবান, কাল ও-বাড়িতে গিন্নি-পাগল চালের পোলাও, আর মুর্গির কালিয়া রেঁধে বড় বিবিসাহেব যেতে লিখে পাঠিয়েছিল—কী করি, সামাজিক মানুষ হয়ে থাকতে হলে দুর্ভোগ ভুগতেই হয় —'

'জোলাপ নেওয়া হল না' ?

'না'।

'গিন্নি-পাগল চাল কাকে বলে আলি সাহেব ?'

'খুব চমৎকার চাল।'

'বাসমতির মতন ?'

'না না, খাবেন একদিন হরিলালবাবু ?'—জিজ্ঞাসু ব্রজমাধবকে টপকে হরিলালবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ওয়াজেদ আলি।

স্নিগ্ধতা ও আত্মমর্যাদায় হরিলাল আস্তে-আস্তে বললেন, 'আমার আর খাওয়া-দাওয়া, দাঁত নেই, কী খাব আমি। মাংস খেতে পারি না, কুচিয়ে কিমা রেঁধে দেয়, সেটাই খাই রোজ'—

'রোজ ?'—কে যেন জিজ্ঞেস করল। হরিলাল নিজের কথা বলতে-বলতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। তিনি যে রোজ মাংস খান এ কথা শুনে ও-রকম দাঁত কেলিয়ে 'রোজ' বলে উঠল কে ? নিজে কথা বলছিলেন, নিজের কথার দিকেই কান পেতে ছিলেন তিনি। অন্যদিকে মন ছিল না তাঁর। কে মানুষটা বলে উঠল, 'রোজ' ? হরিলালের কানের ভিতর দিয়ে মনে ঢুকে তাঁকে সচকিত করতে একটু দেরি করেছে বলেই হরিলাল বুঝতে পারছে না, কে বলেছে। চোখ তুলে চারিদিকে তাকিয়ে সহাস্যে সমীচীনভাবে খতিয়ে দেখছিলেন, 'হ্যাঁ রোজ খাই', হরিলালবাবু দৃঢ়ভাবে বললেন।

কেউ কোনো কথা বলতে গেল না।

'রোজই আমার মাংস না খেলে চলে না! রোজ! আমি মাংস খাই, কিমা মাংস কুচিয়ে কিমা করে খাই। এ বেলা ও বেলা ঘিয়ে রসিয়ে। রোজ। কে জিজ্ঞেস করেছিল আমি রোজ মাংস খাই কি না ?'

কেউ কোনো উত্তর দিল না।

কে জিজ্ঞেস করেছিল ? কেমন হাসিহাসি অমায়িক মুখে এর ওর, ওর তার, কালীশঙ্করের, সকলের দিকেই হরিলালবাবু চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখছিলেন কেমন একটা কঠিনতার আবহাওয়া সৃষ্টি করে তবুও। 'আমি রোজ মাংস খাই কি না, জিজ্ঞেস করল কে ?'

'ক্ষ্যামা দিন হরিলালবাবু। যে জিজ্ঞেস করেছে সে যখন নাচার, তখন একটা কথা নিয়ে এ-রকম বাঘা তেঁতুলের সিন্নি পাকিয়ে তো কোনো লাভ নেই'—ওয়াজেদ আলি বললেন।

'ঠিক বলেছেন আপনি আলি মিঞা'—হরিলাল বললেন—'রোজ মাংস খাওয়া যে কী, হিন্দুর বাচ্চারা তা বুঝবে কী করে?'
ওয়াজেদ আলি জিভ কেটে হাত জোড় করে হরিলালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না না, ওটা ঠিক হল না। কোনো রকম কম্যুনাল কথা বলবেন না হরিলালবাবু। হিন্দু মুসলমান কি আলাদা কিছু?'
'তা নয়', ব্রজমাধববাবু বললেন, 'আলাদা হতেই পারে না'।
'মুসলমানদের একতা আছে; তারা জানে যে হিন্দু-মুসলমান মিলিয়ে কী রকম চমৎকার বিসমাল্লা বাদাম উড়িয়ে নেওয়া যায়'—স্টিমার অফিসের উকিল অস্তিম দত্ত বললে।
'ঠিক কথা। আমরা এক'—আড় চোখে ওয়াজেদ আলির দিকে তাকিয়ে সংক্ষেপে বললেন নবকৃষ্ণবাবু। তাঁর অবশ্য অন্য নানা রকম কথা বলবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এ জায়গায় নয়—এখন নয়।
'আমাকে কাল ফকরুদ্দিন সাহেব বলছিলেন যে এ দেশটা যদি মুসলমানের দেশ হয়, তাহলে হিন্দুরও দেশ, মুসলমান, হিন্দু—সব আলাদা-আলাদা নাম বটে, কিন্তু আসলে দেশটাকে ভাল উন্নত করার চেষ্টা-চরিত্রের ভিতর দিয়ে মুসলমান আর হিন্দু তো এক'—হিমাংশু চক্রবর্তী বললে।
'এক, এক'— একটু অসহিষ্ণুভাবে বললেন নবকৃষ্ণবাবু। কেন যে এই নিরেশ ব্যাপারটা নিয়ে এরা এত কথা কপচাচ্ছে ভাল লাগছিল না তার। অন্য কত কাজের কথা পড়ে আছে। এত বেশি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন নবকৃষ্ণবাবু যে এক দমক হেসে উঠে ওয়াজেদ আলির দিকে তাকিয়ে নিলেন। ঢোঁক গিলে একটু কথা ভেবে নিলেন।
'কথাবার্তা বড্ড কম্যুনাল হয়ে পড়ছে হরিলালবাবু'—বললেন ওয়াজেদ আলি
'তাই তো দেখছি, সেই জন্যেই এ ফস্টিনস্টিতে যোগ দিই নি আমি'—হরিলাল বাবু পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে বললেন।
'কেন? কম্যুনাল হল কী করে?' বিস্মিত হয়ে নবকৃষ্ণ হরিলালবাবুর দিকে তাকালেন।
নবকৃষ্ণের জিজ্ঞাসায় কোনো কান না-দিয়ে হরিলালবাবু ওয়াজেদ মিঞার দিকে চোখ তুলে বললেন, 'ওরাই কথা বলে যাচ্ছিল, ওদের কথায় আমি যোগ দিই নি। ব্যাপারটা কম্যুনাল বটেই তো; হিন্দু আর মুসলমান এক কি

আলাদা, তারা দুই জাতি কিনা, তাদের ধর্মের মত তাদের কালচারও আলাদা কি না—এ নিয়ে বড়-বড় লোকেরা কথা ভাববেন। ও-সব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার তো কোনো কথা নেই'—চুরুটটা জ্বালিয়ে নিলেন হরিলালবাবু, —'অবিশ্যি ওয়াজেদ আলি সাহেব বড় মানুষ। কিন্তু এ-সব বিষয়ে তাঁর কী মতামত সেটা তিনি পরিষ্কার করে বলে আসছেন অনেক দিন থেকে অন্য জায়গায়। কিন্তু আমার এ বাড়িটা তো কোনো পলিটিকসের হাট নয়; এখানে আমরা মিলেছি-মিশেছি—শিক্ষা-দীক্ষা, কলেজ-স্কুল, দু-চারটে ব্যাঙ্ক ফেল, জালিয়াতি, পার্টিশন সুট নিয়ে আলোচনা করতে। আমার সিগারেটের টিনটা ফুরিয়ে গেছে। আপনারা কেউ সিগারেট খাচ্ছেন না যে'—হরিলালবাবু চুরুটে দু-একটা টান মেরে, সেটাকে দাঁত থেকে খসিয়ে ছাই ঝেড়ে নিয়ে বললেন।

পকেট থেকে এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট বের করে ব্রজমাধববাবু দেশলাই বার করলেন—'এই যে ওয়াজেদ আলি সাহেব, সিগারেট নিন।'

ব্রজমাধববাবুর কাঁচি সিগারেট একটা খসিয়ে নিয়ে, জ্বালিয়ে, দু-একটা টান দিয়ে ওয়াজেদ আলি পকেট থেকে নিকেলের সিগারেট কেস বের করে ব্রজমাধব, হিমাংশু সকলের ভিতর বিলি করে দিতে-দিতে বললেন—আপনি চুরুট খাচ্ছেন হরিলালবাবু তাই সাধলুম না, দেখবেন খেয়ে?'

কী সিগারেট ওটা?'

নেভি কাট।'

পরে দেখব। চুরুটটা খেয়ে নিই।'

ব্রজমাধববাবুও কাঁচি বিলি করছিলেন। এ দু-জন মানুষের সিগারেট জ্বলে উঠল সকলের মুখেই—কালীশঙ্কর ছাড়া; সিগারেট খান না তিনি।

ফকরুদ্দিন সাহেবের কথা বলছিলেন আপনি হিমাংশুবাবু, কিন্তু তিনি তো লিগের মুসলমান নন।'

ফকরুদ্দিন সাহেব লিগের নন?'

'আমি জানি তিনি লিগের নন।'

তিনি কি লিগের নন?'

তিনি কি কংগ্রেসের মুসলমান?'

'ফকরুদ্দিন সাহেব লিগে ঢুকেছেন শুনেছিলুম—'
'ফকরুদ্দিন সাহেব কংগ্রেসের নন, কৃষক-প্রজার নন। আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে। আমার চেয়ে বেশি এ-বিষয় কেউ জানে না।'
'কে বলেছে ফকরুদ্দিন সাহেব লিগের? লিগে তিনি নেই।'
'ফকরুদ্দিন সাহেব কি জমায়েৎ-উল-উলেমার?'
'খাকসার পার্টিতে তিনি আছেন বলে মনে হয় না। না, না, মোমিন নন।'
'না না, কংগ্রেসের নন ফকরুদ্দিন সাহেব, কী বলছেন আপনি?'
'ফকরুদ্দিন কি কম্যুনিস্ট?'
'কম্যুনিস্ট ঠিক নয়। সোস্যালিস্ট পার্টির, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট নয়। আরো অনেক সোস্যালিস্ট পার্টি বেরিয়েছে আজকাল।'
'ফকরুদ্দিন কম্যুনিস্ট, আমি জানি।'
ওয়াজেদ আলি বিক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'ফকরুদ্দিন সাহেবের নিয়ে এত কথা। এক জন মানুষকে নিয়ে বড্ড কাটা-ছেঁড়া হচ্ছে কিন্তু হরিলালবাবু। জিনিসটা কম্যুনাল হয়ে যাচ্ছে হরিলালবাবু'—
'আমিও তো তাই দেখছি। সেই জন্যই ওদের ডামাডোলে আমি যোগ দিই নি। আমি কোনো কথা বলি নি। ফকরুদ্দিন সাহেব এটা কী, ওটা কী সেটা, এক জন মানুষকে নিয়ে এত কথা হবে কেন? হেঁজিপেঁজি কথা সব!'—হরিলালবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন।
'যদিও এটা পার্টিশন স্যুটের দেশ'—কে যেন শুরু করলে।
'পলিটিকস থাক'—হরিলালবাবু থামিয়ে দিলেন।
'মুসলিম লিগ বলছিল কিনা যে শরিয়ত অনুসারে দেশশাসন'।
'আবার পলিটিকস!' ধমক দিয়ে ফেলেই হরিলালবাবু একটু হকচকিয়ে উঠলেন। শরিয়তের কথা ওয়াজেদ আলিই আরম্ভ করেছিলেন চাপা গলায় —ওয়াজেদের গলা থেকে দু-তিন রকমের সুর বেরোয়। চোখ বুজে চুরুট টানছিলেন হরিলালবাবু, মনে হয়েছিল তাঁর, যেন ব্রজমাধববাবু শরিয়ত অনুসারে রাষ্ট্রশাসনের ব্যাপারটা নিয়ে উত্তেজিত হবার পূর্বাভাস দেখাচ্ছে। বেপরোয়া ব্রজমাধব। ব্রজমাধবকে কড়কে দেবার জন্য ধমক দিয়ে চোখ খুলেই দেখলেন, ওয়াজেদ আলি কথা বলতে-বলতে হরিলালকে কঠিন, শাদা বরফের মত দাঁত দেখিয়ে থেমে গেলেন।

'ব্রজমাধববাবু, আপনি শরিয়তের কথা-টথা বলবেন না। এ সব বিষয়ে মুসলিম লিগের নেতারাই ভাল বোঝেন, ঠিক বোঝেন। তাঁরা যদি কিছু বলতে চান, আমরা শুনব। ওয়াজেদ আলি সাহেব রাষ্ট্রশাসনের কথা বলুন, আমরা শুনি। খুব মন দিয়েই শুনি। কিন্তু ব্রজমাধববাবু, কালীশঙ্করবাবু এঁরা এ সব শাসন-শরিয়তের জানেন কী? কেন ফোঁপরদালালি করতে যান'—বললেন হরিলালবাবু বেশ স্থির গলায়, ব্রজমাধববাবু ও কালীশঙ্কর-বাবুকে খুব ধমকে, কড়কে দিয়ে, ওয়াজেদ আলির দিকে আশ্রয়ার্থী জুনিয়র উকিলের মতন আস্তে চোখ মেরে।

হরিলালের এ দৃষ্টির নিস্তব্ধ মাহাত্ম্যকে—সাত-পাঁচ না ভেবে—ভাল জিনিস বলে মনে করলেন ওয়াজেদ। জলের মতন গলে গেলেন তিনি। বললেন, 'না-না, ব্রজমাধববাবু কিছু বলেন নি। শরিয়তের কথা আমিই পেড়েছিলাম।'

'রাষ্ট্রশাসন-শরিয়তের কথা আমি তো কিছু বলতে যাইনি হরিলালবাবু'—কালীশঙ্কর বিচলিত হয়ে বললেন, 'আমাকে কেন—'

কিন্তু কালীশঙ্করের কথাগুলো চিলে খাচ্ছে—খেয়ে যাক—গ্রাহ্য না করে হরিলালবাবু তাজ্জব বনে গেলেন, যেন ওয়াজেদ আলির কথা শুনে 'ওঃ, আপনি! আপনি বলছিলেন শরিয়তের কথা। আমি ভেবেছিলুম ঠিক যেন ব্রজমাধববাবুর গলা; নাকি কালীশঙ্করবাবুর। ভাবলুম কলেজের প্রিন্সিপাল, তুমি ছেলেদের নিয়ে থেকো হে, এ সব উজির-বাদশার ব্যাপার নিয়ে তোমার কী? ওঃ, আপনি বলছিলেন ওয়াজেদ আলি সাহেব! আপনি বলছিলেন কোরান শরিয়ত শাসন-টাসনের কথা! বলুন, বলুন শুনি, আমরা সকলে মিলে শুনি; কেমন একটা আবছা ভাব আছে আমাদের মনের ভিতর, জলের মতন পরিষ্কার হয়ে যাবে সব'—কথাগুলো হরিলালবাবু পেটের থেকে ওগরাচ্ছেন বলে মনে হল না ওয়াজেদ আলির।

খুশিই হলেন ওয়াজেদ সাহেব। হাত জোড় করে বললেন হরিলালবাবুকে—'আজ থাক। আজ কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে সব, কম্যুনাল হয়ে যাচ্ছে। আর-একদিন হবে। ইমাম হোসেন সাহেব, মুস্তাক সাহেব, রফিক সাহেব ওঁদের সঙ্গে নিয়ে আসব।'

'বেশ তাই হবে। আমাদের জানিয়ে দেবেন কবে আসবেন। আমরা সকলে মিলে শুনব আপনাদের কথা'—হরিলালবাবু বললেন।

পকেট থেকে একটা ভাল চুরুট বের করে ওয়াজেদ আলির হাতে তুলে দিয়ে হরিলাল বললেন, 'আপনার কেসের সব সিগারেট ত বিলিয়ে দিয়েছেন। চুরুটটা জ্বালিয়ে নিন, ভাল জিনিস। আজ তো মঙ্গলবার, আগামী রববার কলেজ কমিটির মিটিং, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলোতে। দুটো ভারী কথা আপনাদের সকলকে জানিয়ে দিতে চাচ্ছি আমি। গভর্নিং বডির প্রায় সব মেম্বারই তো এখানে হাজির আছেন। মুসলিম মেম্বার অবশ্য চার-পাঁচজন নেই এখানে, কিন্তু তাঁদের মুখপাত্র ওয়াজেদ আলি সাহেব নিজেই আছেন—'

তারিফ জানিয়ে অনেকেই হাততালি দিয়ে উঠল।

আলি সাহেব কিছু খুশি হয়ে, গোলাপছড়ির মত পোড় খেয়ে, মুখ কুঁচকে বললেন, 'ও সম্মানটা জনাব ইমাম হোসেনের—জনাব সৈয়দ আলি—জনাব' —থেমে গেলেন আলি সাহেব।

'আপনি যে খুব ইমানদার তা তো দেখলুম। খুব ভাল কথা। আমরা সকলে অবশ্যি জনাব ওয়াজেদ আলি সাহেবের কথাই সবচেয়ে আগে মনে করি।'

হরিলালবাবু বললেন, 'আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল কালীশঙ্করবাবু চারশ টাকা মাইনে পাচ্ছেন। উকিলদের একজন জুনিয়র মুখফোঁড়ও তো এর চেয়ে বেশি পায়। অথচ উনি দশ বছর ধরে কলেজে প্যাঁদাচ্ছেন। এত বড় একটা কলেজ, এত ছেলে, প্রিন্সিপাল সাহেবকে এত কম মাইনে দিলে চলে না ত'—

'তা তো ঠিকই'—ওয়াজেদ আলি বললেন, 'আমিও ভেবেছি এ সব কথা। আমার মনে হয়—আচ্ছা ওকে—সাতশ টাকা করে দিলে কেমন হয়।'

এ-রকম কথা আর কারু মুখ থেকে বেরুলে তার গালেই চড় মারতেন হরিলাল। সাতশ টাকা! বটে! সাতশ টাকা এক সঙ্গে কোনো দিন দেখেছে কি কালীশঙ্করের মুক্ষি পায়রার বাচ্চারা, ধনা আর জনা? ওদের ধাড়ি বাপ দেখুক গে; ওরা দেখেছে! আমার ছেলেরা নাতিরা তো হাজার-হাজার টাকার গিলে চটকাচ্ছে রোজ। ওয়াজেদ আলি কথাটথা বলে বেশ, তর্কবিতর্ক করতে পারে। কিন্তু ফিনান্সের জ্ঞান নেই; না কি, আমাকে একটু জব্দ করতে যাচ্ছে? ফিচেল ওয়াজেদ আলি?

'না আলি সাহেব। আমি ভেবেছি সাড়ে চারশ টাকা করে দেব।'

'মোটে!'—আলি সাহেব উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, হাসতে-হাসতে বসে পড়লেন। 'আহা, আপনাদের খানদানি চাল দিয়ে কালীশঙ্করকে বিচার করলে চলবে

কেন, ও ত মাস্টার।'

'মাস্টার, তাতে কী! খাবে না? পরবে না? একজন গোয়ানিজ বাবুর্চির মাইনে—'

'আরে ছেড়ে দিন আপনার বাবুর্চির কথা। কালীমাস্টারকে কোয়ার্টার্স দেওয়া হচ্ছে—'

'কোয়ার্টার্স?'

'হ্যাঁ। লিখবে, পড়বে, খাবে, আরামে থাকবে। ওঁদের অত বেশি টাকাও লাগে না। তিনশ-আড়াইশ হলেও হয়। তবে এত বড় একটা কলেজ, এত ছেলে, কম মাইনে পেলে ছেলেদের কাছে মর্যাদা থাকে না। মর্যাদা না থাকলে কাজ খারাপ হয়। কলেজের ক্ষতি হয়। ছেলেরা আজকাল মাস্টারমশাইদের মাইনে খতিয়ে দেখে। বলে, একশ টাকার বকনা, একশ পঁচিশ টাকার বকরি, একশ ত্রিশের বইল যাচ্ছে ঐ, এক-একজন মাস্টারকে দেখিয়ে—'

'বইল! বইল বলে?'

'বইল। বইল বলে।'

জনাব ওয়াজেদ আলি সাহেব হরিলালের দেওয়া চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়েছিলেন। বসে-বসে টানছিলেন। রাতে আজ ফকরুদ্দিন সাহেবের ওখানে যেতে হবে। প্রায় বছর খানেক কলকাতায় থেকে চার পাঁচদিন হল জলপাইহাটিতে ফিরে এসেছেন ফকরুদ্দিন। লিগে ঢুকছেন হয় তো।

'আপনার চুরুটটা হরিলালবাবু, টেনে আরাম আছে। বাঃ। খাশা। কোথায় পেলেন আপনি?'

'কোথায় পেলেম। কলকাতায়, আবার কোথায়। কালবাজার ধুনে ধোনাদা করে তবে জুটল। আড়কাঠিদের কেষ্ট-বিষ্টুর সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে। খান চুরুট আপনি?'

'আলবৎ।'

'দেখি। কিছু আনিয়ে দেব। তাহলে কালীশঙ্করের সাড়ে চারশই ঠিক'—ওয়াজেদের দিকে তাকিয়ে বললেন হরিলাল।

'কালীবাবু কী মনে করেন'—সিকিটাক সহানুভূতি-সমবেদনায় কালীশঙ্করের দিকে ওয়াজেদ আলি সাহেব তাকালেন।

হেসে হাত কচলাতে-কচলাতে কালীশঙ্কর বললেন, 'আপনারা ভাল বুঝে যা

ঠিক করবেন, তাই তো মাথা পেতে নেব।'

'আচ্ছা, সাড়ে চারশই হোক'—ওয়াজেদ আলি রায় দিলেন। ওয়াজেদের চুরুটের পুরু ছাইয়ের মুখোমুখি হরিলালবাবু বসে আছেন। ছাইটা ঝেড়ে ফেললেন ওয়াজেদ। ছাইয়ের ফুলকি-টুলকি কারু চোখে গেল নাকি?

'সাড়ে চারশই হল তাহলে'—সকলের দিকে তাকিয়ে হরিলালবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'সাড়ে চারশ ডি-এ নিয়ে? না, এমনি?'

'ওসব ছেঁদো কথা বলবেন না। চারশ ছিল, পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এক ডাকে'—বললেন সেক্রেটারি হরিলাল।

'আমার একটা কথা আছে।'

'কী কথা আছে ব্রজমাধববাবু?'

'যে বেশি পাচ্ছে তাকেই কি আরো বেশি দেবেন আপনারা? চারশ পাচ্ছেন কালীবাবু, বেশ তো পাচ্ছেন। মাগগি বাজার বটে, কিন্তু সাদা-সিধে মাস্টার, খাঁই কম, একটা সিগারেটও তো খান না। এই দশ-পনের বছর তিনশয় চলেছে, আজ আবার একদিনেই ডিলিক মেরে—'

বাধা দিয়ে হরিলালবাবু বললেন, 'ব্রজমাধববাবু বড় বেশি বকেন। কত চারশ টাকা পাচ্ছেন আপনি আজকাল আর, ফৌজদারির আখমাড়াই মাড়িয়ে? নিজের পশার কমে যাচ্ছে বলে আর-একজনের ভাল হচ্ছে দেখে আপনার চোখ টাটাবে ব্রজমাধববাবু?'

ব্রজমাধববাবু ওৎ পাতছেন মনে হচ্ছিল। এখুনি কথা বলবেন? সিগারেটের দু-একটা টান দিয়ে। ওয়াজেদ আলি সাহেব একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'সহজ কথা আপনি বড় কঠিন করে বলেন হরিলালবাবু?'

'আমি বলছিলাম ওঁকে পঞ্চাশ টাকা বেশি না দিয়ে নীচের দিকের যে-সব প্রফেসররা কম টাকা পাচ্ছেন তাঁদের পাঁচ-দশ-পনের করে বাড়িয়ে দিতে'—ব্রজমাধববাবু নাছোড়বান্দার মত বললেন।

'ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন প্রফেসর। তাদের ভিতর পঞ্চাশ টাকার একটা লাড্ডু ছেড়ে দিলে কে খাবে? খেতে গিয়ে কামড়াকামড়ি করবে নাকি ব্রজমাধববাবু? আর যদি না করে, মাথা পিছু কে কত পাবে?'—খুব স্পষ্ট পুরুষ্টু ঠাণ্ডা গলায় বললেন হরিলালবাবু।

ব্রজমাধববাবু একটু ভেবে বললেন, 'কেন, পঞ্চাশ টাকার চেয়ে বেশি বরাদ্দ হতে পারে না এদের জন্যে? পঁয়ত্রিশজন প্রফেসর, তিনশ পঞ্চাশ—সাতশ, ধরুন চোদ্দশ টাকার ব্যবস্থা, করতে পারি না আমরা মাসে-মাসে এঁদের জন্য ওয়াজেদ আলি সাহেব?'

'সে রকম আয় নেই তো কলেজের, ডোনেশন নেই বাইরের থেকে, সরকার থেকেও বেশি কিছু সাহায্য নেই—ভাল ফাণ্ড নেই—'

'এ সব যাতে থাকে তার ব্যবস্থা করা উচিত নয়?'

'কে করবে? এ নিয়ে কে মাথা ঘামাবে। সব দিকেই ঝামেলা হামলা। কারুর মনে শান্তি নেই—ঘর নেই—বাড়ি নেই—না খেয়ে মরছে, ভেসে যাচ্ছে সব—কে কাকে দেবে? কে আদায় করতে বেরবে? কার কাছ থেকে আদায় করবে? কতগুলো কালবাজারের বজ্জাত ছাড়া টাকা আছে কারু কাছে? কালবাজারের পাজিগুলো টাকা দেবে কলেজকে? কেন, কলেজে খুব সুন্দর মেয়েমানুষ পয়দা হয় নাকি?'

জনাব ওয়াজেদ আলি সাহেব সকলের মুখের দিকে তাকাতে-তাকাতে বললেন, 'সরকারের টাকা নেই? কাগজের টাকা নেই যে তা নয়। কোটি-কোটি বেরচ্ছে রোজ। আরো কোটি-কোটি বেরতে-বেরতে এমন হবে যে, এ সব কাগজ জ্বালিয়ে চায়ের জল গরম করবে মানুষ। এগুলোর হিম্মতে কিছুই পাওয়া যাবে না খাওয়ার, পরবার।'

'বেশ রং চড়িয়ে তো বললেন ওয়াজেদ আলি সাহেব। সরকারের অবস্থা এত খারাপ নয়, সরকারের কাগজের নোট এখনও দিব্যি কথা বলে। যারা মোটা রোজগার করে তারা কী রকম খাচ্ছে, পরছে, ফুর্তি লুটছে আমাদের চেয়ে ভাল জানেন আপনি। টাকার তেজ আছে। তবে ঝোঁক নানা জিনিসের দিকে—ইস্কুল-কলেজের দিকে নয়। দিনকাল খারাপ হয়েছে—এ রকম তো হবেই। পরকে লুটে খাওয়া, নিজের ঘর সামলানো—এই দুটো কাজেই নিজেকে খরচ করে ফেলছে মানুষ; কাজেই পুলিশ চাই, সৈন্য চাই। আত্মরক্ষা করবার জন্যেও—পরকে মারবার জন্যেও। কলেজে স্কুলে পড়ে, পড়িয়ে কী হবে? সেখানে কবিতা তারিফ করতে শেখায়, আকাশে নক্ষত্রদের জন্ম-মৃত্যু-আলোকবর্ষের ইতিহাস জানিয়ে দেয় মাস্টাররা। এ সব শিখে জেনে যা পৃথিবীর সকলেই চাইছে সেই সবের উপরে আমিকে, সব দেশের উপরে

আমার দেশকে, সকলের শক্তির চেয়ে বড়—আমার লেত্তির শক্তিশেলকে পাওয়া যাবে কি? এ সব পেতে হলে এনতার সোনা আর কুঁকড়ো আর ধোনা মুর্গি চাই—'

'মুর্গি চাই? কেন মুর্গি কী হবে?'

'খাবে, একটাকে আর-একটা, লাখটাকে লাখটা। ভ্যালা চলছে মুর্গির লড়াই বটে, রাস্তা-ঘাটে, দেশ-বিদেশে, আকাশে-বাতাসে—'

চুপ করে বসেছিলেন হরিলালবাবু। কথা শুনছিলেন বটে মাঝে-মাঝে চোখ বুজে বা মেলে, চুরুট টানতে-টানতে—যারা বলছিল তাদের বুদ্ধি-নির্বুদ্ধিতাকে ক্ষমা করে।

'আপনাদের কথা শেষ হল?'

হরিলালবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিতে গেল না কেউ। যে-কথা চলছিল এত ক্ষণ তার জের টেনে কথা বা অন্য কোনো নতুন কথাও পাড়া হচ্ছিল না।

'প্রিন্সিপালের মাইনে তো ঠিক হল। এখন আর-একটা ছোট জিনিস আছে। জলপাইহাটি কলেজে নিশীথ সেন বলে একজন প্রফেসর আছে, নাম শুনেছেন ওয়াজেদ আলি সাহেব?'

'নিশীথ সেন? নিশীথ সেন তো ব্যারিস্টার ছিল, না?'

'না, সে নিশীথ সেন নয়।'

'তা আর কে? কিসের প্রফেসর?'

'ইংরিজির। নাম শোনেন নি তার। শুনবেন কী করে? আপনি তো নতুন এসেছেন এখানে। কলেজের মাস্টারদের নামের ফিরিস্তি তালিম করা ছাড়া ঢের দরকারি কাজ আছে আপনার—'

'নিশীথ সেন মানে এন-এস?'—ব্রজমাধববাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ এন-এস'—বললেন হরিলাল।

'এন-এসকে চিনলেন কী করে আপনি ব্রজমাধববাবু?'

'এন-এসকে আমি চিনি'—বঙ্কিম দত্ত বললে।

'এন-এসকে আমি চিনি'—বললে অন্তিম দত্ত।

'নিশীথ সেন প্রফেসরকে আমি খুব ভাল করেই জানি'—নবকৃষ্ণবাবু বললেন।

'কে, নিশীথ প্রফেসর? ও তো কত তাস পিটেছে আমাদের বাড়িতে'—বলে হিমাংশু আরো কিছু ফাঁদবে ভাবছিল।

'আচ্ছা, নিশীথ সেন বলতে বুঝল না, এন-এস বলতেই ধরে ফেলল সবাই, ব্যাপারটা কী রকম হল ?'—হরিলালবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন ওয়াজেদ আলি একটু খটকায় পড়ে।

'ও আছে এক কায়দা আলি সাহেব। একদিন কলেজে বেড়িয়ে আসুন না, বুঝতে পারবেন। করিডর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে শুনবেন টি-বি, টি-বি করে কান ঝালাপালা করছে। ব্যাপারটা টিউবারকিউলিসিস সম্পর্কে নয়, টি-বি মানে প্রফেসর তারিণী বাড়ুজ্যের কথা-হচ্ছে। দু-চার পা এগিয়ে আর-এক ক্লাসের ছেলেরা বি-বিকে নিয়ে পড়েছে, কোনো বিবি সাহেবের দিকে লক্ষ্য নয়, ছেলেরা বিনোদ বোস প্রফেসরকে ঠুকছে। এমনি এ-এম, পি-এম, ডি-ডি-টি, এল-সি-এম, ডি-ডি-টি, এম-জি-সি এ সবই আছে।'

ভারী তামাসা বোধ করছিলেন ওয়াজেদ আলি সাহেব। হরিলালবাবুর কাছে আর-একটা চুরুট নিলেন। জ্বালিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সাহেব, 'জি-এম আছে ?'

সকলে হো হো করে হেসে উঠল, ব্রজমাধব আর কালীশঙ্কর ছাড়া।

'আলবৎ আছে। গৌরী মিত্তির তো!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, গুড মরো।'

সকলে হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল আবার। ব্রজমাধব ছাড়া।

জনাব ওয়াজেদ আলি সাহেব এবারে তার স্ল্যাকসের পকেট থেকে একটা রুপোর সিগারেট কেস বের করে সকলকে সিগারেট বিলিয়ে দিলেন।

'এন-এসের কী হয়েছে ?'

'নিশীথ সেন এ-কলেজের ইংরেজির প্রফেসর। দেড়শ টাকা মাইনে পাচ্ছে। বেশ তো আছে ; এর চেয়ে বেশি আর কী পাবে মফস্বল কলেজে ? এ তো কলকাতা নয় যে টাকার উপর পোকা পড়বার ফাঁক নেই। যা পাচ্ছ অমনি রাবণের চিতেয় ঢালো। দেড়শ টাকার বেশি যে-মাস্টার চায় মফস্বলে, তার বদখেয়াল আছে। এখানে টাকায় দু-তিন সের দুধ পাওয়া যাচ্ছে।'

'কিন্তু চোদ্দ সের পাওয়া যেত। তিন টাকা ছিল চালের মণ—এখন পঁচিশ-ত্রিশ টাকা হয়েছে। কী যে দইবড়া বলছেন আপনি হরিলালবাবু ? দেড়শ টাকায় কী হয় একটা পরিবারের ?' ব্রজমাধববাবু বললেন।

'হয়ে তো যাচ্ছে। সোয়াশ টাকায় তো হচ্ছে। একশ টাকায় হচ্ছে না ? এ

কলেজের যে-সব মাস্টার একশ টাকা পায় তারা কি আপনার কাছ থেকে বুদ্ধি ধার করে খাচ্ছে-দাচ্ছে? ছেলেদের পড়াচ্ছে?'—হরিলালবাবু একটু বিরক্ত হয়ে বললেন।

'খেয়ে দেয়ে সুস্থ হয়ে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে ছেলেদের কাছে উপস্থিত হওয়া চাই তো। মনে একটা সুস্থিরতা থাকা চাই, না-হলে কী করে ভাল করে পড়াবেন মাস্টারেরা? কী করে উপকার হবে কলেজের?' ব্রজমাধব বললেন।

'কলেজের কোনো অপকার হচ্ছে না। স্টাফে যে-টিচারেরা আছেন, তাঁরা ঠিকমতই পড়াচ্ছেন', প্রিন্সিপাল কালীশঙ্করবাবু বললেন, 'একশ-সোয়াশ টাকায় খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, কলেজ গুঁতোচ্ছেন হাঁড়িচাচা পাখির মতো চেঁচিয়ে। বেশ, বেশ আছেন। কেন মাইনে বাড়িয়ে আমড়াগাছি শিখিয়ে মাথা খারাপ করে দেবেন তাঁদের?'

হরিলালবাবু হেসে মাথা নেড়ে ওয়াজেদ আলির দিকে তাকালেন, 'শুনলেন তো প্রিন্সিপালের নিজের মুখের কথা, কিন্তু ব্রজমাধববাবুকে কে বোঝাবে'। আক্ষেপ করে হাত ঘুরিয়ে, আঙুল নাড়িয়ে কয়েকটা রেখার আঁচড়ে-পোচড়ে কেমন কিম্ভূতকিমাকার করে রাখলেন মুখটাকে।

ওয়াজেদ আলি চুরুটে একটি টান দিয়ে বললেন, 'কলেজ কমিটিতে ব্রজমাধববাবু একটা হেলদি অপোজিশনের মত। এ না-থাকলে চলে না'।

ব্রজমাধববাবুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে ওয়াজেদ আলি বললেন, 'আচ্ছা ব্রজমাধববাবু, মেঠো ইঁদুর কি সোনামুগের ডাল খায়?'

'কথার ধার ধারি না আমি। বোবা হয়ে থাকতে রাজি আছি যদি বুঝি'—ব্রজমাধববাবুর মুখে যে-কথাগুলো এসে পড়েছিল সে সব তোড় থামিয়ে দিয়ে আস্তে-আস্তে বললেন, 'মাস্টারদের হয়ে কথা বলবার লোক থাকা চাই তো। আছে বটে একজন স্টাফ রিপ্রেজেনটেটিভ, কিন্তু ওরকম ন্যাতা-জোবরা ভালমানুষ দিয়ে কাজ হয় না।'

'হয় না বুঝি তাকে দিয়ে', ধোঁয়াটে দীনাত্মা চোখ তুলে হরিলালবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কাদের রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে কলেজ কমিটিতে ঢুকেছিলেন ব্রজমাধববাবু?'

কোনো উত্তর দিলেন না তিনি।

'গার্জেনদের তো ?'

এ রকম প্রশ্নের জবাব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন স্বীকার করলেন না ব্রজমাধব। কিন্তু তবুও হরিলাল বড় বোয়ালমাছের মত তাকিয়ে আছে যেন, পুকুরের নরম মাটির কিনারা-ঘেঁষা কোনো কচি কেঁচো দেখে ফেলেছে যেন মনে হচ্ছিল ব্রজমাধবের। তাই বটে কি ? তাই বটে হরিলাল ?

'হ্যাঁ গার্জেনদের রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে এসেছি আমি। কী হল তাতে ?'

'না, হয় নি কিছু—এর পরের কলেজ কমিটির ইলেকশনে—'

ব্রজমাধববাবু, হরিলালের মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল দেখে, গলা খাঁকরে নিয়ে বললেন, 'অভিভাবকদের প্রতিনিধি হয়ে আমি দাঁড়াব ইলেকশনে—কলেজ কমিটি আমি ছাড়ছি না, যতদিন আপনি আছেন, আমিও আছি হরিলালবাবু'।

হরিলালবাবু হেসে ফেললেন। জানে না যে কার সঙ্গে কে দেয়ালা করতে চাচ্ছে। হাতের চুরুটটা নিভে গিয়েছিল, দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে চুরুটের মুখ লাল করে নিচ্ছিলেন, হাসছিলেন। কেউ কিছু বলছিল না কোনো দিক থেকে। হরিলালবাবুর হয়ে দুটো কথা বলা উচিত নয় কি কারো ? কালীশঙ্করবাবুও ঘাপটি মেরে চুপ করে আছেন, যেন তার পঞ্চাশ টাকা এমনি-এমনি আদর করে বাড়িয়ে দেওয়া হল, কালীবাবু, হরিলালের নাতজামাই বলে।

'আপনি বড় তিরিক্ষে হয়ে উঠছেন ব্রজমাধববাবু'—ওয়াজেদ আলি বললেন।

ব্রজমাধববাবুকে এখন এ কথা বলার জন্য যেন বায়না দিয়ে রাখা হয়েছিল ওয়াজেদ আলিকে—প্রিন্সিপাল সকলের অজান্তে বাইরে শূন্যের দিকে চোখ দিয়ে গাঁট্টা মেরে ভাবছিলেন।

'বড্ড বেঁকে আছেন ব্রজবাবু ; ওটা হেলদি অপোজিশনের হতে হয়। নাহলে চুষিকাঠি কে দেবে ? কোথায় পাবে ?' চিপটেন কেটে বললে হিমাংশু চক্রবর্তী।

পথে এসো দাদারা—ভাবছিলেন হরিলাল, কই, অম্বিম দত্ত, বঙ্কিম দত্ত কিছু বলছেন না যে।

কেউ কিছু বলবার আগে ব্রজমাধববাবু বললেন, 'কলেজ ফাণ্ডে কত টাকা আছে ?'

'সেটা ফিনান্স কমিটি বুঝবে। এখানে সে কথা কে জানে—কে বলবে আপনাকে ?'

'আপনি সেক্রেটারি—আপনিই তো জানেন সব।'

ওয়াজেদ আলি সাহেব ব্রজমাধববাবুর কাঁধে হাত রেখে চেপে দিয়ে বললেন, 'এখানে হরিলালবাবু বাড়িতে এসে ও-সব কথা জিজ্ঞেস করা তো ঠিক নয়। যদি দরকার হয়—সাব কমিটিতে ফিনান্স কমিটিতে, আলোচনা করবেন'।

'ফিনান্স কমিটিতে একবারও আমি জায়গা পাই না !'—ব্রজমাধববাবু খানিকটা তিক্ত, পীড়িত হয়ে বললেন।

'কেন ?'

'হরিলালবাবু জানেন—'

'সবই তো জানে হরিলাল। হাঁসের পেটে কেন ডিম আসে, ব্রজবাবুর পশার যত কমে যাচ্ছে মেজাজ তত বেগড়াচ্ছে—পাছার কাপড় ছিঁড়ে যাচ্ছে—সবই হরিলালের কারসাজি'—বলে হরিলালবাবু চুরুটটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে টানতে আরম্ভ করলেন।

'এবারকার ফিনান্স কমিটিতে আপনাকে নেব ব্রজমাধববাবু'—ওয়াজেদ আলি আশ্বাস দিয়ে বললেন।

'আমি একা গিয়ে করব কী—সবই তো আমার বিপক্ষে।'

'যাবেন, আবার যাবেনও না, সে কী করে হয়। চলে যান ফিনান্স কমিটিতে, গিয়ে লড়বেন, একা লড়বেন। নিজেকে, সকলকে, আবহাওয়াকে বেশ পরিষ্কার ঝর্ঝরে করে দিয়ে আসবেন—'

'আপনি যাবেন আলি সাহেব ফিনান্স কমিটিতে ?'

'আমি ? না, আমি না—'

'কেন ?'

'ও-সবের বুঝি না কিছু আমি। হরিলালবাবু মনে করেন আমি কলেজ ফিনান্সের হদিশ পাই না। প্রিন্সিপালের মাইনে সাতশ টাকা করে দিতে বলেছিলুম, প্রফেসরদের তো চারশ-পাঁচশ দিতে চাই। ওতে হয় না। হরিলালবাবুর মতন একজন জানেওয়ালা মানুষ ব্রেক কষে না-ধরে থাকলে তা টেঁকে না।'

'ঠিক কথা বলেছেন ওয়াজেদ আলি সাহেব'—অন্তিম দত্ত বললেন।

'হরিলালবাবুকে বুঝবার মতন আলি সাহেবের মতন একজন দরাজ, দরবারি মানুষ থাকা চাই। না হলে কী করে জোর পাবেন হরিলালবাবু'—সহজভাবেই কথাটা বললেন বঙ্কিম দত্ত। ভাব গ্রহণ করে খুশিও হলেন হরিলাল। তবে বেশি নয়। কথাটাকে আরো গুছিয়ে বাড়িয়ে আস্ফোট করে বলা উচিত ছিল।

'ব্রজমাধববাবু যেন সব ভেঙে ফেলতে চান। জানেন না একটা জিনিস গড়ে তোলা কী রকম শক্ত। ত্রিশটা বছর ধরে, প্রাণপাত করে এই কলেজটা সৃষ্টি করেছেন হরিবাবু। ছাগল দিয়ে ধান মাড়িয়ে খান তো ব্রজবাবু, মানুষের পৃথিবীর খবর রাখেন না'—হিমাংশুবাবু বললেন।

চুপ করে বসে আছে কালীশঙ্কর, কোনো কথা বলছে না। আমার কলেজের নুন খেয়ে ওর পেট জাম্বুবানের মত, কিন্তু বাপের হাত-তোলা তুমি শুধু খাবেই বুঝি কালীশঙ্কর ; বাপের সমুখে বসে দুটো ভাল কথা শোনাতে পারবে না তাকে ?

হরিলালবাবু প্রিন্সিপালের দিকে তাকালেন। হরিলালবাবুর ও-রকম চোখে চাউনির মানে জানা আছে কালীশঙ্করের। গলাটা খাকরে নিয়ে তিনি বললেন, 'ব্রজমাধববাবু গার্জেনদের নমিনেশন পেয়েছেন বলেই আমাদের মাথা কিছু কিনে ফেলেন নি। ফিনান্সের কিছু বোঝেন না তিনি। আমি তাঁকে ও-কমিটিতে ঢুকতে দিচ্ছি না। হরিলালবাবুর কোনো দোষ নেই। হরিবাবুর মত উদার মানুষ জলপাইহাটিতে নেই। বাংলাদেশে খুব কমই আছে। অনেক দেশ তো ঘুরেছি, অনেক লোক দেখেছি আমি ওয়াজেদ আলি সাহেব। জেনে শুনেই কথা বলছি। আমাদের ভাগ্য আমাদের মধ্যে ছিলেন উনি, ওঁকে আমরা পেয়েছি, সেই জন্যই এত গুলো লেকচারার প্রফেসর করে খাচ্ছে। এ না হলে এদের গতি ছিল কী ? কে পুছত এদের ? তিনি যা করেন ভালর জন্যই করেন। বুদ্ধি প্রতিভা হরিবাবুর তো বাংলাদেশের সেরা মানুষদের মত। কলকাতায় থাকলে তিনি বড় মেজ মন্ত্রী হতে পারতেন। আমাদের জন্যেই স্বার্থত্যাগ করে এখানে আছেন। ব্রজমাধববাবু উড়ে এসে জুড়ে বসে আজ অনেক বারফটকা কথা বলেছেন। কিন্তু এ-রকম ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার বুদ্ধি নিয়ে তিনি নিজেরও উপকার করবেন না, কলেজেরও না। যিনি ত্রিশ বছর ধরে হিতব্রত নিয়ে এখানে আছেন জলপাইহাটির কলেজের মানবতার কিসে উপকার হয়

তার মতন কেউ তো তা বুঝবে না। হরিলালবাবুর প্রতিভা ও মহানুভবতা যে কতদূর অপূরণীয় তিনি একদিন মরে গেলেই জলপাইহাটি আর বাংলাদেশ তা বুঝবে।'

কালীশঙ্করের এ-সব কথায় কালীশঙ্করের নিজের বা অন্য কারো আন্তরিক সায় ছিল না। কথাগুলো অর্ধসত্য, হয়ত দশ আনি মিথ্যে, ছয় আনি সত্য।

হরিলালবাবু কী ভাবছিলেন জানা নেই, কিন্তু ভাষণ আর-কারো প্রাণেই বিশেষ কোনো সাড়া জাগাতে পারল না। প্রিন্সিপালের বাংলা ভাষাও যে বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর ছুঁয়ে আজকালকার 'ডি পি আইয়ি' স্কুল-টেক্সটের প্রবন্ধের ভাষায় কল্কে খুঁজছে! এরা কেউ ভাষা নিয়ে মাথা না ঘামালেও এদের ভিতর এক-আধ জন অন্তত—নবকৃষ্ণ অন্তত—সেটা টের পাচ্ছিলেন। নবকৃষ্ণর মনে হচ্ছিল বাংলাটা কেমন জোলো, মাঠো, কেমন বোকাপানা পাত-মাস্টারি বাংলা যেন।

'আমি জানি কলেজের খুব মোটা ফাণ্ড আছে। প্রফেসরদের জন্যে মাসে-মাসে চোদ্দশ টাকা বরাদ্দ অনায়াসেই করা যেতে পারে।'

'সেটা আপনি ফিনান্স কমিটিতে ঠিক করে নেবেন ব্রজমাধববাবু। ওয়াজেদ আলি সাহেব তো ঢোকাচ্ছেন আপনাকে সাব-কমিটিতে, আপনার কোনো আফশোস থাকবে না'—ধীর স্থির গলায় সুভাষিতের মতন হরিলালবাবু বললেন।

'আমি আরো জানি যে কলেজের সেই ফাণ্ডের টাকা থেকে হরিলালবাবু নিজের খরচের জন্যে—', ওয়াজেদ আলি মুখ চেপে ধরলেন ব্রজমাধববাবুর।

'কমিটিতে, কমিটিতে—ও-সব কমিটিতে হবে ব্রজবাবু, এখানে ভদ্রলোকের বাড়িতে কি এই করতে এসেছি—'

'কমিটিতে কী হবে? কমিটিতে কি রাহাজানি হবে?' হিমাংশু চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করলেন ওয়াজেদ আলিকে।

'এই যে হন্যে কুকুরের মতন আঁচড়াচ্ছে 'কামড়াচ্ছে আমাদেরও, তাতে কাউন্সিলে না পাঠিয়ে ছাড়বে না ব্রজমাধববাবু। এ-সব পাগলামি আবার কমিটিতে সেধিয়ে লেলিয়ে দিতে'হবে বুঝি'—বঙ্কিম দত্ত, অভিম দত্ত বললে।

'হে হে হে, হাইড্রোফোবিয়ার ভয়?' হাসতে-হাসতে বললেন ওয়াজেদ আলি সাহেব, 'নিন রাত হয়েছে, ওঠা যাক।'

হরিলালবাবু বললেন 'সেই নিশীথ সেনের কথা বলছিলুম, দেড়শ টাকা পাচ্ছে আমাদের কলেজে, বললে সোয়া দুশ-আড়াইশ, অন্তত দুশ না-করে দিলে কাজ করতে পারবে না সে। কী করে আমি তাকে দুশ আড়াইশ করে দিই আলি সাহেব ?'

'কেমন প্রফেসর ? কী রকম পড়ায় ?'

'আছে, পাঁচ-পাঁচির মতন আর কি, তা যেমনই হোক না কেন, দেড়শ থেকে সোয়া দুশ-আড়াইশ কী করে হয়। এত দিন পরে প্রিন্সিপালের টাকা, পঞ্চাশ টাকা বাড়ল মোটে—না, তা হয় কী করে, প্রিন্সিপালের ইনক্রিমেণ্টের অনুপাত ডিঙিয়ে বাড়তে পারে না।'

'সে অনুপাতের আধা-আধিও বাড়তে পারে না। সিকিটাও না। প্রিন্সিপালের পঞ্চাশ বাড়লে দশ-বার টাকার বেশি বাড়তে পারে না অধ্যাপকের'—হিমাংশু চক্রবর্তী বললে।

'তা ছাড়া একজন মাস্টারের মাইনে যদি বাড়ানো যায় তা হলে অন্যেরা কী দোষ করল ?' বঙ্কিম দত্ত জিজ্ঞেস করলেন।

ব্রজমাধববাবু বললেন, 'এমন দশ-পনেরটা কেস আমার জানা আছে হরিলালবাবু যে আপনার পেটোয়া প্রফেসরদের মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছেন আপনি, অন্যদের দাবি উপেক্ষা করে'।

'তাই নাকি ?' ওয়াজেদ আলি সাহেব হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'লিস্ট আছে আপনার কাছে ?'

'আছে। চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট টাকা করে বাড়িয়েছেন, যারা ওর পেটোয়া নয় তাদের গলা কেটে দিনদুপুরে রাহাজানি করে। অনুপাত কষছেন হিমাংশু চক্রবর্তী প্রিন্সিপালের ইনক্রিমেণ্টের সিকির ভাগ দেওয়া হবে বলে এক-একজন প্রফেসরকে। কেন ? হরিলালবাবুর জামাই কামাখ্যা ঘোষালকে ষাট টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হল এক লাফে এক ডাকে। আপনার শালা ধরণী মজুমদারকে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হল কেন হরিবাবুর এক কথায়, সেটা আমাদের খুলে জানাবেন কি চক্কোত্তি মশাই। হরিলালবাবুর গোমূত্র পান করার জন্য আপনারা মানুষ খুন করতে পারেন দিনে-দুপুরে—পৌষমাস করে বেড়াতে পারেন কার্তিক মাসের কুকুরগুলোর মত।'

এক মিনিট-দু মিনিট নিস্তব্ধ হয়ে রইল সব।

'অত কাছে ঘেঁষে বসবেন না ব্রজমাধববাবুর। ওর মুখের লালা কুকুরের লালা হয়ে গেছে, আলি সাহেব। লাগিয়ে দিলে জলাতঙ্কে বিশ্বসংসার ঘুরেও জল তেষ্টার এক ফোঁটা জল পাবেন না। এ কুকুর কি এখনও গভর্নিং বডির মেম্বার থাকবে?' হিমাংশু চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করল হরিলালবাবুকে।

'সে জানে সরমার বাচ্চাকে যারা পাঠিয়েছে তারা—'

ওয়াজেদ আলি সাহেব একটু বিচলিত হয়ে বললেন, 'এ-রকম কথা বলছেন কেন আপনারা? কথাগুলো ভাল হচ্ছে না। এত গালাগালিতেও মোক্ষম হাড়ে বাতাস লাগিয়ে বসে আছেন ব্রজমাধববাবু'—ওয়াজেদ আলি ব্রজমাধববাবুর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন—

'নিশীথ সেন বলেছে যে সোয়া দু'শ-আড়াইশ টাকা মাইনে না-দিলে কলেজে কাজ করবে না সে। দেড়শ পাচ্ছে, দশ টাকা বাঁড়ানোও সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। নিশীথবাবু মাইনে বাড়বার কোন সম্ভাবনা না দেখে এক মাসের ছুটির দরখাস্ত করেছে। কিসের জন্যে ছুটি চাচ্ছে সেটা দরখাস্তে খুলে জানায় নি, কোনো ডাক্তারের সার্টিফিকেটও দেয় নি, ক্লাশ নিচ্ছে না, ঘুরে বেড়াচ্ছে' —হরিলালবাবু বললেন।

'দরখাস্ত কি মঞ্জুর হয়েছে?'

'না'।

'মঞ্জুর যে হয় নি তা কি সে জানে?'

'সে তো কলেজেই আসে না, কে জানাবে তাকে?'

'কী মতলব নিশীথ সেনের?' আলি সাহেব বললেন।

'কে জানে। কলেজে কাজ করবে না হয় তো আর। আমরা তার দরখাস্ত ছিঁড়ে ফেলেছি—'

'কেন?' ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ব্রজমাধববাবু।

'ও-রকমভাবে কে কবে দরখাস্ত দেয়? সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার না করে বোকার মত দরখাস্ত লিখলে—অন্তত ডাক্তারের সার্টিফিকেট না দিয়ে সেটা পেশ করবার মানে কী?'

'তাই বলে দরখাস্ত ছিঁড়ে ফেলবেন আপনি! মামুলি দরখাস্ত করেছে, কী তার মানে, সেটা আপনার বোধগম্য হয়েছে কি না, কমিটিকে না দেখিয়ে কী করে ঠিক করবেন তা? সেটা কমিটিতে পেশ করতে হবে। কমিটি বিচার

করবে। আপনি কে? নিজেকে কী ভাবছেন আপনি?'

'কিছু মনে করি নি। ওটা ছিঁড়ে ফেলেছি আমি।'

'ছিঁড়ে ফেলেছেন? কমিটির মিটিঙে পোষ্ঠাম বাবার খাসির মত ছিঁড়ে ফেলা হবে।'

'কাকে?'

'আপনার এই বেকুবিটাকে।'

'নিশীথবাবুকে ছুটি দেওয়া হবে না। ছুটি যে দেওয়া হবে না সে কথা সে নিজে এসে জানতে না চাইলে জানানো হবে না তাকে'—কালীশঙ্কর বললেন।

'কী করে জানবে? সে তো কলকাতায় চলে গেছে।'

'জানি না। আমাদের জিজ্ঞেস করে যায় নি।'

'দরখাস্ত তো দিয়ে গেছল।'

'কতবার বলব আপনাকে ব্রজমাধববাবু, যে সেটা কানকাটা দরখাস্ত—'

'কার কানকাটা—দরখাস্তের, না যাকে দরখাস্ত করা হয়েছে তার, সেটা কমিটি দেখেশুনে ঠিক করবে'—ব্রজমাধব বললেন।

'নিশীথ সেনকে ছুটি দেওয়া হবে না ওয়াজেদ আলি সাহেব। ছুটি না পেয়েও যদি কলেজে না আসে তা হলে তার চাকরি থাকবে না।'

'চাকরি থাকবে না? কুড়ি-বাইশ বছর এ কলেজে কাজ করছেন তো নিশীথবাবু। চাকরির উপর হাত দেয়া—ওটা জবরদস্তি হল'—ওয়াজেদ আলি বললেন, 'নিশীথবাবু যদি কলকাতায় গিয়ে থাকেন তা হলে তাঁকে ব্যাপারটা খুলে জানিয়ে দেওয়া হোক। লিখে নিন আপনি কালীশঙ্করবাবু। নিশীথবাবুর চিঠি না পেয়ে কিছু করতে যাবেন না'।

'কমিটির মিটিং হলে তবে তো লিখব। নিশীথবাবুর দরখাস্ত দেখে কমিটি কী ঠিক করে কে জানে। হয় তো সাসপেণ্ড করবে। হয় তো বরখাস্ত করবে। ছুটি না-নিয়ে কলকাতায় চলে গেল; জবরদস্তি কে করছে—নিশীথবাবু না আমরা?' কালীশঙ্করবাবু বললেন।

'সেটা কলেজ কমিটির মিটিঙে বোঝা যাবে'—অমায়িক মুখে তবুও গম্ভীরভাবে বললেন ওয়াজেদ আলি, 'রবিবার তো মিটিং, হরিলালবাবু?'

'হ্যাঁ, ওয়াজেদ আলি সাহেব, আপনাদের কাছে দরকারি চিঠিপত্র আজকালই

যাবে।'

'কিন্তু এ রববার তো এখানে থাকা হবে না আমার—'

'কেন?'

'শুক্রবার ঢাকা যাচ্ছি। দিন সাতেক থাকব। ফিরে আসতে শুক্র-শনি হয়ে যাবে। এর পরের রববার মিটিং করলে হয় না?'

'সব ঠিক হয়ে গেছে তো। কালেক্টর সাহেব তাঁর বাংলোতেই মিটিং বসাবেন বলে দিয়েছেন। এ রববারের পরের রববারে তো তিনি থাকবেন না জলপাইহাটিতে। ওঁর তো মোটেও ফুরসুৎ নেই—মোটেই পাওয়া যায় না মকবুল চৌধুরী সাহেবকে। ওঁকে বাদ দিয়ে—'

'না, না, সাহেবকে বাদ দিয়ে হয় কি? থাকেন তো না বেশি মিটিঙে। যখন নিজে রাজি হয়েছেন নিজের বাংলোতে, আচ্ছা দেখি আমি, দু দিন পিছিয়ে ঢাকায় গেলে চলে কি না, আচ্ছা দেখি—'

সবাইকে আদাব জানিয়ে, হেসে, ছাই বেশ জমে উঠেছে চুরুটে দেখতে-দেখতে, বেরিয়ে গেলেন ওয়াজেদ আলি সাহেব।

নিশীথ বিকেলের স্টিমারে কলকাতায় রওনা হয়ে গেছে সেই রাতেই। সাড়ে দশটা এগারোটার সময় হারীত আস্তে-আস্তে এসে নিজেদের জলপাইহাটির বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়ে দু-চারবার আলগোছে কড়া নেড়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

'কে? কড়া নাড়ছে কে?' ভিতর থেকে বলল সুমনা।

'আমি, খুলে দাও।'

সে কথা কানে গেল না সুমনার। বললেন, 'মানুষ বিদেশে চলে গেল, আর রাত দুপুরে এসে দরজায় কড়া-নাড়া—কে তুমি?'

'আমি। খুলে দাও না দরজা।'

'আমি কে রে?'

'আমি হারীত।'

কী বলছে পরিষ্কার শুনতে না পেয়ে সুমনা বললেন, 'হারীতের গলা পাচ্ছি না? হারীত এসেছে না কি? কে রে বাইরে—হারীত না কি?' বলতে-বলতে দরজা

খুলে দিলেন সুমনা।

'বাপ রে, এ যে হারীত। কোত্থেকে এলি তুই ?'

'বাবা বাড়ি আছেন ?'

'এই তো চলে গেলেন আজ।'

'কোথায় ?'

'কলকাতায়। অনেক চিন্তা মাথায় নিয়ে চলে গেলেন আজ।'

'কেন, কলকাতায় কেন ? কিছু খাবার আছে ?'

'কিছু নেই'—সুমনা অসহায়ের মত চারদিকে তাকিয়ে বললেন।

'কিচ্ছু না ?'

'না। খুব ক্ষিদে পেয়েছে কি তোর? আমি মহিমবাবুদের ওখান থেকে কিছু—'

'না না, সে-রকম ক্ষিদে-টিদে পায়নি কিছু। ওদের ঘুম ভাঙাবার দরকার নেই। এ-রকম চেহারা হয়ে গেছে কেন তোমার ? অঘ্রাণ-পৌষ মাসের দিঘির জলের উপর দিয়ে তরতর করে হেঁটে যায় যে এক রকম বড়-বড় মাকড়সা, হাত-পা সব আঁশের মত, এত ফিনফিনে সেই মাকড়গুলো যে মনে হয় এদের পায়ের নীচের জল মলিদার মত পুরু, ভারী, সেই মাকড়সা হয়ে গেলে তো তুমি মা' —বলে হারীত সুমনার কাঁধে হাত রেখে বিছানার উপর বসিয়ে দিল তাকে, নিজে বসল, বসে মায়ের বুকে মুখ গুজে রাখল।

আস্তে-আস্তে ছেলের মাথাটা সরিয়ে দিলেন সুমনা। বললেন, 'কেমন ধড়ফড় করছে আমার শরীর। ছেলেমেয়েদের দেখলে, তাদের কথা ভাবতে গেলে, কেমন হয়ে যায় যেন সব—হার্টে গিয়ে লাগে।'

'তোমাকে এ অবস্থায় ফেলে কলকাতায় গেলেন বাবা ?'

'তুমি তো এসেছ।'

'আমার তো আসার কথা ছিল না।'

'বাবা চলে গেলেন, তুমিও এলে; কোথায় ছিলে তুমি হারীত; জলপাইহাটিতে ?'

'এই তো আজ জলপাইহাটিতে এলুম। এতদিন কলকাতায় ছিলুম।'

'কলকাতায় ছিলে ?'

'এই তো আজ এলুম।'

'সত্যি কলকাতায় ছিলি তুই ? এমন টাইম ঠিক করে এলি কী করে ? উনি

গেলেন, তুই এলি', সুমনা বললেন, 'আমার বিশ্বাস হয় না, তুই এখানে ছিলি না।' গলা ছেড়ে হেসে উঠতে চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু হাসি হল না। কেমন একটা বিষম আওয়াজ বেরুল। সে স্বর শুনে আশেপাশে কেউ থাকলে লাফ দিয়ে উঠে এসে বলত, ওরে বাবা এ আবার কী হল ?

'আস্তে মা, সোর করো না। মহিমদের ঘুম ভেঙে যাবে। আমি জানলার ফাঁক দিয়ে দেখে এসেছি স্ত্রীকে জড়িয়ে ঘুমিয়েছে মহিম।'

'আরে নচ্ছার, তুই কত কী দেখলি, কত চুকলি কাটলি। নে হাত-পা ধুয়ে আয়। এখন ঘুমোবি তো ? না কিছু খাবি ?'

'এই যে বললে কিছু খাবার নেই—'

'নেই তো। কিন্তু মতিলালের দোকানে কিছু মুড়ি-বাতাসা পাবি ?'

'এত রাতে ?'

'টেমি জ্বলছে না, এই তো দেখছিলুম ?'

'ঝাঁপ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি দেখে এসেছি।'

'কী হবে তা হলে ?'

'কিচ্ছু হবে না, জল খাব।'

পকেট থেকে সিগারেট বের করে নিয়ে হারীত বললে, 'এটা খেতে দেবে ?'

'কিছু যখন নেই খাবার, তখন না খাবি তো করবি কী রে বাছা—'

'তোমার সমুখে তামাক খাই নি কোনো দিন আমি। তুমি এ-সব পছন্দ কর না জানি। কিন্তু আজ তো ধোঁয়া ছাড়া খাবার কিছু নেই। এটা খেতেই হবে—'

কিন্তু তবুও সিগারেট না-জ্বালিয়ে পকেটের ভিতর ফেলে রেখে দিল হারীত। সুমনা তাকিয়ে দেখলেন, কিছু বললেন না। একটা কাঁসার গেলাস দিয়ে জলের কুঁজো ঢাকা ছিল, তিন-চার গেলাস জল খেয়ে কুঁজোয় একটা ঝাকুনি দিয়ে হারীত বললে, 'কিচ্ছু নেই তো আর, এর পর জলতেষ্টা পেলে কী হবে ? তুমি কী খাবে ?'

'আমার তেষ্টা পায় না, তোর তেষ্টা পেলে মহিমবাবুদের কলসির জল খেয়ে নিস—শোবার ঘরের দরজা আবজানো আছে ওদের।'

শুনে মহিমবাবুদের জলভরা কলসিটা নিয়ে এল হারীত। বললে, 'এতেই হবে। কাল খুব ভোরবেলা দোয়েল শিষ দেবার আগে শ্যাওড়া তলায় আছাড় মেরে ফেলে আসব কলসিটা। সারাটা দিন অর্চিতা মাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে-

তাকিয়ে দেখব কী ভাবে। কী নাম ওর অর্চিতা না অর্চনা?'

'অর্চনা।'

'তবে অর্চিতা ডাকে কেন?'

'সে তোমার বাবা ডাকে।'

'কেন?'

'নানা ফিকিরে মানুষের সঙ্গে একটু টিটকিরি-পিচকিরি কেটে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা রাখে, কথা বলে, কথা বলে, কথা বলে, বাপরে। কাজ করে বটে কথা থামিয়ে, না হলে মাস্টার বলে? মেশে মেয়েদের সঙ্গে, কিন্তু আর-একটু বেশি মেয়ে-ঘেঁষা হলেই অর্চনা ওকে ধরে ফেলেছিল।'

'কলকাতায় গিয়ে থাকবেন কোথায়?'

'জিতেন দাশগুপ্তর ওখানে।'

'কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে গেছেন?'

'ছুটির দরখাস্ত করে গেছেন। বলেছেন জলপাইহাটিতে ফিরবেন না আর, কলেজে কাজ করবেন না আর।'

'কাজ করবেন না, ফিরবেন না, তা হলে তোমার কী হবে?'

'আমার কী হবে সেটা ঠিক করবার জন্যেই তো তুমি এখানে এসেছ হারীত। কে তোমাকে টেনে আনল? যে-রাতে উনি চলে গেলেন, সেই রাতেই তুমি এলে এটা কেমন হল?'

এটা ঠিকই হল, তবে জিনিসটা আশ্চর্য কিছু নয়, তুমি তা মনে করতে পার, কিন্তু নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। অসাধারণ কিছু নেই পৃথিবীতে, থাকলে মন্দ হত না। কিন্তু, তার [?] চিন্তার সম্পর্কে বেশি কথা বলতে রাজি ছিল না তার মন আজ এই রাতে, সুমনার মত অসুস্থ সেকেলে আই-এ পাশ স্ত্রীলোকের সঙ্গে। 'আমি এসে পড়েছি বটে, কিন্তু দু-তিন দিন মাত্র থাকবার জন্যে এসেছিলুম, কলকাতায় এখন আমাদের খুব কাজ', হারীত বললে।

'কিসের কাজ? তুমি চাকরি কর?'

'না, আমরা একটা পার্টি গঠন করেছি—'

'কিসের পার্টি? দেশ তো স্বাধীন হয়েছে—'

সুমনাকে সব কথা বলবার দরকার নেই হারীতের; সুমনা শুনতেও চায় না। বলছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। হারীত অঘ্রাণ-পৌষ মাসের দিঘির মলিদার

মতন টলটলে জলের উপর সেই বড়-বড় ফিনফিনে মাকড়ের হাত-পা-মাথা-পেট দেখতে লাগল মার দিকে তাকাতে-তাকাতে। স্বাধীন হয়ে মার তো এই হয়েছে! স্বাধীনতার জল-বাতাস লাগতেই হরিলালবাবুর কলেজের কাজে হয়ে গেল বাবার, একটা দরখাস্ত মেরেই ছুটলেন তিনি কলকাতায়। কলকাতায় স্বাধীনতার আড়ে-দিঘে, সমস্তটা বালি-ধুলো হলকা-হাঁফের মিঠে চাকলি খেতে-খেতে, ঐ লোকটার হাড়গোড় যদি কালচে হয়ে পড়ে না থাকে সেই দুর্দান্ত মরুভূমিতে, তবে কী বলবে হারীত। এ তো স্বাধীনতার কলির সন্ধ্যে।

সুমনার হাত-পায়ে কেমন একটা শাঁখচুন্নি যেন নড়ে-চড়ে উঠছে ঘরের ভিতর। ঘরে কোনো রেড়ি-কেরোসিনের আলো নেই, চাঁদের আলো আছে, দেওয়ালের উপরের দিকে ভাঙা খলফার বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসছে। এত গরমের রাতে ঘরের দরজা-জানালা সুমনা বন্ধ করে দিয়েছে সব।

'শরীরে রক্ত নেই তোমার, তাই ঠাণ্ডা লাগে বুঝি সব সময়?'

'কেন? কী হয়েছে? ঠাণ্ডা দেখলে কোথায়?'

'দরজা জানলা সব বন্ধ করে বসে আছ কেন? আমি জানলা খুলে দিচ্ছি—'

'চোর আসতে পারে কিন্তু হারীত।'

'আসুক। কী নেবে?'

সুমনাকে নিশীথ দেড়শ টাকা দিয়ে গেছে, তা দিয়ে দু-তিন মাস সংসার চালাতে হবে। সে-টাকাটা সে লুকিয়ে রেখেছে ঘরের কোনো এক জায়গায়। চোর ঢুকলে অবিশ্যি বার না করে ছাড়বে না। বলবে কি সুমনা হারীতকে সেই টাকাগুলোর কথা? আজ থাক; রাতের বেলা টাকাকড়ির কথা বলতে নেই।

'তুমি কম্যুনিস্ট হয়ে গেছ হারীত?'

তিন-চারটে জানালা খুলে হাওয়ায় একটু ঢুলছিল হারীত বিছানার এক কোণায়; সব কথা কানে গেল না তার।

'বলি, ও হারীত। হারীত।'

'কেন, বল।'

'শুদোচ্ছিলুম তুমি কি কম্যুনিস্ট হয়ে গেলে?'

'কম্যুনিস্ট? না। আমাদের আর-এক পার্টি।'

'কী নাম তার?'

'কোনো নাম নেই', হারীত বললে, 'বলতে পার সোস্যালিস্ট, কিন্তু কংগ্রেস সোস্যালিস্ট না। আরো আট-দশ রকমের সোস্যালিস্ট পার্টি দেখা দিয়েছে। 'এ'র থেকে 'জেড' অব্দি ইংরেজি অক্ষর সাবাড় হয়ে গেছে পার্টিগুলোর নাম দিতে-দিতে। কাজে-কাজেই আমরা আর-কোনো বর্ণমালা ব্যবহার করব না, কোনো নাম দিচ্ছি না পার্টির—'

'পার্টি শব্দটাও উঠিয়ে দাও। ও শব্দটা শুনলেই আমার কেমন লাগে। আমাদের গণেশ দিনরাত পার্টি-পার্টি বলে মাথার পোকা খসিয়ে ছাড়ত মানুষদের। বিভাকে নিয়ে পালাল। টাকার খাঁকতি পড়তেই বিভা আর ছেলেকে ফেলে পার্টি ক্যাম্পে আছে, অনুকণা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে সহবাস করছে, কেউ কিছু বলছে না।'

'তুমি এত কথা জানলে কী করে?'

'অর্চনা আমাকে বলেছে।'

'অর্চনামাসি জানল কী করে?'

'আমি জানি না। তুমি শুনেছ এ-সব?'

'না।'

'রাজনীতি করছ, টাকা পাচ্ছ কোথায়? খেতে পরতে দেয় কে?' সুমনা বললে, 'বলি অ হারীত, হারীত, হারীত!'

'কী গো?'

'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? চাকরি করছ না, টাকা পাচ্ছ কোথায়? খাওয়াচ্ছে কে?'

'আমার একা খাওয়ার জন্য আমি কিছু রোজগার করি। ছেলে পড়াই, লিখি, মাঝে-মাঝে বাস কণ্ডাক্টারি করি, মোটর ড্রাইভারি শিখছি। কেরানিগিরি গোলামি-টোলামি করব না আমি।'

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সুমনা বললে, 'গোলামি করেই তো তোমার বাবার এই দশা হল। এর চেয়ে ঠিক সময়ে কলকাতায় গিয়ে মোটর ড্রাইভারিও যদি শিখতেন। নিজে, পরে, ট্যাক্সি চালিয়েও যদি থাকতেন কলকাতায়, কত স্বাধীনতায় মর্যাদায় কলকাতায় থাকতে পারতাম আমরা'।

'তুমি কী করে জানলে এ-সব', হারীত একটু তামাসা বোধ করে। সুমনার দিকে তাকাল।

'মাঝে-মাঝে হিতেন এসে বলে ; এই কলেজের ফোর্থ ইয়ারের হিতেন। তোমার বাবার খুব ভক্ত। আমাদের ভালটা দেখে, ভাল করে, ভাল চায়, হিতেন, তা ট্যাক্সি চালালে ঐ রকমই নাকি, হারীত ?'

'হ্যাঁ, প্রফেসারির থেকে ঢের বেশি পাওয়া যায়। হরিলালের মুখনাড়া খেতে হয় না—'

'কি ছেলে, হবে নাকি তুমি ট্যাক্সি ড্রাইভার ? না গভর্নমেন্টের বড় চাকরি করবে ? দেশ তো স্বাধীন। তোমার বাবাকে রেহাই দেবে কে ?'

হারীত দেয়ালে ঠেস দিয়ে জানলার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। একটা সাদা বেড়াল চলে গেল ; সজনে গাছে, আমলকী গাছে বেশ দেখাচ্ছে বাইরের জ্যোৎস্না ; আমলকীর ডালে সাদা বেড়ালটা যেন বসে আছে, না ওটা তো চাঁদ ; বেশ ভারী, খুব বড, ওটার চাপ বোধ করতে পারা যায় যেন, সাদা স্নিগ্ধ ওর রোঁয়ার হৃদয়ে চোখ বুজে ঘষে সাদা কাবলি বেড়ালের অনাদি প্রতীকের মত ওর উজ্জ্বল সত্তাকে বেশ ভাল লাগে।

'আমাদের কলকাতায় নিয়ে যাবে কবে ? হারীত ?'

মার কথার কোনো জবাব দিচ্ছিল না, হারীতের মুখে এ-সবের কোনো উত্তর জোগাচ্ছিল না। বাবাকে রেহাই দেবে, মা-দের কলকাতায় নিয়ে যাবে, এ-জন্য তো তার জীবন নয়। তার মা-বাবার চেয়েও ঢের হয়রান লোক আছে পৃথিবীতে। ব্যক্তিবিশেষকে নিস্তার দিতে হলে সেই সব ব্যক্তিদেরই প্রথম সুবিধা করে দিতে হয়। তার মার চেয়ে তাদের কি বেশি ভালবাসে সে ? ভাল সে কাউকেই বড় একটা বাসে না, মানুষের কষ্ট দেখেও প্রায়ই সে বিচলিত হয় না, তবে ছোটদের উপর বড়-বড় খিঙ্গি লোকদের অত্যাচার সে হজম করতে পারে না। বোকা দুর্বল মানুষ কষ্ট পাচ্ছে বলে ততটা নয়, কিন্তু কেবলি টাকাকড়ি, ভুয়ো প্রসার-প্রতিপত্তি, কতকগুলো লোককে লুটতরাজে মাতিয়ে রাখছে অন্যদের থেঁতলে ফেলে—এ-সব সে সহ্য করতে পারে না। পৃথিবীতে ভাল রক্ত আসুক—দরকার হলে খুব কঠিনভাবে নিকেশ করে দিয়ে যা খারাপ আছে তাকে। আসুক ভাল তেজ, সহনশীলতা, আলো।

'বলি, তোমার বাবাকে রেহাই দেবে না ?'

'তাঁর নিজেরই হাত-পা আছে—'

'তা তো আছে। তা দিয়ে জলপাইহাটির কলেজ করা হল আদ্দিন। এখন

এ বয়সে কলকাতায় গিয়ে গাড়ি চাপা পড়বে, না, চাকরি করে পরিবার খাওয়াবে ?'

'তা পারবে। দেশ স্বাধীন হয়েছে', কেমন কঠিনভাবে বললে যেন হারীত ; কথার মধ্যে রসকষ, বিবেচনা, দয়া কিছুই নেই যেন। অথচ এও মনে হয় যে বয়ে যাওয়া খারাপ ছেলে নয়, জিনিস আছে, কিন্তু খুব দূরের জিনিস—সুমনা, নিশীথ বা এই পুরুষেরও কাজে লাগবার জিনিস নয়, কোন পুরুষে লাগে কে জানে, এক-আধজন ব্যক্তি নয়, সমস্ত ব্যক্তিরই যাতে সুবিধা সক্ষমতা হয় সেই দৃঢ়তার আবছা কাজে মন ডুবে গেছে তার, ঈশ্বর থেকে আরম্ভ করে মহাত্মা মোহনদাস পর্যন্ত যা পারলেন না সেই ভীষণ কাজে আরো কত শত-সহস্র বছরের ধোঁয়া-শূন্যতার ভিতর এক ফোঁটা রক্ত, এক কণা শিশিরের মত হারীত। সাজিয়ে গুছিয়ে না, কেমন বিশৃঙ্খল ভাসা-ভাসা ভাবে এই কথাগুলো বোধ করতে লাগল।

হারীত এসেছে, কিন্তু মার জন্যে কোনো টান নেই তার, ভানুর কথা জিজ্ঞেস করছে না, রানুর কথা না। লিকলিকে রেখায় দাগড়া-দাগড়া খাঁজে কপালটাকে অন্ধ করে, কালো মুখে, জানালার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আছে। এর চেয়ে ওর বাবাকেও তো বেশি সরেস, বেশি তরুণ দেখায়।

'ভানুর খোঁজ খবর রাখিস ?'

'ভানুর তো থাইসিস হয়েছিল।'

'হ্যাঁ। তারপর কী হয়েছিল বলতে পারিস ?'

'না তো। কোথায় আছে ভানু ? মরে গেছে বুঝি ?'

সুমনা কিছু ক্ষণ নিরেট হয়ে বসে থেকে বললে, 'তাই বুঝি মনে হয় তোর ?'

অনেক চিন্তা করছিল এত ক্ষণ হারীত। সুইচ পুড়ে যাওয়া বাল্বের মত হয়ে গেছে সে সব ; সেটাকে খসিয়ে ফেলে দিয়ে মার দিকে তাকিয়ে বললে, 'ভানু মরে যায় যদি, কী করতে পারবে তোমরা। কলকাতায় কত থাইসিসের রোগী—কেবলই তো মরছে। কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না তো।'

'তা তো পারছে না। কিন্তু ভানু বেঁচে উঠছে।'

'বেঁচে উঠছে ? কোথায় ?'

'কাঁচড়াপাড়া হাসপাতালে—'

'ও, সেই থাইসিস হোমে। বেঁচে উঠল বুঝি ? কে বললে তোমাকে ?'

'কেউ না। আমার মন বলছে।'

'তোমার মন বলছে। তবেই হয়েছে', হেসে উঠল হারীত।

যেন কিছু হয় নি, কিছু হলেও কিছুই হয় না এমনি অস্বাভাবিকভাবে হারীত হাসছে, কথা বলছে।

সুমনার নাড়ী ছিঁড়ে হারীত একদিন বেরিয়েছিল। সেই ছেঁড়ার ব্যথাটাকে টেনে হিঁচড়ে টনটনিয়ে দিতে এসেছে হারীত।

'রানু-ভানুর কথা বলিস? ভাবিস ? যে ওরা তোকে আসকে পিঠে পুড়িয়ে এনে খেতে দিয়েছে ? কোনো দিনই ভালবাসতি না তো আসকে পিঠে। কিন্তু রানু-ভানু কি তোর নিজের নয় ?'

'রানু কোথায় ?'

'কোনো খোঁজ নেই।'

'আর-কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না তাহলে—'

'তুই তো কলকাতায় থাকিস, খুঁজে দেখছিস না ?'

'কলকাতায় আছে তোমাকে কে বললে ? যদিও বা থাকে এক কণা ভুষি হারিয়ে গেলে কি এক মাঠ ভুষির ভিতর থেকে তা তুমি খুঁজে বের করতে পারবে ?'

হারীতের কথা শুনে ব্যাপারটার অদ্ভুত রকমটা সুমনার চোখে ভেসে উঠল। একটা ছেঁড়া ঠ্যাঙের মত পড়ে থেকে আস্তে-আস্তে বুকের কঙ্কালে হাত বুলোতে-বুলোতে থেমে রইল।

'মসজিদে দেখেছিস ?'

'কোথাকার মসজিদে ?'

'কলকাতায়—'

'কোন মসজিদে ?'

'নাখোদায়—'

শুনে ঝুম মেরে হারীত সুমনার দিকে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ। 'কে বোকা বলে তোমাকে এই সব, হিতেন বলেছে ?'

'না, অর্চনা—'

'অর্চনামাসি', হারীত একটু চুপ করে থেকে বললে, 'ঐ মহিমের সঙ্গে থেকে-থেকে মাসি মরছে। না হলে কখনো এই রকম কথা বলে ?'

‘কোথায় আছে রানু তাহলে ?’

‘ঐ তো ভুষির কথা বললাম।’

সুমনা একটু ক্ষেপে উঠে যেন বললে, ‘তোর এত বড় বাড়! তুই কি হয়েছিস কী ? যা তুই বেরিয়ে যা। তোর মুখ দেখতে ভাল লাগে না আমার। বেরিয়ে যা তুই। বেরিয়ে যা। বেরো আমার বাড়ির থেকে। জোচ্চোর বেল্লিক শয়তান কোথাকার।’

মুখে রক্ত উঠবার উপক্রম হল সুমনার। কিন্তু মাকে শান্ত ঠাণ্ডা করবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না হারীতের দিক থেকে।

সে বিছানার থেকে সরে দাঁড়াল—দরজা খুলে বেরিয়েই গেল—অন্ধকারের ভিতর—যে-পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথে।

সারা রাত একা কাতরাতে-কাতরাতে শেষ রাতে বাস্তবিকই যেন দিঘির ঠাণ্ডা মাংসের মত জলের উপর দিয়ে ফিনফিনে হাত-পায়ের একটা মাকড়ের মত চলে গেল, মিশে গেল, বন-জঙ্গলের অন্ধকারের কবেকার কী সে, পৃথিবীর অখণ্ড মাকড়ের জালের মত সুমনা।

শেষ রাতে জল খেতে উঠে অর্চনা দেখল যে জলের কলসি ঘরে নেই ; রান্নাঘর ঘুরে এল। কোথাও নেই কলসি। তবে কি চোর ঢুকেছিল ঘরে ? শুধু কি কলসির জল খাবার জন্যই ঢুকেছিল, তাই নিয়ে পালিয়ে গেছে ?

সুমনার ঘরের দিকে গেল অর্চনা। আজ বিকেলে নিশীথ চলে যাওয়ার পর সুমনার ঘরে অনেকক্ষণ ছিল সে ; প্রায় রাত এগারটা অব্দি ছিল। তারপরে মহিম তাকে ডেকে নিয়ে গেছে। কথা ছিল মহিমের সঙ্গে প্রথম রাতটা অর্চনা নিজের ঘরে ঘুমিয়ে নিয়ে, রাত একটা-দেড়টার সময়ে সুমনার কাছে ফিরে আসবে। একা মানুষ, রোগী মানুষ সুমনা, তার কাছে লোক থাকা চাই। নিশীথও বলে দিয়ে গেছে, সুমনা যেন রাতে একা না থাকে অর্চনা, তুমি থেকো, যদি মহিম তোমাকে মাঝে-মাঝে ছেড়ে দেয়। না হলে রাজেনের মাকে রেখো। অবসর পেলেই অর্চনা নিজের বালিশটা কাঁধে করে এনে সুমনার খাটে শুয়ে থাকবে—ফাঁকে-ফাঁকে শোবে ; যতদূর সম্ভব দুপুর রাতের পাড়িটা সুমনাদির সঙ্গে কাটিয়ে দেবে সে। রাজেনের মার সঙ্গেও কথা বলা হয়েছে ; পাঁচ টাকা চেয়েছিল এ জন্যে, তিন টাকায় রাজি করানো গেছে। কাল থেকে শোবে। রাজেনের মা থাকলে অর্চনার নিজের ঝুঁকিটা

অনেক কমে যাবে ; নিজের সুবিধা মত তা হলে সুমনার কাছে আসবে সে। কোনো-কোনো রাতে একেবারে না এলেও চলবে হয় তো। আজ রাতে অবিশ্যি রাজেনের মাও ছিল না, সে নিজেও কেমন বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়েছে প্রায় সমস্তটা রাত ; কোথায় জলের কলসি—কী হল সুমনাদির—অর্চনা ঘুমের আবেশ থেকে নিজেকে খসাতে-খসাতে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সুমনার ঘরের ভিতর গেল। ঘরের ভিতর ঢুকে বিছানার কাছে গিয়ে দেখল মানুষটা কেমন নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে, হাত-চুল-কাপড়-ঠ্যাঙের দিকে তাকালে মনে হয় মরে গেছে যেন। কেমন ভেঙে গেছে নাক। মরে গেছে কি ? অর্চনা আস্তে-আস্তে সুমনার হাতটা তুলে নিল—উঃ কী ভীষণ ঠাণ্ডা, যেন লিকলিকে সাপে ছোবল দিয়ে ঠাণ্ডা বিষ ঢেলে দিয়েছে সুমনার প্রাণের ভিতর।

'মরে গেল দিদি। মরাই ভাল। বড় কষ্ট পাচ্ছিল। নিশীথদার থাকা উচিত ছিল জলপাইহাটিতে। সুমনাদির এ-রকম অবস্থায় কলকাতায় যাওয়ার কোনো মানেই হয় না তাঁর।

অর্চনা হয় তো কাতর না হয়ে বিছানার পাশে বসে ভাল করে বুঝে নিচ্ছিল সুমনার নাড়ী। না, মরেছে বলে মনে হচ্ছে না, অনেক ক্ষণ নাড়ী হাতে বসে থেকে মনে হল যেন অর্চনার। তিরতির করছে নাড়ী। মেয়ে মানুষের প্রাণ, কি সহজে যায় ? যাবেই বা কেন ? নিশীথ চলে যাবে আর সুমনা মরে যাবে—সেই রাত্রেই ? একটা কথা হল ? কী ভাববে নিশীথ। তাড়াতাড়ি অর্চনা কাজের দিশপাশ স্থির করে ফেলল—মহিমকে অবিলম্বেই পাঠিয়ে দিল মজুমদার ডাক্তারের কাছে। তাঁকে না পেলে যে-কোনো কেজো ডাক্তারকে নিয়ে আসবে। তাড়াতাড়ি স্টোভ জ্বালিয়ে সেঁক দিতে লাগল, কী একটা কবিরাজি ওষুধ ব্যবহার করল অর্চনা ( জিনিসটা হাতুড়ে হয়ে যাচ্ছে : নিশীথ, হারীত, বা সুমনা নিজেও, পায়ে দাঁড়ানো থাকলে, বলে দিত অর্চনাকে )। সাড়া পাওয়া গেল, স্টোভে দুধ গরম করে দু-চামচ দেওয়া গেল।

সাড়া পাওয়া গেল বটে, কিন্তু কোনো শব্দ নেই, চোখ মেলানো যাচ্ছে না, শরীরের ঠাণ্ডা ভাবটা যেমন তেমনই।

মরে কি যাচ্ছে ? এখনও মরে নি, কিন্তু আস্তে-আস্তে মরে যাচ্ছে কি ?

ডাক্তার মজুমদার এসে তাড়াতাড়ি নানা রকম পরীক্ষা করে বললেন, 'না, ভয়ের নেই কিছু। কিছু না, কিছু হবে না। ঠিক আছে।'

ঐ রকম কথাই সব সময়েই বলেন মজুমদার সাহেব। যে-রোগী পাঁচ মিনিট পরে মরে যাবে তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়েও বলবেন ঠিক আছে সব, কিছু হয় নি, ঠিক আছে। এ রকম কত বার কত জায়গায় অর্চনা দেখেছে ডাক্তার মজুমদারকে 'ঠিক আছে' বাৎলাতে; বিশেষত সদর হাসপাতালে। জলপাইহাটির সদর হাসপাতাল সংক্রান্ত মেয়েদের একটা বড় কমিটির মেম্বার অর্চনা। অনেক সময় তাকে সভা সমিতি তত্ত্বাবধান, তদারকের ব্যাপারে হাসপাতালে যেতে হয়। দশ-বার বছর ধরে যাচ্ছে সে। কত রোগীকে কত ওয়ার্ডে মরতে দেখল সে ডাক্তার মজুমদারের 'ঠিক আছে' কথামত কানপ্রান ভিজিয়ে নিয়ে। মৃত্যুর সময় কোনো মন্ত্র হিসাবে ডাক্তার সাহেবের 'ঠিক আছে'-র খুব একটা মূল্য আছে বটে, বেশ একটা আশ্বাস উপকার আছে, মরুক্কে রোগীর পাশে মজুমদারের দাঁড়িয়ে থাকা শান্ত ব্যক্তিসত্তার; অর্চনা নিজেও যেন এই ভদ্রলোকটাকে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে মরতে পারে।

'ঠিক আছে'? ঠোঁটে আঁচল রেখে জিজ্ঞেস করে অর্চনা।

ডাক্তারের কী সব প্রক্রিয়া চলছিল—ইনজেকসন দিয়েছে নাকি? না, কী করেছে? করছে? ডাক্তার তার সাত ফুট লম্বা শরীরের চওড়া পিঠ ও নীচে প্যাণ্টের পাহাড় প্রমাণ মাংস দিয়ে সুমনাকে একেবারেই আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল; ডাক্তারের পিছে দাঁড়িয়ে কিছুই দেখছিল না অর্চনা। বাইরে খড়মের শব্দ হচ্ছিল মহিমের: পায়চারি করছে। ভিতরে ঢুকতে সাহস যে নেই তার তা নয়, রুচি যে নাই তা নয়, তবে কী হবে ঢুকে—মজুমদার আছে—কাছে অর্চনা আছে; একা এক-শর মত। ডাক পড়ে যদি ভিতরে তা হলে ভিতরে যাবে মহিম; ওষুধ আনতে হলে নণ্টুকে পাঠাবে; গুরুতর কিছু ঘটে থাকলে—

যদি সত্যিই তেমন কিছু হয় তা হলে আজ আর কলেজে যাওয়া হবে না। এমনও হতে পারে যে কিছুক্ষণ পরে খাট নামাতে হবে বাইরে, লোকজন, জিনিসপত্র, কাঠ-চন্দনের ব্যবস্থা করতে হবে।

জেগে উঠে হাত-মুখ ধোয়ার অবসর পায় নি মহিম, ঘাটের দিকে যাবার সুযোগ নেই এখনো; কখন কী হয়ে যায়। যদি খারাপ কিছু না হয় তাহলে ঐ নিমগাছটার থেকে, ঐ যে কাকে বাসা বেঁধেছে ঐটের থেকে, একটা কচি ডাল পেড়ে দাঁতন করবে সে, নিমের পাতাগুলো অর্চনাকে ভাজতে দেবে—

কলেজের কাজে ও-রকম নিরুৎসাহ হয়ে পড়াটা ঠিক হয়েছিল কী ? ছুটি যখন কিছুতেই দিতে চায় না ওরা তখন ছুটির দরখাস্ত দিয়ে কালীশঙ্কর আর হরিলালকে চটানো, সুমনাকে এ-রকম অবস্থায় ফেলে কলকাতায় যাওয়া ঠিক হয় নি নিশীথের। হারীত কোথায় ? গাল ফুলিয়ে নিশীথের জীবনের গোলকধাঁধার ভিতর নিজের মনপবনটাকে ফুঁসিয়ে-ফাঁসিয়ে দিতে গিয়ে চোখের পিচুটি পরিষ্কার করতে-করতে, পাইচারি করতে-করতে—কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল সে।

'ঠিক আছে'—ডাক্তার মজুমদার এইবারে নিজেকে টানটান দাঁড় করিয়ে নিয়ে বললেন।

'ঠিক আছে ?'

'কিছু ভয় নেই, চোখ মেলেছেন ; এক্ষুনি কথা বলবেন, ঠিক আছে'—মজুমদার বললেন, 'আমি প্রেসক্রিপশন লিখে দিচ্ছি, এই ওষুধগুলো দেবেন। বুঝবেন তো আমার নির্দেশ ?'

'বুঝব বৈকি—আমি হাসপাতালের—'

'মেয়েদের কমিটির মেম্বার। হে হে হে। আচ্ছা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি—প্রেসক্রিপশন লিখতে-লিখতেই বুঝিয়ে দিতে লাগলেন তিনি, অর্চনা ঝুঁকে পড়ে ঠিক করে নিচ্ছিল।

'নিশীথবাবু কি চলে গেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। মহিমবাবু কোথায় ?'

'বাইরে। ডাকব ?'

'দরকার নেই। ঠিক আছে। বুঝলেন, উপরে লিখে দিয়েছি যে-ওষুধটা, সেটা একটা মিকশ্চার, আনিয়েই একবার দেবেন, তার পর চার ঘণ্টা অন্তর, দু বারের বেশি নয়।'

'মোট তিন বার তা হলে ?'

'ঠিক আছে। আর এই যে-পাউডারটা দিচ্ছি—'

'মোট তিন বার তা হলে ?'

'পাউডার ?' উৎকণ্ঠিত হয়ে মজুমদার তাকালেন অর্চনার দিকে—

'না মিকশ্চার।'

'সে তো মিটে গেছে, ঠিক আছে। এই পাউডারটা দু বার দেবেন মিকশ্চার দেওয়া হয়ে গেলে এক ঘণ্টা পর পর—'

মজুমদারের ভাষাটা খুব পরিষ্কার নয়, তবে হেঁয়ালির ভাষা নয়, অর্চনা বুঝে নিল; বুঝে নিয়েছে কি না অর্চনার মুখে চোখ বুলিয়ে সেটা বিদ্যুৎ-ক্ষিপ্রতায় একবার খতিয়ে নিলেন কি না-নিলেন ডাক্তার মজুমদার, 'এক ঘণ্টা পর পর—দু বার—বেশি হয় না যেন। ঠিক আছে। আর এই পিলটা—রাতের ঘুমের আগে—একটা শুধু।'

'একটা?'

'ঠিক আছে।'

'আজকের রাতের জন্যে শুধু?'

'আজকের রাত শুধু।'

'কালকে মিকশ্চার দেব?'

'কাল সকালে এসে ব্যবস্থা করব আমি।'

'মিকশ্চার পাউডার দেব না তা হলে কাল?'

অর্চনার কাঁধে নিজের হাত কি হাতের ছায়ার, একটা আলতো চাপ দিয়ে ডাক্তার বড় বসন্তবাউরি পাখির মত অমায়িকভাবে হেসে বললেন, 'কালকের কথা কাল। আজকে এই ওষুধগুলো দিন।'

'কী খাবে?'

'দুধ, ফলের রস। কমলা। গ্লুকোজ। যেমন খাচ্ছিলেন—'

'ভাত খেতে পারে?'

'যদি খেতে চান? নরম চাট্টি, মাখন, মাছের ঝোল, দুধ দিয়ে—'

'ঠিক আছে'—অর্চনা বললে।

ঠিক আছে-টা মজুমদার নিজেই বলতে যাচ্ছিলেন, অর্চনা সেটা ঠিক সময়েই বলে ফেলাতে ডাক্তার মজুমদারের চিন্তা ও অনুভূতির প্রবাহ একটা সদ্গতি পেল, ভাল লাগে না তার। সদাশয় মুখে অর্চনার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'নিশীথবাবু যাবার বেলায় বলে গেলেন কিছু আপনাদের?'

'কী কথা?'

'ওষুধপত্র আমার জ্যোৎস্নার ডিসপেন্সারির থেকেই আনিয়ে দেবেন।'

'সেখান থেকেই তো আনানো হয়।'

'ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না—নিশীথবাবু ভিজিটের টাকাকড়ি দিয়ে গেছেন—এক মাস-দেড় মাসের—' অর্চনা শুনছিল। ডাক্তারের কাছ থেকে প্রেসক্রিপশনটা হাতে নিয়ে তাকিয়ে ছিল সেটার দিকে ; কোনো কথা বললে না।

'ওষুধপত্রের দাম দিয়ে গেছেন নিশীথবাবু।'

'শুনেছি।'

'আমার মনে হয় ছ মাসের ভিজিট, ওষুধ, পেটেণ্ট ওষুধ সব চলবে যা-টাকা দিয়ে গেছেন, তাতে। পাঁচশ টাকা তো কম নয়।'

অর্চনা প্রেসক্রিপশন দেখছিল—আড়চোখে ; চোখ তুলে তাকাল সে।

'তাছাড়া ওঁর আজ যে-রকম হয়েছে রোজই তো এ-রকম স্ট্রোক—স্ট্রোক ঠিক নয়—রোজই তো আর এ-রকম ইয়ে—আরে—কী বলে একে—কার্ডিয়াক গোলমাল হবে না, ঘন ঘন ডাকতে হবে না আমাকে। তা ও পাঁচশ টাকায়—বেশ—'

'ঠিক আছে' —অর্চনা বললে।

ডাক্তার প্রায় চোখ বুজে কথা বলছিলেন। একটু বিস্মিত, ব্যাহত হয়ে চোখ হুটো পুরোপুরি খুলে ফেলে অর্চনার দিকে তাকালেন।

একটু চুপ থেকে সুমনার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে চোখ মেলেছেন; কথা বলছেন। কী বলছেন শুনুন তো। আমি কানে খাটো হয়ে পড়ছি, যা বয়েস। এক রকম আমেরিকান ইয়ারফোন বেরিয়েছে—খুব ছোট—আফিমের গুলির মত—না, সে আগের জিনিস নয়—কানে রাখলে সব অমন পরিষ্কারভাবে—কী বলছেন—হারীত?—হারীত কী ?—ও—ওর ছেলে হারীত, ঠিক আছে। হারীতকে দেখতে চাচ্ছেন ? ঠিক আছে। এখন কথা বলবেন সব। ওষুধগুলো এখুনি আনিয়ে নিন। জ্যোৎস্নার ওখান থেকে। ভিজিটের, ওষুধের সব টাকা দিয়ে গেছেন নিশীথবাবু'। মজুমদার লম্বা-লম্বা পা ফেলে চলে যেতে-যেতে বললেন, 'বেশ পাকা কাজই করেছেন নিশীথবাবু—ছ মাসের দাদন দিয়ে আমাকে লটকে রেখে গেছেন। হে-হে—তা দেড় মাসের তো হবেই'।

'আজ সন্ধ্যের সময় আসবেন আপনি এক বার ?'

'আমি ? না, আজ আর কী হবে। কাল সকালে আসব।'

'ঠিক আছে।'

'হারীত কোথায় ?' সুমনা বললে।

'হারীত ? আছে। আছে।'

'কোথায় ?'

'কলকাতায় হয় তো। ঝুপ করে এসে পড়বে এক দিন।'

'না, না, এসেছিল সে এখানে। কাল রাতে এসেছিল। তোমাদের খবর দিতে পারি নি। তোমরা তখন ঘুমুচ্ছিলে। তোমাদের ঘরের থেকে জলের কলসিটা নিয়ে এসেছিল, কিছু খেতে দিতে পারি নি, খুব তেষ্টাও পেয়েছিল হারীতের। ঐ দেখ কলসিটা।'

কলসিটা দেখবার জন্যেই শেষ রাতে পা দিয়েছিল এই ঘরে অর্চনা। এত ক্ষণে দেখা হল।

'হারীত এসে চলে গেল যে ?'

'কোথায় গেল ?'

'তোমাকে বলে যায় নি ? বা রে! কেমন যেন এক রকম উচ্ছন্নে হয়ে গেছে হারীত। তোমার কথা না-শুনে চলে গেল দেখেই বোধ হয় তোমার এই হার্টের গোলমালটা হয়েছে সুমনাদি। তোমার এ রকম অবস্থা দেখে চলে গেল ?' সুমনার কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছিল—কথাটা হারীতকে নিয়ে সেই জন্যে—হার্টের জন্যেও কিছু বটে, 'কেমন যেন হয়ে গেছে এক রকম আজ-কালকার ছেলেরা মেয়েরা সব। কী করবে এরা ? দেশ স্বাধীন করবে ? দেশ তো স্বাধীন হয়েছে।'

'আমিও তো বলেছিলাম হারীতকে, এখন আবার ও-সব কী হারীত ? এখন আবার ক্ষুদিরাম, গণেশ, অনন্ত সিং, মাস্টারদা কী যে! দেশ তো স্বাধীন হয়েছে।'

'হাঁ, দেশ তো স্বাধীন হয়েছে'—সন্দিগ্ধভাবে ডান হাতের আঙুল মটকাতে-মটকাতে বললে অর্চনা।

'উনিশশ বেয়াল্লিশে তো হারীত কলেজে ছিল। দিনরাত সাইকেলে আর পায়দলে মেরে দিয়ে কত কাণ্ডই না করেছে। তখন বিশেষ কিছু বলতাম না ওকে, ওর বাবাও ওকে রেহাই দিয়েছিল, বলেছিল, আমি নিজে অবিশ্যি ঠিক এ রকম করতাম না, তবে, সকলের সঙ্গে মিলে বেশ একটা কাজ হাতে নিয়েছে বটে হারীত, করুক। জিজ্ঞেস করেছিলাম, যদি মরে ? বলেছিল, মরতে হবে জেনে নিয়েই তো এই কাজে নামা, মরছেও তো অনেকে। শুধু একা হারীত

বেঁচে যাবে ? বলেছিল। হারীত তো তখন কংগ্রেস ছিল। কর্ত করেছে কংগ্রেসের জন্যে। ক্রিপসের সঙ্গে কথাবার্তার সময় থেকেই ওর কংগ্রেসিতে ভাঙন ধরে, বলে, কী হবে কংগ্রেস দিয়ে ?'

'ঘুমোও সুমনাদি।'

'ঘুমোচ্ছি।'

'ওঁকে ওষুধ আনতে পাঠিয়েছি। এক দাগ মিকশ্চার দেব, এক ঘণ্টা পরে পাউডার।'

'আর যে-সব ওষুধ আছে ?'

'কিছু বললেন না তো, সে-সবের কথা। আজ লাগবে না, পরে খাবে। কাল আসবেন উনি।'

'হারীত চলে গেল—তার পর থেকেই কী যে হল। মরে গেলেই তো ঠিক হত। ভেবেছিলাম, 'মরে গেছি ঐ বিমটার ঐ খোঁটাটার সঙ্গে গলায় দড়ি বেঁধে। কে যেন আমায় ধরে গলায় দড়ির প্যাঁচ কষে ঝুলিয়ে দিল—আমি তোমাকে ছুঁয়ে বলছি অর্চনা—সাদা বিচ্ছিরি একটা লোক—'

'নিজেই প্যাঁচ কষছিলে', হেসে বললে অর্চনা, 'মজুমদার বোধ হয় বাঁচিয়ে দিয়ে গেছেন। কেমন লাগছে ?'

'এখন একটু ভাল।'

'ক্রমেই ভাল হবে।'

'এত বছর কংগ্রেসের কাজ করে তারপর যখন দেশ স্বাধীন হল তখন সটকে পড়ল হারীত। আবার নতুন করে আরেক নতুন কংগ্রেসের জন্যে কাজ করতে হবে না কি—'

'নতুন কংগ্রেস ? কোথায় ?'

'হারীতের মনের মধ্যে। আর কোথায় ?'

সুমনা বললে, 'আবার সেই বারীণ ঘোষ, অরবিন্দ, প্রফুল্ল চাকী, সত্যেন, বাঘা, গান্ধীজির সেই ডাণ্ডি সত্যাগ্রহ, চৌরিচৌরা, জালিয়ানওয়ালাবাগ—আবার সেই ক্রিপস ক্যাবিনেট মিশন—আবার সব'।

'না, তা আর কী করে হয় ?'

'তা হলে নতুন কংগ্রেসের মানে কী ?'

'নতুন যা, তা নতুন। তার ভিতর এ সবের কিছু ছায়া কিছু ছক-টক থাকতে

পারে, কিন্তু তবুও তা আলাদা জিনিস। দিন বদলাচ্ছে, দেশ বদলাচ্ছে, মানুষ বদলাচ্ছে—'

'ঠিকই তো'—অনেক ক্ষণ পরে সুমনা বললে, 'কিন্তু যে জিনিসের জন্যে অনেকটা বছর ধরে কাজ করা যায় সেটার একটা সুভালাভালি হলেও তাকে ব্যর্থ মনে করতে হবে এ কী রকম ?'

'কিসের ?' কী যেন কোনো এক নিহিত পৃথিবীর থেকে টলমল দুটো কালো চোখ ফিরিয়ে এনে জিজ্ঞেস করল অর্চনা। পলিটিকসের কথা সে ভাবছিল না, সুমনার কথার দিকে আধখানা কান ছিল কি না ছিল। কান মন সরে যাচ্ছিল তার, অন্ধকার, অনেক জল এসে জীবনের অন্য সব চিন্তা ও ধ্বনির তাগিদগুলি থামিয়ে মানুষের মনটাকে জলের মতন অচেতনে নিস্তব্ধ নিশীথ করে রাখছে যেখানে।

'সফল পরিণতি নয় ? দিন রাত রক্ত ঢেলে লড়েছিল বটে কংগ্রেস, কিন্তু আমরা বেঁচে থাকতে-থাকতেই যে দেশটাকে স্বাধীন করে দেবে তা ভাবতে পারি নি।'

'দেশটাকে স্বাধীন করে দিয়েছে'—অর্চনা বললে।

'স্বাধীন করে দিয়েছে দেশটাকে।'

'প্যাটেল সেদিন বলছিলেন জওয়ার ক্ষেতের থেকে হাততালি দিয়ে পাখি তাড়িয়ে দেবার মতন করে ইংরেজদের খেদিয়ে দিয়েছে কংগ্রেস ?'

'তা তো বটেই, তা তো দিয়েছেই তো।'

'চলে গেছে ইংরেজরা ?'

'আছে গুটিকতক দালালি করবার জন্যে'—সুমনা বললে, কিন্তু তবুও ঠিক বলা হল না মনে ভেবে উশখুস করে বললে, 'ও চলে গেছে সব। ইংরেজরা চলে গেছে। ইউনিয়নে নেই ওরা আর।'

'না, নেই ওরা আর। ব্রিটিশ চলে গেছে।'

'ব্রিটিশ গেছে।'

'দেশটা স্বাধীন হয়েছে আমাদের।'

'দেশটা আমাদের স্বাধীন হয়েছে, ইস !'

'কী হল ?'

'মাথাটা ঘুরে গেল কেমন, আমার হাতটা চেপে ধরো। একটু কাছে এগিয়ে

এসো, অর্চনা।'

খানিক ক্ষণ পর ওষুধ, কমলালেবু, দুধ খেয়ে একটু জোর পেল যেন সুমনা।

'কাল রাতে হারীতকে বকেছিলুম।'

'কেন?'

'পনেরই আগস্টের পর দেশে যে আমাদের লক্ষ্মীর মত সূর্য জ্বলছে এ ও স্বীকার করতে চায় না।'

'ওর বাবা স্বীকার করেন, নিশীথবাবু?'

'তিনি কী করেন, না করেন, আমরা জানি না। তাঁকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। ওর বাবার মতন তো নয়, হারীতকে ধরা ছোঁয়া যায়। পনেরই আগস্টের পরেও ওর মনটা কেমন কালি মেরে আছে।'

'কেন?'

'কেন? যা-হয়েছে তাতে খুশি হয় নি।'

'কী চায় হারীত?'

'আবার পলিটিকস করছে।'

'কী রকম পলিটিকস? রিভলভার ধরবে?'

'কী জানি। স্বাধীন হয়েও শান্তি নেই। ছেলেমেয়েগুলোর এই দশা। উনি কলেজটাকে এক পাশে ফেলে জলপাইহাটির ঘর ভেঙে চলে গেলেন যা-নেই তার ভিতর হারিয়ে যেতে। আমার অসুখের জন্যে পরের রক্ত খেতে হয় আমাকে, তবুও শরীরে রক্ত থাকে না, তিল-তিল করে মরে তবুও ফুরোতে চায় না। বড্ড বেকায়দায় পেয়েছে দেশের স্বাধীনতা আমাদের ক-জনকে। তবুও'—সুমনা একটু আঁটসাঁট হবার চেষ্টা করে বললে, 'ইংরেজদের শাসন নেই সেটা আমি বোধ করছি। তুমি আর মহিমবাবু তো ভাল আছ, স্বাধীনতাটাকে বেশ—খুব—উপভোগ করছ না তোমরা?'

'হ্যাঁ আমরা বেশ ভাল আছি, খুব মাল টেনে খাচ্ছি দেশের স্বাধীনতাটাকে' —হাসতে-হাসতে বললে অর্চনা।

বেলা তিনটের সময় হারীত ফিরে এল। মুখ-চোখ-চুল ভারী খারাপ দেখাচ্ছিল তার। যারা আগে কোনোদিন দেখে নি তাকে, এ চেহারার দিকে তাকিয়ে

মোটেই ভাল লাগবে না তাদের। চেহারার জন্যেই যদি মানুষকে আমল দিতে হয় তা হলে এ চেহারাকে এক ডাকে ফিরিয়ে দিতে হয়, কানে তুলতে হয় না এর কোনো কথা।

খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমিয়ে, ওষুধ দেবার, দেখবার, শুনবার, তদারক করবার জন্যে সুমনার ঘরে এসেছিল অর্চনা! ওষুধ, কমলালেবু খাওয়া হয়ে গেছে সুমনার। অর্চনা বিছানার পাশে বসে নিজেকে খানিক, সুমনাকে কিছু, হাওয়া খাওয়াবার জন্যে হাতপাখাটা নাড়ছিল, মাঝে-মাঝে দু-চারটে কথা বলছিল— স্বাধীনতা হল তবু সুখ হল না, শান্তি এল না, নতুন কি পলিটিকস করা যায়, শাড়ি-কাপড় পাওয়া যাচ্ছে না, খাবার জিনিস না-পাওয়ার মত, সকলেই সহজেই ভাত কাপড় স্বস্তি পেতে পারে কী করে, ঐ নিম-জাম-বকুলের পাখি-গুলোর মত দেশের জল-ফলফলি খেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে শান্তিতে কল্যাণে থাকতে পারে কী এই সুন্দর চোতের বাতাসে—কী সে টাকাকড়ির ব্যবস্থা, জননীতি, স্বাধীন দেশের সর্বভূমির জন্যে কল্যাণনীতি—এই সব নিয়ে আলোচনা করছিল তারা। যে-গাইগোরু হরিণীর মত যেন অনেকটা, অর্চনাকে তেমনি দেখাচ্ছিল।

'কে রে বাপু, দুপুরবেলা ঘরের ভিতর, কে তুমি!'

'আমি এসেছি, ঘুমিয়ে আছে মা?'

'কে, হারীত নাকি?' অর্চনা তৃতীয় চক্ষু বার করবার চেষ্টা করে যেন বললে, 'কেমন বদলে গেছে হারীত! এ কী হয়েছে হারীত!'

সুমনা শুয়ে-শুয়ে প্রায় চোখ বুজে কথা বলছিল; চোখ মেলে উঠে বসবার চেষ্টা করে বললে, 'কে হারীত, ও হারীত'।

হারীত এগিয়ে এসে একটা টুল টেনে নিয়ে বসে বললে, 'আমি এসেছিলাম কাল রাতে, জানো অর্চনামাসি?'

'শুনেছি। কোত্থেকে এলে?'

'কলকাতার থেকে।'

'কাল রাতেই যে? কাল তো নিশীথবাবু কলকাতায় গেলেন—তিনি যাওয়া মাত্র তুমি এলে। কী করে এ যোগাযোগ ঘটালে হারীত।'

'মাঝে-মাঝে ঘটে যায় তো দেখছি।'

'কলকাতায় ছিলে তো তুমি, না আশেপাশে কোথাও গা ঢাকা দিয়েছিলে,

নিশীথবাবু চলে গেলে দেখা দেবে মনে করে ?'
'তা মনে করতে পার। তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে।'
'আমাকে ?'
ঠাট্টা করে বলছে হারীত, হারীত যখন ঘরে ঢুকেছিল তখন তাকে না-চিনতে পেরে কেমন কটমটিয়ে তাকিয়েছিলাম সেজন্য কেমন একটু তামাসা করে কথা বলছে হারীত, অর্চনা ভাবছিল।
'আমি যখন জলপাইহাটি ছেড়েছিলাম তখন তো তোমাকে এত সুন্দর দেখি নি!'
'কী বলছে হারীত ? কাকে বলছে ?'—সুমনা আবার শুয়ে পড়ে চোখ প্রায় বুজে ফেলে বললে।
'অর্চনামাসিকে বলছি।'
'অর্চনা তো সুন্দরই, কিন্তু—'
'সেই কথাই বলছিলুম, দেখে খুব ভাল লাগল, যেন দশ-পনের বছর বয়স কমে গেছে অর্চনামাসির।'
অর্চনার হাতে একটা বই ছিল। সুমনার সঙ্গে কথাবার্তা বলার ফাঁকে-ফাঁকে পড়বে ভাবছিল, এত ক্ষণ বন্ধ ছিল বইটা, এবার খুলে দেখছিল।
'শোনো অর্চনামাসি—'
'খেয়ে এসেছ ?' সুমনা বললে।
'হুঁা।'
'চান করেছিলে ?' অর্চনা জিজ্ঞেস করলে।
'আমায় দেখে কী মনে হয় ?'
'দেখে কিছু বুঝতে পারছি না আমি। অনেক দিন পরে দেখছি।'
'চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে ?'
'খারাপ তো হয়েছেই,' অর্চনা বললে, 'ঘরদোর ছেড়ে দিনরাত বাইরে হুজ্জোতি করলে ভাল হবে চেহারা ?'
'আমাকে কি ঘুমের ওষুধ দিয়েছে অর্চনা ?'
'কে ? ডাক্তার ? জানি না তো। কেন, ঘুম পাচ্ছে ?'
'কেমন ঘুম-ঘুম লাগছে আমার।'
'ঘুমিয়ে পড়ো।'

'তোমরা কথা বলো। হারীত চান করেছিলি? খেয়ে এসেছিলি?'
'হ্যাঁ।'
'কোথায় খেলি?'
'আমাদের পার্টির এক বন্ধুর বাড়িতে।'
'জলপাইহাটিতে তোদের পার্টি আছে নাকি? ওরে বাবা রে। তুমি কম্যুনিস্ট নাকি হারীত?'
'বলেছি তো তোমাকে, আমরা একেবারে নতুন স্বাধীন সব কর্মী। কম্যুনিস্ট কংগ্রেস কোনো কারু সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।'
সুমনা তবু জিজ্ঞেস করল, 'তুই কি কম্যুনিস্ট?'
হারীত কথা না-বাড়িয়ে সোজাসুজি উত্তর দিয়ে বললে, 'না!'
'তবে যা! পার্টি-পার্টি করছিস কেন কম্যুনিস্টদের মত।'
'বাবা!'—হারীত যেন ধন্য মেনে বললে, 'মেয়ে লোকের এত তো দেখি নি আমি কোনোদিন।'
কিন্তু তবুও হারীত তর্ক করতে গেল না। সুমনার এই নির্বিবেক জাতক্রোধটাকে নিয়ে ঘাঁটাতে গেল না আর।
'বেশ পেট ভরে খেয়েছিস তো?'
'হ্যাঁ।'
'কাল রাতের—কাল রাতে তো তোমাকে দিতে পারলুম না কিছু হারীত—কাল রাতের না খাওয়ার শোধ তুলে একেবারে পেটে গলায় খেয়ে এসেছ বুঝি?
'ও-রকম শোধ তুলে খাওয়ার অভ্যেস নেই আমার, যেটুকু দরকার তাই খেয়েছি।'
'চান করেছ কোথায়?'
'জুলেখা বেগমের দিঘিতে।'
'জুলেখা বেগমের দিঘি? সে কোথায়?'
'এই তো এখান থেকে মাইল পনের হবে।'
'অদ্দুর গিয়েছিলে চান করতে?'
'বাসে গিয়েছিলুম।'
'নাম শুনেছ জুলেখা বেগমের দিঘির, অর্চনা? আমাকে চান করতে নিয়ে যাবে এক দিন হারীত? কত বড় দিঘি হবে? অর্চনা?—ঘুমিয়ে পড়তে লাগল সুমনা! আবিষ্টভাবে কী যেন ভাবছিল, নিজের মনের ভিতর থেকে উঠে এসে অর্চনা

বললে, 'হ্যাঁ, বেশ বড় দিঘি। তা দেখে এসো গিয়ে একদিন হারীতের সঙ্গে। আমি দেখেছি—চার-পাঁচ বছর আগেও গিয়েছিলাম একবার। জুলেখা বেগমের দিঘি এখান থেকে কুড়ি মাইলটাক তো হবেই—লালপুরের পথে—বেশ সুন্দর জায়গায়—প্রান্তরের ভিতর, চারদিকে উঁচু-উঁচু গাছপালা, ওরা কী বলে হারীত—হ্যাঁ হ্যাঁ পহরিঘাসের দেশে, সুমনাদি, সুমনাদি—'

সুমনা ঘুমিয়ে পড়েছে।

'ঘুমিয়েছে মা?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, ঘুমোক।'

'আমি উঠি।'

'বোসো। মহিমবাবু কি কলেজ থেকে ফিরেছেন?'

'না।'

'তা হলে বোসো তুমি। কথা বলা যাক। বসতে পার নিশ্চয় তুমি'—হারীতের চোখে কেমন একটা সমীহ ও আকাঙ্ক্ষার আন্তরিকতা। তাকিয়ে দেখল অর্চনা। কী রকম এই ছেলে? কী চায়।

'কাল রাতে রানুর কথা বলছিলুম; মা বিরক্ত হলেন—'

'কে, রানু? কোথায় সে? কোনো খোঁজ পাওয়া গেছে রানুর?'

'না! সেই কথাই মাকে বলছিলুম। এক কণা ভূষিকে কী করে খুঁজে পাওয়া যাবে এক মাঠ ভূষির ভিতর, বলছিলুম মাকে। শুনে, ক্ষেপে উঠে, আমাকে বাড়ির বার না করে ছাড়বেন না তিনি—

'তাই বলে বেরিয়ে যেতে হয়, ও-রকমভাবে ক্ষেপিয়ে দিয়ে এ-রকম মরার মতন রোগীকে একলা ঘরে ফেলে? তোমার যে কবে কাণ্ডজ্ঞান হবে হারীত?'—বকছে বটে, কিন্তু তবুও বকুনির হুল নেই, হুলটা খসিয়ে নিজের গলা থেকে আওয়াজ আর কথা অর্চনা বার করছে।

'ও-রকম মারমুখো হয়ে উঠলে আমি কী করতে পারি?'

'কিছু করতে পার না? অথচ তুমি রিভলবার ধরে কংগ্রেসকে মারতে চলেছ?'

'কংগ্রেসকে মারতে চলেছি মানে? কী যে বল তুমি অর্চনামাসি। মা তোমাকে যা ভজিয়েছে তাই বিশ্বাস করেছ তুমি। কংগ্রেসের ভিতর একদিন ছিলুম আমি। এখন আর নেই। দেশ তো বিমুক্তি পেল, কেন এ-রকম হচ্ছে এ

নিয়ে আন্দোলন করছি ; একটা নতুন পলিটিকসের সাধনা করছি আমরা।'

'এও কি প্রফুল্ল চাকী, বিনয় বোস, মাস্টারদার মত ?'

'না। তা হবে কেন। সে ইতিহাস এত বেশি আমাদের চোখের সামনে যে এক্ষুনি ফিরে-ফিরতি হবে না। আর তা ছাড়া—'

'এত বেশি কচলানো থ্যাঁৎলানো হয়ে গেছে সে আন্দোলনের, যে বিরতি এসেছে।'

'হ্যাঁ। তাছাড়া ইতিহাস একই জিনিসকে একই রকমভাবে প্রশ্রয় দেয় না। মানুষের মনও চায় না, সমাজের ও ইতিহাসের দাবিও তাতে মেটে না।'

'মার্কস কি এই কথা বলেছেন ?'

'আমি মার্কস পড়ি নি।'

'তবে কোত্থেকে বলছ ?'

'আমার নিজেরই যা মনে হয়েছে তাই বলছি। মার্কস পড়ে দেখতে হবে। ইংরেজিতে পড়লেও হয়, তবুও হাইনের কবিতা পড়বার জন্য জার্মান শিখছিলুম ; এখন দেখছি 'ডাস কাপিটাল' ঐ ভাষায়ই পড়া ভাল—'

মার্কস পড়েছে হারীত—আগাগোড়া ইংরেজি অনুবাদটা—কিন্তু অর্চনার কাছে সে কথা কেমন একটা অব্যয় খামখেয়ালির ঝোঁকে চেপে গেল হারীত।

'জার্মান শিখে ফেলেছ ?'

'শিখছি। মার্কসকে নিয়ে যত নাচানাচি করা হয় সেটা তাঁর প্রাপ্য নয়—'

'তুমি এই কথা বল ?'

'অনেক নতুন কথাই বলি আমি। কংগ্রেস ভাল লাগছে না। আমাদের দেশ স্বাধীন হল বলে কয়েকটি লোক ছাড়া আর-কেউ কিছু সত্যি টের পেল না, এই কথা যে আমাদের দেশের আজকের প্রাঞ্জল সত্য, এই আমি বলছি ; বেশ বিচারক্ষম পণ্ডিত লোকরাও আমাদের দেশের প্রায় সব কিছু জিনিসকেই রাশিয়ার নিকটে ঘষে খাঁটি কিনা যাচাই করে দেখেন। এটা আমার কাছে গুরু নিপাতকী বলে মনে হয় ; ফ্রয়েডের স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা তাঁর কাজের ব্যাখ্যার চেয়ে অবিশ্যি বেশি ঠিক, কিন্তু তবুও আট আনির বেশি ঠিক নয়। আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির—'

'আমার কাছে কেন এ সব, আমার কাছে কেন,' কাতরভাবে অনুনয় করে বললে অর্চনা।

'যার কাছে মন খোলে তার কাছে বলি আমি, তোমাকে ভাল লাগে তাই বলি।'

হারীতের গলায় ঘেরাটোপ ও সঙ্কোচ ঘুচে যাচ্ছে যেন। কী করবে অর্চনা? হারীতের তাকে ভাল লাগে সে তো ভাল কথা। নিশীথ সেনের মত মানুষকে ভাল লাগে না যার, অর্চনাকে তার ভাল লাগে; কেমন যেন একটু অসঙ্গত কথা বটে। কিন্তু কোন দিক দিয়ে কী রকম চেতনা বৃত্ত হচ্ছে বলে অর্চনাকে হারীতের ভাল লাগে? হয় তো কিছু নয় জিনিসটা—অস্বাভাবিক কিছু নয়—সরল সহজ স্নেহ-মমতার ব্যাপার। কলকাতার কাশি রক্তে আর পলিটিকসের বত্রিশ তাতে ঝলসে গিয়ে—এখানে মায়ের কাছে এসে মাতৃত্ব না পেয়ে, অর্চনাকে পেয়ে বসেছে যেন—মা মাসি রানু ভানু—এমন-কি পাড়ার বৌদি- দিদির দাবিও 'একা অর্চনার মেটাতে হবে। পাতানো বৌদি বা দিদি আছে কেউ হারীতের—জলপাইহাটিতে? না নেই তো। নেই।—অর্চনা খুব নিবিড়ভাবে সমস্ত জলপাইহাটিতে জাল ফেলে কাউকে ধরে আনবার চেষ্টা করছিল, কোনো নারীকে—বয়সে বড়, সমান, ছোট—হারীতকে যে টানে। না, কাউকেই মনে করতে পারছে না সে। ভাবতে-ভাবতে হারীতের উপর কেমন একটা মমতা বোধ হল অর্চনার।

'কতদিন থাকবে এখানে?'

'বেশি দিন না। মা একটু ভাল হয়ে উঠলেই চলে যাব।'

'সময় নেবে অনেক একটু ভাল হয়ে উঠতেও।'

'তাই মনে কর তুমি?' হারীত তার চুলের ভিতর যেন মুক্তির জাঙ্গাল নেড়ে-চেড়ে ভেঙে আঙুল চালিয়ে নিয়ে বললে।

'আমি কিছু মনে করি না, ডাক্তার বলছেন।'

'কিন্তু অত দিন আমি কী করে থাকব জলপাইহাটিতে?'

অর্চনা কোনো কথা বললে না; হারীতের দিকে তার চোখ ছিল না, কলকাতায় কোথায় গিয়েছে নিশীথ, কী করছে, এরও অতিরিক্ত একটা ধীর নিস্তট ভাবনায় মনটা ভরে ছিল তার।

'চলে যাবে কলকাতায়? জলপাইহাটিতে থাকবে না?'

'এইখানেই তো থাকবার আমার ইচ্ছা।'

'তবে?'

'কলকাতায় ঢের কাজ—'

'জার্মান শিখছ—'

হারীত হেসে বললে, 'সে তো রাতে ঘুমের আগে শেখা। সারাটা দিন— মুশকিল হয়েছে খোলাখুলিভাবে কিছু করবার নেই—কাউকে মন খুলে কোনো কথা বলবার সাধ্য নেই। যে-কাজে হাত দিয়েছি সেটা মোটেই জনপ্রিয় নয়। উনিশশ বেয়াল্লিশে তখনকার সরকারের ঘর-বাড়ি উচ্ছেদ করে লোকলস্কর ভাগিয়ে দিয়ে, টেলিগ্রাফ ছিঁড়ে, রেল লাইন উলটে-পালটে, সরকারের নানা-রকম দপ্তরখানা কানা করে দিয়ে যা করেছিলুম আমরা, আমাদের কাজে সমস্ত দেশটারই তো প্রায় সমর্থন পেয়েছিলুম, কত উৎসাহ দিয়েছিলে তুমি। বাবাও বিষ নজরে দেখেন নি; উপর-উপর দেখে কিছু বোঝা যেত না তাঁর, কিন্তু তবুও উপলব্ধি করে বুঝেছিলুম মোটামুটি সায় আছে বাবার; মা তো নিজেকে ঢেলেই দিয়েছিলেন'—বলতে-বলতে থেমে গেল হারীত—'হ্যাঁ সবাই সেদিন আমাদের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এখন যা করতে চাচ্ছি তা তো উনিশশ বেয়াল্লিশের পরিণতি নয়, এ একেবারেই নতুন জিনিস, কারুরই উৎসাহ নির্দেশ নেই।'

'না আমারও নেই।'

'কেন?'

'জওহরলাল খুব বিপন্ন মানুষ। শক্তিশালী বড় মানুষ, কিন্তু তবুও তোমরা তাঁকে শক্তি দাও। তোমরা তাঁকে ক্ষমতাময় করে তোলো।'

কেমনভাবে বলে অর্চনা, কীই-বা বলে—যা খুশি বলুক, তবুও তো নিরেস নয়। নিজের কী এক সংকল্পসাপেক্ষ প্রাণের নিয়মে সজীব—সেই সজীবতাটাকে অনুভব করছিল হারীত।

'আমার মনে হয় তিনি যা করবেন, চোখ বুজে অনুসরণ করতে হবে তাই। খুব ভুল করবেন না তিনি। দেশের এখন যে-রকম টলমল অবস্থা, ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় নেই; জওহরলালের মতন নেতাকে চাঁদ পেড়ে দিতে বলে—না-পারলে সাবড়ে দিতে গেলে যে কোটালের বান ডাক দেবে তাতে এত দিকচিহ্ন উড়ে যাবে, এত বেশি অন্ধকার এসে পড়বে যে আমাদের পিতারা—আমরা শেষ হয়ে যাব সব; আমাদের সন্তানদের মাথা তুলে দাঁড়াতে কত বছর লাগবে কে জানে।'

অর্চনার কথা শুনে হারীত হাসি মুখে কিছু ক্ষণ চুপ করে থেকে কথা বলবার উপক্রম করতেই টের পেল হাসি নিভে গেল।

'তুমি যা বলছ তার ভিতর ঢের খিঁচ আছে। কিন্তু সবচেয়ে আগে আমরা যে মুভমেন্টটা চালাতে যাচ্ছি সেটা কী রকম তুমি তো তা বিচার করে দেখলে না!'

'কেউই তো তোমাদের সহ্য করে না। আমি বিচার না করেই তোমাদের পছন্দ করি না।'

'কেন?'

'কেবলই ভাঙবার চেষ্টা করা ভাল না।'

হারীত হেসে ফেলল, হাসিটা ভিতর থেকেই এসেছে, ভিতরের টানেই ফুরিয়ে গেল আবার। হারীত আস্তে-আস্তে বললে, 'গড়ব বলেই কোথাও-কোথাও ভাঙার দরকার দেখছি, কে বলে আমরা ভাঙছি শুধু?'

'না-ভাঙো তো ওদের সঙ্গে মিলে সৃষ্টি করো। গড়বার কাজে ওরা এখন খুব ব্যস্ত, অনেক লোক দরকার ওদের।'

'জলপাইহাটিতে আছ বলেই তুমি এই কথা বলছ। মহিমবাবু একশ তিরিশ টাকায় চাকরি করছেন, তাকে নেবে ওরা? তোমাকে নেবে? আমাকে নেবে?'

'আমরা তো এক্সপার্ট নই। কী হবে আমাদের নিয়ে?'

'তা হলে ওদের সঙ্গে মিলে সৃষ্টি করব কী করে, ওদের বড-বড মালিক, মালিকানার তাঁবে তাদের পেটোয়া লোকেরা গা ঘেঁষে। মহামানুষরা থেকে-থেকে দেশটা চালাতে চাচ্ছে বটে, কিন্তু ধাড়ি মনিবরাই তো চালাচ্ছে আজকাল। এদের, এদের সাঙ্গপাঙ্গদের সুবিধাবাদে, শিল্পাদরপনার চূড়ান্তে দেশের স্বাধীনতার কোনো মানেই খুঁজে পাওয়া গেল না আজ পর্যন্ত। ব্রিটিশ ভারতের অধীনতা-স্বাধীনতার পলিটিকস উড়িয়ে দিয়ে আমাদের জড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তান্ত্রিক ডাইনির হাতে বানানো গাছের মত, এমনই এক জায়গায় যেখানে শিকড় নেই, দেশ নেই, নেতাদের শক্তি নেই, পলিটিকস নেই, কিছু নেই, সমস্ত পৃথিবী সমস্ত পৃথিবীকে গিলছে শুধু। অন্ধকার অন্ধকারকে খাচ্ছে—'

হারীত থেমে গেল। অর্চনা শুনে যাচ্ছিল। হারীতের শেষ হয়ে গেলে, অর্চনা তার মস্ত বড় কাল খোঁপায় হাত রেখে, একবার চাপ দিয়ে নিয়ে, হারীতের চোখে চোখ রেখে বললে, 'আমাদের দেশে কেন, সব দেশেই এ রকম; আজ

কেন—অনেকদিন থেকে। নিশীথবাবু সব বলেছেন আমাকে। তাঁর কাছে শিখেছি-জেনেছি অনেক কথা। তিনি বলেছেন, এই রকমই ছিল—এই রকমই প্রায় থাকবে। বরাবর এক দল লোক পৃথিবীকে শোধরাবার চেষ্টা করবে, বরাবরই খুব নির্দোষ মন নিয়ে—যেমন তুমি করতে চাচ্ছ—কিন্তু তাই বলে অন্যেরা তো নির্দোষ নয়, তাদের জ্ঞানপাপ খণ্ডানোও শক্ত ; আজকের এখন-কারই সুখ চায় তারা ; নিজের সুবিধে সুখই চায় প্রতিটি ব্যক্তিই, যে-কোনো উপায়ে হোক ; আজ যদি প্রায় সকলে মিলে ভাল হওয়া যায়, আত্মত্যাগ করা যায়, তা হলে তিন পুরুষ, ধরো, বড় জোর দশ পুরুষ, পরে যে বেশ সুস্থির শুভ ব্যবস্থা হতে পারে পৃথিবীর সকলের জন্যেই, এ প্রস্তাবে সায় দেবার মতন ব্যক্তি বা জাতিমন এত কম যে তা নিয়ে কোনো রকম বড় চূড়ান্ত কাজ কিছুতেই চলতে পারে না। চোখের সামনে সব সময়েই সৎ দৃষ্টান্ত জিইয়ে রাখা দরকার। যেখানে সবই প্রায় সহজ ও সরল—সেখানে স্বর্গের জন্যে অসাধ্য সাধনের সত্যিই বিশেষ মূল্য আছে ; পৃথিবীকে একেবারে অন্ধকারে গড়িয়ে পড়তে কেবলি বাধা দিয়ে চলেছে চার হাজার পাঁচ হাজার বছর আগের জানা ইতিহাসের সময় থেকে আজ পর্যন্ত।'

'বাবা এই সব কথা বলেন, আমি জানি,' হারীত বললে, 'আর তুমি তোতা-পড়ার মত সে সব বলে যাও আর বিশ্বাস করো?' অর্চনার দিকে সুসন্দিগ্ধ চোখ তুলে তাকিয়ে হারীত বললে।

'নিশাথবাবুর চেয়ে বেশি ভাল, বেশি নির্ভর করা যায়, এ রকম কারো সঙ্গে দেখা হয় নি আমার।'

'কী হিসেবে ভাল ?'

'তোমার কাছে অত খুলে বলতে পারব না আমি।'

'ভাল মানে ভাল মানুষ ?'

'তা তো নয়ই। তোমাকে এক হাটে বেচে হারীত, আর এক হাটে কিনে আনতে পারেন তিনি।'

হারীত তাকিয়ে দেখল, কথা বলতে-বলতে কেমন একটা আভা এসে পড়েছে যেন অর্চনামাসির মুখে। তা হলে সেই পুরুষ মানুষটিকে কি ভালবাসে অর্চনা-মাসি ? না তাকে কামরিক্ত চোখে তাকিয়ে দেখতে পৃথিবীর সব বস্তুর চেয়ে সব চেয়ে বেশি ভালবাসে ? এই শেষের জিনিসটার ভিতর থেকেও তো

কামনার জন্ম হয়। মুখ, কপাল, কেমন যেন গৌরী রৌদ্রে রক্তিম হয়ে আছে অর্চনামাসির—ছায়ার ভিতর বসে আছে অথচ। অনির্বাণ এই জিনিস। অর্চনার দিকে তাকিয়ে রইল হারীত। তাকিয়ে রয়েছে যে টের পেল অর্চনা। তার মুখে যে রক্তসঞ্চার কী এক শোভা এনেছিল—যেন কোনো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের দেশ থেকে—খুব তাড়াতাড়িই যেন মিলিয়ে গেল তা।

কেন অর্চনার সঙ্গে এ রকম তির্যক ব্যবহার করছে হারীত? জলপাইহাটির কোনো যুবতী কি এ পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে হারীতকে? না তো, এখানকার প্রায় কোনো মেয়ের সঙ্গেই তো তার আলাপ নেই! কলকাতার মেসে-মেসে থাকে সে—রাস্তায় আড্ডায় বস্তিতে ঘুরে বেড়ায়—সেখানে চোখে পড়ার মত কাউকে দেখে নি; মাঝে-মাঝে ক্যাম্পে যায় বটে, হারীতের ধর্মে বিশ্বাসী মেয়েরা আছে সেখানে; কিন্তু সেখানে হারীতের মোটামুটি কর্মী নাম; ভাল করে তাকিয়ে দেখে না কোনো মেয়ের দিকে; কিন্তু তাকিয়ে দেখবার মত ছিলও কি কেউ? ভাবছিল হারীত।

হারীতের যা বয়স, মনের যে অপূর্ব অস্বচ্ছ রুচি, এতে কোনো দিকের প্রায় কোনো মেয়েই মনে ধরল না তার; জলপাইহাটিতে এসে নজর পড়ল একজন বড় বিবাহিত মহিম ঘোষালের ভাঁড়ার সংসারের এই দেবযানীটির দিকে। না, না এটা কিছু নয়। ভাল লেগেছে দিদির মত—হয় ত বন্ধুর মতই অর্চনা-মাসিকে। তার জীবনের আসল জিনিস হচ্ছে, কলকাতায় ফিরে যাওয়া, সেখানে গিয়ে কতগুলো দরকারি বই পড়া, কথা ভাবা—যা বইয়ের অতিরিক্ত, সুস্থতা সুবিধা আনা যারা তা পাচ্ছে না কোনোদিন সেই সব মানুষদের জন্যে, খানিকটা ভাল করতে চেষ্টা করা—পৃথিবীকে, মানুষের নীতিকে—খুব সম্ভব, মানুষের মনটাকেও। অসম্ভবই সব—তবুও চেষ্টা করা দরকার। হাস্যকরই সব। কিন্তু তবুও হাসি গম্ভীর হয়ে ওঠে।

'কলকাতায় তুমি সঙ্ঘের কাজ ছাড়া আর-কী করছ হারীত?'

'এ ছাড়া কী আর করবার আছে?'

'ওরা তোমাকে টাকা দেয়?'

'ওরা কারা? আমার কর্মীরা? কোত্থেকে টাকা পাবে?'

'তা হলে কী করে চলে তাদের? কী করে চলে তোমার?'

'ওরা এখনো বাড়ির খেয়ে', হারীত একটু হেসে বললে, 'আমাকে অবিশ্যি

এটা-ওটা করতে হয়। পড়াচ্ছিলুম একটা ইস্কুলে—ছেড়ে দিয়েছি। একটা কোচিং ক্লাস খুলেছিলুম কলেজের ছেলেদের নিয়ে। তাও ছেড়ে দিলাম। এক-আধটা প্রাইভেট টুইশন ছিল, আর করব না ভাবছি।'

'কেন, মাস্টারের ছেলে মাস্টারি করবে না?'

'না! নানা রকম ছেলে ঘেঁটে দেখলাম। ওরা পরীক্ষায় পাশ করতে চায় শুধু, শিক্ষকে [illegible] পরের মুখের [illegible] কেড়ে [illegible] চায়—ম্যাট্রিক থেকে আই-সি-এস অব্দি। কী হবে এদের পড়িয়ে? মাস্টারির বদ রক্ত বের করে দিয়েছি সব। কলকাতায় এখন আমি মোটর মেরামতি, ড্রাইভারি শিখছি,' হারীত বললে।

অর্চনা হারীতের দিকে তাকিয়ে, এক-আধ মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললে, 'শিখতে পারলে ও-সব জিনিসে পয়সা আছে বটে। কিন্তু তোমার শরীরে কি সইবে? এক সঙ্গে অনেকগুলো কাজ নিয়ে বসেছ তো হারীত।'

'গতবার যখন আমাকে দেখেছিলে তার চেয়ে ঢের খারাপ হয়ে গেছে আমার চেহারা?'

'ঢের খারাপ।'

'কবে এসেছিলাম জলপাইহাটিতে; কত দিন আগে?'

অর্চনা একটু ঘাড় কাত করে হিসেব করে নিয়ে বললে, 'প্রায় দেড় বছর আগে। গত বছর আশ্বিন মাসে এসেছিলে। এখন তো চোত মাস।'

'বাপ রে! সব হিসেব ঠিক। আমারও তো মনে ছিল না।'

হলেও হতে পারে রক্তের প্রতিভা গাণিতিক রামানুজমের হারীত; কিন্তু তারও অতীত কিছু রয়েছে অর্চনার। কেমন একটা সহানুভূতি এসে পড়েছিল অর্চনার মুখে, একজন বিশেষ মানুষের জন্যে প্রায় তলদেশ থেকে সহানুভূতি। সে জিনিসের থেকে আলাদা, ঢের নিকটতর, একটা অনুভবে আলোকিত হয়ে বসে থেকে অর্চনার মুখের সহানুভূতিটাকে এমন নির্দোষ নির্মল মনে হল হারীতের যে তার মাধব গোয়ালার কথা মনে পড়ল, এমনই ট্যাকটেকে টলটলে দুধ দিয়ে যেত মাধব, রোজ সকালবেলা, নিশীথ খেত নির্বিকার মুখে, কিন্তু দু-এক চুমুক দিয়ে সরিয়ে রাখত হারীত।

একটা ভারী নিশ্বাস ফেলে হারীত বললে, 'শরীর এত খারাপ হয়েছে, চেনা যায় না আমাকে?'

'কলকাতায় নামলেই দানোয় পায় তোমাদের। কী করে শরীর ভাল থাকবে সেখানে? কী খাওয়া হয়? কী খাওয়া হয় মেসে?'

হারীত একটা ফিরিস্তি দিল; যা নেই, খাওয়ানো হয় না সেই সব মাছ মাংস ডিমের তালিকাও ঢুকিয়ে দিল। অর্চনার বিশ্বাস হল না।

'দুধ খাও না?'

'হাঁ। কিনে খেতে হয়?'

'কী রকম দুধ?'

'জলপাইহাটির মাধব গোয়ালাকে মনে আছে তোমার?'

'হাঁ। ঐ যে ট্যাকটেকে দুধ দিত।'

'হাঁ, হাঁ, ঠিক ধরেছ তুমি'—হাসতে-হাসতে বললে হারীত। কিন্তু হাসিটার উৎস যে মাধব নয়, অর্চনা নিজে, কে বলে দেবে তা অর্চনাকে—আলোকবর্ষের পথে—কবে কোন দিন?

'ও মা—কেন ও-রকম জোলো দুধ পয়সা দিয়ে কেন তুমি? খুঁজে বার করতে পারলে কলকাতায় খুব ভাল-ভাল দুধ পাওয়া যায়। মাধবের দুধ তো একেবারে জল ছিল। সেই রকম জল—'

'দুধ খেতে চাইলে পৃথিবীর প্রায় সব লোকই তো জল দেয়,' বললে হারীত।

হারীতের কথায় কোনো নিভৃত ইঙ্গিত আছে সেটা মনেও হচ্ছিল না অর্চনার। এমনি সে সাতপাঁচ ভাবছিল। অর্চনাকে নিস্তব্ধ দেখে হারীত বললে, 'সুলেখা কোথায় আছে বলতে পারো?'

'কে সুলেখা?' কেমন একটা ঘুম-বিঘুমের ভিতর থেকে উঠে যেন বললে অর্চনা।

'জলপাইহাটির শশাঙ্কবাবুর মেয়ে।'

'ও', অর্চনা একটু ভেবে বললে, 'ঐ যে লালপুরের রাস্তার দিকে থাকে যারা?'

'হাঁ। এখানে আছে?'

'সুলেখাকে চেনো তুমি?'

'বিয়ে হয়ে গেছে কি সুলেখার?'

'কই শুনি নি তো।'

'তোমাকে সঙ্গে করে যাব একদিন সুলেখার কাছে।'

অর্চনা উড়িয়ে দিয়ে বললে, 'আমি কোনোদিন যাই না ওদের বাড়িতে।

শশাঙ্কবাবুর স্ত্রীকেও আমি চিনি না।'

'তা হলে যাবে না তুমি ?'

'আমি কী করে যাই হারীত ?'

ঘুমের ঘোরে সুমনা কেমন যেন গোন-গোন গোন-গোন শব্দ করছিল ; শব্দটা মিইয়ে অস্ফুট হয়ে উঠল ; ঘুমের ভিতরে খানিকটা তৃপ্তি পেলেও কেমন একটা ব্যথার আক্ষেপ যেন বোধ করছিল তার শরীর। হারীত আর অর্চনা নিস্তাপ নিঃস্বত্ব চোখে তাকিয়ে ছিল সুমনার দিকে, দু জনেই। সুমনা পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল আবার ; নিঃশব্দিত হয়ে গেল সব।

'মাধব গোয়ালা কোথায় আছে আজকাল ?'

'বলতে পারি না তো। জলপাইহাটিতে কিছু দিন এবার থাকছ তো হারীত ?'

হারীত কী করবে না-করবে, কী ইচ্ছা অনিচ্ছা, মনের কথাটা ভাল করে স্থির করতে পারে নি এখনো ; বললে, 'মার অসুখটা ভালর দিকে না গেলে কলকাতায় যাওয়া হয় না। তুমি বলছ সময় লাগবে। এর ভিতর বাবা এসে পড়বেন ?'

দূরের একটা জামরুল গাছের সাদা-সাদা ফলের দিকে তাকিয়ে অর্চনা বললে, 'তা তোমার বাবা জানেন। আমি কী করে বলব, আমার জানার কথা হারীত ?'

'কে আর জানবে—আমি ভাবছিলুম—তুমি যদি না জান—'

সাদা-সাদা ফল, বাতাসে উড়ু-উড়ু জামরুলের বড়-বড় সবুজ পাতা, সৃষ্টির আগুনের উৎস থেকে যেন সদ্য উঠে আসা একটা তরতাজা হলুদ পাখির দিকে তাকিয়ে ছিল অর্চনা।

'তোমার বাবা চিঠি লিখতে বলে গেছেন।'

'কাকে—তোমাকে ?'

'যখন খুব বেশি দরকার হয়, জানাতে বলেছেন। কিন্তু আমি লিখব না।'

'কেন ?'

অর্চনা তাকিয়ে দেখছিল জামরুলের ঘন সবুজের ভিতর সেই পাখিটা ডালের থেকে ডালে লাফিয়ে যাচ্ছে, উড়ন্ত পাতার ঝালরে ঢাকা পড়ছে, বেরিয়ে আসছে আবার—

'দরকারের টানে নিজেই তো চলে আসবেন নিশীথবাবু। যদি না আসেন—'

পাতা আর বাতাসের আকাশের ফাঁকে কেমন যে জ্বলজ্বলন্ত প্রাণের হলুদ—ও-রকম হলুদ হয়ে চোতমাসের বৃহৎ বাতাসের ভিতরে নিজের শরীরকে পালকরণিত প্রাণের আধার বলে অনুভব করে নিতে পারত যদি মানুষ। উড়ে চলে যেত যেদিকে ইচ্ছা—

'না আসেন যদি ?'

'তা হলে'—অর্চনা হারীতের মুখের দিকে তাকিয়ে না-তাকিয়ে বললে, 'কাঁঠাল পিটিয়ে পাকা করবার ভার তো আমার উপর নয়, সে তোমার মার উপর,' বলে অর্চনা ঠোঁটে দাঁতে হাসি মাখিয়ে একটু হাসতেই বুজে এল হাসি।

'তার মানে ?'

'কলকাতায় যে গেছে তাকে চিঠি লিখে টেনে আনব কেন আমি ?'

'কেন কলকাতায় কে উজিরি পেতে গেছেন ?' হারীত হেসে বললে, 'এখানে ঘরদোরে নাজিরি ভাল ছিল না ?'

'এই যা—পাখিটা উড়ে গেল', জামরুলের গাছের দিকে তাকিয়ে বললে অর্চনা।

'কী বলতে চাও তুমি ?' ঘাড় ফিরিয়ে হারীতের মুখের দিকে চেয়ে অর্চনা বললে, 'কিসের উজিরি হারীত ? নাজিরি কিসের ?'

'আমার কথার মানে ধরা গেল না বুঝি ?'

ধরা গেছে হারীতের কথার মানে, কিংবা ধরা যায় নি, কী যে হয়েছে ধরা না দিয়ে অর্চনা পড়ন্ত বেলার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে উঠি-উঠি করবে কি না ভাবছিল। উঠল না, বসে রইল সে।

'সুলেখাদের ওখানে যাবে ?'

'হ্যাঁ। কবে যাবে ?' হারীত বললে।

'কে। আমি ? আমার যাবার কথা নেই তো।'

'কেন, ওরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে নি তো। বিনে নিমন্ত্রণেই যাব দু জনে। জলপাইহাটিতে এসেছি। চারদিকে একটু ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে।'

'বেশ তো, বেড়াও।'

'একা ? একা ?'

'একা দরকার হলে একা। সঙ্গী পেলে তাই-ই সই। এই তো ছিল ওঁর হাল—'

'ওঁর কার ? মহিমবাবুর ?'

'না, নিশীথবাবুর।'

'অ'—হারীত বললে।
'কেন, তুমি ওঁর সঙ্গে বাইরে যেতে না মাঝে-মাঝে?' শুধোল হারীত।
'কে, আমি? আমাকে—কেন আমাকে সঙ্গে নেবেন তিনি?'
'তা নেবেন না। তা জানি আমি। ওকে চিনি না আমি? কিন্তু মাঝে-মাঝে মা যেতেন, মাঝে-মাঝে তুমি যেতে সঙ্গ ধরে—প্রথম-প্রথম একটু পিছে থেকে। যেতে না? উনি যে রাত একটা-দেড়টা অব্দি বেড়াতে ভালবাসেন—তেপান্তরের দিকেই যেতে ভালবাসেন—একাই বেড়াতে যান—মোটের উপর এ সব মিলে বেশ একটা চৌখুপি ছক ছিল বটে।'
হারীত কোন এক দূরের দিকে চেয়েছিল,—অর্চনার দিকে না তাকিয়ে দৃষ্টিটাকে তবুও নিকটতর পদার্থগুলোর দিকে ফিরিয়ে এনে হারীত বললে, 'যার-যার জীবনে যা হয়, তাই-ই হয় তার-তার জীবনে। অন্য কারু জীবনে অন্য রকম হয়।'
বাইরে ভিতরে বাতাস ছিল খুব এত ক্ষণ, বাতাসের তোড় কমে গেছে। ঘরের ভিতরটা একটু গুমোট হয়ে উঠেছে। অর্চনা কান পেতেছিল বটে হারীতের কথায়। কিন্তু ও-সব কথায় যোগ দিয়ে কিছু বলতে গেল না সে।
'জলপাইহাটিতে এসেছ এত দিন পরে, ইচ্ছে করবেই তো বেড়াতে। হিতেনদের সঙ্গে বেড়াতে পারো।'
'হিতেনদের সঙ্গে? হারীত হেসে বললে, 'ওরা তো খোকা'।
'খোকা?'
'কী আমার কাছে আর হিতেনরা?'
অর্চনা কেমন একটু মৃদু তামাসা বোধ করে ভাবছিল, জিজ্ঞেস করবে হারীতকে —অর্চনার কাছে হারীত কী? খোকা? না, কর্তাব্যক্তি? জিজ্ঞেস করবে-করবে করে, তবুও করতে গেল না আর। হারীত ও তার সঙ্গে কেমন সেতু তৈরি হয়ে গেছে যেন ধোঁয়ার মতন; কাটা-ছাঁটা কথার ভাবনার বিচারের ছোঁয়ায় সে-ধোঁয়াটাকে অর্চনা একেবারে উড়িয়ে মুছে ফেলতে চায় না। হারীতকে সুমনাদির ছেলে বলেই মনে করতে পারছে না, নিশীথের ছেলে বলে তো মোটেই না; হিতেন পড়ে ফোর্থ ইয়ারে। 'তুমি বি-এ পাশ করেছিলে কবে না।'
'উনিশশ আটত্রিশে।'

'ও মা দশ-এগার বছর আগে! তোমার বয়স এখন কত হারীত?'

'ত্রিশ-একত্রিশ।'

'নিশীথবাবুর কত?'

'আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশ।'

'ওঁর আঠার-উনিশ বছরের সময়ে তুমি হয়েছিলে?'

'অঙ্ক কষে তাই তো বেরয়।'

অর্চনা হাত পাখাটা তুলে নিয়ে একটু বাতাস খেয়ে রেখে দিল সেটা। ঘরের ভিতর বাতাস এসে পড়েছিল জামরুল বনের বুকের ভিতর থেকে উছলে উঠে: আ!—ভারি আরাম লাগছিল ঘরের ভিতরের জাগা ঘুমোনো মানুষ তিনটির। একটু মুখ আড়াল করে কিছু একটা ভেবে নেবার জন্যে অর্চনা হাতপাখাটা তুলে নিয়েছিল।

'তা হলে সুমনাদির বয়স ছিল কত তখন?'

'পনের-ষোলো—'

'মাত্র?' বললে অর্চনা, 'কী রকম ভীষণ অল্প বয়সে বিয়ে করেছিলেন নিশীথবাবু।'

'সেই জন্যেই আমি বিয়ে করে ফেলতে দেরি করছি। তোমার বয়স কত?'

'আমার চৌত্রিশ। নিশীথবাবুর থেকে চোদ্দ বছরের ছোট আমি।'

'তুমি আমার তিন বছরের বড়' হারীত বললে, 'আমি যদি ছ-বছর আগে জন্মাতাম তা হলে আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট হতে তুমি।'

সুমনা ঘুমের আকুতিতে কেমন কেঁদে উঠল, হেসে উঠল, বিড়-বিড় করছিল, ভোন-ভোন ভোঁ-ওঁ-ওঁ-করতে লাগল।

তারপর ঘরভরা অনেক আশ্রয়দাতা আলগা বাতাসের ভিতর স্থাপিত হয়ে স্নিগ্ধ সমুদ্রের নীচে কানকোর ফুলকোর নিঃসাড়তা নিয়ে ডুবে রইল যেন মাছের মতন।

'এক মাস এ দেশে থাকো তুমি হারীত।'

'থাকব। একটু জিরিয়ে নেওয়া দরকার। কী বলো?'

'হ্যাঁ, ভারি বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে তোমার। কলকাতায় ও-রকম করে থাকলে—'

অর্চনা শরীর দিয়ে বাতাস পান করছিল—ঘরের ভিতর এসে পড়েছে সব।

কী যে নুন, ফেনা, আগাছার মত কত শত কথা অর্চনা ভাবছিল। ঘুমিয়ে পড়তে চায় শরীর। ঘুমের ভিতর থেকে জেগে-জেগে স্থবির স্বপ্নের সংকল্পর প্যাঁচে জড়িয়ে যেতে থাকে একটা আবছা সমুদ্রের ঘনাল অন্ধকারের ভিতর।
'কেমন থাইসিসের রুগির মত চেহারা হয়ে গেছে আমার। যে দেখে সেই বলে।'
অর্চনা অন্য দিকে তাকিয়েছিল ; হারীতের শরীরের উপর চোখ বুলিয়ে নিল একবার ; বাতাসের মত বাহিত হয়ে চলে গেল আবার অন্য দিকে তার চোখ।
'তুমি এখানেই থাকো ; আমি হাতে নিচ্ছি।'
'কী জিনিস ?' হারীত বললে।
'তোমার শরীরটাকে সারিয়ে দেবার ভার।'
দিনগুলো যেন নিদাঘের দিকে চলে যাচ্ছে ; বাতাস আসছে চার দিককার বিকালের নিস্তেজ রোদ পাখপাখালি বনবনানীর উজান বেয়ে—কোথায় চলে যাচ্ছে আবার। কাকের চেয়েও কাল কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি সুগঠিত পাখিগুলো চারদিক থেকে জানিয়ে দিতে আসছে ; যা বাতাস, রোদ, জল, জামরুল, শিমূলের বন, মানুষেরও মনের অবলম্বন, একাকী জানিয়ে দিতে পারে না।
'জলপাইহাটিতে শরীর ভাল করে কলকাতায় গিয়ে আবার তো ভেঙে ফেলে দেওয়া ; আবার ফিরে আসা জলপাইহাটিতে। এই টানা-পোড়েনে কী তৈরি হবে ? আমার কলকাতার থাইসিসের শরীর আর বড, বলবৎ সব স্ট্রাইক ? না, আমার জলপাইহাটির সুস্থ মানুষের মত শরীর আর চারদিককার ভরা মৃগয়ার চিৎকার সারা দিন—মানুষের মাংস খাবার জন্য মানুষের ?'
'স্ট্রাইক করবে না কখনো ; স্ট্রাইক কিছুতেই করতে পারবে না। মোটেই করবে না।'
'না, এখন করব না। আমি করব না, অন্য দশজনে করবে। তাতে তোমার কী লাভ ?'
'তোমার কি রাতে-রাতে জ্বর হয় ?'
'না তো।'
'স্লো-ফিভারের মত হচ্ছে ? টের পাচ্ছ না ?'
'টের পাই। জ্বর নেই।'

অর্চনা থুতনির উপর হাতের মুঠো রেখে হারীতের কথা শুনছিল। বললে, 'আমি তোমাকে একটা থার্মমিটার দেব, যখন দরকার মনে কর, টেম্পারেচার নিয়ে দেখো ; আমাকে জানিও ; চার্ট করে রেখো।'

'কই দাও থার্মমিটার।'

'এখন নয়, পরে দেব। জলপাইহাটিতে তুমি থাকো। এ দেশটাকে ভালবেসে এইখানেই কাজ করো তুমি। চৈত্রের শেষ দিনগুলোর ঘরভরা বাতাসের ভিতর বসে থেকে এ দেশটাকে দেখছ তো তুমি, আমিও দেখছি, কেমন চমৎকার ঘাস, আকাশ, জল, ফসলের দেশ। এখানে কাজ করার অনেক কিছু আছে। অনেক প্রায়মরা-আধমরা মানুষদের উপকার হয় তাতে। স্ট্রাইকের দরকার নেই। আমি তোমার সঙ্গে আছি।'

এক দুই তিন চার পাঁচ সাত আট দশ বারো গুনতে পারা যায় যেন, অনেক ঝাঁকড়া চুলের উজ্জ্বল শিশুদের মত অনেকগুলো বাতাস ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছে। জামা-কাপড়-আঁচল নিয়ে ঝাঁপাঝাঁপি করছে। ভাঙ-ভাঙ করে অর্চনার খোঁপাটা ভেঙে পড়ল প্রায়। না, অত-বড়, জমাট, কাল খোঁপা কি ভাঙে, কিন্তু অনেক গুলো সাপের জিভের মত শকশকে চুল উড়ে-উড়ে অর্চনার কপাল চোখ কেমন বিষকালি করে দিয়ে যাচ্ছে। অর্চনা নিজেকে সামলে নিচ্ছিল।

'তুমি সঙ্গে থাকবে ? কী রকম ভাবে সঙ্গে থাকবে ?'

'তা দেখবে তুমি। পৃথিবীর ভাল করা কঠিন। পৃথিবীর ভাল করা যায় না।'

'কে বলেছে তোমাকে ? তোমার গুরু ?'

'গুরু বলেছে বটে'—অর্চনা অল্পসল্প হাসতে গিয়ে না-হেসে উড়িয়ে দিল বাতাসের ভিতর হাসির অদৃশ্য গুঁড়োগুলোকে। নিশীথবাবুকে অর্চনার গুরু বলছে হারীত ? বাতাসে অর্চনার খোঁপাটা ভেঙেই পড়ল প্রায়। এত বাতাস এ দেশে—অথচ ঝড়ের বাতাস নয়—নীল আকাশে রৌদ্রে কোনো মেঘ নেই। দক্ষিণের ঐ জামরুল শিমূল জাম ঝাউয়ের কোকিল ফিঙে নীলকণ্ঠ মাছ-রাঙাদের পাখার ঝিলিক ডানার সূর্য ইতস্তত নিক্ষেপ করে ; কোনো বিরাম নেই—বাতাসের আত্মদানের কোনো বিরাম নেই।

হারীত একটু ভেবে বললে, 'পৃথিবীর ভাল যে হয় না, সেটা বাবা পঞ্চাশ বছর বয়সে বুঝতে পেরেছেন। আমার তো একত্রিশ। আমি কেন তা স্বীকার

করব।'

'আমি স্বীকার করেছি।'

'তা করেছ তুমি ওঁর শিষ্য বলে।'

অর্চনা খোঁপায় হাত দিয়ে সেটাকে ঠিক করে নিল। আলগা বেঁধেছিল অনেক ভারী চুলের মস্ত বড় খোঁপাটা। ঠিক করতে-করতে সেটাকে আলগা করেই রেখে দিল তবু। কোনো কথা বললে না।

'আমি ভেবেছিলুম—'

'থাক, তোমার বাবার কথা এখন থাক।'

কিন্তু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নিশীথের কথাই পাড়ল অর্চনা; বললে, 'তিনি তো কলকাতায় চলে গেছেন; চিঠি লিখলে আসবেন বলেছেন। তা তিনি আসবেন না।'

'কী করে জানলে?'

'এ যদি না-জানলাম—'

না, এর পর আর নিশীথবাবুর কথা পাড়বার দরকার নেই অর্চনার কাছে। বাতাসে-বাতাসে হারীতের মাথার চুলগুলো কাকের বাসা হয়ে গেছে। অর্চনা তার খোঁপা ঠিক করে নিচ্ছে। হারীত তাকিয়ে দেখল। খোঁপা জুত করে নেবার ছলে নিজের মুখ হারীতকে দেখতে দিচ্ছে না। কেমন যেন সেই মুখ; নাকে ঘাম জমেছে, চোখে শিশির; সামনে একটা চনচনে উনুন রয়েছে যেন।

'তোমার স্লো ফিভার হয়, তুমি নিজে বুঝতে পারছ না, কিন্তু আমি টের পেয়েছি।'

'থার্মমিটার দিলেই মিটে যাবে, কী হয় না-হয়।'

'তুমি জলপাইহাটিতে থাকবার ব্যবস্থা করে ফেলো।'

'থাকব ভাবছি। কত দিন থাকব?'

'রাতে-রাতে জ্বর হলে অনেক দিন থাকতে হবে।'

'কেন, এর বুঝি ওষুধ নেই কলকাতায়?'

'নেই।'

'নেই?'

'তোমার মতন লোকেদের নেই—'

ভোরবেলা সুমনার অসাড় ঘুমের থেকে বাইরের পাতা, পাখি, বাতাস, সজীবতার

দিকে চোখ ফিরিয়ে কেমন যেন এক রকম মনের হঠাৎ উজ্জ্বলো বললে, 'ঠিক, শরীরটাকে ভাল করে নেওয়া দরকার। কেমন অবসন্ন হয়ে পড়েছি। ভারী অসুখবিসুখ হয় নি, তবে দুর্বল হয়ে পড়েছি খুব। ভাল হতে হবে।'

'এইখানে থাকো। সেরে ওঠো, এ দেশটাকে যদি ভাল লাগে—থেকে যাও, কাজ করো—'

'ক দিন থাকবে তুমি এখানে ?'

'আমি ? মৃত্যু অব্দি।'

হারীত একটু চুপ করে থেকে বললে, 'তা হলে আমি যদি থাকি, তা হলে এক-জন লোক হাতের কাছে পাওয়া যাবে তো আমার মৃত্যু পর্যন্ত ?'

'হ্যাঁ, কাজে হাত দিলে আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমার যত দিন কাজ করবার ক্ষমতা আছে।'

'জায়গাটা তো নতুন দেশের এলাকায় পড়েছে। ভালবেসে কাজ করতে পারা যাবে তো ?'

'যেন তুমি ভালবাসো না কাউকে।'

হারীত জামরুলের অগণন পাতার ভিতর সাদা-সাদা ফলের দেশে বাতাসের আসা-যাওয়ার এখন খানিকটা নিঃশব্দ, তবুও সমুচ্ছল, ব্যবহারের দিকে তাকিয়েছিল। পাতাদের গুপ্ত রাজ্যে একটা ফিঙে বসেছিল; উড়ে গেল। শিমূল জামরুলের ঘন ঘেঁষাঘেঁষির ভিতর কোকিলটাকে দেখেছিল একবার হারীত। আর দেখছে না।

'কিন্তু একজন মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত; সে তো অনেক দিনের কথা। আমি মরব কিংবা তুমি মরবে—অনেক দিন পরে হয় তো। কিন্তু সেইদিন পর্যন্ত কি এই রকমই থাকবে সব ?'

অর্চনা উঠে দাঁড়াল—'অত দূরের কথা ভাবি না আমি। মরার কথাও ভাবি না। এটা যে নতুন দেশ, তাও ভাবি না। শরীরটাকে ঠিক করে নাও। থাকো এখানে, কাজ করো। ভালবেসেছ কি কিছু ?'

'ভালবেসেছি'—আরো খুলে পরিষ্কার করে বলতে গিয়ে, হারীত অনুভব করল অর্চনা জানতে চাচ্ছে না। উড়ো মরালের স্বৈরী আগ্রহে নয়, সেটাকে শান্ত করে নিবিড় নিবিষ্ট হয়ে হারীত যা বলতে চাচ্ছে সেটা বুঝে দেখতে চাচ্ছে না অর্চনা।

'সে যে জিনিসই হোক, ভালবেসে থাকলে কাজে প্রাণ পাবে, শান্তি পাবে কাজ করে।'

'শান্তি-টান্তি চাই না আমি। তবে মাঝে-মাঝেই করমচার বনে গিয়ে বসতে চাই—তেপান্তরের দিকে মুখ রেখে—ওখানে গিয়ে কথা বললে কেমন হয়।'

'ওঃ! নিশীথবাবু যা চাইতেন না।'

'চাইতেন না বুঝি তিনি ?'

'না।'

'কিন্তু আমি তো চাই।'

'তুমি চাও ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আজকালই—'

অর্চনা যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে এ-রকমভাবে বললে, 'কোনো তাড়াহুড়ো নেই এ দেশে।'

কলকাতায় পৌঁছে জিতেন দাশগুপ্তের বাড়িতে এক রাত কাটিয়েছে নিশীথ। সে রাতে জিতেন ছিল তার বাড়িতে। পর দিন সকালেই অফিসে চলে গেল জিতেন। তারপর জামসেদপুর। সকালবেলার থেকে দুপুর অব্দি, কেটে গেল নিশীথের জিতেনের বাড়িতে প্রথম দিনটা। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ড্রয়িংরুমে বসে কথাবার্তা হল নমিতার সঙ্গে—তার পর দু জনেই নিজ মনে বই পড়ে নিল ঘন্টা দুই-আড়াই। বাইরের দিকে অবিশ্যি মন ছিল না কারুরই; অন্য অনেক কথা ভাবছিল তারা; দু-এক পাতার বেশি পড়া হল না। বই বন্ধ করে সরিয়ে রেখে দিল; ঠিক হয়ে বসল; মুখোমুখি বসেছিল কেমন যেন নিঝঝুম হয়ে। ঠিক বুঝতে পারছিল না। কী কথা বলতে চায়—হয় তো কোনো কথার দরকার নেই তা হলে এখন আর; বাইরের অন্ধকার থেকে এমন একটা আশ্চর্য পরিভাষায় অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে চৈত্রের বাতাস ঘরের ভিতরে-ফিতরে আনাচে-কানাচে, দেয়াল-ক্যালেণ্ডারকে ঠক-ঠক করে কাঁপিয়ে, খোলা বইয়ের পাতা উল্টিয়ে-লড়িয়ে, যেখানে যা রেশমের মত উর্ণা ছিল, মানুষের সোনালি চুল, কাল চুল, শার্টের কলার, শরীরের স্নায়ু হৃদয় জিনিস-টাকে বিস্রস্ত বিচলিত করে নিস্তব্ধতার ভিতর শুক্তি প্রসবের মত কী এক

অন্তঃশীল সাড়া নিয়ে উড়ে আসছিল—চলে যাচ্ছিল রাত্রির বাতাস।

'জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। আপনি পড়বেন?'

বাইরের আকাশে সাদা মেঘে কেমন আলো—'না, পড়ব না, বাতিটা নিভিয়ে দেওয়া যাক।'

বাতি নেভাতেই চারদিক থেকে ছুটে এসে স্থির হয়ে রইল নানা রকম জ্যোতির্ময় জ্যামিতিক খণ্ডের মত ভিতরের জ্যোৎস্নাগুলো।

'চাঁদটাকে তো দেখছি না'।

'উপরে উঠে গেছে।'

'উপরে? বেশি কি রাত হল?'

'না, আজ সপ্তমী তিথি কিনা। বিকেলবেলার থেকেই টঙে চড়ে আছে চাঁদ। কী খুঁজছেন; সিগারেটের টিনটা? এই যে আমার সোফায় আমার কোলের উপর'—কোনো কথা না-বলতেই নিজের সোফার থেকে উঠে একটু এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে টিনটা তুলে নিয়ে বললে, 'কিছু মনে করবেন না, একটা সিগারেট খাচ্ছি। নিন আপনি একটা।'

'দেশলাই নিন।'

দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালিয়ে দুটো সিগারেট জ্বালাতে গিয়ে পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে পড়ল; দুটো কাঠি জ্বালালেও তো হত একটার পর একটা ধীরে সুস্থে—দু জনের দুটো সোফার দূরত্বের ভিতর বসে থেকে; এ-রকম কথা ভাবতে গেল না কেউ। মনের অবস্থা তাদের পরস্পরকে কেমন যেন কাছে টেনে এনেছে।

টেলিফোন বেজে উঠল, নিশীথ শুনতে পেল প্রথম। বললে না কিছু। নমিতাও না শুনেছে যে তা নয়; সহসা সাড়া দিচ্ছে না।

'আপনার টেলিফোন নমিতা দেবী।'

'শুনেছি। যাচ্ছি। বেরুবেন কি আজ?'

'না।'

'চলুন, মোটরে বেরিয়ে আসি।'

'কোন দিকে?'

'চৌরঙ্গিতে চলুন। আমার একটু মার্কেটিং করতে হবে'—নমিতা বললে।

'এত রাতে?'

'না, রাত তো বেশি নয়। কিছু পাখি আনা যাবে নিউ মার্কেট থেকে কিনে। বাবুর্চি ভাল জিনিস আনে না। পয়সা চুরি করে। মাখন আনতে হবে; প্যাস্ট্রি; কী পাখি ভালবাসেন আপনি?'

'সব পাখিই?'

'ভালবাসেন—সব পাখি?'

'ও, খেতে? না-না—'

'তবে কি শুয়োরের মাংস? পর্ক?'

'শুয়োরের মাংস আমি খাই নি কোনোদিন—'

'খুব ভাল জিনিস। আপনি হয় তো মিষ্টি খেতে ভালবাসেন—'

নিশীথ এত সব কথাবার্তার বহর করছিল না নমিতার কাছ থেকে। বই পড়ে না পড়ে দু ঘণ্টা নিস্তব্ধ হয়ে থেকে—তার পরে বই বন্ধ করে, বাতি নিভিয়ে, তাদের দু জনে নিরবসন্ন নিঃশব্দ নিবিড়তার ভিতর রয়ে গেছে। নিশীথ মননযানের সেই বিদূর চৈত্ররজনীর নেপথ্যে থেকে শুয়োরের মাংসের দেশের অবিমিশ্র বাচালতায় নেমে পড়েছে; দেখ, কি সহজে মানুষের মন, এই নারীটির মন।

'টেলিফোন,' নিশীথ বললে, 'অনেক ক্ষণ থেকে ডাকছে; জিতেনকে?'

'শুনেছি।'

'এটা অবিশ্যি প্রথম রাতের ফোন।'

'বৌনি হল'—নমিতা একটু হেসে বললে।

'বেশি রাতে ভাল জিনিস আনবে। এখনকার এ ডাকটাকে অগ্রাহ্য করতে পারেন।'

'বুঝেছি।'

নমিতা উঠে ঘাড় কাত করে হাসতে-হাসতে চলে গেল। কলিং বেল বেজে উঠল। নিশীথ বাতি নেভানো ঘরে একা বসে সিগারেট টানছিল। কে ডাকছে কলিং বেলে? কাকে ডাকছে? উঠে যাবে নাকি ভাবছিল। নীচে নেমে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসবে?

বিশু এসে বললে—'একজন ভদ্রলোক এসেছেন।'

'মেমসাহেবের কাছে?'

'না, আপনার কাছে। আপনি সেন সাহেব?'

‘সেন সাহেব নয়—সেনবাবু। হ্যাঁ।’ নিশীথ উঠবার উপক্রম করছিল।
বিশু বললে, ‘ডেকে আনব তাঁকে ?’
‘আনবে ?’ নিশীথ চার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে, ‘আচ্ছা নিয়েসো।’
ড্রয়িং রুমের বাতিটা জ্বালিয়ে নিল নিশীথ। বিশু সঙ্গে করে নিয়ে এল ; খোলা গলা, হাফ শার্ট, ট্রাউজার পরা ত্রিশ-একত্রিশ বছরের একজন ছোকরা। ভাল করে তাকিয়ে দেখল নিশীথ। এ কে ? এ লোকটাকে তো [illegible] কোনোদিন, [illegible]। ভদ্রলোক হাসি মুখে নমস্কার জানাল নিশীথকে, প্রতিনমস্কার করে নিশীথ একটু অবাক হয়ে বললে, ‘আমাকে চাচ্ছেন ?’
‘হ্যাঁ, আপনাকেই।’
‘আমি তো নিশীথ সেন।’
‘হ্যাঁ, প্রফেসর নিশীথ সেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমি—’
‘আমি তো প্রফেসর নই। বসুন।’
ভদ্রলোক নমিতার খালি করে দেওয়া কৌচে বসে পড়ে বললে, ‘আপনি জলপাইহাটি কলেজের ইংরেজির প্রফেসর নন ?’
‘ওটা কি একটা কলেজ। ওখানে প্রফেসর বলে না।’
‘সে সব বিচার করবার ভার তো আমাদের উপর নয়। ছোকরাটি বললে, আমার নাম সুবল মুখুজ্যে, আমি এম-বি পাশ ডাক্তার। আমার স্টেথিস্কোপটা হল ঘরে রেখে এসেছি, হারিয়ে যাবে না তো ?’
‘হল ঘরে ? বসুন, আমি নিয়ে আসছি।’
‘আপনি বসুন, আমি আনছি।’
স্টেথিস্কোপ ঝুলিয়ে-দুলিয়ে এবারে আর-একটা কৌচ বেছে নিয়ে বসে সুবল বললে, ‘আমি কলকাতার মেডিক্যাল এম-বি, ট্রপিক্যাল ডিজিজেরও রিসার্চ করছি, আমি টিউবারকুলোসিসেরও স্পেশ্যালিস্ট—’
মানুষটির গুণপনা তা হলে কম নয়, দেখতেও মন্দ না। বেশ সুস্থ, সবল, সফল ; একটা নির্দোষ ভাবও রয়েছে মুখের মধ্যে ; রয়েছে বিবেচনা শক্তির কেমন একটা সহজ সজাগ সাধুতা যেন, নিশীথ অবহিত চোখে সুবলের দিকে তাকিয়ে দেখছিল।
‘সিগারেট নিন।’
হাত জোড় করে সুবল বললে, ‘মাফ করবেন, আমি খাই না।’

'জলপাইহাটি থেকে এসেছেন বুঝি ? নাকি সাব-ডিভিশন থেকে—'

'না। আমি কলকাতায় প্র্যাকটিস করি—'

'ওঃ'; নিশীথ বললে; কী যে অন্যমনস্ক মন তার; এই তো ভদ্রলোক বলছিলেন ট্রপিক্যাল ডিজিজের রিসার্চ করছেন—

'আমি আগে কাঁচড়াপাড়ায় ডাক্তারি করতুম। আজকালও যাই মাঝে-মাঝে সেখানে—'

'ও শিগগির গিয়েছেন ?'

'সেখান থেকেই ফিরেছি কাল কলকাতায়।'

'কলকাতায় কোথায় থাকেন আপনি ?'

'আমি পার্কসার্কাসে থাকি।'

'সেখানে কি সুবিধে হয় ?'

'বড্ড গোলমাল চলছিল। দাঙ্গার সময় পার্কসার্কাসে ছিলুম। খুন করে ফেললেও করতে পারত। কিয়েকবার চেষ্টাও করেছিল। ডাক্তার বলে কেউ-কেউ আমার উপর সদয় ছিল। কিন্তু ম্যাস-হিস্টিরিয়ার সময় মানুষ তো আর কাণ্ডজ্ঞানে চলে না',। সুবল বললে, 'পার্কসার্কাসের শাহাদৎ হোসেনের পরিবারই আমাকে রক্ষা করেছে; বিশেষত, মেয়েদের হিম্মতেই বাঁচা সম্ভব হয়েছে—সে এক ফিরিস্তিই বটে—'

'কী হয়েছিল, বলুন।'

সুবল হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, 'আর-এক সময় বলব,' নিশীথের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'কাঁচড়াপাড়ার কথা বলছি।'

'সেখানে তো যক্ষ্মা হাসপাতাল আছে।'

'আছে। দেখেছেন হয় তো।'

'নাঃ যাই নি। সেখানে আমার শালা আছেন, শঙ্কর গুপ্ত, বড় ব্যবসায়ী লোক, কয়েক লাখ টাকা আছে।'

'তাঁকে চিনি আমি, কাল দেখা হয়েছিল গুপ্ত সাহেবের সঙ্গে। আপনার মেয়েকে কার সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন কাঁচড়াপাড়ায় আপনি ?'

'আমার মেয়েকে ? ভানুকে ?' নিশীথের বুকটা দুর দুর করে উঠল, বললে, 'ভানুর খবর কী ? আপনি দেখে এসেছেন তাকে ?'

'বলছি,' স্টেথোস্কোপটা সোফার উপর থেকে তুলে নিয়ে হাতে দুলিয়ে সুবল

বললে, 'কই আপনি বললেন না তো, মেয়েকে কার সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন?'
'কেন, কী হয়েছে, আমি নিজে যেতে পারি নি, আমার নিউমোনিয়া হয়েছিল তখন, জলপাইহাটি কলেজের প্রফেসর মহিমবাবু ভানুকে কাঁচড়াপাড়ায় তার মামার বাড়িতে রেখে এসেছিল। মহিম ফিরে এসে বলেছিল আমাকে, যে ভানুর মামা তাকে যক্ষ্মা হাসপাতালে রেখে দেবেন। ব্যবস্থা করছেন।'
সুবল বললে, 'তারপর আর-কোনো খোঁজখবর নেন নি আপনারা?'
'নিতে পারি নি। নিউমোনিয়া থেকে সেরে উঠতে সময় লাগল। স্ত্রীর খুব বেশি অসুখ হল। চলছে এখনো, বাঁচবে কি না কে জানে। আমার ছেলে তো কলকাতা রানাঘাট, রানাঘাট কলকাতার বাঁশবনে পলিটিক্স করে বেড়াচ্ছে। মফস্বলে মাস্টারি করে সব দিক সামলানো বড় কঠিন সুবলবাবু।'
'একটা চিঠিও তো লেখেন নি?'
'কাকে? শঙ্করবাবুকে? আমার স্ত্রী লিখেছিলেন। কোনো উত্তর পান নি।'
'শঙ্করদা তো বললেন না কিছু চিঠির কথা—'
'বলেন নি? নিজেও আমাদের জানান নি কিছু। কেমন আছে ভানু?'
'বেড পায়নি কাঁচড়াপাড়া হাসপাতালে—'
'বেড পায়নি!' নিশীথ আকাট অন্ধকারে সুবলের দিকে তাকিয়ে রইল, 'কোথায় আছে তা হলে?'
নমিতা ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে সুবলকে দেখে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললে, 'আমি যাচ্ছি, নিশীথবাবু।'
'কোথায়?'
'পার্কসার্কাসে।'
'আপনার বাবা ডাকছেন বুঝি? কেমন আছেন তিনি?'
নমিতা একটু থেমে, ভেবে বললে, 'আছেন এক রকম। আগের চেয়ে যে খারাপ তা নয়। কিন্তু মা ডেকেছেন ও-ফ্ল্যাটে, মার বড্ড অসুখ হয়ে পড়েছে।'
'কী হয়েছে?'
'মাথায় যন্ত্রণা খুব, জুলফিকার ফোন করেছিল। আমাকে যেতে বলেছে,' আড়চোখে সুবলের দিকে তাকিয়ে নমিতা বললে, 'ইনি কে?'
'ইনি হলেন সুবলবাবু, ডাক্তার সুবলবাবু।'
'আজ্ঞে—'

'ইনি হচ্ছেন শ্রীযুক্তা নমিতা দাশগুপ্ত, আমার বন্ধু গ্র্যাহাম অ্যাণ্ড গ্র্যাহামের শ্রীযুক্ত জিতেন দাশগুপ্তের স্ত্রী'—হাসির ঝিলিক, নমস্কার দেয়া-নেয়া শেষ হয়ে গেলে নমিতা বললে, 'আচ্ছা আমি উঠি। জুলফিকার আমাকে ডাকছে—'

'জুলফিকারের অসুখ ?'

'না, সে ভাল আছে। অসুখ শুধু মার।'

'আপনার বাবার অবস্থাও একই রকম ?'

নমিতার ভুরু দুটোর মাঝখানে একটু খিঁচ এসে পড়েই মিলিয়ে গেল, বললে, 'প্রায় সেই রকমই। একটু খারাপ হয়েছে হয় তো। ডাক্তারবাবু আসবেন।'

'ডাক্তর রোজেনবুর্গ ?'

'রোজেনবুর্গ !'

'জুলফিকার'—নিশীথ থেমে গেল।

'জুলফিকারের কথা কী বলছিলেন ? জুলফিকার দু বার ফোন করেছিল, আমাকে বললে। এবারে যে করেছে তার আধ ঘণ্টা আগে আরেক বার।'

'কই শুনি নি তো। আপনি শুনেছিলেন ?'

'না। শুনি নি তো। কী হল ?'

'জুলফিকার নিজে বলেছে যে ফোন করেছিল ?'

'নিজের মুখে বলেছে জুলফিকার'—নমিতা বললে।

'তা হলে তো মহাভারত অশুদ্ধ হয় না,' নিশীথ বললে।

নিশীথের মুখের গম্ভীর নিস্তব্ধতার দিকে তাকিয়েই কেমন যেন একটু হাসি পেল সুবলের। সুবলের মুখে যে-হাসির ভাব এসে পড়েছে নমিতার সেদিকে দৃষ্টি ছিল না; নিশীথ আন্দাজ করছিল হয় তো যে সুবল হাসছে। কিন্তু সে সুবলের দিকে ফিরে তাকাচ্ছিল না।

'জুলফিকার শব্দের মানে কী ?' নিশীথ জিজ্ঞেস করল। নমিতা মানে জানে না। কোনো ইংরেজির থেকে ইংরেজি, বাংলার থেকে বাংলা কোনো অভিধানেই শব্দটির মানে পাওয়া যাবে না, সুবলও বলে দিতে পারে না। কোনো রকম ডিকশনারিই নেই এ বাড়িতে; কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল নিশীথ।

'জুলফিকার—'

'কী বলছিলেন জুলফিকার'—সচকিত হয়ে মুখ তুলে তাকাল নমিতা।

'জুলফিকার হয় তো ভুল করেছে ? আধঘণ্টা আগে ফোন সে করে নি।'

'তবুও বলেছে ফোন করেছে এটা কী রকম ভুল ?'

নিশীথ তার চোখ দুটো সুমুখের দেয়ালের ওপর—তারও উপরে বিমের দিকে তুলে নিয়ে গম্ভীরভাবে বললে, 'এ ধরনেরও এক রকম ভুল আছে বটে।'

'তা থাকতে পারে,' নমিতা তেরছা মাথায় আড় চোখে নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কিন্তু কোনো রকম ভুল করবার ছেলে নয় তো জুলফিকার।'

'কখনো ভুল হয় না তার ?'

'এ বয়সে কেন হবে ?' নমিতা বললে, 'কোনো বয়সেই হয় না ওর মতন মানুষের।'

'সকলেরই ভুল হয়, শয়তান ছাড়া,' নিশীথ একটু দুষ্টুমি করে হেসে বললে।

নমিতা ডোরাকাটা স্ল্যাকস পরে এসে ছিল, পায়ে উইমেনজ একসিলারি কোরের মিলিটারি জুতো, কিউই দিয়ে পালিশ করতে-করতে নিজের মুখ তাতে দেখে ফেলেছে হানিফ। বুট সমেত ডান পাটা খানিকটা উঁচিয়ে স্ল্যাকসের ডোরাগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে নমিতা বললে, তা হলে শয়তান হবে জুলফিকার। কী মানে আছে স্বর্গের, যদি সেখানে জুলফিকারের মত শয়তান না থাকে।

হদিসের কথা। সন্ধ্যে বেলা মাঝদিঘির ঘাপটিতে যে-সব রুই-চিতল চরে বেড়ায় তাদের বুড়ো ল্যাজের তেল-চকচকে কথা।

'নিশীথ নিজের হাতের নেবানো সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিল আবার।'

নমিতা সিগারেট জ্বালিয়ে নিল—'টেলিফোনে জুলফিকারের গলা রিসিভার ধরলেই আমি বুঝতে পারি। জিতেনের গলার চেয়ে ভাল করে চিনি আমি জুলফিকারের গলা।'

'কেমন ফ্যাসফ্যাস করে যেন টেলিফোনে জিতেনের গলা'—নমিতার দিকে তাকিয়ে নিশীথ বললে।

'না তা নয়, জিতেন পেটে আধখানা কথা রেখে দেয় কি না, সেই জন্যেই অস্পষ্ট। বেশ পরিষ্কার করে বলে সব জুলফিকার। আমি উঠি। আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।'

'কে ? মা ?'

'না, জুলফিকার।' নমিতা চলে যাচ্ছিল, নিশীথ ডাক দিয়ে বললে, 'শুনুন

নমিতা দেবী।'

নমিতা ফিরে এসে খুব অভিনিবেশের সঙ্গে নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কি ?'

'আমি বলছিলুম জুলফিকার'—নিশীথ বললে না কিছু ; নমিতা দাঁড়িয়ে রইল। নিশীথ বললে না আর-কিছু। কী বলবে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল নমিতা।

'জুলফিকার কি ? কি বলছিলেন জুলফিকার ?' নমিতা জিজ্ঞেস করল।

'আমি বলছিলুম জুলফিকার কী সিরেফ জুলফিকার ?'

'আচ্ছা', সুবলের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি চারিয়ে নিশীথের পিঠে টোকা মেরে হাসতে-হাসতে বেরিয়ে গেল নমিতা। যাবার সময়ে বলে গেল, 'খেয়ে নেবেন নিশীথবাবু। নটা-দশটার সময়, আজ রাতে যদি বাড়ি না ফিরি। ফিরব না হয় তো'।

'জুলফিকার কি সিরেফ 'জুলফিকার ?' বেশ গলা ছেড়ে বলে উঠল নমিতা হল ঘরটা পেরিয়ে যাবার সময়। হো হো করে হেসে উঠল। 'My !' নেমে হানিফের স্ল্যাঙ, খানিকটা জোর উর্দু ঝেড়ে মোটর বার করে নিয়ে চলে গেল। খুব চিন্তিত মুখে সুবলের দিকে তাকিয়ে নিশীথ বললে, 'কাঁচড়াপাড়ায় বেড পায় নি। কোথায় আছে ভানু তা হলে ? একটা চিঠি লিখেও জানালেন না আমাদের শঙ্করবাবু—তা হলে তো আমি নিজেই কাঁচড়াপাড়ায় গিয়ে ব্যবস্থা করতাম।'

'তিনি তো আপনাদের দুষছেন। কোনো খোঁজ খবরই নিলেন না আপনারা। তা দুষতে পারেন বটে, আমাদেরই দোষ, স্বীকার করে নিল নিশীথ, কোথায় আছে ভানু ?

'এত দিন তো শঙ্করবাবুর বাড়িতেই ছিল—তাঁর মোটেই ইচ্ছা নয় যে তাঁর ওখানে থাকে, নিজের বাড়িতে যক্ষ্মা রুগিকে রাখতে চান না তিনি।

'তা জানি। ভানুর মামা হন তিনি, কিন্তু আমাদের কারু সঙ্গেই কোনো আত্মীয়তা রাখতে চান না। ডেকেও জিজ্ঞেস করেন না তাঁর সহোদর বোনকে, আমার স্ত্রীকে।'

সুবল স্টেথোস্কোপটা একবার শূন্যে নাচিয়ে নিয়ে বললে, 'বড় বিচ্ছিরি রোগ। কেউ, রাখতে চায় না থাইসিসের রুগিকে নিজের বাড়িতে, নিজের বাচ্চা হলেও রাখতে চায় না।'

নিশীথ তার হাতের সিগারেটটা ফেলে দিল। পকেটের থেকে একটা কৌটো বার করে ক্যাকটিনা পিল গিলে ফেলে বললে, 'ঠিকই তো। কিন্তু এত বড় এক জন লোক শঙ্করবাবু, কাঁচড়াপাড়ায় একটা বেড যোগাড় করে দিতে পারলেন না। কেবিনও তো পারতেন ঠিক করে দিতে।'

'ভর্তি যে হাসপাতাল।'

'আর যাদবপুরে'?

'আমি নিজে গিয়ে চেষ্টা করেছি যাদবপুরে—'

'ভানুর জন্যে?'

'হ্যাঁ। ভর্তি একেবারে হাসপাতাল।'

নিশীথ বললে, 'আদ্যিকাল থেকেই ভর্তি হয়ে আছে? নতুন রুগি আর আসছে না? কথা হচ্ছে আমাদের রুগির জন্য বেড নেই। শঙ্করবাবু গা দিলে কোথাও না কোথাও বেড পাওয়া যেত। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে কি আর বেড জোটে? অবিশ্যি আমার মেয়ে, দায়িত্বটা আমারই। কিন্তু আমি জানতে পারি নি তো এই রকম হয়েছে—'

'শুধু চিঠিফিটিতে হয় না, আপনি একবার গেলে পারতেন নিজে কাঁচড়াপাড়ায়, নিউমোনিয়া থেকে উঠে—'

'ভুল হয়ে গেছে। আমি উঠে দাঁড়াতে না-দাঁড়াতেই কঠিন রোগ হল আমার স্ত্রীর। কিন্তু তবুও আমার যাওয়া উচিত ছিল। কেমন আছে ভানু?'

'শঙ্করদা আর রাখতে চাচ্ছেন না ভানুকে।'

'রাখতে চাচ্ছেন না? কেন, মরে যাচ্ছে ভানু?'

'আপনি কলকাতায় এনে রাখতে পারবেন?'

'ভানুকে? কাঁচড়াপাড়ায় কি বেড পাওয়াই যাবে না?'

সুবল দেখে এসেছে, জেনেছে, সতর্কিতভাবে মাথা নেড়ে বললে, না 'শীগগির নয়।'

'যাদবপুরেও না?'

'বড়লোক দিয়ে বড়লোককে খোশামুদি না করিয়ে নিতে পারলে পাওয়া কঠিন। জানাশোনা আছে মন্ত্রীদের কারুর সঙ্গে ,আপনার?'

নিশীথ অনেক জলে নেমে পড়া স্নিগ্ধ হাঁসের মত সফলতার, ঘরের অবিরাম বাতাসের মধ্যে বসে থেকে বললে, 'মন্ত্রীদের সঙ্গে আমার? না সে সব নেই

কিছু।'

'ভেবে দেখুন তো ভাল করে। আজ কাল তো স্বাধীনতার নানা সুবিধে সব দিক দিয়েই।'

'স্বাধীন মন্ত্রীদের কাউকে চিনিনে আমি। কাউকেই না।' নিশীথ সুবলের দিকে তাকিয়ে বললে, 'না, ব্যোমকেশ চক্কোত্তি গয়নভি গজচক্র বলত সেই মিনিস্ট্রিতে সে সময়। গজচক্রের আমল থেকে আজ অব্দি কত মিনিস্ট্রি এল গেল, আমার বাবাও চেনেন নি কাউকে, আমিও না। স্কুল কলেজে পড়ি নি এদের কারুর সঙ্গে। বড় মানুষ হলে ইস্কুল কলেজের ইয়ারদের কথা মনেও থাকে না কারু।'

'অ্যাসেম্বলি কোনো হোমড়াচোমড়াকে চেনেন?'

'কাউকেই চিনি নে।'

'কর্পোরেশনের—?'

'কিংবা বি-পি-সি-সি, অভয়াশ্রম সোদপুর—কাউকেই চিনি নে দাদা। থাকি জলপাইহাটিতে, কী করে চিনব? কলকাতায় এলে বড়লোক ঘেঁষি না। জিতেন আমারই মতন ফর্দা লোক ছিল যুদ্ধের সময়ও; ওর সঙ্গে মিশতে-মিশতে দেখতে-দেখতে ও বড় লোক হয়ে গেল।'

'দাশগুপ্ত সাহেব হয় তো চেনেন অনেককে?'

'তা চিনতে পারেন', চিন্তিত মুখে, কোথাও কোনো সমাধান আছে কি না সন্ধান করতে-করতে বললে নিশীথ, 'দাশগুপ্ত নেই তো এখানে।'

'নেই?'

'জামসেদপুরে গিয়েছেন।'

'মিসেস দাশগুপ্তকে বলে দেখলে হয়। অনেক বড়-বড় চক্রে চলাফেরা, মানুষটিও বেশ দরদি, দরাজ, তাই তো মনে হল।'

নিশীথ সোফায় ঠেস দিয়ে ঘাড়ে একটা ভাঁজ ফেলে ডান হাতটা তুলে আঙুলের নখের দিকে তাকিয়ে সাত-পাঁচ ভাবছিল; নমিতাকে কী বলতে হবে নিশীথের, কাঁচড়াপাড়া যাদবপুরের টি-বি হাসপাতালের বেড বুক করা যায় যাতে কাউকে ধরে-টরে খুব তাড়াতাড়ি? আজ তো এই প্রথম দেখা নমিতার সঙ্গে। এ নামে কোনো স্ত্রীলোক আছে গতকালও তো জানত না সে। নিশীথকে যে কে ভাল করে জানত না নমিতা। নিশীথের পারিবারিক কথা জিজ্ঞেস করে নি, নমিতাকে

বলেও নি কিছু সে। জিতেন দাশগুপ্তও তো জানে না রানু হারিয়ে গেছে, ভানুর যক্ষ্মা, সুমনা এই রকম, হারীত ঐ রকম, নিশীথের নিজের ব্যাপারটাও সব রকম ; এ তো জিতেন জানে না, জানতে চায়ও না। যে-সৌহার্দ ভাঙিয়ে খেয়ে জিতেনের বাড়িতে এবারেও উঠেছে নিশীথ সে জিনিসের চেহারা এত-দিনে কী রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক করে বুঝবার অবসর না দিয়েই জিতেন তো জামসেদপুরে চলে গেছে।

যদি নিশীথ বোঝে যে ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না, তা হলে নিজেকে জোর করে এ বাড়িতে গছিয়ে দিয়ে থাকবে না সে। কলকাতায় আজ-কাল বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না, গোয়াল পাওয়া যাচ্ছে না। তবুও কোনো গোয়ালে গ্যারাজে জোটে কি না আস্তানা খুঁজে দেখবে। না হলে জলপাইহাটি ফিরে যেতে হবে। মিছে কারু উপর অবিচার করতে চায় না নিশীথ। জিতেন ও নমিতা দু জনেই —যা দেখছে নিশীথ—লোক ভাল, কিন্তু এখানে অনাহ্বানে রবাহূত অতিথির মত এসে বেচারিদের পারিবারিক স্বাধীনতা নষ্ট করার কোনো অধিকার নেই তো নিশীথের।

'ভানুকে অবিলম্বেই কলকাতায় আনতে হবে ?'

'আজ তো হবে না, কাল আনলেই ভাল হয়।'

নিশীথ চক্ষুস্থির করে তাকাল—'দুটো দিনও আর সবুর সইবে না ?'

ঘড়ির ডায়ালের মত স্টেথোস্কোপটা দোলাতে-দোলাতে সুবল বললে, 'না, আর পারবেন না।'

'আমি যদি কলকাতায় না আসতাম এখন ? আমি যে এখানে এসেছি তাঁকে তা কে বললে ?'

'অনেক দিন থেকেই তো লোক পাঠাচ্ছেন এখানে আপনার খোঁজে। কলকাতায় এলে যে এখানে থাকেন আপনি, শঙ্করদা জানেন তো। শুনেছিলেন আপনার আজ-কাল কলকাতায় আসবার কথা।'

শঙ্করবাবুর কাছ থেকে এসে এ বাড়িতে আমার খোঁজ করত ভানুর ব্যাপার নিয়ে ? একটু অস্বস্তি বোধ করল নিশীথ—'কাকে পাঠানো হত ?'

'আমিই তো এসেছি বরাবর।'

'কার কাছে খোঁজ নিয়েছেন আপনি ?'

'দাশগুপ্ত সাহেবের কাছে। হানিফের কাছে।'

'মিসেস দাশগুপ্তের কাছে ?'

'না, ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। দাশগুপ্তকে আমি জিজ্ঞেস করে যেতাম কলকাতায় আপনি এসেছেন কিনা। এ ছাড়া আর-কিছু বলার দরকার হয় নি তাঁকে, তিনিও জিজ্ঞেস করেন নি কিছু।'

এই তো এইমাত্র ক্যাকটিনা পিল খেল, বুকের ভিতর কেমন ধড়ফড় করছিল বলে। হার্টে অসুবিধা, নিশ্বাসে কষ্ট। একটু ভাল বোধ করতেই সিগারেটের টিনটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল আবার নিশীথ।

'কোথায় আনি ভানুকে। কী করি ?' ক্লিষ্ট মুখে সিগারেটের টিন হাতে করে নিশীথ বসে রইল।

'এ বাড়িতে তো আনা যেতে পারে ?'

'এটা তো আমার নিজের বাড়ি নয়—'

'নীচের তলায় দূরে একটা আলাদা ঘরে থাকতে পারে।'

'ও রকম রুগিকে নিজের বাড়িতে কেন রাখবে জিতেন ? আমি কেন রাখতে দেব ? জিতেন হয় তো রাজি হয়েও যেতে পারে—কিন্তু না,' নিশীথ ঘাড় নেড়ে বললে, 'আপনি ডাক্তার মানুষ, সুচিন্তাও করছেন। বোঝেন তো সব দিক দিয়েই জিনিসটা খারাপ—খুব খারাপ হবে।'

'তা হলে শঙ্করবাবুকে বেশি দোষ দিতে পারেন না। তিনি তো এতদিন রেখেছেন।'

নিশীথ বললে, 'তা ঠিক। যারা উপকার করে তারা একটু চাঁট মারলেই আমরা হেলে পড়ি। অবিচার করি। শঙ্করবাবু আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। কে কার জন্যে করে ? কিন্তু তিনি করেছেন।'

'কিন্তু এখন কী করবেন ?'

'কলকাতায় যে-সব আত্মীয় বন্ধু আছে আমার তাদের বাড়িতে, উঠতে বা এক বেলা থাকতে আমি নিজেই সঙ্কোচ বোধ করি। ভানু কী করে—'

'কালকের ভিতরেই একটা কিছু ঠিক করে ফেলতে হবে তো। আজই গিয়ে বলতে হবে শঙ্করবাবুকে।'

নিশীথ মরীয়া হয়ে বললে, 'চার পাঁচদিন পরে জিতেন ফিরে আসবে। এ কটা দিন অপেক্ষা করতে পারবেন না শঙ্করবাবু ?'

'ওঁরা কালই পুরী চলে যাচ্ছেন।'

'কালই।'

নিশীথের শার্টের গলার বোতাম খোলা ছিল, কেমন একটা হাঁফ বোধ করে আর-একটা বোতাম খুলে দিল সে; বললে, 'মিসেস দাশগুপ্ত আজ রাতে আর ফিরবেন বলে মনে হয় না। না হলে তাকে বলে এই বাড়িতে কয়েকটা দিনের জন্যে একটা ব্যবস্থা করে নেয়া যেত—'

'একটা ফোন করে দিন মিসেস দাশগুপ্তকে—'

'এখন এ বিষয় নিয়ে তাকে ফোন করা চলে না।'

'কেন?'

'মিসেস দাশগুপ্ত জুলফিকারদের সঙ্গে একটু মজলিস করতে গেছেন।'

বলে ফেলে কেমন একটু অপ্রস্তুত বোধ করল। কথাটা বোধ হয়, (ঠিক জানে না নিশীথ), মিসেস দাসগুপ্ত জুলফিকারের সঙ্গে রাত কাটাতে গেছে। কিন্তু সে কথা সুবলকে সে তো বলতে পারে না। যা বলেছে সেটাও বলা উচিত হয় নি হয় তো। মা-বাবাকে দেখতে গেছে। আজ ওখানেই থাকবে—এইটুকু কথা বলা উচিত ছিল সুবলকে!

'মজলিসে কি মদ খাওয়া হবে?'

নিশীথ মাথা নেড়ে শান্ত অব্যয় মুখে সুবলের দিকে তাকাল—'না মদ নয়। মিসেস দাশগুপ্তের বাবার প্যারালিসিস। মারও হঠাৎ অসুখ করেছে। তাঁদের দেখতে গেছেন মিসেস দাশগুপ্ত। জুলফিকারের স্ত্রী আগের থেকেই ওঁকে নেমন্তন্ন করেছিল। যদি সম্ভব হয় এক ফাঁকে সেটা রক্ষা করে মা-বাবার তদারকের জন্য যেতে হবে। ওঁরা সকলেই পার্কসার্কাসে দুটো পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকে।'

সুবলকে গোটা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে সুবলের মুখের দিকে নিশীথ তাকাল আর-একবার।

'তা হলে উনি আজ রাতে আর আসবেন না। কাল সকালে কি আসবেন?'

'তা আসতে পারেন।'

'যদি না আসেন, কাল নিশ্চয়ই ফোন করতে পারবেন আপনি।'

'কাল ফোন করে একটা ব্যবস্থা করে যদি পরশু ভানুকে এখানে আনা যায়, তা হলে চলবে সুবলবাবু?'

সুবল একটু নরম হয়ে বললে, 'তা বরং হতে পারে। বলে-কয়ে এক দিন তারিখ

সরানো যেতে পারে। পরশু পুরী যাবেন।'

'কিংবা কাল ওঁরা পুরী চলে যাবার আগে যদি আমি কাঁচড়াপাড়া গিয়ে শঙ্করবাবুর কাছ থেকে তদারকি বুঝে নিয়ে চার-পাঁচটা রাত থাকি কাঁচড়াপাড়ায়, তারপর জিতেন এলে ভানুকে নিয়ে এখানে চলে আসি ?'

'সব ঘর-দোর বন্ধ করে যাবেন ওঁরা পুরী যাবার আগে।'

'ভানু যে-ঘরে থাকে সেটাও ?'

'হ্যাঁ। সেটা তো একটা ছোট খড়ের ঘর, ওদের দরদালানের থেকে চারশ হাত দূরে। সেটা পুড়িয়ে দিয়ে যাবে। ডিজইনফেক্ট করে যাবে সব।'

মুখ-চোখ কেমন কঠিন নিশব্দ হয়ে রইল। নিশীথের কথা বলা দরকার। কী ব্যবস্থা করবে তার একটা পরিষ্কার নির্দেশ, কিন্তু নিশীথ নির্দায় নির্বর্ণ হয়ে বসে রইল।

'আমি একটা কথা বলি আপনাকে। সেইজন্যেই এখানে এসেছিলুম। পার্ক-সার্কাসের ফ্ল্যাটে আমি আর মা আছি, আর কেউ নেই। ভানুর চিকিচ্ছে আমিই করেছি কাঁচড়াপাড়ায়। আমার মনে হয় না, দুটো লাঙ্গসেই ধরেছে। আবার এক্সরে করতে হবে। রোগ কঠিন খুব। কিন্তু আশা ছেড়ে দেওয়া যায় না। ভানুকে আমার ওখানে রাখতে চাই। আমার মার আপত্তি নেই। আপনার অনুমতি আছে ?'

নিশীথ নিজের চিন্তা-সকল্পের ছেঁড়া-ছেঁড়া খড়গুলোর ভিতর থেকে অন্ধকারে অন্ধ চোখে কিছু গ্রথিত করে নেবার চেষ্টা করছিল—খুবই এক মনে দেয়াল, কার্পেট, সোফা, বই, বাতাস, বাতি, সুবলেরও অস্তিত্বের উপর চার-আনি মনের—ক্রমায়ত নির্মনের সিট আবরণ টেনে দিয়ে যেন। সুবল কথা বলে যাচ্ছে টের পাচ্ছিল সে, কী বলছে সেটা শুনে, না শুনে, বুঝে, না বুঝে সুবলের কথা শেষ হল যখন তার স্বরূপ অনুভব করে নিতে পারল : বাতাসে আলোয় চিন্তার সুস্থিরতার ভিতর নিশীথ ফিরে এসেছে যেন প্রায়।

'হ্যাঁ আছে'—নিশীথ বললে।

'তা হলে আজ রাতেই নিয়ে আসব ভানুকে ?'

'আজ রাতেই ? তা কী করে হয় ?'

'আমার মোটরে।'

ও মোটরও আছে তা হলে সুবলের। নিশীথ একটু ভেবে বললে, 'আজ

থাক। অত তাড়াহুড়ো—'

'আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। মাও জানে যে আজ রাতেই ভানু আসবে।'

'ভানুকে দেখেছেন আপনার মা?'

'না।'

'আপনার ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?'

'মা ছাড়া কেউ নেই।'

নিশীথ ইলেকট্রিক আলোর বাল্বের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চোখ থেকে সেই ঝাঁকটা বেড়ে ফেলতে-ফেলতে বললে 'কিন্তু রুগির ছেঁড়া-ছানার ভিতর এ-রকম ভাবে লেপ্টে পড়াটা ঠিক হবে না সুবলবাবু। আপনি তো ডাক্তার, এরই স্পেশালিস্ট বটে, কিন্তু তাই বলে কি এ জিনিস নিজের ঘরের ভিতর এনে রাখতে হবে?'

'ভানুর কাছে মা যাবেন না।'

'কিন্তু একই ফ্ল্যাটে তো। কী করে এ কাজে সায় দিলেন আপনার মা? তিনি কি আপনার হাল ছেড়ে দিয়েছেন?'

সুবল স্টেথোস্কোপটাকে ছড়িয়ে বিছিয়ে বললে, 'মা আমার ছোটবেলার থেকে যা চেয়েছেন আমি সব সময়ই তা করেছি। এখন এমন একটা অন্যায় বিশ্বাস হয়েছে আমার উপর যে আমি যা দাবি করি তাতেই তিনি রাজি হন—'

'বিশ্বাসটা অন্যায় আপনিই তো বলেছেন।'

'হ্যাঁ। অন্যায় বই-কি'—সুবল বললে, 'এ-রকম যক্ষ্মারুগি নিজের বাড়িতে রাখা বড্ড নিরেস।'

'তবে?'

সুবল স্টেথোস্কোপ ঘাড়ে ঝুলিয়ে কথা ভাবছিল. কিছু বললে না।

'ভানুকে, আমাকে বিপন্ন দেখে এ-রকম ব্যবস্থা করবার মত মেজাজ-টেজাজ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে তো আপনার বয়সের মানুষের। কিন্তু তবুও ভাল জিনিস আছে কিছু পৃথিবীতে। থাকে সব সময়ই।'

এবারও নিজের মনে স্টেথোস্কোপ নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল সুবল। বাতাসে শার্টের কলারটাই উড়ে ঘুরে মিহি আওয়াজ করছে; আর কোনো শব্দ নেই কোনোদিকে; নীরবতা ভাঙবার কোনো উপক্রম দেখা গেল না।

'কারো-কারো জীবনে।'—বললে নিশীথ আবার।

'আমি উঠি, রাত হয়েছে।'

'ভানুকে আপনাদের বাড়িতে রাখলে আপনাদের ক্ষতি হতে পারে সেটা স্বীকার করেন তো?'

সুবল বললে, 'রোগ যে-রকম গেড়ে বসেছে, তাতে খুব সাবধানে থাকলেও আমার না হোক, মার হয় তো হতে পারে।'

'খুব সাবধানে থাকলেও?'

'ভানুকে দেখতে মা দিনে দু-চারবার যাবেনই, ঠেকানো যাবে না। আমি বাড়ি না-থাকলে আরো কী করবেন, না করবেন, বলা যায় না। খুব বেশি স্নেহআর্তি—মাকে ভালবাসি আমি। এই পৃথিবীতে মা ছাড়া কেউ তো আমার নেই।'

'সুবলবাবু, জেনেশুনে কেন কেউটে ঢোকাচ্ছেন ঘরের ভিতর?'

পৃথিবীর আহ্নিক গতির একটি ধ্বনিকণার মত বিলীন হয়ে যাবার আগে বললে নিশীথ। সুবল উঠে দাঁড়াল। পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে দিল নিশীথকে—'এই যে আমার ঠিকানা। ফোন নম্বরও আছে। কার্ড আপনি হারিয়ে ফেলবেন, ঠিকানাটা আপনার বইয়ে এক্ষুনি টুকে রাখুন নিশীথবাবু—' বলে, চলে যাবার আগে ঘরের ভিতর রাতের ভরপুর বাতাসের ভিতর দাঁড়িয়ে সুবল বলবে ভাবছিল, ভানুকে আমার ভাল লেগেছে। কিন্তু তবুও নিশীথকে বললে না কিছু।

প্রায় আন্দাজ করে ফেলেছিল যেন নিশীথ। কিন্তু বিশেষ কোনো তথ্য নেই তার হাতে—ক্রমেই বিজ্ঞানী হয়ে উঠছে তার মন। তেমন কোনো স্পষ্ট সম্বন্ধচিহ্নের অভাবে সুবলের মনের ভিতর প্রবেশ করতে চেষ্টা করল না সে। ছেলেটি অনেকক্ষণ হয় চলে গেছে। বাতি নিবিয়ে রাখল। অন্ধকার। দমকা বাতাসে মেঝের আনাচে-কানাচে মাথা কুটে মরছে ফোন নম্বর—নাম—কার্ড—

রাত দশটা-সাড়ে দশটার সময়েও নমিতা ফিরল না। তা হলে ফিরবে না আর আজ রাতে অনুভব করে নিয়ে নিশীথ চান করে খাওয়া দাওয়া সেরে জিতেনের শোয়ার ঘরের পাশে তার বাড়ির অফিস ঘরে ঢুকল। দিব্যি বিছানা তৈরি আছে। সোফা, কুশন, ইজিচেয়ার রয়েছে। সিলিং ফ্যান,

টেবল ফ্যানও। ঘরে যে-রকম বাতাস খেলছে তাতে ফ্যানের দরকার হয় না। ধবধপে মশারি খাটের এক দিককার দুটো রডের সঙ্গে আটকানো রয়েছে। দরকার হলে টানিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এত বাতাসে মশা আসবে কোত্থেকে। নমিতা জলের কথা ভোলে নি। দুটো বড়-বড় সোরাই ভর্তি করে জল রেখে গেছে, এ জল ওয়াটারকুলারে ছিল, তা হলেও বড় আইস-প্রুফ কাচের পাত্রে বরফের কুচি রেখে গেছে ঢের, রেফ্রিজারেটরের থেকে বার করে আট দশ বোতল স্কোয়াশ, মিনারেল ওয়াটার ইত্যাদি। এত বাতাস, এত জল, এত ঠাণ্ডা, এখন শরীরে একটা জিনিসের দরকার শুধু, ঘুমের আবেশ। আজ রাতে খুব লম্বা চৌকশ ঘুম না দিলে চলবে না নিশীথের। কাল সে ঘুমোতেই পারে নি ভাল করে। শরীরটা কেমন দুর্বল লাগছে। বয়স বেশি হয়েছে। অনাচার চলছে। হার্টের অসুখে অতিরিক্ত চা-কফি-সিগারেট খেয়ে চলেছে সে। নিশীথের মনে হল, তার শরীরের যে-রকম অবস্থা তাতে ডাক্তার না দেখালেও খাওয়া-দাওয়া চলাফেরার সংযমের দরকার। কিন্তু জিতেনের এ বাড়ি থেকে শরীর মনকে নির্লিপ্তি দান করা কঠিন। নমিতার বয়স ঢের কম, জীবনবেদ একেবারেই অন্য রকম। রয়েছে কেমন যেন এক অথল অবনমিত উত্তেজ নমিতার হৃদয়ে শরীরে; কখনো ঝর্ণার মত ঠাণ্ডা, কখনো কড়া লবণের ঝাঁঝের মত, যেন নিঃসাগরিক দেশ থেকে আগত পথিকের চোখে মুখে।

নমিতার সঙ্গে তাল রেখে চলা শক্ত নিশীথের পক্ষে। জিতেনের টাকা আছে, স্নায়ু ও আয়োজন আড়ম্বরে অক্লান্তি, সে নমিতার পৃথিবীতে না চরলেও সেখানে মাথা ঠিক রেখে ঢোকে, নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলাফেরা করে, দরকার মত বেরিয়ে পড়তে পারে। তবুও জিতেন হয় তো ঠিক এ-রকম জিনিস চায় নি, নমিতার চেয়ে বেশি আত্মস্থ, নিজের চিন্তা আকাঙ্ক্ষার নিকট নিকটতম আত্মীয়ের মত কোনো স্ত্রীলোককে পেলে ভাল হত তার?

এক গেলাস জল খেল নিশীথ। কোনো বোতল ভাঙতে গেল না। তেপয়ের উপর দু-তিনটে সিগারেটের টিন, একটা টিন হাতে তুলে নিয়ে দেখল সে; ওয়েস্টমিনস্টার। সিগারেট ঠাসা, চমৎকার গন্ধ বেরুচ্ছে। ক্যাকটিনা পিলও খেতে হয়, সিগারেট তবুও খাবে সে? দুটো সিগারেট বার করে নিল নিশীথ। বড় তেপয়টার উপর কতকগুলো বই; ইংরেজি উপন্যাসও আছে; বাংলা নভেল একখানা দেখল সে, বইটা পড়েছে সে; এ বইটা তা হলে গ্র্যাহাম অ্যাণ্ড

গ্র্যাহামের বড সাহেব জিতেন দাশগুপ্তের অফিস ঘরেও ঢুকে পড়েছে! বেহুলার লৌহগৃহ ভেঙে কালনাগের মতন বুঝি? নাকি এ বই বেহুলা নিজেই সেঁধিয়েছে? কে দিয়েছিল? জুলফিকার? জহরলালের একখানা বই আছে; অরবিন্দর ইংরেজি বই একটা, আর-একটা ইংরেজি অনুবাদ। ইংরেজির বাংলা অনুবাদও পড়ে। কে পড়ে, নমিতা না জিতেন? না নিশীথের দরকার হতে পারে সেই জন্য সকালবেলা যে বেরিয়েছিল নমিতা, কুড়িয়ে এনেছে চার দিক থেকে? একটা বাংলা বই তুলে নিল জিতেন; দু-চার পাতা পড়ে রেখে দিল। ফয়েকটভাঙ্গেরের উপন্যাসটা তুলে নিয়ে দেখল এটা ইংরেজি অনুবাদ নয়—মূল জার্মান, জার্মান ফরাসি শিখবার ইচ্ছা অনেকদিন থেকে নিশীথের, কিন্তু জীবনের অনেক ইচ্ছার মতই এও উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে; একটা নিশ্বাস ফেলে, দুর্বল শরীরে হার্টের অসুবিধা বোধ করে বইটা রেখে দিল সে, দুহামেলের একখানা বই, জিদের একখানা। অনুবাদ? না, সনাতন ফরাসি। যত পাতা ওলটানো যায় সবই অমর পরিষদের ফরাসি। ইংরেজি বই যে-গুলোকে ভেবেছিল নিশীথ, তা হলে সেই বইগুলো এ-রকম; এই রকম ইংরেজি বর্ণমালায় লেখা শুধু? চার দিকে জল, বরফ, বাতাস, বই, তবুও কেমন একটা অদ্ভুত তেষ্টায় শুকিয়ে উঠছে যেন প্রাণ, খাঁটি ইংরেজি ভাষায় লেখা একটা উপন্যাস, গল্প, কবিতার বই নেই এই বইয়ের স্তূপের ভিতর? জওহরলালের বই আছে, লুই ফিশারের, এডগারসের, এডগার ওয়ালেসেরও. না, ঠিক এই বইগুলো আজ এ সময়ে চাচ্ছে না নিশীথ।

এ-সব বিদেশী ভাষায় লেখা উপন্যাস এখানে এনে জড়ো করেছে কে? নমিতা না জিতেন দাশগুপ্ত? নমিতা জার্মান জানে? ফরাসি জানে জিতেন? এরা জার্মান ফরাসি জানে নাকি দু-জনেই? শুধু জানা নয়; জেনে সাহিত্যও পড়া। জিতেনকে কোনোদিন ভাল একখানা ইংরেজি-বাংলা বই শুঁকতে দেখে নি নিশীথ। ব্যবসার বিষয়ে নিত্য-নতুন টেকনিক বার করা ছাড়া আর-প্রায় কোনো দিকেই কোনো দিনই মন খেলা করত না তার। জিতেনের তেপয়ের উপর তার অফিস ঘরের ভিতর ব সা তো আজ কেচে গণ্ডুষ করছে। তবে জিতেন থাকতে এই বইগুলো এখানে ছিল না হয় তো। আজই এনেছে নমিতা খুব সম্ভব। জিতেন দুহামেলের নাম শোনে নি, জিদের নাম শোনে নি, ফয়েকটভাঙ্গেরের না; টমাস মানের না; জার্মান সে জানে না নিসন্দেহ

বলতে পারা যায় ; ফরাসি না, ইংরেজি বলতে-লিখতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের ইংরেজি না। সাহিত্য কাকে বলে জানে না জিতেন। জানতে চায়ও না। নমিতা কতদূর কী জানে ? একটা সিগারেট জ্বালল নিশীথ। ঘুম আসছে না। ফরাসি জার্মান বইগুলো নিয়েই বিছানায় গিয়ে শুল সে। এ বইগুলোই নেড়ে-চেড়ে বিচিত্র অক্ষর ও শব্দ বাক্যের আবছায়া হাতড়ে কেমন একটা সরস-কঠিন অজ্ঞাতকুলশীল আমেজে অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়তে হবে তাকে। সোয়া এগারটা বেজে গেছে, দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল। নীচের তলায় হানিফকে শুতে বলেছে আজ, অনেক রাতে নমিতা যদি আসে, কলি' বেল টেপে, হানিফ দরজা খুলে দেবে।

জিদের বইয়ের ফরাসি পড়ে দেখছিল, ইংরেজি অক্ষর জানা আছে বলে পড়তে পারা যাচ্ছে, উচ্চারণ ঠিক হচ্ছে না, দু-চারটে শব্দের মানে ধরতে পারা যাচ্ছে ; অনেক আগে--কলেজে থাকতে এক সময় ফরাসি প্রাইমার কিনে দু-একদিনেই হারিয়ে ফেলেছিল নিশীথ। তাই মনে হচ্ছে ফরাসির সঙ্গে একেবারে যে মুখ চেনা নেই তা নয়। রেখে দিল বইটা। টমাস মানের জোসেফ বিষয়ক উপন্যাস এটা নয়। সেটা আমেরিকায় বসে লেখা, জার্মান, তাই না ? কেমন আছে সুমনা ? একাকী রয়েছে এত রাতে ? অর্চিতাকে বলে এসেছে সব ; ছেড়ে দিতে পারা যায় অর্চিতার উপর সব ; জলপাইহাটির থেকে চলে আসবার আগে করমচার বনে ঢুকে, ভাঙা লোনাধরা গাঁথুনির সিঁড়ির উপর পা ছড়িয়ে বসে, তেপান্তরের দিকে চেয়ে থেকে দু-চার ঘণ্টা কাটিয়ে এলে পারত নিশীথ। কলেজে কাজ তো করবে না সে। কলকাতায় কোথাও কিছু না-জুটলেও— চাকরি না-পেলে, বাড়ি না-পেলেও কলেজের কাজে ফিরে যাবে না। কলেজের কাজে না ফিরলেও জলপাইহাটিতেও কি যাবে না আর ? অর্চিতার সঙ্গে সেদিনই শেষ দেখা সেরে এল বুঝি ? সুমনার সঙ্গে দেখা হবে না আর ? রানু কোথায় ? পাওয়া যাবে কি সত্যিই রানুকে কোনো দিন ? নরেনদের কোনো হাত আছে কি বাস্তবিক ব্যাপারটায় ? এ-রকম আশ্চর্য ভাল ছেলে সুবল ? ভানু বেঁচে যাবে হয় তো। ভানু বেঁচে উঠলে সুবল কি বিয়ে করতে চাইবে তাকে ? তা হতে পারে ; অসম্ভব নয়, তা হতে পারে, সিগারেটটা নিবে যাচ্ছে বুঝি ? না নেবে নি, সিগারেট নেবে নি, এখুনি না-টানলে নিবে যাবে তবু। ভানুকে বিয়ে করবে সুবল ? খুব ভাল হবে তা হলে,

কিন্তু খুব গেড়ে বসেছে রোগটা—দুটো লাঙ্গস হয় তো—সুবল ভালবেসে মন দিয়ে চিকিৎসা করবে। কিন্তু ধন্বন্তরি নয় তো! মজুমদার ধন্বন্তরি নয়, অর্চিতার টান আছে নিশীথদের জন্যে। কী অপরাধ হত জলপাইহাটিতে ছোট আশা, সাদামাটা কাজ, খাঁটি শান্তি, বৃহৎ মমতার ভিতরে পড়ে থেকে এক দিন পৃথিবীর থেকে অণুর মত রেণুর মত একটুখানি নাম মুছে ফেলে সময়ের নিরবচ্ছিন্ন গতি-অগতিসাগরের অচেতনায় হারিয়ে গেলে ?

আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে, বিছানার কাছেই দেয়ালে সুইচ, ডান হাত বাড়িয়ে আলোর সুইচ নিবিয়ে ফ্যানের সুইচ চালিয়ে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল নিশীথ। পৌনে বারটা বেজেছে।

দেড়টার সময়ে নমিতার মোটর এসে থামল। মোটর, গ্যারাজে ঢুকিয়ে কলিং বেল টিপতেই, হানিফ বেরিয়ে এল। গ্যারাজের দরজায় হানিফকে তালা মারতে বলে, নিচের তলায় সদর দরজা আটকে দিয়ে, সিড়ি ভেঙে উপরে চলে গেল নমিতা। ঘুম পায় নি তার। নমিতার মার মাথার যন্ত্রণা সারিডন খেতে-খেতেই কমে গেছে। বাবার অবস্থা একই রকম। একটু খারাপ হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। নমিতার সঙ্গে কথা বলতে-বলতেই খারাপ ভাবটা কাটিয়ে উঠেছিল যেন সলিল মুখুজ্জে। রোজেনবুর্গ এসেছিল। নমিতার মা, মার চেয়ে নমিতার দিকে ঝোঁক বেশি ছিল তার, কথাবার্তা মিসেস দাশগুপ্তের সঙ্গেই বেশি হয়েছে ; অনেক দূরের থেকে নমিতার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছে, চশমা লাগবে আপনার, তবে চশমা না নিলেও হয়, একটা ওষুধ দিচ্ছি আপনাকে। প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে বলেছে, এই ওষুধটা খাবেন রোজ। এক মাস খেলেই চোখ ঠিক হয়ে যাবে। নমিতার কাছে এগিয়ে এসে তাকে বিছানার উপর চিত করে শুইয়ে দিয়ে স্টেথিস্কোপ বাগিয়ে সব কিছু পরীক্ষা করে, খুব গম্ভীর মুখে ভাল করে সব দেখে নিয়েছে ডাক্তার ; নমিতার মাই দুটোর কাছে বুকের ফালিটুকুর থেকে শুরু করে নাভি তলপেট অব্দি সব টিপে ঠেসে ঠুকে দেখেছে রোজেনবুর্গ ; এমন সুড়সুড়ি লেগেছে নমিতার, কেমন কাতুকুতু বোধ করেছে সে,···হিহিহি গ্লিব গ্লিব, গ্লিবল ক্লিবল ক্লিব ক্লিব, বু বু বু···হেসেছে সে, হেসেছে ডাক্তার। বলেছে, আছে মোটের উপর মন্দ নয়, তবে লিভারে দোষ আছে, কিডনিটাও খুব ঝর-ঝরে নয়। একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়েছে। তিন মাস সে ওষুধ খেতে হবে ;

তা হলে আর কোনো গলদ থাকবে না। ব্রাণ্ডেনবুর্গের হের ব্রকমানের সাদা ঘুড়ির মত হাওয়া-ঝড় পিটিয়ে ছুটে বেড়াতে পারবে নমিতা। ব্রাণ্ডেনবুর্গের হের ব্রকমানের ঘুড়ির কথাটা অবশ্য নিতান্তই ব্যক্তিগত একটা অভিজ্ঞতার ব্যাপার, ডাক্তারের জার্মানি বাসকালের জীবনের। কী সে ব্যাপারটা রোজেনবুর্গকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছে নমিতা, মাথায় নানা রকম তাগিদ ছিল তার। রোজেনবুর্গ ওষুধের খুব ভক্ত নয়, বার বার বলেছে নমিতাকে, ওষুধ বেশি কিছু ব্যবহার করতে নিষেধ করে দিয়েছে, একেবারেই কোনো ওষুধ দিত না, জল বাতাস-রোদ প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিত। তবে মুশকিল, কলকাতা সমুদ্রের পারে নয়, চমৎকার খোলা সৈকত নেই এখানে ; নিসর্গের নিজের বর্ণাও নেই, কলকাতার জলবাতাস ভিজে বিশ্রী বিষাক্ত, এখানে ও-রকম চিকিৎসা চালানো কঠিন ; এখানে ন্যুডিস্টদের মত খোলা খালি শরীর নিয়ে, রোদে নদীতে হাওয়ার ভিতর ফিরে বেড়ানোর তেমন কোনো মানে হয় না। তা যদি হত, নমিতাকে তা হলে প্রকৃতির সব পবিত্র উপাদানগুলোর সঙ্গে একাত্ম হয়ে ঘুরে বেড়াতে বলত রোজেনবুর্গ। কথাটা বেশ মনে ধরেছিল নমিতার। কলকাতা যদি নীল সমুদ্রের পারে রৌদ্রালোকিত প্রদেশ হত, ঝাউ শাল পিয়াল পিয়াশাল সিসু পাইন পপলারের বন উপবন থাকত যদি সে সমুদ্রের এপাশে-ওপাশে, এ বলয়ে কাছে-দূরে, বলয়পরাৎপরে, তা হলে সে গাছের বীথির ভিতরে, রোদে, ছায়াগুচ্ছের দেশে, খোলা সৈকতের অফুরন্ত সূর্যে—কোথায় কে আছে, না-আছে উপেক্ষা করে ঘুরে বেড়াত—সুস্থ সম্পূর্ণাঙ্গ মেয়েশরীর নিয়ে—সমস্ত জামাকাপড়ের আবরণের ভিতর থেকে নিজেকে খুলে ফেলে।

রোজেনবুর্গ এ-রকম একটা আশ্চর্য উজ্জ্বল আকৃতি ফলিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তার রক্তের ভিতর ; রাত সাড়ে দশটার সময় চলে গেল ডাক্তার। তারপর জুলফিকারদের ওখানে গিয়েছিল সে। একটার সময় পাট শেষ করে মোটর নিয়ে একা-একা একটু ঘুরপথে ফিরেছে।

বাড়িতে ফিরবার ইচ্ছা ছিল কি তার? সংকল্প, স্বপ্ন, প্রাণে নিয়ে গিয়েছিল কি সে পার্কসার্কাসের ফ্ল্যাটে রাত কাটাবার ? মাথা ধরেছে, ঘুম আসবার কথা নয়, যদি না ঘুমের ওষুধটা খাওয়া যায়। ঘুম নেই শরীরে, নিজের ঘরের ভিতর ঢুকে, জুতো খুলে, ফ্যান চালিয়ে দিয়ে বিছানার উপর লাফ দিয়ে পড়ে দু-

তিনটে বালিশ আঁকড়ে চেপে ধরে, ছিটকে ফেলে, খানিকটা গড়াগড়ি খেয়ে নিল, তারপর নিঃসাড়ভাবে মিনিট পনের বিছানায় পড়ে থেকে কী ভাবল সে, কী করল, তা অন্ধকার জানে, আস্তে-আস্তে স্থিরতা এল মনে, শরীরটা ঠাণ্ডা লাগল, জামা-কাপড সব খুলে ফেলে একেবারে উদল শরীরে বাথরুমে চলে গেল সে—প্রায় আধ ঘন্টা পরে জলের ভিতর থেকে উঠে এল যেন জলদেবীর মত, একটা মস্ত বড় টার্কিশ তোয়ালে গলায় জড়িয়ে, সম্পূর্ণ শূন্যাম্বর আকাশ-বাতাসের মত শরীরে। বাথরুম থেকে ফিরতে-ফিরতে সেই অবস্থায়ই, বড় তোয়ালে জড়িয়ে নিশীথের ঘরে ঢুকে নিজে দেখতে গেল লোকটা এ ঘরে আছে কি না, ঘুমিয়েছে কি না, ঘর অন্ধকার, ফ্যান চলছে ; নিশীথ ঘুমিয়ে আছে। নমিতা কুঁজোর থেকে এক গেলাস জল ঢেলে বরফকুচি মিশিয়ে খেয়ে নিল ; মাথায়, নাকে, চোখে, ঘাড়ে, পিঠে ঘষে নিতে লাগল বরফের কুচিগুলো, তাকাল নিশীথের দিকে একবার-দুবার ; পাশ ফিরে শুয়ে আছে নমিতারই মুখোমুখি। চোখ মেললেই ভূত দেখে বোবা বনে যাবে হয় তো এই নিরেট মানুষের দেশের লোকটা কিন্তু চোখ মেলবার কথা নয়—আইসক্রিমের বোতলের ছিপির মত—লোহার চাবি দিয়ে চাড় না দিলে—এই ঘুমন্ত লোকের। চাড় দেবে কী সে ? কুঁজোর থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে এন্তার বরফকুচি মিলিয়ে নিশীথের মুখের উপর ছুঁড়ে মারবে ? হাসি পেল নমিতার। গঁ গঁ গঁ গঁ করে উঠল যেন ঘুমের ভিতরে নিশীথ। তোড়ে হাসি ছুটে এল নমিতার বুকে মুখে সমস্ত উদল শরীরের জলের ঝিরঝিরানির ভিতর ; খিল খিল করে হেসে উঠল সে। নিশীথ কি চোখ মেলেছে ? সে দিকে, কোনোদিকে, না-তাকিয়ে তেপয়ের উপর থেকে একটা সিগারেটের টিন ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে গেল সে।

নিজের ঘরে ঢুকে টিনটা রেখে দিয়ে বড় একটা শুকনো, সাদা, চৌখুপি, পুরুষদের মত তোয়ালে বের করে সমস্ত শরীরটাকে ভাল করে রগড়ে মুছে নিল। একেবারে জলে জলসত্র হয়ে আছে। সমস্ত শরীরটাই জল ; বাথরুমের থেকে নাইতে-নাইতে জলের ভিতর থেকেই উঠে এসেছে সে। গা মোছা তো দূরের কথা, তোয়ালেটা অব্দি নিংড়ে নেয় নি। একেবারে ভিজিয়ে তিতিয়ে এসেছে নিশীথের ঘরটাকে নিশীথ যদি জেগে ওঠে—ভিজে ঘর-দোর, ভিজে বই-কাগজপত্র দেখে কোনো জলজিনী নারীর কথা ভাববে কি সে—ঢাকুরিয়া

হ্রদ থেকে উঠে এসে রাতে হানা দিয়েছিল, নাকি ছাদ চুঁইয়ে বৃষ্টি পড়েছিল—জানালা দিয়ে জলদেয়াসিনী ঢুকেছিল ঘরের ভিতর বিশ পঁচিশটা জল পায়রা উড়িয়ে? এই সব মিলিয়ে যা হয়, নমিতা একাই সেই জল, জলপায়রা, জলদেয়াসিনী, জলবৃষ্টি, হ্রদের জল। ঘষে রগড়ে ভাল করে নিজেকে মুছে নিয়ে পাউডার মেখে স্ল্যাক্স, লেডিস কোট পরে নিল নমিতা। চুল ব্রাশ করে নিল—আয়নার কাছে না দাঁড়িয়ে—ডান হাতে বাঁ হাতে আন্দাজে ব্রাশ চিরুনি চালিয়ে। ঠিকই হল, ঠিকই হল সব। কেমন হল দেখবার জন্য আয়নার কাছে দাঁড়াল না সে।

সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে নিশীথের ঘরে ঢুকল সে, ঘড়িতে পৌনে তিনটে বেজেছে। ঢুকে দেখল নিশীথ ঘুমিয়েই আছে। বাতি জ্বালিয়ে পড়বে কি সে টমাস মানের জার্মান উপন্যাসটা? পড়লে ড্রয়িংরুমে গিয়ে পড়তে হয়, কিংবা হলে, অথবা তার নিজের ঘরে। এই ঘুমন্ত মানুষের উপর উপদ্রব করার কোনো অর্থ হয় না—এই শান্ত অন্ধকার ঘরটায় চড়া বাতি জ্বালিয়ে বই পড়ার অছিলায়। নিশীথবাবু জেগে উঠেছেন মনে করে এই ঘরে নমিতা ঢুকেছিল। স্ল্যাক্স কোট সেই জন্যেই পরেছিল সে, নিশীথবাবু ঘুমিয়ে আছেন জানলে এ-সব জিনিস পরার দরকার হত না তার, আদুড় গায়ে নিজের ঘরে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ত সে। ঘুম আসবে না, কিছুতেই আসবে না আজ আর—কাজে-কাজেই ঘুমের ওষুধ—সব চেয়ে কড়া পিলটা খেয়ে…। কিন্তু জেগে ওঠে নি তো—ঘুমিয়ে আছে নিশীথ। নমিতা বাথরুম থেকে সোজা-সুজি এ ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে যাবার সময় অনুভব করেছিল, চোখ মেলেছে যেন মানুষটা। ঠিক সেই মুহূর্তে বাস্তবিকই যদি চোখ মেলে ফেলত নিশীথ তা হলে এখন এমন অঘোরে ঘুমুতে পারত না কিছুতেই। ঘুমুচ্ছে নিশীথ, মনের থেকে সব ময়লা কেটে গেছে যেন, এমনই নির্দোষভাবে। এ রকম পারত না কিছুতেই।

ও, নিশীথ জাগে নি, দেখে নি কিছু তবে। সিগারেটে তিনটে টান দিয়ে নমিতা ভাবছিল, ভেবেছিলুম নিশীথ দেখে ফেলেছে, কেমন একটা অভিমান শুরু হয়েছে, নাকি শেষ হয়েছে, মনে ভেবে বুকটা কেমন দুরু-দুরু করে উঠে-ছিল ওর ঘরের থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছিল সে যখন। গা মুছতে-মুছতে, পাউডার ছিটিয়ে, জামা-কাপড় পরবার, চুল আঁচড়াবার সময়

কেমন মজার একটা নেশা, ব্যথায় টুকুর-টুকুর করছিল যেন বুকের ভিতর, একটা জিনিস শুরু না-হতেই শেষ হয়ে ভালই হয়েছে বলে—নাকি কিছু ক্ষণ পরে শুরু হবে বলে ?

বুঝে উঠতে পারছিল না যেন নমিতা। আস্তে-আস্তে খুব মৃদু প্রাণনায় সিগারেট টানতে লাগল। কোনো হেতু ছিল না। চানের ঘর থেকে সটান নিশীথের ঘরে ঢুকেছিল এমনিই সরল সরেস প্রাণের নির্লক্ষ্যে। নিশীথ জেগে আছে কি না-জেগে আছে—জেগে থাকলে ও-অবস্থায় তার ঘরে ঢোকা উচিত নয়, ঘুমিয়ে থাকলে ঢুকলেও ঢোকা যেতে পারে ; এ সব কথা ভেবে দেখবার মত মনের অবস্থা ছিল না তার, এমনই বেগ ও আবেগের ঘন আগুন ছুটে এসেছিল প্রাণের ভিতর নির্দোষ প্রকৃতির থেকে। কিন্তু তার পর থেকেই মনে কেমন একটু দোষ এসে ঢুকেছে যেন। সেই জন্যেই সতর্ক হয়ে পড়েছে সে। বেশ সাবধানে সাধুতায় সতর্কতায় উইমেনজ অকসিলিয়ারি কোরের মিলিটারি পোশাক পরে এসেছে সে। যুদ্ধের সময় ওয়াকেতে কাজ করত সে, সেই থেকে এ রকম পোশাক পরার রেওয়াজটা রয়ে গেছে, আজকালও অর্ডার দিয়ে বানিয়ে নেয় এই পোশাক।

সিগারেটটা শেষ হয়ে গেছে। অচেতন হয়ে ঘুমুচ্ছে নিশীথ। মনের মধ্যে নমিতার আফিমের গুলির মত একটা খুঁত এসে ঢুকেছে যেন, অনেক রাত-অব্দি-জাগা ডাক্তারের নির্গলিত নগ্নকান্তিবাদের লেকচার শোনা, পার্ক-সার্কাসের পেঁজপোলাও মাংস মদ খাওয়ার উত্তেজনায় প্রশ্রয় পেয়ে। এ ছাড়াও প্রশ্রয় পেয়েছে মন, এমনিই কোনো একটা সময়ে কোনো একটা জিনিস পেতে ভাল লাগে মনের। মনই যদি এ-কথা বলে, শরীর খোঁচা না-পেয়েও যদি শারীরিক হয়ে উঠতে চায়—যেমন আজ সন্ধ্যার সময় ড্রয়িংরুমে বসে বই পড়তে-পড়তে হয়ে উঠেছিল প্রায়, তা হলে—কঠিন। নমিতা আর-একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিল। নিশীথ ঘুমুচ্ছে নাক না-ডাকিয়ে বেশ নিবিড়-ভাবে, বাইরে রাত দুটো-আড়াইটে অব্দি দুর্দান্ত বাতাস খেলে গেছে আজ ঘরের ভিতরটাকেও কাঁপিয়ে, নাচিয়ে, তৃপ্ত, স্নিগ্ধ করে গেছে। কিছু ক্ষণ হল বাতাস থেমে গেছে বাইরে-ভিতরে, একটা গাছের পাতাও নড়ছে না, গরমের হল্কা ঠিকরে পড়ছে যেন সাদা মেঘগুলোর ভিতর থেকে। অন্দরে ভীষণ গরম—যে ঘরের ফ্যান নেই। এ ঘরটাকে বড় জোরালো ফ্যানটা ঠাণ্ডা করে

রেখেছে। ঘুমিয়ে আরাম পাচ্ছে তাই ঘুমনো মানুষ। কাল ভোরের আগে নিশীথ জেগে উঠবে বলে মনে হয় না। টমাস মানের জার্মান বই নিয়ে নিজের ঘরে চলে যাবে ভাবছিল নমিতা। মাঝে-মাঝে দোষ ঢুকে পড়ে তার মনে, শরীরটাকে মুখিয়ে রাখে—মাঝে-মাঝে আত্মদানও করে বটে সে—আবার নির্দোষভাবেও নিজেকে অর্পণ করে, ঝর্ণার জলকণিকারা যেমন পর স্পরকে করে—প্রকৃতির কোনো এক বৃহৎ আদিম নাদের ভিতর জেগে ওঠে, পটভূমির নিঃশব্দতাকে প্রাণবীজ দান করে নাদের নীল নির্দোষ আনন্ত্যে পৌঁছবার জন্যে। নিশীথকে ডেকে জাগানো যায় অবশ্যি কিংবা ঠেলে; কিংবা ফ্যানটা বন্ধ করে দিলে গরমে ভেপসে উঠে পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই না-জেগে পারবে কি সে এই দারুণ গুমোটের রাতে? তা হলে মানের বই দুটো তুলে নিয়ে ফ্যানটা বন্ধ করেই চলে যাওয়া যাক—তার পরে নিজের ঘরে গিয়ে, ফ্যান খুলে, পোশাক ছেড়ে, শুয়ে পড়বে সে। ঘুমিয়ে পড়লে, ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুম না-পেলে নমিতা এ দিকে আবার খোঁজ নিতে আসবে—ঘুমের ওষুধ খাওয়ার মর্জিটাও যদি মরে যায়।

বই দুটো হাতে তুলে নিয়ে ফ্যানটা বন্ধ করে দিল সে। এইবারে ঘর থেকে স্রেফ বেরিয়ে পড়বে, কেমন তামাসা বোধ হল, ঘরের আবছা আলোর ভিতরে আস্তে, ধীরে-সুস্থে, হাঁটতে গিয়েও কেমন যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল হঠাৎ, তেপয়-বই-টিন-গেলাস নিয়ে একেবারে মেঝের উপর। বালিশের থেকে মাথা তুলে ঘাড়টা ফিরিয়ে আচ্ছন্নভাবে তাকিয়ে দেখল নিশীথ, নমিতা উঠে দাঁড়িয়েছিল।

'কে?'

'আমি।'

'আমি! আমি মানে?'—ধোঁয়াটে চোখে বললে নিশীথ।

'ওঃ এই যে।' ভাল করে নমিতার দিকে তাকিয়ে দেখল নিশীথ, আবার তাকাল। আর-একবার তাকিয়ে দেখার দরকার অনুভব করে, নির্মল দৃষ্টি-শক্তিই যেন ফিরে পেল, উঠে বসল সে—'ভোর হয়ে গেছে?'

'এই হচ্ছে।'

'কিসের যেন একটা শব্দ হল। আমি স্বপ্ন দেখছিলুম, মনে হল, ধ্বসে ভেঙে গেল কী যেন সব।'

'না'—নমিতা ঘাড় নেড়ে বললে, 'আওয়াজটা স্বপ্নে নয়, এমনিই হয়েছে। দুটো তেপয়ই হুড়মুড় করে পড়ে গেছে ধাক্কা খেয়ে—'

'বইটই-গেলাস-টিন সব ছিটকে পড়েছে দেখছি'।

দু জনে মিলে কুড়িয়ে গুছিয়ে ঠিক করে নিচ্ছিল সব। ঘরের ভিতর জল ছড়িয়ে আছে চারদিকে। নমিতা হয় তো নিশীথকে জিজ্ঞেস করবে, কেন এই জল—ভেবে নিয়ে নিশীথ জলের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেল না নমিতাকে। কোনো কুঁজো ভাঙে নি, বোতল ফাটে নি, কেমন করে সমস্ত ঘরটাকে নিশীথ তবুও জলময় করে রেখেছে বুঝে উঠতে পারছিল না নিশীথ। তেপয় দুটো দাঁড় করিয়ে বইটই গুছিয়ে ঠিক করে নমিতা একটা সোফায় গিয়ে বসল—নিশীথ আর-একটায়।

'ফ্যান না খুলেই ঘুমোচ্ছিলেন নিশীথবাবু ?'

নিশ্চল পাখাটার দিকে তাকিয়ে নিশীথ বললে—'হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়লুম, মানের নভেলটা নাড়াচাড়া করতে-করতে।'

ফ্যানটা খুলে দিল সে।

'জার্মান জানেন আপনি ?'

'না।'

'তা হলে পড়ছিলেন ?'

'দেখছিলুম। এ-সব জার্মান-ফরাসি বই পড়েন আপনি ?'

'হ্যাঁ, পড়ার জন্যে এনেছি।'

'খুব ভাল রপ্ত হয়েছে জার্মান হয় তো ?'

'না। ফরাসিটা হয়েছে খানিক। দেখলুম রোজেনবুর্গও ভালো জার্মান জানেন না।'

'তিনি তো জার্মান ?'

'জার্মান ইহুদি।'

'কী করে আপনি শিখেছেন তা হলে জার্মান ? নিজে-নিজে ?'

'না রে বাবা !'—নমিতা একটু উত্তেজিত হয়ে হেসে বললে, 'স্কুল কলেজের পোড়োদের মত উবু হয়ে বসে কোনো কিছু শেখাটেখার সাধ্যি নেই আমার। মাস্টার দেখলেও ভয় করে। আমি ভাষা শিখি মানুষের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে।'

'কোথায় জার্মান পাবেন কলকাতায় আজকাল ?'
'সেজন্যে একটু মুশকিল হচ্ছে।'
'কোথায় পেলেন খাঁটি ফরাসি, কলকাতায় ?'
'দু জন ফরাসি মেমসাহেব পেয়েছিলুম পার্ক স্ট্রিটের দিকে। তাঁরা এখনো আছেন কিনা জানি না। তবে শিখে নিয়েছি, বইটই পড়তে পারি। কিন্তু ফ্রান্সে-প্যারিসে না গেলে, লোকজনের সঙ্গে কথা না বললে এ ভাষায়—'
'চেকনাই থাকে না ?'
'চেকনাইয়ের ভাষা কি ফরাসি ?'
'চিপটেন কাটার ভাষা তো।'
'পড়েছেন ভিলোঁ আপনি ?'
'না খুঁজেছিলুম বটে। পাই নি কোথাও। বদনাম আছে ভিলোঁর।'
'আমার কাছে আছে ভিলোঁ—'
'সে তো শাহি ফরাসিতে'
'কানে শুনে নেবেন সেই ফরাসি, বাংলে দেব জ্যামিতিক ইংরেজিতে—' দীর্ঘছন্দ শরীরে একটু কুঁজো হয়ে হেসে বললে নমিতা।
নমিতা+স্ফিক=জ্যামিতিক ? ভাবছিল নিশীথ।
'সাহিত্যটা জ্যামিতিক হয়ে যাবে না তো ?'—নিশীথ বললে।
'কেন ?'
'ইংরেজিটা জ্যামিতিক বলছেন ?'
'টিন খসিয়ে সিগারেট বার করে নিল একটা।'
জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'এটা তো চিপটেনের ভাষা হল আপনার। জিতেন কি আর সাহিত্যের খোঁজ-খবর নেয় ? সময় কোথায় তার ? তা ছাড়া সুকুমার বিদ্যের পথ দিয়ে ও মানুষ হয়ে ওঠে নি। তবুও মনটা কুঁকড়ে যায় নি ওর, বেশ সরস আছে। ভিলোঁ অবিশ্যি তর্জমা করে শোনাই নি ওকে, তবে আনাতোল ফ্রাঁসের কড়া ভিয়েনে মাঝে-মাঝে চড়িয়েছি।'
বলতে-বলতে নিশীথের দিকে বড়, ভরা চোখ মেলে তাকাল নমিতা। আনাতোল ফ্রাঁসের প্রায় সব বই-ই পড়েছে নিশীথ। ফ্রাঁসের কড়া ভিয়েন এটা ওটা সেটা অনেক কিছুই তো হতে পারে। কিন্তু এ-গুলোর মধ্যে কোনটা সম্প্রতি লক্ষ্যস্থল নমিতার, উপলব্ধি করে নিশীথ টিনের দিকে হাত বাড়িয়ে

সিগারেট বার করবার, জ্বালিয়ে নেবার কাজে একটু নিমগ্ন হয়ে থাকতে চাইল।

কোনো ঘড়ির দিকে না তাকিয়ে নিশীথ বললে, 'আরো বেশি অন্ধকার হয়ে পড়ছে যেন। বাইরে কি মেঘ?'

জানলার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে নমিতা বললে, 'মেঘ নেই।'

'নেই?'

'সাদা মেঘ আছে। ওতে কি অন্ধকার হয়?'

'না। কেমন গুমোট। বাইরে মেঘ নেই, ঝড়ের লক্ষণ নেই?'

'নেই তো। গুমোট কেন? ফ্যান চলছে তো!''

'বলছিলেন না ভোর হচ্ছে, কটা বেজেছে?'

'চারটে বাজতে দশ মিনিট। ঘড়িটা তো আপনার মুখোমুখি দেয়ালে।'

'একটার সময় ঘর আলো হয়েছিল, চারটের সময় অন্ধকার হল কী করে?' জ্বালি-জ্বালি করে সিগারেট না-জ্বালিয়ে জিজ্ঞেস করল নিশীথ।

'চাঁদ ডুবে গেছে বলে অন্ধকার।'

'এত তাড়াতাড়ি ডুবে গেল?' নিশীথ জ্বালিয়ে নিল সিগারেটটা।

'আজ তো ডুববার কথাই তাড়াতাড়ি। দ্বাদশী চতুর্দশীর চাঁদ নয় তো। বাতাস ছেড়েছে। অনেক দূরে একটা কালো মেঘ। সপ্তমীর রাত।'

ঘাড় তুলে নমিতার ডব্লিউ-এ-সি-র পোশাকের উপর চোখ বুলিয়ে নিল নিশীথ। নমিতার চোখের উপর চোখ রেখে বললে, 'এই কি এলেন নাকি আপনি পার্কসার্কাস থেকে?'

'আমি দেড়টার সময় এসেছি।'

'দেড়টার সময়? তা হলে এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলেন বুঝি পাশের ঘরে? কিন্তু এই পোশাকে গরম লাগছিল না? জুতো পরে?'

'হ্যাঁ জুতো পরেই ঘুমোই আমি।' নমিতা বললে, 'মিলিটারি ধড়াচূড়ো পরেই তো ঘুমোই আমি। না হলে ঘুম হয় না আমার।' নমিতা কুজোর থেকে জল গড়িয়ে নিল গেলাসে, বরফের এক মুঠো কুচি মিশিয়ে জলের ভরা গেলাসটা হাতে ধরে কৌচে এসে বসল।

'জল খাচ্ছেন?'

'খাবেন আপনি?'

নিশীথ সিগারেটে একটা লম্বা টান শেষ করে কথা বলার আগেই নমিতা বরফ-জলের গেলাসটা এগিয়ে দিয়ে বললে—'এই নিন।'

'না না, ওটা আপনি খান—আমি নিচ্ছি।'

'আপনি নিন নিশীথবাবু—আমি ঢেলে নিচ্ছি।'

'আপ পিজিয়ে মেমসাহেব।'

'আপ পিজিয়ে সেন সাহাব।'

গেলাসটা হাতে তুলে নিশীথ এক চুমুকেই শেষ করে ফেলবে ভাবছিল, তেষ্টা পেয়েছিল তার। কিন্তু এক টানে গেলাস সাবাড় করে দিলে আর-এক গেলাস বরফ-জল অবিলম্বেই হাজির হবে, তার পরে বরফ স্কোয়াশ ;—শেষ রাতের আবছায়ায় হাওয়া, বরফ আর নীরবতার ভিতর অন্তরঙ্গতার এই খেলা মন্দ নয়! কিন্তু খেলা ছাড়া আর-কিছু নয়, দু দিনের জন্যেও বটে ; জিতেন এলেই কেটে যাবে, জুলফিকাররা, জুলফিকারদের মতন আরো অনেকে মাঝখানে এসে পড়লেই মোড় ঘুরে যাবে, উবে যাবে সব। নিশীথকেও এমনিই শিগগিরই তো চলে যেতে হবে একদিন জিতেনের বাসা ছেড়ে দিয়ে। নমিতার হাতের খোবানি তার প্রাপ্য নয়, তার ঠিক জায়গা হচ্ছে জলপাইহাটির করমচা বনের ভাঙা সিঁড়ির উপর পা ছড়িয়ে বসে অর্চিতার কিংবা বারুণীদেবীর ( কোথায় গেছে সে আজকাল ? ) কথা শোনা তেপান্তরমুখো হয়ে। নিশীথ আলতো চুমুক দিয়ে রসিয়ে-রসিয়ে খাওয়ার ভান করে যাচ্ছিল বরফজল, যেন যখন কাল মেঘ আসে একখণ্ড, মরুভূমি তাকে ঝাপটে ধরতে চায় না, ভদ্রতা বাঁচিয়ে আস্তে-আস্তে ঝিনুকে মেরে-মেরে খায়। জিতেনের এ বাড়িতে কাল মেঘের উদয় হলেও নিশীথ যে মরুভূমি নয়—বরং চেরাপুঞ্জি, নমিতাকে সেটা বুঝিয়ে দিতে হবে ভরা গেলাসের বরফ ফোঁটা-ফোঁটা খেয়ে—ফোঁটা-ফোঁটা গ্রহণ করে নিশীথের জীবনের এই আধো সত্য আধো মিথ্যে আশ্চর্য উত্তর-মেঘটাকে।

'কাল মেঘ করেছে ?'

'হঁ্যা। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। বেশি বড় নয়।'

'ঝড় হবে মনে হচ্ছে ?'

'খুব চেপে জল এলে ভাল হয়। যা গুমোট।'

'ঝড় বিদ্যুৎ বেশি করে ঘনিয়ে এলে ভাল হয় ; বৃষ্টি বেশি চাই না। অন্ধকার

থাকবে, ঝড় থাকবে, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে সব। বৃষ্টি কিছু-কিছু পড়ছে, সব সময়েই যেন আসছে-আসছে। কিন্তু বেহায়া বৃষ্টির নাকানি-চোবানি নেই।'

'ঝমঝম করে খুব বৃষ্টি পড়ে অন্ধকার রাতে ; ভাল লাগে না আপনার ?'

'লাগে, কিন্তু আজ নয়, এখন নয়, মনের অবস্থা এখন যে-রকম তাতে কেবলি অন্ধকার ভাল লাগে ; মেঘের বাতাসের আর বিদ্যুতের জিত ভাল লাগে জলের উপর।'

'মানে ঝড় চাই ?'

নিশীথ কোনো উত্তর দিল না।

'জল চাই না ?'

'না।'

'ঝড়, অন্ধকার, বিদ্যুৎ চাই। যদি শিলাবৃষ্টি হয় ? এখন চোত মাস তো।'

'কেমন হত সেই ঝড় তাহলে ?'—কে যেন জিজ্ঞেস করল।

কেমন হত সেই অন্ধকার ? অনেকদিন পরে জেগে উঠে তার পর সূর্যের মুখ ? বাতাস নেই, মেঘ নেই, সমতল ভূমিতে অনেক পাহাড় এসে পড়েছে যেন চারিদিকে—নিঃশব্দ অন্ধকারের। একটা আরশোলা সোঁ করে মাঝশূন্য দিয়ে উড়ে কোথায় দেয়ালের আবছায়ায় ঠিকরে পড়ল। দেখল দু জনে। আরশোলাটা আবার উড়ে হারিয়ে গেল অন্ধকারের ভিতর, কোথায়। চুপ করে চুপ করে উত্তরোত্তর নিস্তব্ধতায় আঁকিবুকির শব্দহীন অসমতল ছড়ানো অনর্গল পাহাড়ের অন্ধকারের ভিতর তারা বসেছিল।

'ঝড় হচ্ছে না আজ রাতে। রাত কি ফুরিয়ে যাচ্ছে ? কটা বেজেছে ?'

'সোয়া চারটে। সেই কাল মেঘটাকে দেখছি না তো এখন আর।'

'আকাশে মেঘ নেই তা হলে ? আকাশে কি তারা জ্বলজ্বল করছে ?'

'হ্যাঁ, সমস্ত আকাশটাকে কেমন চমৎকার দেখাচ্ছে নিশীথবাবু। এক টুকরো মেঘ নেই কোনোদিকে, কেবলি আলো, কেবলি জ্যোতিষ্ক—'

'চলুন ছাদে উঠি গিয়ে, নক্ষত্র দেখব।'

'চলুন।'

'জিতেনের টেলিস্কোপ আছে ?'

'নেই। জিতেনকে ছাদে নিয়ে গিয়েছিলাম দু-তিনদিন রাতে। ডেক চেয়ারে বসেছিলাম আমরা, ব্যবসা-টাকাকড়ি-ইনকাম ট্যাক্সের কথাই বললে জিতেন।

আমি দু-একটা তারা দেখাচ্ছিলাম তাকে, কিন্তু উৎসাহ দেখলাম না। আকাশে নক্ষত্রগুলো যে আছে সেটা সে জানে বটে, কিন্তু কখনো অনুভব করেছে বলে মনে হয় না।'

'জিতেন অনুভব করেছে কিন্তু আপনাকে বলে নি।'

'কী করে জানলেন আপনি?'—নমিতা উঁচু তালবীথির কাঠকুড়োনির মত চোখে নিশীথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

নিশীথ কোনো উত্তর দিতে পারল না। অন্ধকারের ভিতর জলের মতন সহজ সত্য কোনো একটা জবাব হাতড়ে বেড়াতে লাগল। কিন্তু সে রকম স্বাভাবিক ও স্বীকার্য কোনো কিছু খুঁজে পাওয়া গেল না।

'কী করে জানলেন আপনি?'

'আমি নিজে তো অনুভব করি···রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে।'

নমিতা জানলার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে চোখ ফিরিয়েছিল। বাইরে সমস্ত বাতাস নিঃশেষিত হয়ে গেছে। মেঘ নেই, অনেক তারা আছে। ঘরের ভিতরে খানিকটা বাতাস আলোড়িত করে তুলবার জন্যে মেশিন যথাশক্তি দানবীয় কাজ করে চলেছে তার।

'পৃথিবীর প্রথম মানুষ এক রকম ভাবে বুঝেছিল নক্ষত্রগুলোকে—শেষ মানুষেরা আর-এক রকম ভাবে বুঝবে। আকাশ-রাত্রি ও নক্ষত্রেরা রয়েছে তবুও সকলকেই সব কিছু দেখবার সুযোগ দিয়ে। আমরা দেখতে পারি শুধু, তার চেয়ে খুব বেশি আর নয়। কিন্তু যা দেখছি, হৃদয় যা দেখাচ্ছে তার চেয়ে আশ্চর্য কিছু নেই—এই অনুভব করি।'

'আপনি তো করেন নিশীথবাবু। বলছেন। কিন্তু কথা হচ্ছিল জুলফিকারের, জুলফিকার কি অনুভব করে?'

নিশীথ সোজা হয়ে বসতে-বসতে বললে, 'জুলফিকার নয় তো জিতেনের কথা হচ্ছিল।'

নমিতা ভুল শুধরে হেসে বললে, 'যাচ্চলে—জিতেনের কথাই তো হচ্ছিল।'

'পির সাহেব কি জিতেনের মত?'

'পির সাহেব?'—নমিতা নিশীথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তার পর বললে, 'না, তার নিজেরই মত। একদিন দেখবেন তাকে, চলুন।'

'চলুন।'

'আচ্ছা, আমি ফোনে জুলফিকারের সঙ্গে দিন ঠিক করে জানাব আপনাকে।' —যেন জুলফিকারই পির সাহেব। খুব সেয়ানা নমিতা। ধরে ফেলেছে নিশীথের ইশারা। যেখানে সপ্তর্ষি তারাগুলো ঘুরে এসে স্থির হয়েছে, নিশীথ মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল, জানলার ভিতর দিয়ে সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে নমিতা। কিন্তু নিশীথ নিস্তব্ধ হয়ে আছে অনুভব করে পৃথিবীতে ফিরে এসে মাটির গন্ধে আসক্ত মৃত্তিকার নারীর মত ধুলোমাটির খোঁজে তাকাল।

'ছাদে চলুন।'

'সিঁড়ি কোনদিকে? এর আগে যখন এ বাড়িতে এসেছি তখন ছাদে উঠবার কথা মনেই হয় নি কোনো দিন। জিতেনও বলে নি কিছু। ছাদ যে আছে খেয়ালই ছিল না আমাদের কারো।' নিশীথ বললে।

কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল নমিতা। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'সাড়ে চার। চলুন। আমি নিয়ে যাচ্ছি। চোখ বুজে চলুন'—বললে নিশীথকে। কিন্তু নিশীথ বসেই রইল সোফার উপর। ছাদে না গিয়েও এ ঘরেও এই মুহূর্তে মন যে-সব অন্তিম জিনিস চাচ্ছে, শরীরকেও সুপাত্র হিসেবে আহ্বান করে মনের সে সব দাবি মেটানো কেন যেন এখন আর দুঃসাধ্য বলে মনে হচ্ছে না নিশীথের। কথা অনেক বলা হয়েছে; কথা বলতে চাইবে না নারী আর, চাইবে না পুরুষ আর, একটু নিস্তব্ধ হয়ে থাকতে চাইবে মানুষের যা প্রাপ্য নয় সেই নিঃসময়ের ভিতর, মানুষের যা প্রাপ্য সেই খণ্ড সময়কে অনুনয় করে সরে যেতে বলে। জানে তো নমিতা। নিশীথ যে জানে তাও জানে। কিন্তু তাও কথাই বলবে নিশীথ, নমিতাকে দিয়ে কথাই বলাবে, ছাদে যাবে-না, কিছু করবে না।

জল খাবে বলে উঠে দাঁড়াল নিশীথ।

'দিচ্ছি।' —নমিতা বললে।

যে গেলাসে এইমাত্র নিজে জল খেয়েছিল, না-ধুয়ে সেই গেলাসেই জল বরফ ভর্তি করে নিশীথকে দিল নমিতা। পৃথিবীর কোনো দেবতা-দেবীরও এঁটো জল খায় না নিশীথ। কিন্তু আজ এই রাতে, এখন, সে-পৃথিবী ফুরিয়ে গেছে যেন। নমিতার হাতের থেকে বরফের গেলাসটা তুলে নিয়ে সোফায় ফিরে গেল।

'আপনি তো খুব বসে, জিরিয়ে খাচ্ছেন। ছাদে যেতে দেরি করে ফেলছেন নিশীথবাবু।'

'স্কোয়াশ দিয়েছেন দেখছি। কখন খুললেন বোতল? টের তো পাই নি।' নিশীথ বললে।

'পান নি?'—নমিতা নিজের জন্যে এক গেলাস ভরে আনতে-আনতে বললে, কিন্তু তবুও খুলেছি তো। এবারে টের পাচ্ছেন?'

নমিতা সোফায় ফিরে এসে বরফ মেশানো ক্রাশড রসের গেলাসটায় একটা চুমুক দিয়ে বললে, 'আমিও তা হলে তাড়াহুড়ো করে খাব না। ছাদে উঠবার সিঁড়িটা দেখেন নি বুঝি কোনো দিন? স্পাইরাল সিঁড়ি।'

স্পাইরাল? নিশীথের মনে পড়ে গেল এইবারে, 'ওঃ'!

'চড়েন নি? সিঁড়িটা বাইরের দিকে, দালানটার পশ্চিমদিকের দেয়াল ঘেঁসে, সদর দরজা দিয়ে ঢুকবার সময় বড় একটা নজর পড়ে না। গাছপালার আড়াল থেকে যায়—'

'হ্যাঁ। ও-দিক দিয়ে দিন-রাত চাকর-বাকর ঝাড়ুদার জমাদারদের তো চলাফেরা করতে দেখতাম---'

নিশীথ স্কোয়াশের গেলাসের বরফ নাড়ল খানিকক্ষণ গেলাসটা ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে।

'ওদেরই তো সিঁড়ি ওটা।'

'ছাদে ওঠে গিয়ে?'

'উঠলে উঠবে। কোথায় যাই আমি আর জিতেন ছাদে? যাক না ওরা ছাদে—জমাদার, রফিক, হানিফ।'

নিশীথ সায় দিয়ে বললে, 'তা নিশ্চয়ই যাবে। কিন্তু গিয়ে বিশেষ ভাল লাগবে না ওদের।'

'কেন?'

'সমাজ-সংসারে ভিত্তি নেই, ছাদে দাঁড়িয়ে কী সুখ পাবে আর? কত ক্ষণ পাবে? ওদের সাংসারিক গাঁথুনিটাকে শক্ত করে দেওয়া দরকার। জিতেনরা তাই করছে।'

নিশীথের ভাল মানুষি শ্লেষটা ভাল মনে গ্রহণ করে নমিতা বললে, 'একটা কিছু করা দরকার আমাদের। সমাজের নীচের দিকে যারা আছে, দিন রাত বেশি

টাকার, বেশি সুখের খাঁই মিটিয়ে তাদের আমরা গণ্যই করছি না। মাড়িয়ে, গালিয়ে, থেৎলে ছুটেছি, এই অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে নানা রকম পলিটিক্যাল কর্মীদের।'

নিশীথ চুপ করেছিল। নমিতা তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করছে দেখে গেলাসের বরফগুলোকে একটা নাড়া খাইয়ে দিয়ে বললে, 'ঠিকই তো বলে কর্মীরা। তাদের অভিযোগ আমার মত নিম্ন মধ্যশ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধেও। ঠিকই বলে তারা।'

'বলে আমরা ক্যাপিটালিস্ট।'

'আপনারা তো ক্যাপিটালিস্ট।'

'আপনিও তো।'

নিশীথ গেলাসের বরফ গলানির দিকে তাকিয়ে বললে, 'না, আমি ক্যাপিটালিস্ট কী করে বলি নিজেকে? জিতেন হতে পেরেছে। জীবনের যুদ্ধে কী করব, না করব, কিছু ঠিক না করতে পেরে গা ভাসিয়ে অনেক দূর এসে পড়েছি। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি আজ ক্যাপিটালিস্টের বন্ধু। অবিশ্যি জিতেনের ক্যাপিটালিজমের খোঁচা আমাকে দিতে আসে না সে। আমিও তার সঙ্গে বেশি মিশে-মিশে বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। আজ পর্যন্ত জিতেনের সঙ্গে মিলে-মিশে চলেছি।'

'তা হলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কী করে হল? ও, আমার সঙ্গে হল বুঝি? অনিচ্ছায়?'

নিশীথ হেসে ফেলল, কোনো কথা বললে না। এ-রকম সহজ কথার কী উত্তর দেবে সে? কোনো রকম জলের মতন সোজা উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না; নেইও বুঝি সে রকম জিনিস কোথাও? নমিতা কেমন চিন্তিত দেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। হাতে গেলাসটা ধরে; বেশি বরফের ঠাণ্ডা গেলাসটা।

'ছাদে যাওয়া হল না।'

'না।' নমিতা বললে।

'চলুন যাই'—নিশীথ বললে

'না, পাঁচটা বাজে'—ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে নমিতা।

'কী হবে পাঁচটা বেজেছে বলে?'

'লোকজন উঠে পড়েছে।'

'আমরা ছাদে বেড়াব। ওরা দেখবে। দেখুক। কী হবে দেখলে?'

'না, সে জন্যে নয়। রাত দেড়টা-দুটো-আড়াইটের সময় ছাদে যেতে হয়; সব জিনিসের একটা সময় আছে; নক্ষত্র দেখবার, ঘুমিয়ে থাকবার, ছাদে ঘুমিয়ে থাকবার।' নিজের হাতের গেলাসের ফলের রস এক চুমুকে শেষ করে তেপয়ের উপর রেখে দিল নমিতা। কী একটা ফিকে কথা বলে ফেলেছে নমিতাকে, কোনো স্বাভাবিক সার্থক কথা ভাবতে-ভাবতে কেমন অস্বস্তিবোধ করেছিল নিশীথ।

আলো এসে পড়েছে। চারদিকে লোকজন জেগে উঠেছে। হানিফ এসে পড়ল। কাজেই রাতটাকে সার্থক করে তোলবার শেষ চেষ্টায় মনটা আলোড়িত হয়ে উঠলেও মাঝ পথেই অর্ধসমাপ্ত হয়ে রইল সব।

'কী চাই হানিফ?'

'জুলফিকার সাহেব আপনাকে যেতে বলেছেন।'

'কোথায়?'

'তাঁর বাড়িতে—পার্কসার্কাসের ফ্ল্যাটে।'

'আজ? কখন?'

'আজ ছোট হাজরি খেয়ে যাবার সময় হবে আপনার?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে নমিতা বললে, 'কাকে দিয়ে খবর পাঠালে জুলফিকার?'

'তিনি নিজে এসেছিলেন।'

'এ বাড়িতে? কখন?'

'ভোর পাঁচটার সময়ে।'

'তারপর?'

'উপরে চলে এলেন আমার সঙ্গে।'

'উপরে এসেছিল?' কেমন যেন ঘোড়া হাওয়ায় ফিতের মত শূন্যে হঠাৎ ডাক পেয়ে উঠে বললে নমিতা।

নমিতার মুখের দিকে নিঃস্বার্থ চোখ ফিরিয়ে হানিফের দিকে একবার তাকিয়ে ঘর-বাইরের আলো-রোদের দিকে তাকাল নিশীথ।

'উপরে কোথায় এল পাঁচটার সময়, কী আমি তো টের পেলুম না

হানিফ।'

'ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসেছিলেন।'

'কেন ?'

'কী উত্তর দেবে ? একটু ধাঁধায় পড়ে ঢোক গিলে চুপ করে রইল হানিফ।'

'জুলফিকার কি জানে না যে দাশগুপ্ত সাহেব বাড়িতে নেই ?'

'তা জানেন, জরুর।'

'তবে ? আমি যে জেগে আছি তা বলো নি তাকে ?'

'বলেছিলুম, কিন্তু সাহেবের সঙ্গে আপনি কথা বলছেন সেইজন্যে চলে গেলেন।'

নমিতা ঝনঝনিয়ে উঠে বললে, 'আচ্ছা !'

নিশীথ আর-একটা সোফার কাছেই বসে আছে।

কাতরে উঠে নমিতা বললে, 'আচ্ছা'।

'আচ্ছা ! আচ্ছা !—বলতে বলতে সিগারেট বার করে নিয়ে ঘরটার চারদিকে ঘুরে এল একবার নমিতা, কিছু ক্ষণ পরে বললে, 'আচ্ছা যাও, তুমি হানিফ। আমি চা খেয়েই ফোন করে দেব জুলফিকার সাহেবকে।' চলে গেল হানিফ।

'কী হয়েছে জুলফিকারের ?'

'জানি না তো।'

'আজ খুব ভোরে আসবার কথা ছিল তার ?'

'আমাকে বলে নি তো'।

'দাশগুপ্ত সাহেব থাকলে এ ঘরে আসে না বুঝি জুলফিকার ?' হাতের সিগারেটটা তেপয়ের উপর গড়িয়ে, সরিয়ে রেখে, নমিতা তেরছা কান্নিক মেরে নিশীথের দিকে একবার দ্রুত তাকিয়ে, সিগারেটের দুটো তিনটে থেকে ওয়েস্ট মিনিস্টারেরটা বেছে নিয়ে, সিগারেট বার করে টিনটা সরিয়ে রাখল খোলা মুখে—ঢাকনি আটকাবার কোনো চেষ্টা না করে।

'কেন আসে না এদিকে জুলফিকার ; দাশগুপ্ত সাহেব বাড়িতে থাকলে ?'

'ও-সব কথার কোনো খেই পাবেন না নিশীথবাবু।'

'কোনো কথারই খেই নেই পৃথিবীতে, জানেন কি ?'

কিন্তু, নমিতার মন অন্য কোথাও যেন ঘুরে বেড়াচ্ছিল, নিশীথের কথার দিকে তার লক্ষ্য ছিল না। সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিল নমিতা।

'জুলফিকারকে চেনেন আপনি ?'

'একজন মুসলমান অফিসার তো ? পার্কসার্কাসে থাকে।' নিশীথ বললে।

'এই কি একজন মানুষের পরিচয় হল ?'

নিশীথ নিজের ভুল ধরতে পারে, রুমালে সিকনি ঝেড়ে ঠাণ্ডা হয়ে বললে, 'মোটামুটি হল।'

'নামটা পেলাম, এখন মুখস্থ করলেই হয়ে যায়। প্রায় মানুষের এইই বুঝি পরিচয় নিশীথবাবু ?'

নমিতার দিকে তাকাল নিশীথ—স্নিগ্ধ শ্রদ্ধায় ; জ্ঞানের কথা বলেছে নমিতা।

'দাশগুপ্ত সাহেব জুলফিকারকে পছন্দ করেন না। কিন্তু দু-জনের মধ্যে বড় সাহেব কে ?'

'তিনি মনে করেন জুলফিকারের সঙ্গে আমি বেশি মিশি।'

'কিন্তু দাশগুপ্ত তো বড় সাহেব ?'

'এটা, জীবনের কথা নয়—ব্যক্তিগত জীবনবেদের কথা'—নিশীথের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখ ফিরিয়ে নমিতা বলল।

'কী করেছে জুলফিকার ?'

'কী করেছেন আপনি নিশীথবাবু ?'

'আমি ? কী করেছি আমি ?'

'ভাব করে ফেলছেন আমার সঙ্গে। কী বলবেন আপনার স্ত্রী জানতে পারেন যদি। কী মনে করছে হানিফ ? কী ভেবে গেল জুলফিকার ?'

কী মনে করত অর্চিতা এখানে থাকলে ? নমিতাকে ভাল লাগে নিশীথের, তাই সে মিশেছে ; জুলফিকারেরও ভাল লাগে নমিতাকে, আরো বেশি মিশেছে তাই নমিতার সঙ্গে।

'আপনার মা কেমন আছেন ?'

'মাথার যন্ত্রণাটা কমে গেছে সারিডন খেয়ে। ঘুমুচ্ছিলেন, যখন আমি চলে আসি। রোজেনবুর্গ একটা ওষুধ দিয়ে গেছেন—যদি দরকার হয়।'

'কেমন আছেন মুখার্জি সাহেব ?'

'বাবার একটু খারাপ হচ্ছিল। সামলে নিয়েছেন। আমি যেতেই দেখলাম প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছেন।'

'মুশকিল এই বয়সে এ রকম করিৎকর্মা মানুষের এ রকমভাবে টিঁকে থাকা।'

'কী হবে, চারা নেই ; নিজের দোষেই হয়। বাবার তো সিফিলিস হয়েছিল',

নমিতা বললে, 'আমার জন্মাবার আগে'।

চোখে-মুখে বিশেষ কোনো ভাব দেখা গেল না নিশীথের ; কিছু হয়েছে বা হয় নি—তা নয় ; যা আছে তাই যেন রয়েছে সব, সমস্ত প্রস্থানের ভিতরে।

'মারও হল তাই।'

'কেন, রক্ত পরীক্ষা করে ইনজেকশন নেন নি ? মুখার্জি সাহেব তো এত বড় তালেবর লোক। কিন্তু এটা করেন নি কেন ? করেন নি ?' আস্তে-আস্তে বললে নিশীথ।

'না, ইনজেকশন নেন নি ; তিনি মনে করেছিলেন কোনোই রোগই তাঁকে খেতে পারে না, তিনিই রোগ খেয়ে ফেলেন। এক-একটা লোকের কেমন ম্যানিয়া থাকে নিশীথবাবু। শত বুদ্ধি-বিবেচনা থাকলেও জীবনের ভিতরে কলি ঢোকবার ছ্যাঁদাটা ঠিক করে রেখে দেন তারা। কারু সাধ্যি নেই ছ্যাঁদা বোজাবে। মাও ইনজেকশন নেন নি।'

'কেন ?'

'বাবা তো রোগ স্বীকার করতেন না। মাও ব্যাধটা পেলেন, আরো চার-পাঁচ-জনকে তো দিয়েছেনই, আট-দশজনও হতে পারে।'

ভোরের আলোয় মনে হচ্ছিল যেন কোনো নির্মল মেয়েমানুষের মত আত্মস্থ হয়ে নচিকেতার মত, বৃষ্টির মত, পাখির মত, আওয়াজে কথা বলছে নমিতা। বাবা-মা কী করেছে সবই জানে, সবই সকলকে বলতে কোনো দ্বিধা নেই তার, বোধ বিচারের এমনই একটা সত্য ও কল্যাণে যেন সে পৌঁছেছে।

'মা যাঁদের খেয়েছেন তাঁরা সেরে যান। রোজই সাপের কামড় খেয়ে বেজির ওষুধ খেতে হয় তাদের। তাঁরা ঠিক আছেন। কিন্তু আমার রক্তে তো জন্ম থেকেই বিষ। কোনো ওষুধ আছে কি না বলতে পারছি না। আমার বাবার জন্যে'—নমিতা বললে।

সিগারেটের টিনের লেবেলের উপরকার ক্ষুদে অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে দূর থেকে পড়বার চেষ্টা করছিল নিশীথ ; চোখের শক্তি পরীক্ষা করে দেখছিল।

'আপনার কথা বলেছিলেন আপনার বাবা ?'

'কাকে ?'

'ডাক্তারকে।'

'না, আমাকেও বলেন নি ; আমি নিজে অনেকদিন পর্যন্ত বুঝতে পারি নি

কিছু।'

'অনেক দিন ?'

'জিতেনের সঙ্গে বিয়ের দেড় বছর আগে বুঝেছি।'

'ও।'

'ইনজেকশন নিচ্ছি। বিয়ে তো ছ মাস আগে হয়েছে।

'জিতেন জানে ?'

'আমি বলি নি কোনোদিন,' নমিতা বললে, 'জিতেনকে বলবেন না যেন নিশীথবাবু।'

কী করে বলবে নিশীথ। এ সব ব্যাপারে নিজের স্ত্রীর চেয়ে কর্তা তো কেউ নেই। কেষ্ট নিজে যদি মারে কেউ রাখতে পারবে না। যদি রাখে কে মারবে তবে আর ?

'ইনজেকশন দিয়ে সেরে গেছে রোগ ?'

'না, সারে নি এখনো। ট্রিটমেন্ট চলছে। সময় লাগবে সারতে।'

'রোজেনবুর্গ দেখছেন ?'

'না। বিনয় কাহালি।'

'সে কে ?'

'খুব বড় স্পেশালিস্ট ; আমাদের কাউকেই চেনেন না। জানেন না আমি কে। জিতেন দাশগুপ্তের নাম শোনেন নি কোনো দিন।'

'আশ্চর্য, দাশগুপ্তের নাম শোনে নি এমন বাঙালি ডাক্তারও আছে কলকাতা শহরে ?'

'বিনয় কাহালি ?'

সিগারেটের টিনের লেবেলের উপরে লেখা কিছুতেই পড়তে পারছিল না নিশীথ ; চোখ খারাপ হয়েছে ; দেখানো দরকার ; ছানি পড়তে আরম্ভ করল না তো ?

'জিতেন তো ফাঁদে পড়তে পারে—না জেনে ?'

'কিন্তু অন্য কাউকে নাশ করবে না।'

নমিতা একটা সিগারেটের টিনের ঢাকনি খুব টাইট করে এঁটে নিতে-নিতে বললে, 'জিতেন খুব ভাল ছেলে।'

'কিন্তু রোগ হলে ওর নিজের পরিণাম তো ভাল নয়।'

'সেদিকে আমার দৃষ্টি আছে নিশীথবাবু, জিতেনের নুন খাচ্ছি বলে রক্তও খাব?' টাইট ঢাকনির সিগারেটের টিনটা দু-একবার খুলবার চেষ্টা করে, খুলে ফেলে আবার টাইট করে এঁটে দিতে-দিতে বললে নমিতা, 'এ সব বিষয়ে সব কথা আপনাকে কী করে বলি বলুন?'

নমিতা সব কথাই তো নিশীথকে বলে ফেলেছে।

ইয়ুসুফকে বলেছে হয় তো, জুলফিকারকে আরো বেশি বলেছে? আরো বেশি কী কথা থাকতে পারে যা সত্যিই বলবার মত? নিশীথ সে সব অন্তিম আর্য-সত্যগুলোকে ভেবে দেখছিল। নাঃ, কিছু নেই আর; বাবা-মার সিফিলিস। নিজেও দূষিত বলেছে—সে একজন পুরুষকে সবই তো বলেছে। হয় তো কথা বলা শুধু, হয় তো সত্য কথা বলা, কিন্তু সব থিতিয়ে শেষ পর্যন্ত অমৃত রয়েছে; নমিতার সুস্থ সফল সুন্দর শরীরের দিকে তাকিয়ে অনুভব করছিল নিশীথ।

'যাবেন আজ পার্কসার্কাসে?'

'যাব'।

'কখন?'

'খেয়ে-দেয়ে দুপুর বেলা। আপনি কি কম্যুনিস্ট নিশীথবাবু?'

'না তো। আমার ছেলে একটা নতুন সোস্যালিস্ট পার্টি গড়ছে, আমি কোনো দিকেই ভিড়লুম না।'

'আমি তো ক্যাপিটালিস্ট—'

'দেখছি তো।'

'আমাদের কি উচ্ছেদ করে দেয়া হবে?'

'চেষ্টা চলছে। তবে শিগগির সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।'

'এ চেষ্টায় আপনি কোন দলে?'

'সকলের যাতে ভাল হয়, সবার উপর সুবিচার হয়; আমি, আমার সেপাই, আমার রাধাচক্রের জয় হল কি না অন্য সব কাপ্তেনদের উপরে—সেদিকে লক্ষ্য না রেখে —এ রকম একটা শিব সুস্থ, প্রাণবান পরিণতিতে আজকের কোনো বিপ্লবই আমাদের নিয়ে যাবে বলে মনে হয় না' বলতে-বলতে থেমে গিয়ে, খানিকক্ষণ থেমে থেকে নিশীথ বললে, 'তা হলেও যারা মনে করছে তাদের আন্দোলনের লক্ষ্য সকলের ভাল, কল্যাণের পথ সত্যিই সুগম করে দেয়া সকলের জন্যে—আমার ঝোঁক তাদের দিকে।'

'অনেক ক্যাপিটালিস্টই তো আজকাল এই রকম কথা বলছে, নমিতা বললে।

'তা বলছে বটে। সে জন্য এ সব কথার মর্যাদা কমে যাচ্ছে। কথা চাচ্ছে না এখন আর মানুষ কোনো শ্রেণীর কোনো নেতার মুখ থেকে। সব কথা শোনা হয়ে গেছে। এখন নমুনা চাই'—নিশীথ বললে, 'যারা সত্যিই পৃথিবীর ভাল হবে মেনে নিয়ে ভেবেচিন্তে কাজ করে আমার ঝোঁক তাদের দিকে। কিন্তু পৃথিবী কোনোদিন শুদ্ধ হবে না আমি জানি। যে-কোনো বিপ্লব শেষ পর্যন্ত বিপ্লবে গিয়ে দাঁড়ায়। ভবিষ্যৎ মানবের ভাল করতে গিয়ে সমসাময়িক মানুষকে শেষ করে দিয়ে যায়। কিন্তু তবুও ভবিষ্যৎ মানুষের ভাল হয় না। তিন হাজার বছর ধরে এই তো চলছে। আরো তিন-চার হাজার বছর এই রকমই চলবে।'

'এই কি আপনার ধারণা ?'

'এর চেয়ে শ্রেয় ধারণায় আমাকে দাঁড় করিয়ে দিন না, আপনাকে শিরোপা দেব।'

'এক-একজন বড় মানুষের মৃত্যু হলে ওরা লেখে, সভা সমিতিতে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বলে যে শেষ পর্যন্ত মানুষের প্রতি আস্থা কোনোদিনও হারিয়ে ফেলেন নি তিনি। মানুষ যে অমানুষ সেটা তিনি দিন-রাত্তির দেখেছেন চারিদিকে বটে, কিন্তু স্বীকার করতে চান নি। চারদিকে সব ভেঙে পড়ছে, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে মানুষের হাতে, সেটা দেখতে পেলেও তিনি জানতেন মানুষের হৃদয় ঠিক জায়গায়ই আছে, মানবতার প্রতি বিশ্বাস শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল তাঁর,' নমিতা বললে, 'কেন এ রকম বলে, লেখে, যে-কোনো বিশেষ কর্মিৎকর্মা বা চিন্তাশীল লোকের মৃত্যু হলে ?' নিশীথকে জিজ্ঞেস করল নমিতা।

'এ ছাড়া কী আর বলবে ? এ ছাড়া কী আর লিখবে ?' বললে নিশীথ, 'পৃথিবীর উন্নতি হবে, মানুষের ভাল হবে, মানুষ ভাল—এটা ক্যাপিটালিস্ট বা কম্যুনিস্টদেরই নিজেদের কথা নয়, সকলেরই, পৃথিবীর মানুষ সাধারণেরই, এই ধারণা।'

'ধারণাটা দুর্বার ?' নমিতা হেসে বললে, 'তবেই হয়েছে,' তবে একটা কথা নিশীথকে বললে, 'মানুষ যদি সত্যিই ভাল না হয় তা হলে সে যে ভাল, তার পৃথিবীর যে ভাল হবে, এ ধারণা এমন গেড়ে বসে কী করে তার মনের ভিতর ?'

'কই আমার তো বসে নি।'

'আপনার কথা আলাদা—'

'খুব ভাল হবে মানুষের; মনে হয় আপনার? আজ কংগ্রেস, কাল কম্যুনিস্ট, পরশু স্যোসালিস্টরা সত্যিই সিদ্ধির স্তরে পৌঁছিয়ে দেবে পৃথিবীটাকে?'

'হতে পারে। অসম্ভব কী? কংগ্রেস তো প্রাণান্ত চেষ্টা করছে।'

'কম্যুনিস্টরাও তো প্রাণান্ত চেষ্টা করছে।'

'কম্যুনিস্টরা? কোথায়?'

'কেন, তাদের দেশে রাশিয়ায়। আরো অনেক দেশে। আমাদের দেশেও তো।'

নমিতা তা জানে বটে।

'জিজ্ঞেস করেছিলুম আপনি কম্যুনিস্ট কি না।'

'আমি কোনো কিছুই নই।'

'ঐ কথাই বলে কম্যুনিস্টরা; বলে ওরা কোনো দলেরই নয়।'

'কোনো কম্যুনিস্টই তা বলে না।'

'আধা কম্যুনিস্টরা তো বলে?'

'কাকে বলে আধা কম্যুনিস্ট নমিতা দেবী?'

নমিতা একটা সিগারেট নিল। —'কাকে বলে আমি ঠিক বলতে পারছি না। আমি নিজেই হয় তো একজন। জুলফিকারও হয় তো। সে তো মার্কস পড়ছে—'

'বড় বইটা? দাস ক্যাপিটাল?'

'হ্যাঁ, মূল জার্মান থেকে, মাঝে-মাঝে আমি বুঝিয়ে দিই তাকে। ইংরেজি অনুবাদটা পড়তে চাচ্ছে না তাই।'

জুলফিকার হয় তো ভেবেছে কায়কাবাদের উক্তি তার নিজের ভাষায়ই পড়া ভাল। 'ঠিকই ভেবেছে' —নিশীথ বললে।

'বেশ লিখেছে তো মার্কস। ঠিক কথাই লিখেছে। আপনি পড়েছেন দাস ক্যাপিটাল?'—নিশীথের দিকে আন্তরিক অমায়িক ঘাড় ফিরিয়ে নমিতা বললে।

'এইবারে পড়ব ভাবছি—'

'আমার জার্মান বইটা জুলফিকারের কাছে আছে। মাঝে-মাঝে নিয়ে আসতে পারি। তর্জমা করে শোনাতে পারি আপনাকে। আলোচনা চলতে পারে

তারপর আপনাতে-আমাতে—জিতেন থাকলে সেও বলবে যা বলবার। ক্যাপিটালিস্টদের পক্ষ থেকে কিছু আত্ম-সমর্থনের উপায় আছে হয় তো জিতেনের। নিজেদের বারটা বেজে গেছে এ কথা সে কিছুতেই স্বীকার করতে চাইবে না।'

'কে, জিতেন ?' সিগারেট জ্বালাতে-জ্বালাতে বললে নিশীথ।

'বড্ড ঘোড়েল লোক' নমিতা হাতের সিগারেটটা ঠোঁটে আটকে নিয়ে বললে।

'খুব পরিব্যাপ্তি আছে আপনার মনের নমিতা দেবী। প্রায় কোনো স্ত্রীলোককেই এ রকম দেখি নি আমি, আপনার মতন এ রকম—'

'আমার মতন ?' নমিতা সাত-পাঁচ ভেবে নিশীথের দিকে তাকাল।

'জার্মান দাস ক্যাপিটাল আর ফরাসি ভিলোঁ, কী করে একই মানুষের মনে প্রায় সমান ঠাঁই করে নেয়, সেটা আন্দাজ করছিলুম। মার্কসের কারণ-সাগরে যারা ডুবে আছে, তাদের আমি খুব শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাদের ভিতর কেউ যদি ভিলোঁর মতন শয়তানের কবিতার রসগ্রহণ করবার দুঃসাহস দেখায়, তা হলে—'

'কী হয় তা হলে ?'

'তা হলে সে লোকের মনের চারণভূমির প্রসার দেখে বাস্তবিকই খুব আশ্বাস পাওয়া যায়।'

নমিতা নিজের মনের এ দিককার শ্রী সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিল না, এবারেও বিশেষ কোনো সম্ভ্রমবোধ করল না সে নিজের চিত্তবৃত্তির জন্যে। মার্কসের চিন্তাকূট অনুসরণ করে নিদারুণ জার্মান বাক্যগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে গিয়ে লেগেছে মন্দ না। ভিলোঁর ফরাসি কবিতা ভাল লেগেছে ; এ কোনো বৃহৎ মনের পরিচয় নয়, মহৎ মনের তো নয়ই ; তবে মনের রসিকতা আছে তার হয় তো, রসিকতায় উদারতা আছে বটে।

'ভিলোঁর কবিতার কথা ভুলেই গিয়েছিলুম।'

'ভিলোঁর ফরাসি আবৃত্তি করে পড়বেন, শুনতে চাই। পড়ে তারপর তর্জমা। কবে সম্ভব হবে ?'

নমিতা মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে বললে, 'আজ, কাল, যে-কোনোদিন। যখনই সুবিধে হয় আপনার।'

'যে কোনোদিন—যখনই সুবিধে—আচ্ছা তা হলে —বইটা জুলফিকারের কাছে আছে। আনিয়ে নিতে হবে।'

নিশীথ কী যেন বলতে যাচ্ছিল—না বলে কুঁড়েমি অনুভব করে নমিতার ডান পায়ের উপর চড়ানো বাঁ পায়ের যুগল শোভার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

'ভিলোঁ ফরাসিতে আরো ভাল লাগবে আপনার।' —নমিতা বললে। বলে সে নিশীথের চোখ অনুসরণ করে নিজের ডান পায়ের উপর চড়ানো বাঁ পায়ের অনড় আবদ্ধতার দিকে তাকিয়ে দেখল একবার।

'কিন্তু আমার তর্জমায় তেমন জুত লাগবে না আপনার নিশীথবাবু।'

বাবুর্চি এই ঘরে বড়-বড় তেপয় এনে সাজিয়ে ঠিক করে গেল। চা, প্যাস্ট্রি, ডিম, জ্যাম, মার্মালেডের শিশি একে-একে রেখে গেল সব। দুপুর রাতে বেশ সাধ মিটিয়ে ঘষে মেজে রগড়ে সাফ করেছে নমিতা। হাত-মুখ ধুতে গেল না আর। নিশীথ মুখধোবার বেসিন থেকে পাঁচ মিনিটেই কাজ সেরে ফিরে এল। পাউরুটির কাঁচা স্লাইসে মাখন মার্মালেড মাখাচ্ছিল নমিতা। হয়ে গেছে। নিশীথকে ফিরে এসে কৌচে বসতে দেখে বড় ঘন নীল টিপট থেকে চা ঢালতে লাগল।

চা দিয়েছে আজ। নমিতা বললে, 'খাবেন কফি?' নিশীথকে জিজ্ঞেস করল।

'না, বেশ চমৎকার চা।'

'বিকেলে কফি হলে ভাল হয়?

'বিকেলে কি থাকবেন আপনি এখানে?'

'না থাকলে বাবুর্চিকে বলে যাব।'

'পার্কসার্কাসে যাবেন?'

'হ্যাঁ, জুলফিকার বলে দিয়েছে।'

'আমিও বেরিয়ে পড়ব হয় তো বিকেলে।'

'জুলফিকার ইয়ুসুফের ভাই' —একটা প্যাস্ট্রিতে কামড় দিয়ে বললে নমিতা।'

'পশ্চিমবাংলা সরকারের একটা কী পজিশন অকুপাই করে আছে। দাঙ্গার সময়ে সোরাবর্দি সাহেবের গভর্নমেন্টের একটা কী-পজিশন ধরেছিল। লোক ভাল। আমার বাবা-মাকে তো দাঙ্গার সময়ে কেটেই ফেলত পার্কসার্কাসে, বাঁচিয়েছে জুলফিকার ইয়ুসুফ—'

চা খাচ্ছিল নিশীথ, খানিক খেয়েছে ; চায়ের পেয়ালাটা তেপয়ের উপর রেখে দিয়ে একটা প্যাস্ট্রি বেছে নিতে-নিতে বললে, 'আপনাকেও তো বাঁচিয়েছে, ছিলেন না পার্কসার্কাস সেই সময়ে ?

'ছিলুম।'

'কে ইয়ুসুফ ? ইয়ুসুফ বাঁচাল বুঝি আপনাকে ?'

'না। তার ভাই। জুলফিকার নিজের ঘরে হাওয়া করে রেখে দিয়েছিল আমাকে দশ রাত—'

'ক বছর ছিলেন ওদের ফ্ল্যাটে বিয়ের আগে ?'

'পার্কসার্কাসে ? বছর তিনেক ছিলুম।'

নিশীথ বললে, 'কোথায় দেখল আপনাকে জিতেন ?'

নিশীথ খাচ্ছে না কিছু, চা খাচ্ছে শুধু, প্যাস্ট্রি খাচ্ছে না, পাউরুটি স্যাণ্ডউইচ যা হোক না, ডিম পোচ একটা খেয়েছে শুধু। নিশীথকে ডিম প্যাস্ট্রি স্যাণ্ডউইচ খেতে বললে নমিতা। 'গ্র্যাহাম অ্যাণ্ড গ্র্যাহামে জিতেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার।'

'একেবারে সিংহের নিজের গহ্বরে ?'

'একটা ব্যবসা চালাচ্ছিলুম ইয়ুসুফ আর আমি।'

কিসের ব্যবসা ?'

'সেটা আপনাকে বলব না নিশীথবাবু।'

'মিটে গেছে বুঝি ব্যবসা ?'

'মিটিয়ে—চুকিয়ে-বুকিয়েই দিয়েছি বলে জানে জিতেন।'

খানিকটা স্যাণ্ডউইচ কেটে, ডিম পোচের খানিকটা মিশিয়ে নিয়ে, মুখে তুলবার আগে বলে নিল নমিতা ; খেতে-খেতে বললে, 'কিন্তু চলছে ব্যবসাটা। সেটা নিয়ে নয়, অন্য দু-দশটা ফাঁক-ফিকির সম্পর্কে দাশগুপ্ত সাহেবের পরামর্শ নেবার জন্য কয়েক দিন তাঁর অফিসে গিয়েছিলুম আমি আর ইয়ুসুফ—আরো চা খাচ্ছেন নিশীথবাবু ? ডিম, মাখন, জেলি, কেক কিছু খাচ্ছেন না। ও-সব খোকারা খায় বুঝি ? দিন, আমি ঢেলে দিচ্ছি।'

'দিন।'

টি-পটটা স্বামিনী নিজের হাতে নিয়ে নিশীথের পেয়ালায় চা ঢেলে দিতে লাগল।

'কথা হচ্ছিল ক্যাপিটালিস্ট, কম্যুনিষ্ট, সোশ্যালিস্টদের নিয়ে। কথা বলতে-বলতে খেই হারিয়ে ফেলেছি আমরা। কয়েকজন বড় ঘরের মেয়ে ইদানীং আমার বাড়ি প্রায়ই আসছে।'

'কেন ?'

'চেনাজানা ছিল না তাদের সঙ্গে ; নাম শুনি নি কোনো দিন। দেখছি তারা সকলেই বেশ ভাল-ভাল সমিতির মেম্বার, সেক্রেটারি, ভাইস প্রেসিডেণ্ট, ট্রেজারার। সমিতিগুলো সবই প্রায় দেশসেবার ব্যাপার নিয়ে ; কিন্তু দেশসেবার চেয়েও মানুষসেবার দিকে ঝোঁক তাদের ঢের বেশি। ঝাড়ুদার-জমাদার হানিফ, কৃষাণ, ট্রাম-বাস ফ্যাক্টরির মজদুর ; এদের নিয়েই তাদের সমিতিসভাগুলো ঢের বেশি ব্যস্ত।'

'আপনিও মেম্বার হয়েছেন বুঝি ?' নিশীথ বললে।

টি-পট থেকে নিজের পেয়ালায় চা ঢেলে নিতে-নিতে নমিতা বললে, 'হতে চাই নি আমি প্রথমে।'

'কেন ?'

'আমি তো ক্যাপিটালিস্ট।'

'তাতে কি ? যে-সব মহিলারা এসেছিলেন আপনার কাছে তাঁদের ভিতর অনেকেই তো বুর্জোয়া ক্যাপিটালিস্ট।'

নমিতা চায়ে চুমুক দিতে যাচ্ছিল, পেয়ালাটা সরিয়ে নিয়ে বললে, 'কে বললে আপনাকে ?'

'আপনিই তো বললেন বড় ঘরের মেয়েরা সব এসেছিল, আপনার কাছে। বড় ঘরের মেয়েরা কী করে কৃষাণমজদুররাজ হয় ?'

খেল না, চায়ের পেয়ালাটা হাতেও রাখল না নমিতা। তেপয়ের উপর বসিয়ে রেখে বললে, 'দেখলাম বেশ ভাল চেহারা, সুস্থ শাড়ি-কাপড় ঠিক-ঠিক। স্বামীরা বড়-বড় অফিসার, তাই বলেছি বড় ঘরের মেয়ে। কিন্তু তাই বলে ওঁরা কি প্রলেতারিয়েতদের বিপ্লব আনতে পারবে না ?'

'তা আনতে পারবে'—নিশীথ বললে, চা-ই খাচ্ছিল শুধু ; একটা স্যাণ্ডউইচ কেটে নিচ্ছিল।

'আপনি ভর্তি হয়ে গেলেন বুঝি ওদের দলে ?'

'হয়েছি তো।'

স্যাণ্ডউইচের ছোট একটা টুকরো মুখে নিল নিশীথ। আর খাবে না।

'ওরা কি শুধু চাঁদা নিয়েই ছেড়ে দেবে আমাকে? মাঝে-মাঝে স্ট্রাইকের দরকার হবে?'

'স্ট্রাইক দাঁড় করাতে হবে, পরিচালনা করতে হবে। আপনার যদি ঝোঁক থাকে, সেদিকে দিব্যি পারবেন আপনি।'

নমিতার ওয়াকি পোশাক ও সুস্থ সফলতার দিকে তাকিয়ে নিশীথ বললে, 'চমৎকার এলেম আছে মিসেস দাশগুপ্ত আপনার; গড়বার ভাঙবার। কী করবেন? ভাঙবেন?'

'একটা কিছু করতে হবে নিশীথবাবু। কী যে করব ঠিক পাচ্ছি না। ভাঙবেন বলছেন কেন? কেন, স্ট্রাইকের দরকার নেই কি কোনোদিকেই একেবারে আর? স্ট্রাইক করা মানেই কি ভাঙা? যে-যে জিনিস খারাপ হয়ে গেছে সে গুলো না-ভেঙে ভাল সৃষ্টি করা যাবে কী করে? সে গুলোকে জুড়ে বসে থাকতে দিলে চলবে কেন?'

'পলিটিক্সের আমি কিছু বুঝি না মিসেস দাশগুপ্ত।'

'অথচ আপনি' পলিটিক্সের প্রফেসর নিশীথবাবু—'

'আমি ইংরেজির প্রফেসর।'

'বেশ তো ইংরেজির, ফিলজফির! কিন্তু আজকালকার দিনে পলিটিক্সের ব্যাপারে অন্ধ হয়ে থাকবার উপায় নেই কারু।'

'জিতেন কী বলে? স্ট্রাইক করতে বলে?'

'সে কেন স্ট্রাইক করতে বলবে।'

'গ্র্যাহাম অ্যাণ্ড গ্র্যাহাম তো মস্ত বড় একটা বজ্জাত জায়গা। ওটাকে সব চেয়ে আগে ভেঙে ফেলা দরকার; যদি স্ট্রাইক করতে চান আপনি। জিতেনের অফিস ছেড়ে দিয়ে স্ট্রাইক করার কোনো অর্থ হয় না—'

হানিফ একটা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে এসে নমিতাকে দিল। দু জনকেই সেলাম ঠুকে চলে গেল সে। নিশীথ ভাবছিল এই হানিফদের কথা হচ্ছিল; এ রকম সেলাম ঠুকবার কী দরকার ছিল তার, এ রকম শশব্যস্তভাবে? কেমন করে ঘাড় বেঁকিয়ে মাথা হেঁট করে চলে যাচ্ছে; যেন মাটির থেকে ওঠাতেই পারছে না মাথা। কৃষাণ কামিনদের অবস্থা বুঝি হানিফদের চেয়েও খারাপ?

'কে করেছে টেলিগ্রাম?'

'জিতেন।'

'কী খবর ?'

'জামসেদপুর থেকে দিল্লি চলে যাচ্ছে জিতেন, দশ-পনের দিনের জন্য। আপনাকে থাকতে বলেছে এখানে। জিতেন ফিরে না আসা পর্যন্ত কোথাও যেতে নিষেধ করেছে।'

'কেন যাচ্ছে দিল্লি ?'

'ব্যবসায়ের দরকারে।'

'নিজের ব্যবসায়ের কাজে, না অফিসের ?'

'গ্র্যাহাম অ্যাণ্ড গ্র্যাহাম তো জিতেনের নিজের জিনিস হয়ে যাচ্ছে।'

নিশীথ ভারী আশ্চর্য, কেমন আলোড়িত বোধ করে বলল, 'সত্যি ? কই শুনি নি তো। বলে নি তো কোনো দিন আমাকে জিতেন।'

বিশেষ উৎসাহ বোধ না করে নমিতা বলল, 'বলবার সময় পায় নি। গ্র্যাহাম অ্যাণ্ড গ্র্যাহাম তো ওর নিজের—'

'কেন ? সাহেব পার্টনাররা কোথায় গেল ?'

'বিলেত চলে যাচ্ছে গুডউইল বিক্রি করে দিয়ে।'

'একা জিতেনকে ?'

'জিতেনকে।'

হানিফ এসে চায়ের পেয়ালা, ডিস, সরঞ্জামগুলো সরিয়ে নিয়ে গেল সব। চা খাওয়া হয়ে গেছে। নমিতা দুপুরে এ বাড়িতে খাবে, না অন্য কোথাও, জিজ্ঞেস করল হানিফ।

'হানিফ, তুমি জুলফিকারকে ফোন করে দাও যে আমি আজ দুপুরে পার্ক-সার্কাসে যাব। একটা-দেড়টার সময় যাব।'

'বহুৎ আচ্ছা হুজুর।'

ফোনটা নমিতার হাতের কাছেই ছিল, ইচ্ছে করলে নিজেই করতে পারত কিন্তু কেন যেন গড়িমসি করে উদাসভাবে ঘরবারের দিকে তাকিয়ে পিছিয়ে রইল সে। হানিফ রিসিভার ধরে দাঁড়িয়েছিল ; কানেকশন হয় নি এখনো।

'হানিফ, জুলফিকার যদি জিজ্ঞেস করে, তুমি ফোন করছ কেন, মেমসাহেব বাড়িতে নেই নাকি। তা হলে বলে দিও যে মেমসাহেব বেরিয়ে গেছেন।'

'বহুৎ আচ্ছা হুজুর।'

'যদি জিজ্ঞেস করে যে বাড়িতে আর-কেউ আছে কি না, তবে বলে দিও যে সেনসাহেব আছেন, মেমসাহেব কোথায় আছেন, কী বলেছেন, না বলেছেন, সব জানেন সেনসাহেব। জুলফিকার সাহেব যদি চান সেনসাহেবকে ডেকে দিতে পার হানিফ, —বলো।'

'বহুৎ আচ্ছা হুজুর।'

জুলফিকার ডাকল না কাউকে। হানিফ ফোন করে চলে গেল। —'হানিফকে দিয়ে ফোন করালেন কেন?'

'আমি ফোনে গেলে কথায় কথা বেড়ে যেত ঢের জুলফিকারের।'

'ভালই তো হত।'

'যাচ্ছিই তো পার্কসার্কাসে।'

আটটার সময়ে চা খাওয়া শেষ হয়ে গেল। নিশীথ উঠে গেল, চান করে বেরিয়ে পড়তে হবে। নমিতা নিজের ঘরে ঘুমোতে গেল। এগারটা-বারটার সময় ঘুমের থেকে উঠে স্নান করে পার্কসার্কাসে চলে যাবে। নিশীথ বাথরুমে চলে গেলে হানিফকে ডাকল নমিতা, বললে, সে ঘুমোতে যাচ্ছে, বারটায়ও যদি না জাগে তা হলে হানিফ তাকে জাগিয়ে দিয়ে যায় যেন।

জাগিয়ে দিয়ে যাবে? কিন্তু কাপড়-জামা খুলে ফেলে শুয়ে পড়বে তো নমিতা। অন্দরের দিকের দরজা-জানলা সব বন্ধ করে, বাইরের দিকের জানলাগুলোর উপর পর্দা টেনে দিয়ে ফ্যান খুলে ঘুমিয়ে পড়বে সে, খুবই হুশিয়ারি আছে তার; নানা জায়গায় নানা রকম কাজকর্ম তত্ত্ব-তদারক তদ্বির-আমন্ত্রণ থাকে তার; এখান থেকে ওখানে—ওখান থেকে সেখানে যাওয়ার ফাঁকে-ফাঁকে মাঝে-মাঝে ঘুমিয়ে নেয় সে; কিন্তু বেকুবের মত ঘুমোয় না, সব জায়গাতেই সময় মত হাজির হয় গিয়ে। নিশীথের সঙ্গে কথা বলে সারাটা রাতই আজ জেগে কাটিয়ে দিল। নমিতার এখন ঘুম পেয়েছে, ঘড়িতে আটটা বেজে দশ মিনিট—সাড়ে এগারটার সময় কিংবা মিনিট পনের-কুড়ি আগে বা দশ-পনের মিনিট পিছিয়ে জেগে উঠবে সে এই সংকল্প নিয়ে ঘুমোতে গেল। নিতান্তই যদি না-জাগে, হানিফ কলিং বেল টিপবে নীচের তলার থেকে—বেজে উঠবে তার ঘরের ভিতর; হানিফ সাড়ে এগারটার অ্যালার্ম ঠিক করে গেছে বিছানার কাছে তেপয়ের উপর ঘড়িটাতে, বেজে উঠবে; এতেও না জাগলে দরজায় ধাক্কা দেবে হানিফ। খুব জোরে কড়া নাড়বে, দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়বার

দরকার হবে না হানিফের। হানিফ ঘড়ি ঠিক করে চলে গেছে। অন্দরের দিকের দরজা জানলাগুলো বন্ধ করে দিল নমিতা, ফ্যান খুলে ও-দিককার জানলাগুলোর পর্দা টেনে স্ল্যাক্স কোট খুলে ফেলে শুয়ে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের ওষুধ লাগে নি আজ।

বাথরুম থেকে স্নান সেরে ধোপদুরস্ত পাঞ্জাবি ধুতি পরে বেরিয়ে পড়ল নিশীথ। কাছেই একটা সেলুনে দাড়ি কামিয়ে নিল। জলপাইহাটির থেকে পঞ্চাশ টাকা হাতে নিয়ে নেমেছিল, এখন কুড়ি-পঁচিশ টাকা হাতে আছে। সুমনাকে শিগগির টাকা পাঠাবার দরকার নেই, দেড়শ টাকায় মাস তিনেক চালাতে পারবে একা মানুষ; ডাক্তারকে পাঁচশ টাকা দিয়ে এসেছে। মাস তিনেক চলবে ওষুধ, পথ্য, ভিজিট, ইনজেকশন। ভানুর জন্য কিছু টাকা দেওয়া দরকার নিশ্চয়ই সুবলকে, কিন্তু সেটা অবিলম্বে না দিলেও চলবে; কিছু ফলটল কিনে দেওয়া দরকার বটে ভানুকে। কিন্তু খানিকটা টাকার যোগাড় না করে কোনো দিক দিয়েই কিছু করবার ভরসা পাচ্ছে না নিশীথ।

কোথায় টাকা পাবে সে? চারদিককার ট্রাম, বাস, মোটর, ট্রাকের দুর্নিবার পৃথিবীতে অর্থসঞ্চয়ের কলাকৌশলটা দ্রুত আয়ত্ত করে ফেলা দরকার তার, খুব তাড়াতাড়ি; তা হলেই সেও দ্রুত, একাত্ম হয়ে যাবে এই অপ্রকৃতিস্থ মহানগরীর এই অনর্গল অপরিস্রুত উল্লাসকে আশ্চর্য পরিস্রুত তাণ্ডবে পরিণত করবার দুর্দান্ত সময়যন্ত্রের সঙ্গে। কিন্তু আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ বছরেও টেঁকুর তুলে হাঁটতে-হাঁটতে যদি তাকে নিজের কায়দা-কানুন ঠিক করে নেবার কথা ভাবতে হয়, তা হলেই হয়েছে। চার দিকে কুড়ি-বাইশ বছরের ছোকরারা জিপে ছুটে যাচ্ছে, ব্যাঙ্ক লুটছে, কালবাজার চিবিয়ে খাচ্ছে, বড়-বড় মনসবদারি জোগাড় করছে নতুন ইউনিয়নে, জায়গা জমি কিনছে যাদবপুর বেহালায়, টালিগঞ্জ রিজেন্টপার্কে, বালিগঞ্জে দিব্যি ভিলা তুলে ফেলছে সব, মেয়েমানুষ নিয়ে কৃতকৃতার্থ হয়ে ফিরছে।

এই কলকাতায় চাকরি জোগাড় করতে হবে তাকে আটচল্লিশ বছর বয়সে? চাকরি করে পরিবার আনতে হবে। যেখানে ফুটপাতেও মাথা পাতবার জায়গার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যাচ্ছে, একটা গোয়াল, ভঁইষের ভাগাড়, শুয়োরের খোঁয়াড়, গ্যারাজ—কিছু খালি নেই, সেখানে বাড়ি খুঁজে নিতে হবে তার—বাড়ি, ফ্ল্যাট, রুম—রুম দু-চারটে এক-আধটা, একটা রুমের আধখানা

—সিকিটাক অন্তত। দাশগুপ্ত সাহেবের ভিলার সোফা-কৌচে নমিতার হাত তোলায় থেকে-খেয়ে কী নিদারুণ অথর্ব হয়ে পড়েছে সে একটা দিনেই ; যুক্তিকে সরিয়ে দিয়ে সে বসিয়েছে স্বপ্নকে ; সংকল্পকে সরিয়ে দিয়ে বাসনাকে। যেখানে কাজ করবার কথা তার, মুখে রক্ত চাগিয়ে তুলে দেড়শ-দুশ টাকা মাসোহারা হাতড়ে পাবার জন্য, সেখানে সে লক্ষপতির রূপসীকে সময়ের বুক থেকে খসিয়ে সব সময়ের আশ্চর্য শূন্যে সৃষ্টির সাদা মরালীর মত ছেড়ে দিয়েছে যেন ; পাখিদের পরিভাষামদির অধীর কথোপকথনে বিলোড়িত হয়ে নিষ্পেষিত আহত ঝিলের জলকণিকার মত ছুটেছে সে আকাশ-হংসীর পিছনে নীলিমার থেকে দূর অগম নীলিমার দিকে।

কুড়ি-পঁচিশ টাকা হাতে আছে মাত্র। দু-তিন মাস পরিবারকে কিছু পাঠাতে হবে না তার বটে, কোনো কিছু অদ্ভুত আকস্মিক ব্যত্যয় না ঘটলে তার টাকার উপর দাবি জানাতে আসবে না কেউ শিগগির। কিন্তু যে-মানুষের আয় মাসে আট দশ হাজার, তার বাড়িতে পঁচিশ-তিরিশ টাকা সম্বল করে আট ঘণ্টাও কী করে থাকে সে ? একটা পয়সাও অবশ্যি খরচ করতে হবে না নিশীথকে—থাকা-খাওয়া আপ্যায়িত হওয়ার নানা রকম ফেলাছড়ার ব্যাপার-গুলোতে। কিন্তু অনুভব করবে নাকি নমিতা অন্দরে-বাইরে, বাজারে, নানা রকম ব্যাপারে যে এ লোকটার হাতে হানিফের মতন সচ্ছলতাও নেই ? জিতেন এসে কী বুঝে নেবে, কী আন্দাজ করবে ? থাকতে দেবে কি নিজের বাড়িতে নিশীথকে এক মাস ফুরিয়ে গেলে আরো কিছু দিন—তার পরে আরো কিছু দিন, এত বড় একটা দিকপাল মানুষের বিবাহিত জীবনের সুখ স্বাধীনতা সুবিধেগুলোয় নিশীথের মত একটা ইঁদুরকে দাঁত বসাতে দিয়ে।

না রাখলেও হয় তো স্থির করে নিয়ে জিতেন তবুও রাখবে হয় তো নিশীথকে ; জিতেন কী স্থির করেছে উপলব্ধি করে নিশীথকে অনুভব করে নেবে নমিতা। আজও তো অনুভব করেছে নমিতা—সে দিনও করবে। কিন্তু এত দিন কি জিতেনের বাড়িতে থাকবে নিশীথ নমিতাকে তিলে-তিলে সেই আর-এক অনুভূতির নিরেস নাস্তিলোকের দিকে ঠেলে ফেলবার জন্যে ?

হয় তো কিছুই, বিশেষ কিছুই, মনে করবে না এরা দু জন। গ্র্যাহাম অ্যাণ্ড গ্র্যাহামের সর্বগ্রাসী প্রতাপে এত আলোড়িত হতে থাকবে জিতেন যে নমিতার দিকেও মন দেওয়ার অবসর পাবে না সে, তাগিদ থাকবে না তার। এখনই তো

পাওয়া যাচ্ছে সেই ইঙ্গিত। এ ইশারা গ্রহণ করে ক্রমেই বিমোহিত হতে থাকবে হয় তো নমিতা, আইনের মারফৎ নয়, এমনিই, তার সাধ-সাধনার দেশে, চেতনার দেশে তার, বিবাহিত জীবনের জাত, কুলশীল, সব নিয়ম নির্দেশের থেকে। আভাস-আভাসের চেয়ে বেশি সাড়া পাওয়া যাচ্ছে নমিতার অস্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর থেকে এখনই যেন, সেই অনলোজ্জ্বল লিঙ্গ শরীরের নিজেকে বিমুক্ত করে নেওয়ার পিপাসার।

হয় তো এ রকমও হবে না কিছু। জিতেনকে নমিতাকে ঠিক করে বুঝতে পারে নি এখনো নিশীথ। মিষ্টি অপভ্রংশে ভাতার হয়ে ভেঙে পড়তে না চাইলেও, আদি শব্দের মর্যাদার ভর্তা হয় তো থাকবে জিতেন, স্বামিনী হয়ে থেকে যাবে নমিতা জিতেনের বাড়িতে পরস্পরের মৃত্যু পর্যন্ত।

ছক যেদিক দিয়েই ঘোরানো যাক না কেন, আসল কথা হচ্ছে মাসে দেড় হাজার, দু হাজার, আট শ, ছ শ টাকা অন্তত রোজগার না-থাকলে, একটা ভদ্রলোকের মতন বাড়ি—হোক না ভাড়াটে—নিজের জন্যে যোগাড় করে উঠতে না-পারলে, নমিতাদের আবহের ভিতর নিজেকে একটি আবির্ভূত প্রদীপের মতই মনে হবে যেন নিশীথের—আলাদিনের আমলে জেল্লা থাকলেও এই গ্যাস-বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানের যুগে কোনো সঙ্গতি নেই, কোনো ব্যবহার নেই সে জিনিসের আর।

নাঃ, নমিতাদের সঙ্গে বড় জোর এক মাসের বেশি থাকা যায় না আর। এক মাসও না-থাকতে হলেই ভাল। পনের দিন, দশ দিন, সাত দিন পরেও যদি সে নিজের মাথা গোঁজবার মত কোনো একটা আস্তানায় সরে যেতে পারে সেইটেই ভাল হবে। দুটো জিনিসের দরকার এখন অবিলম্বেই ; একটা ফ্ল্যাট, একটা রুম কিংবা আধখানা রুম হলেও হয় ; একটা চাকরি কিংবা রোজগারের যে-কোনো একটা উপায় বের করে নেওয়া, আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে।

বাইশ-তেইশ বছর জলপাইহাটি কলেজে কাজ করেছে নিশীথ ; তার আগে দু-তিন বছর কলকাতায় একটা কলেজে কাজ করেছিল, স্কুলে মাস্টারি করেছে। এখন যখন পেনশন নেওয়ার সময় এসেছে জীবনে, হার্ট খারাপ হয়ে গেছে, রক্তের চাপ বেড়ে গেছে তখন নিশীথকে খালি হাতেই কাজ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে, ও-কাজে পেনশন নেই, ও-অনটনের কাজে সংসারের টাল

সামলাতে-সামলাতে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের সব টাকাই খরচ হয়ে গেছে, হাতে কিছুই নেই আর—জীবনের। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর অক্লান্তভাবে চাকরি করার পর—তেইশ টাকা সাড়ে ছ আনা ছাড়া। করি-করি করে একটা লাইফ ইনসিওরেন্সও করতে পারে নি সে। বয়স বেশি হয়ে গেল, মোটা টাকা প্রিমিয়াম দিতে হবে বলে খুব বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও লাইফ ইনসিওরেন্স করতেই পারল না আর নিশীথ।

জলপাইহাটি কলেজ ছেড়ে এসেছে, কলকাতার কোনো একটা কলেজে অবিলম্বেই যদি কাজ জুটে যেত তা হলে মন্দ হত না। চব্বিশ-পঁচিশ বছর সে প্রফেসরি করেছে বটে, কিন্তু তাই বলে সরকারি কলেজে করে নি তো। সরকার তার নিজের কলেজগুলোর জন্যে ব্যবস্থা করে রেখেছে, পেনশন আছে, ভাল প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের ব্যবস্থা আছে, মোটা মাইনে আছে, এক কলেজ থেকে অন্য কলেজে বদলি হয়ে যাওয়ার পথ খোলা আছে ; চব্বিশ বছর কোনো সরকারি কলেজে কাজ করলে কী অবস্থা হত এখন নিশীথের। লম্বা ছুটি নিয়ে, তার পর পেনশন নিয়ে, কলকাতার এ সব জায়গায় কিংবা আরো দূরে টালিগঞ্জ, বেহালায়, যাদবপুরে, সোনারপুরে, লক্ষ্মীকান্তপুরে একটা রুম অন্তত যোগাড় করে নিরিবিলিতে থেকে যেত সে ; বেঁচে থাকলে সুমনাকে নিয়ে আসত ; লিখত-পড়ত, দেশ-দশের কাজে নিজের মনের আলোর নির্দেশ পেয়ে যতদূর সম্ভব করতে সে। এ রকম সুযোগ, অবকাশ, খানিকটা স্বস্তি, সম্ভব হত জীবনে। কিন্তু চব্বিশ বছর প্রাইভেট কলেজে কাজ করেছে বলে এখন সে পথে দাঁড়াল। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়—যৌবনের প্রৌঢ়তার চব্বিশটা বছর—যাদের জন্যে ভাল মনে দান করেছে নিশীথ, কোথায় সেই সব ছেলেরা আজ ? কী করবে তারা—কী দেবে নিশীথকে ? কোথায় সেই সব মনিবেরা যাদের কলেজের জন্যে প্রাণ ঢেলে, অন্য কোনো দিকে না-তাকিয়ে, অন্য সব জিনিসের প্ররোচনা প্রলোভন এড়িয়ে, জীবনটাকে একটা নির্দোষ কঠিন নিয়মাচরণের শান্তি ও স্বল্প দৃষ্টির নিখিলে পরিণত করেছিল নিশীথ ? একটা সামান্য দরখাস্ত কী রকম হবে, না-হবে, হরিলালবাবুদের সঙ্গে নিশীথের ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এতেই গিয়ে ঠেকল তবুও ? নিশীথের যদি ভুল হয়ে থাকে তাকে ডেকে নিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারতেন তাঁরা, যদি অবসাদ এসে থাকে উৎসাহিত করতে পারতেন না কি তাঁরা নিশীথকে, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের

চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা করে মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছেন, কিছু টাকা বাড়িয়ে দিতে পারতেন না নিশীথকে, মহিমকে, মুরুব্বির অভাবে যারা উপেক্ষিত হয়ে আছে তাদের সকলকে ? কলেজের মোটা ফাণ্ড আছে, লাখ-লাখ টাকা আছে হরিলালবাবুর নিজের।

অন্য যে-সব সাধ ছিল যৌবনে, পড়বার-পড়াবার, অধ্যাপনা করবার, রাবণের চিতায় জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে সে সব ; মাস্টারি করবার শক্তি ছাড়া কিছু নেই এখন আর নিশীথদের, অন্য কোনো দিকে রুচি নেই। এর জন্যেই কি টাকার বেকায়দায় ফেলে মাস্টারদের পথে দাঁড় করিয়ে দিতে হয় ?

তাই তো দেওয়া হয়েছে। পথেই তো দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা যে করা হয়েছে—এত ক্ষণ পরে যেন হুঁশ হল নিশীথের। যারা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তারাও যেন কেউ নয়, শূন্যের ভিতরে শূন্য, যে-সব ছেলেদের চব্বিশ বছর ধরে পড়িয়েছে সেই সব শূন্য। নিশীথ আর নিশীথের মতন যে-মাস্টাররা আজ পথে-পথে ফিরছে, তারা যদি সে-সব শূন্যকে আঘাত করে গিয়ে একটা বিধি-ব্যবস্থা করে দেখার জন্য তা হলে শূন্য ঋণী ও ঋণ শূন্য হয়ে মহাশূন্যের ভানুমতীর খেলা দেখাবে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত।

গবর্নমেন্ট তার নিজের ইস্কুল-কলেজের শিক্ষক-অধ্যাপকদের স্বার্থ সংরক্ষণের ভার স্বীকার করে নিয়েছে। খুবই উত্তমরূপে সংরক্ষণ যে করা হচ্ছে তা নয়। তবে সরকারের ইস্কুলে কলেজে পনের-কুড়ি বছর কাজ করলে সে সব মাস্টারদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রাষ্ট্রের যে দায়িত্ব আছে সেটা মেনে নিয়ে সে দায়িত্ব পালন করে আসছে গভর্নমেন্ট। গভর্নমেন্ট কলেজে কুড়ি-পঁচিশ বছর কাজ করলে যা-হোক একটা ভাল গ্রেডেই পৌছে যায় মাস্টার, গভর্নমেন্ট তাকে পেনশন দিতে প্রতিশ্রুত, যে-প্রতিশ্রুতি ইংরেজের আমলেও গভর্নমেন্ট কোথাও ভেঙেছে বলে জানা নেই ; পঁচিশ বছর গভর্নমেন্ট কলেজে বা ইস্কুলে কাজ করবার পর নিশীথেরই মতন হাত ঝেড়ে বেরিয়ে আসে মানুষ, তার জন্যে কোনো ব্যবস্থা নেই, সে পেনশন পাবে না তাকে নতুন করে চাকরি খুঁজে নিতে হবে—কলেজ হোক, অন্য কোথাও হোক—এ রকম কোনো সাধু দৃষ্টান্ত গভর্নমেন্টের হাতে নেই। কিন্তু কোনো প্রাইভেট কলেজে বিশ-পঁচিশ বছর চাকরি করলে ( ভাঙা হার্ট আর ব্লাড প্রেসার নিয়ে ) সে মানুষ তো লায়েক হয়ে গেছে। তার সম্বন্ধে তার নিজের কলেজের কোনো দায়িত্ব নেই আর ;

অন্য প্রাইভেট কলেজগুলো তার সম্বন্ধে কোনো চিন্তা করবে না, পারত পক্ষে স্থান দেবে না তাকে নিজেদের কলেজে, কিছুতেই দেবে না বলে অগত্যা পেটের চিন্তায় মাস্টারি লাইনটাই ছেড়ে দিয়ে তাকে চলে যেতে হবে অন্য কোথাও—অন্য কোনো রকম কাজের সন্ধানে—পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর বয়সে। খবরের কাগজে ঢুকতে চেষ্টা করতে হবে হয় তো—কিন্তু সেখানে তারা বলবে, আপনার তো এ-লাইনে কোনো অভিজ্ঞতা নেই, কী করে পারবেন আপনি ; অর্থাৎ মাস্টার নিতান্তই যদি পারতে চায়, তা হলে ভেকেন্সি থাকলে সাব-এডিটরি একটা দিতে পারা যায় তাকে আশি, নব্বই, একশ, একশ কুড়ি টাকায় টেনে-মেনে, কিংবা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এডিটরের কাজ—নীচের দিকে—দিতে পারা যায় সে কাজ খালি থাকলে, মাস্টারের মুরুব্বির জোর থাকলে। ভাল খবরের কাগজের সম্পাদনার কাজ ভাল মাইনেয় কে দেবে তাকে? দেওয়া হলেও সে দায়িত্ব খবরের কাগজের এ-পক্ষ সে-পক্ষ সব পক্ষের মন পেয়ে মান রেখে মেটাতে পারবে কি সে নিজের মান বাঁচিয়ে। টাকার জন্য সবই পারতে হবে। না-পেরে যাবে কোথায় সে ; এই হয় তো ভাবছে নিশীথ। সবই পারবে বটে সে, কিন্তু খবরের কাগজে ঢুকলে নিজের মান বাঁচাতে পারবে না। না-পারলে না-পারবে, কী হবে মান দিয়ে? কলেজ কি তার মান রেখেছে? কিন্তু খবরের কাগজের কাজটাও কে দিচ্ছে তাকে? খবরের কাগজের সাব এডিটরি একশ-সোয়াশ টাকায় কিংবা জুনিয়ার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এডিটরি দেড়শ-দুশ টাকায় করবে কি সে নিজের ছাত্রদের অধীনে (তাদের কারু-কারু চোদ্দ-পনের বছরের চাকরি হয়ে গেছে সংবাদপত্রে, প্রধান অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এডিটর হব-হব করছে কেউ-কেউ) দৈনিকে কিংবা কোনো পত্রিকায়? করবার ইচ্ছা আছে কি না নিশীথ ভেবে দেখছিল। যদি করতে চায়, তাহলে অমুক ঘোষ কিংবা তমুক মিত্তিরকে ধরলে হয়। কিন্তু তাদের তো চেনে না সে। তাদের ধরবে কাকে ধরে? তাদের ধরতে পারা যায় অমুক বোস বা তমুক দত্তকে ধরে। আর তাদের ধরবে কী করে। বোস বা দত্তকে কী করে ধরবে? ধরবে দাঁ, দে, গুঁই, দুই-কে ধরে। ভারী দীর্ঘ পথ তা হলে খবরের কাগজের ঘোষের কাছে পৌঁছুনো, তারপর জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এডিটরি পাওয়া তার নিজের ছাত্রদের নেকনজরে বসে থেকে, কিংবা সাব-এডিটরি? নিশীথ ভাবতে-ভাবতে থেমে দাঁড়িয়েছিল, আবার

চলতে শুরু করল।

কলেজ, খবরের কাগজ, আর-কোথায় কাজ করতে পারে সে? গভর্নমেণ্টের চাকরির বয়স নেই তার; কোনো কমার্সিয়াল ফার্মে নেবে না তাকে, অভিজ্ঞতা নেই; কোনো ব্যবসা ফেঁদে বসা শক্ত, পুঁজি নেই কিছুই; ফাটকার বাজারে ঘুরবে কি সে; সেখানে খালি হাতে হয় তো ঘুরতে পারা যায়; কিন্তু এই আটচল্লিশ বছরে একদিনও সে স্টক এক্সচেঞ্জে, লায়ন্স রেঞ্জে, ক্লাইভ স্ট্রিটে, ক্যানিং স্ট্রিটে বা বড়বাজারের হল্লাটায় যায় নি; যখন সে কলেজে পড়ত তখন এক-আধ দিন ঘুরে দেখেছিল বটে; কলকাতা শহরের নতুন-নতুন জায়গাগুলো চিনে নিচ্ছিল যেন।

'কে, আপনাকে চিনি যেন মনে হয়' —একজন সাহেবি পোশাকের ভদ্রলোক নিশীথকে বললে।

'আমাকে?' —নিশীথ আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখল মানুষটিকে। বেশ সুস্থ সুগঠিত চেহারা, ভাল খায়, থাকে, পরে, মনে কোনো দুশ্চিন্তা নেই, মুখে তাই বড় সফলতাকে ভেদ করে অমায়িকতার ছোট হাসি।

'আপনাকে চিনি-চিনি মনে হচ্ছে, ভুল করলুম না তো'

'না ঠিকই আছে। মনে পড়েছে।'

'চিনতে পেরেছেন আমাকে? কোথায় দেখেছিলুম আপনাকে বলুন তো।'

'কলেজে। স্কটিশে—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি স্কটিশের ছেলে। স্কটিশে পড়তেন আপনি। তাই ভাবছিলুম চিনি-চিনি, কোথায় দেখেছি যেন।'

'আপনার নাম মনে আছে আমার।'

'মনে আছে?'

তসরের সুটের লম্বা শরীরটা একটু নুয়ে এল, খাড়া হয়ে ঠিক হল তারপর। খাড়া মানদণ্ডের মতন নিশীথের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল সুট, বুট, মানুষ। কী নাম তার নিজের, সেটা জানতে চায় সে।

'রবিশঙ্কর মজুমদার তো—'

রবিশঙ্কর হাততালি দিয়ে হেসে বললে 'Hit! আপনারা কাঁচা খান নাকি? একেবারে র-বি-শ-ঙ্ক-র-ম-জু-ম-দা-র—lock, stock, barrel! Terrible লোক তো আপনি। স্কটিশে পড়েছিলাম কি আজ?'

'ত্রিশ বছর আগে।'

'সে যেন মহাসরীসৃপদের দিন ছিল এ পৃথিবীতে তখন, লক্ষ বছর আগের কথা। বললেন তো ত্রিশ বছর,' বললে রবিশঙ্কর, 'মনের অনুভূতিতে ত্রিশ বছর আর লক্ষ বছর একই জিনিস হয়ে দাঁড়ায়, যা-অতীত একটু বেশি দিন কেটে গেলেই কোটি বছর আগের অতীত বলে মনে হয়। নিন—' সিগারেট কেস বের করে খুলে নিশীথকে এগিয়ে দিল, 'আপনার নাম তো ভুলে গেছি। বেশ মনে করে রেখেছেন আমার নাম কিন্তু।'

'আমি নিশীথ সেন।'

'নিশীথ সেন। বা বেশ তো। সংক্ষেপে অনেকখানি। কিছুটা মেয়েদের নামের মত যেন। আঃ-হাঃ-হাঃ হাঃ'—হাসতে লাগল রবিশঙ্কর, কোমরটা ভেঙে ধনুকের মতন খানিকটা বাঁকা হয়ে গেল—'আঃ-হা-হাঃ-হঃ। কলকাতায় থাকেন ?'

'বেড়াতে এসেছি। আপনি তো এখানেই আছেন রবিবাবু ?'

'আমি মাদ্রাজে আছি এখন।'

'মাদ্রাজে ? সেখানে কী ?'

'স্কটিশ থেকে বি-এ পাশ করেই তো বিলেত চলে গেলুম। বি-এ-তে অনার্স পাই নি। বিলেতে গিয়ে আই-সি-এস দিলুম। হল না, অ্যাকাউন্টসে গেলুম—ইনকরপোরেট—এখন মাদ্রাজে ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের পোস্টে আছি।'

রবিশঙ্কর তো একটা বোকা ছেলে ছিল। লম্বা-চওড়া মানানসই চেহারার নিরেট বালখিল্যতাই তো ওকে সকলের কাছে হাস্যাস্পদ করে রেখেছিল। স্কটিশ চার্চ কলেজ; ত্রিশ বছর আগে। স্ক্রিমজার সাহেব ক্লাশে এসেছেন, লেকচার দিচ্ছেন, চটাপট ব্ল্যাকবোর্ডে সাহেবের লেকচার লিখে ফেলতে লাগল রবিশঙ্কর শর্টহ্যাণ্ডে। ও তখন শর্টহ্যাণ্ড শিখছিল। মাঝে-মাঝে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। সাহেব দেখতে পেয়ে বের করে দিলেন রবিশঙ্করকে। খানিকক্ষণ পরে ঢ্যাঙা দোরগোড়ায় এসে হাজির হয়ে বললে, May I Come in, Sir। স্ক্রিমজার ঢুকতে অনুমতি দিলেন। হাঁ করে স্ক্রিমজার সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে মিনিট দশেক কেমন গম্ভীর অনৈসর্গিক মূর্খতায় বসে রইল নিজের জায়গায়, তারপর কেমন একটা

চাড় দিয়ে উঠে দাঁড়াল সাড়ে ছ ফুট উঁচু শরীরটা নিয়ে। পাঁচ সাত মিনিট এর, ওর, তার, প্রফেসারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল নিশব্দ নিরীহ কৌতুকরিক্ত মুখে। সাঁ করে এগিয়ে গিয়ে বোর্ডের শর্টহ্যাণ্ড লেখাগুলো মুছে ফেলে নিজের জায়গায় ফিরে এসে মাথা টান করে ঝিমুতে লাগল, টপ করে খানিকটা লালা ঝরে পড়ল ওর জিভের থেকে বইয়ের উপর, ভেঙে গেল ঘুমের চটকা, আড়চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল কেউ দেখে ফেলেছে কি না রবি মজুমদারের মুখ থেকে লালা ঝরে পড়েছে। সে সময়ে, যে-কোনো কারণেই হোক না কেন, ওর দিকে যে ফিরে তাকাত, তাকেই আঙুল দিয়ে নিজের জিভ আর বই দেখিয়ে হি-হি করে হাসতে থাকত রবি।

এই সব কারণেই তো রবিকে চিনে রেখেছিল নিশীথ—ত্রিশ বছর পরে আজও ভুলতে পারে নি। সেই রবি আজ ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল। কী করে নিজেকে শুধরে নিল রবি? রবি যদি ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল হয়, তা হলে তো নিশীথের বিলেতের কনজারভেটিভ পার্টির প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার কথা। যে-সিগারেটটা দিয়েছিল নিশীথকে, পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বালিয়ে দিয়ে, নিজের হাতের সিগারেটটাও জ্বালিয়ে নিল রবি। ভূতত্ত্বের লক্ষ-কোটি বছরের কথা বলছিল। লক্ষ বছরই কেটে গেল যেন, তা না হলে সে মানুষ কখনো এই রবিতে দাঁড়ায়।

'স্ক্রিমজারের কথা মনে আছে?'

'কে স্ক্রিমজার?'

'স্কটিশের ইংরেজির প্রফেসর ছিলেন—'

'খেয়াল নেই ভাই। আমি তো ফোর্থ ইয়ারে স্কটিশে এসেছিলুম, থার্ড ইয়ারে রিপনে ছিলুম।'

'শর্টহ্যাণ্ড শিখছিলেন তো কলেজে পড়বার সময়ে।'

'হ্যাঁ, কী করে জানলেন আপনি?' রবি মজুমদার নাদা পেটে দু-এক পা এগিয়ে-পেছিয়ে হাস-হাস কৌতুকে নিশীথের দিকে তাকাল।

'স্ক্রিমজারের একটা ক্লাশের কথাও কি মনে নেই আপনার?'

'বললুমই তো লক্ষ বছর আগে হয়ে গেছে সব।'

তা হয়ে গেছে বটে। স্কটিশের দিনগুলো। —একটা নিশ্বাস ফেলে ভাবছিল নিশীথ। কোথায় সেই সব ছেলে—সেই হস্টেলগুলো, ডাগুাজ ওয়ান,

অগিলভি, টমরি……সেই সব প্রফেসর ? সেই ত্রিশ বছর আগের কলকাতা ; এ হস্টেল সে হস্টেলে রাতে-রাতে মজলিস করে বেড়ানো, পরে মিনার্ভা-মনোমোহনে যাওয়া ; সুরেন বাঁড়ুয্যে, বিপিন পাল, অ্যানি বেসান্ত, তিলক, গোখলের বক্তৃতা, পলিটিক্স, রবীন্দ্রনাথের আলো, আলোকোত্তর হিরণ আনন্ত্য, সত্যেন দত্তের নিরবচ্ছিন্ন নিজের টাল সামলানো ; ভোর বেলা ডাণ্ডাজ হস্টেলের তিন তলার রুমে সারা রাতের বেশ একটা চৌকশ ঘুম থেকে শীতের রোদ মুখে মাখিয়ে জেগে উঠতে না-উঠতেই বিনয়েন্দ্র মুখুয্যের গলা শোনা যেত, করিডরে দাঁড়িয়ে গরম চা খেতে-খেতে বলছে—কাল সারাটা রাত মনোমোহনে ছিলুম। কী গলার আমেজ, কী বলবার দোরস্ত চাল। কাকে বলছে বিনয় ? শুভ্রাংশুকে হয় তো। হয় তো নিশীথকেই শুনিয়ে-শুনিয়ে বলছে। বিছানা ছেড়ে, নেমে, বাইরে করিডরে আসতে দেরি হয়ে যেত নিশীথের ? যখন সে এসে পৌঁছেছে বিনয় নেই, শুভ্রাংশু নেই, কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে সব, আজ ত্রিশ বছর পরেও তাদের দেখা কোথাও মিলল না। বেঁচে আছে ? কী করছে ? কোথায় গেছে আর-সব ? আরো অনেকে। অনেক অনেক—বলে শেষ করা যায় না কত যে সব ছিল। এত সবের কোনো ছত্রাংশও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। বিনয়ের থিয়েটারে রাত কাটানোর রেশ কানে নিয়ে সন্ধ্যার সময়েই শোভনলাল ভটচাজের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ত নিশীথ, তারাসুন্দরীর অভিনয় দেখবার জন্যে। স্টারেই তো। বাংলার স্টেজে তখন গিরিশ ঘোষের আত্মাই কথা বলছে। শিশির ভাদুড়ী আসেন নি তখনো। সিনেমা বলে বিশেষ কোনো একটা জিনিসই ছিল না তখন। সিনেমা আজ থিয়েটারকে কোথায় যে ঠেসে রেখেছে।

'কলকাতায় বেড়াতে এসেছেন। কোথায় থাকেন নিশীথবাবু ?'

'জলপাইহাটিতে।'

'জমিদারি আছে বুঝি ? ওটা তো পাকিস্তানে গেল।'

'হাঁা, পাকিস্তানে।'

'তা কী রকম হবে নিশীথবাবু ? টাকবে কি জমিদারি ? না ওরা উৎখাত করে দেবে জমিদারি-টমিদারি ? কী রকম মুনাফা আপনাদের ?'

'না, আমার নিজের কোনো জমিদারি নেই।'

'Oh!' রবি মজুমদার সিগারেটে দু-চারটে টান দিয়ে বললে, 'আমি করাচি

গিয়েছিলুম, ওয়েস্ট পাঞ্জাবে গিয়েছিলুম—'

'কবে ?'

'এই তো, তখনো দাঙ্গা চলছে, দাঙ্গা তো এখনো চলছে। একজন সাহেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম। একজন আমেরিকান জার্নালিস্টও সঙ্গে ছিলেন। তিনি মহিলা ; বছর চব্বিশ পঁচিশ বয়স হবে, এঃ, রাস্তায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পা ধরে গেছে—'

দু-চারটে লাথি মেরে নিল রবি মজুমদার, হাত দুটো কোমরে ছিল, তুলে নিয়ে দু-দিকের দাবনার দিকে চালিয়ে চেপে মালিশ করে নিল।

'চলুন না এ-চায়ের দোকানটায় গিয়ে বসি—' নিশীথ বললে।

'না। এ সব রাস্তার—কী নাম এটার ?—রাসবিহারী এভেন্যু—না, এ সব পাড়ার চায়ে-টায়ে ঢুকি না আমি। মাঝে-মাঝে ফার্পোতে গিয়ে খাই। মন্দ নয় গ্রেট ইস্টার্ন, গ্র্যাণ্ড হোটেল—আসুন আমার গাড়িতে।'

'কোথায় ?'

'এই যে মিনার্ভা কার—রাস্তায় পার্ক করে রেখেছি। এই যে এই! আপনার দাবনার কাছে ; ও দিকে তাকাচ্ছেন কেন নিশীথবাবু ?'

'ওঃ, এই তো।'

'এই তো ? তাই তো। এত বড় মিনার্ভা গাড়ি আপনার চোখেই পড়ল না যেন মশা খুঁজছিলেন আঁকু-পাঁকু করে ? দেখতে পেয়েছেন মশাটা ?'

ফিকে নীল রঙের আশ্চর্য গাড়ি-দানবটার ঝঝ্‌রে শরীরটার দিকে এবং তার চেয়েও বেশি তার কেমন একটা অটল মহানুভবতাকে অনুভব করে নিয়ে নিশীথ বললে, 'এই গাড়িটা তো এতক্ষণ এখানে ছিল না মজুমদার সাহেব।'

'সেই জন্যই তো ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পাপক্ষয় করছিলুম। এই তো এল। গাড়িটাকে একটু হাওয়া খেতে পাঠিয়েছিলুম। আসুন।'

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি ?'

'আমি গ্র্যাণ্ড হোটেলে উঠেছি—'

'সেখানে যাবেন এখন ?'

'না। এ পাড়ায় একটু কাজ আছে। কি হে হরিদাস, দেখা হল মেমসাহেবের সঙ্গে ?'—ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল রবিশঙ্কর।

'না হুজুর। এখনো ঘুমের থেকে ওঠেন নি।'

শুনে ডান চোখের ভুরু নাচিয়ে শিকেয় চড়িয়ে, বাঁ চোখের ভুরুটাকে নীচে স্থির নিরেট অবস্থায় রেখে হরিদাসের দিকে তাকাল রবিশঙ্কর। ভুরু দুটোর আশ্চর্য রকমারি দেখে নিচ্ছিল নিশীথ। ঠিক রবিশঙ্করের মত পারে কি না চেষ্টা করে দেখছিল। কিন্তু সে কি হয়, ও অনেক-অনেক বছর অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে হিসেব-নিকেশ সাহেব-মেমসাহেব চষে চেখে যোগসাধনা করার ফল।

'বড্ড মুশকিলেই ফেলেছে। কখন উঠবে 'ঘুমের থেকে ?'

'আর কত ঘুমোবেন। এখুনি উঠবেন।' হরিদাস আশ্বাস দিয়ে বললে।

'ওখানে আর কে আছে ?' জিজ্ঞেস করল রবিশঙ্কর।

'বেয়ারা আছে একজন—আর-কেউ নেই,' হরিদাস বললে।

'সাহেব তো কলকাতায় নেই।'

'না, তিনি বম্বে গেছেন।' হরিদাস বললে।

'দিল্লি গেছেন।' রবিশঙ্কর বললে।

'চলুন না, আপনি নিজেই মেমসাহেবের বাড়িতে চলুন—এই তো কাছেই। সেখানে গিয়ে বসলেই তো ভাল হয়,' নিশীথের দিকে একটু তাকিয়ে ওজন করে হরিদাস বললে, 'আপনার চিঠি দিয়ে এসেছি বেয়ারার কাছে।'

'না, আমি যাব না। আমি তাকে লিখে দিয়েছি গাড়ি দিয়ে ভাইপো হরিদাসকে পাঠালুম, কাছেই আছি।'

নিশীথের দিকে তাকিয়ে রবিশঙ্কর বললে, 'আসুন আপনি।' গাড়ির ভিতর ঢুকে ব্যাক সিটে গিয়ে বসল নিশীথ, রবিশঙ্কর ঠাকরুনকে নিয়ে গ্র্যাণ্ড হোটেলে যাবেন ? নিশীথের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে একটু দেখে নিল হরিদাস।

'সম্প্রতি সেখানে যাচ্ছি, তারপর'—রবিশঙ্কর বেশি কথা বলে ফেলেছে অনুভব করে কথা বাড়াতে গেল না আর সংক্ষেপে বললে, 'দেখা যাবে। আর-একবার দেখে এসো তো তুমি হরিদাস। ফোন করলুম, কে এক ছোকরা ধরলে। বললে ঘুমুচ্ছেন, কখন উঠবেন বলতে পারে না; ড্যাম—নটা-দশটা অব্দি ঘুমোয় কলকাতার এই পচা ভ্যাপসা—কাছেই তো? একটু নোলা সেঁধিয়ে দেখে এসো তো। পা চালিয়ে যাও, মিনিট কুড়ি বসে দেখে এসো, জাগিয়ে নিয়ে এসো। আমি বসে আছি গাড়িতে।'

'নিয়ে আসব পায় হাঁটিয়ে ?'

'আরে মল যা ! এসে খবর দিলেই তো গাড়ি যাবে।'

হরিদাস চলে গেল।

'একটা ইডিয়ট !' রবিশঙ্কর বললে।

ত্রিশ বছর আগে রবিশঙ্করকে ইডিয়ট বলত স্কটিশের ফোর্থ ইয়ারের ছেলেরা। কিন্তু সে তো সময়প্রস্থানের লক্ষ বছর আগের কথা, এর ভিতর কত পরিবর্তন হয়েছে প্রাণপ্রবাহের, মনের গতির।

'হরিদাসকে যে-মেমসাহেবের কাছে পাঠানো হল, কে সে ?'

'কোথায় গেল হরিদাস ?'

জবাব দেবার কোনো দরকার নেই ; হরিদাস খবর নিয়ে এলে নিশীথকে গাড়ির থেকে নামিয়ে বিদায় দিয়ে নিজেই এবার গাড়ি নিয়ে যাবে সে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকবে না আর, মনে-মনে ঠিক করে নিচ্ছিল রবিশঙ্কর।

ট্রাউজারের পকেট থেকে পাইপ-পাউচ বের করে তামাক পাতা পাইপে ভরে নিতে-নিতে বলল,—'করাচি আর ওয়েস্ট পাঞ্জাবে গেছলুম। সঙ্গে বেন্থাম সাহেব ছিলেন ; মিস মিলফোর্ড সেই আমেরিকান জার্নালিস্ট মেয়েটির নাম। মিস মিলফোর্ড—মিলি—ওকে পেলে সেই সে কালের হোলকার-টোলকার বর্তে যেত—'পাইপ জ্বালিয়ে নিয়ে রবিশঙ্কর বললে, 'আচ্ছা সেন, বাওনা মার্ডার কেসের সেই মেয়েটার নাম মনে আছে তোমার ?'

'না।'

'মনে নেই, বাওনাকে খুন করা হয়েছিল ?'

'কী হবে ও-সব জিনিস মজুমদার সাহেব ; ও-সব তো ভূতত্ত্বের লক্ষ বছর আগের কথা।'

পাইপ টানতে-টানতে একটু ফিকে হেসে হাসির মুহুর্ত্তে মনটাকে একটু চাঙ্গা করে নিয়ে রবি মজুমদার বললে, 'মিলফোর্ডকে পেলে বর্তে যেত হোলকার। আমেরিকানরা বড্ড হুজুগে মাতে, মিলিকে আমি রাজি করিয়ে-ছিলুম আমাকে বিয়ে করতে—'

নিশীথের হাতের সিগারেটটা পুড়ে-পুড়ে গাঁজের মত হয়ে গেছল, জানলার ভিতর দিয়ে ফেলে দিল সে।

'কিন্তু আমি তো বিয়ে করেছি। আমার ছেলেপুলে আছে।'

'কবে বিয়ে করেছেন ?'

'বছর কুড়ি আগে। স্কটিশ মেয়ে। ডাণ্ডির মেয়ে।'

'বিলেতে থাকতেই বিয়ে করেছিলেন বুঝি ?'

'ছটি ছেলেমেয়ে আমার। কী করে মিলিকে বিয়ে করি আমি ?' রবিশঙ্করের একটা ভুরু নেবে উপরে উঠে গেল, নীচে সানুদেশের শান্ত রোমাঞ্চ নিয়ে রয়ে গেল আর-একটি, 'কিন্তু মিলি মুখিয়ে ছিল—'

'জানত, ছটি ছেলেপুলে আপনার ?'

'খুব ভাল করেই। আমার স্কচ স্ত্রীকে দেখেছে সে তো। দেখে ঠোঁট উল্টেছে।'

'কেন ?'

'বেঁটে তো, বেঁটে স্কচ।'

রবিশঙ্কর বড় চাকরি করে, বেশ সুখেও আছে বটে কিন্তু মুখে বিশেষ কোনো স্বস্তি দেখা গেল না তার, কেমন যেন কর্তিত, সোমকীটদষ্ট, বিষণ্ণ ; ভূতত্ত্বের লক্ষ যুগ কেটে না-গেলে আগে কোনো পট পরিবর্তন আসবে না যেন বহু-প্রসবিনী ডাণ্ডিনীকে সরিয়ে দিয়ে মিলফোর্ডকে কোলে তুলে নেবার মত।

'আমেরিকানরা ও-সব গ্রাহ্য করে না। যদি আমার মন ঠিক করে মিলফোর্ডকে ঘরে নিয়ে আসি, তা হলে ওদের সবাইকে স্কটল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেবে সে।'

'অনেক টাকা কড়ির ব্যাপার তো। কে দেবে টাকা ?'

'স্কটল্যাণ্ডে পাঠাতে ?'

'পাঠাতে। খোরপোষ দিতে।'

রবিশঙ্কর কাঁধ নাচিয়ে একটু হাসল। বললে, 'খেই পেলেন না আপনি জিনিসটার। কথা হচ্ছে মিলফোর্ডকে আমি আনব কি না। সেটা যদি ঠিক হয়ে যায় ডাণ্ডি সত্যাগ্রহ শুরু হয়ে যাবে।'

'ডাণ্ডি চলে যাবে স্ত্রী ? নিজের থেকেই ?'

রবিশঙ্কর উদ্দীপ্ত হয়ে পাইপ টেনে যাচ্ছিল। বললে, 'কী হয়েছিল গান্ধীজির ডাণ্ডি সত্যাগ্রহে ?'

'তখন কিছু হয় নি অবিশ্যি, কিন্তু—'

নিশীথকে কথা শেষ না-করতে দিয়ে রবিশঙ্কর বিলোড়িত হয়ে বললে—'কী হবে এদের ডাণ্ডি সত্যাগ্রহের ফলে ?'

সেটা কী হবে, জানে না নিশীথ। সেটাকে সত্যাগ্রহ বলা যায় কি না, তাও জানে না। গান্ধীর ডাণ্ডি সত্যাগ্রহের ব্যাপারটাকে নেহাতই একটা অনুপ্রাসের

ভোজবাজিতে এ জিনিসটার সঙ্গে জড়িয়ে কী রকম হল, অনুভব করে নিচ্ছিল নিশীথ ; এ যেন স্ক্রিমজারের ক্লাশের শর্টহ্যাণ্ড ঝাড়ার মতই হল ; প্রফেসরের পিছনে দাঁড়িয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে।

'বিয়োতে-বিয়োতে বারটা বেজে গেল ওর। বছর-বিয়োনি বৌ। বেঁটে। ক্যাড। ঘর যাও, ঘর যাও গে, যাও পাকিস্তানের পাটের আঁশ বাছো মিসেস গ্রাণ্ডিদের সঙ্গে এক গাট্টা বসে। ও যাক। ওর জন্য আমি ভাবি না। কিন্তু ছেলে-মেয়েদের জন্য মনটা কেমন করে। কিন্তু'—নিশীথের ঘাড়ের উপর এক হাতের কেঁদো থাবাটা চড়িয়ে দিয়ে, দু-এক দমক পাইপ টেনে নিয়ে, রবিশঙ্কর বললে, 'ওরা সবাই আমারই ছেলে-মেয়ে কি না তাতে সন্দেহ আছে।'

রবিশঙ্করের কথাটা যেন শোনে নি নিশীথ, অন্য কথা পেড়ে বললে, 'হরিদাস আপনার ভাইপো?'

'হ্যাঁ।'

'নিজের ভাইয়ের ছেলে?'

'আমার সহোদর ভাইয়ের। আমার দাদার ছেলে হরিদাস।'

'আপনার নিজের দাদার ছেলে, তা হলে আপনাকে হুজুর বলে কেন?

'হুজুর বলেছে বুঝি? ঐ ওর এক রকম, বোধনার ছেলে তো!' রবিশঙ্কর নিজের পাড়া কথাটার দিকে ফিরে গিয়ে বললে, 'আমার ছেলেপুলেরা কে কার ছেলে-মেয়ে বুঝে উঠতে পারছি না। আমার সঙ্গে কারুরই তো চোখ-নাকের মিল নেই'—কেমন একটা সমস্যার চোরাবালিতে ঠেকে কাতর হয়ে বললে রবিশঙ্কর।

নিশীথ তাকিয়ে দেখল কেমন যেন ছোট শুকনো মুখে বসে আছে।

'আমার সঙ্গে আমার ছেলে-মেয়েদের চেহারা-ফেয়ারার কোনো মিল নেই। মতি-গতি বোধ-বিচারেও নেই'—রবিশঙ্কর বললে।

সাদৃশ্য যদি না থাকে তা হলে ফুরিয়ে গেল, এর পরের ছেলেপুলেগুলোর যাতে সেটা থাকে সেই ব্যবস্থা করা উচিত রবির, ভাবছিল নিশীথ।

'চেহারায় মায়ের আদল আছে কিন্তু কম বেশি সকলেরই—কিন্তু বাকিটা অন্য সব সাহেবদের মত।'

শুনে সমঝোতা হল নিশীথের। রবিশঙ্কর যা বলেছে মিথ্যে হতে পারে,

সত্য হতে পারে। যাই হোক না কেন, জিনিসটা মজুমদারকে স্বস্তি দিচ্ছে না। তলিয়ে কথা ভাবতে গেলেই কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে হয় রবিশঙ্করকে। নিশীথ তার স্কটিশ চার্চ কলেজের সহপাঠীর গাড়িতে পাশে বসে উপলব্ধি করছিল। টাকা আছে, কিন্তু স্বাদ নেই যেন। সুখ আছে, কিন্তু সাহচর্য নেই, শান্তির অভাব, পদমর্যাদা আছে কিন্তু এই তো অপমান। অপমানের উৎসটা সত্যি কি মিথ্যে ঠিক করে বুঝে নেবার পথ নেই রবি মজুমদারের। কিন্তু বুঝে উঠতে না পেরে জিনিসটাকে গায়ে মেখে নিয়েছে সে—এতদূর পর্যন্ত—যে সে বলে যে তার কোনো সন্তানই তার নিজের নয়। তা হয় তো ঠিক নয়। কিন্তু মানা মানছে না রবিশঙ্করের মনটা, যেন কিছু দোর্দণ্ড সৌখিনতা ও সুখে উপচে পড়ছে মানুষটার শরীর। শরীরে এত সুখ নিয়ে কি মনে এত অসুখ থাকতে পারে? রবিশঙ্করের আঁতের একটা কথা ভাবতে গিয়ে নিজের মনে যে-অসুখের ছোঁয়াচটুকু লেগেছিল, সেটা ঝেড়ে ফেলল নিশীথ। একটা পেটমোটা গন্ধগোকুলের কাছে নিজেকে নীলকণ্ঠ পাখির মত মনে হচ্ছিল নিশীথের।

'ভার্জিনিয়া এখানকার স্কচ আইরিশ সাহেবদের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করছে। আমি অফিসে যাবার মুখে টুক করে ঢুকে পড়ছে এক-একজন, অফিস থেকে ফিরে এসে দেখি আর-একজনের সঙ্গে গল্পগুজব করছে। যতক্ষণ অফিসে ছিলুম ততক্ষণ কী করছে?'

'ওদের দেশের যে-সব মেয়েরা আমাদের এ দেশি ছেলেদের বিয়ে করে, সাহেবরা সে-সব মেয়েদের দিকে ঘেঁষে না বলেই তো জানতুম মজুমদার সাহেব।'

'না তা নয়, ওটা আপনার ভুল নিশীথ সেন, বড্ড খচ্চর ঐ আইরিশগুলো। কী করেছে ওদের সঙ্গে ভার্জিনিয়া, কী না করেছে।'—পাইপ কামড়াতে-কামড়াতে রবিশঙ্কর বললে। পাইপটা জ্বলছিল না; সেটাকে দাঁত দিয়ে শক্ত করে কামড়ে ধরে পাতলুনের পকেটে ডানহাতটা ঢোকাল, হয় তো দেশলাই কিংবা পাউচ বার করবার জন্যে।

'আইরিশ না, স্কচরা?'

'আইরিশরা'—রবিশঙ্কর বললে।

'কিন্তু আপনার স্ত্রী তো স্কচ।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আইরিশরা—'

'এ দেশে এত—ওরা তো—'

'ওরা তো আয়ারেই থাকে না সব।'

'এখন তো এ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে সব।'

'অনেকগুলো বাঁদর এখনো আছে নিশীথ। কিন্তু'—রবিশঙ্কর দেশলাই বার করে বললে, 'আমি তো অনেকের কথা বলছি না। আমার বড় ছেলের বয়স দশ বছর। এগার-বার বছর আগের থেকেই শুরু হয়েছে, চোখ বুজে, একেবারে মুখে পাথর বেঁধে, ধুনে সাফ করে দেবার খেলা।'

'বরাবর মাদ্রাজে ছিলেন?'

'কিছুদিন বোম্বেতে ছিলুম। বেশ ভাল ছিলুম বোম্বেতে। তারপর দিল্লিতে আসতেই মূলে হাভাত করে দেয় আর-কি। আবার বোম্বে গেলুম। সেখানে আরো বেশি শুরু হল। ম্যারিন ড্রাইভে একটা খাসা ফ্ল্যাটে থাকতুম তিন-তলায়। একদিন রাতে', দেশলাই জ্বালিয়ে নিয়ে রবিশঙ্কর পাইপ ধরাল, 'একদিন রাতে অফিস থেকে ফ্ল্যাটে ফিরে দেখি আমাকে দেখে কেমন হক-চকিয়ে গেছে ভার্জিনিয়া। কেমন থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি যেই বাথরুমের দিকে চলেছি, অমনি ছোঁ মেরে আমাকে ধরে খাবার ঘরের দিকে নিয়ে গেল। খাবার ঘরে আমাকে বসিয়ে রেখে বললে, বোম্বেতে থাকো, এ যেন তোমার বিলেত থাকার সামিল; বাংলাদেশের কোনো জিনিসই তো পাও না, এই দেখ, তোমার জন্যে কেমন বেঙ্গলি সুইটস তৈরি করেছি। বলে একটা ডিশ ভর্তি পুডিং-কেক-প্যাস্ট্রি দিয়ে গেল; এই হল বেঙ্গলি সুইটস। বললে, খাও, আমি একটু আসছি। খুব ক্ষিদে পেয়েছিল; কাঁটা চামচ বাগিয়ে খাচ্ছিলাম, কিন্তু খানিক খেয়ে কেমন সন্দেহ হল আমার, আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বাথরুমের দিকে যেতেই দেখি একটা আইরিশ বাথরুমের জানালায় হাঁসের নলি গলিয়ে স্পাইরাল সিঁড়ি বেয়ে ভোঁ ভোঁ।'

'কী করে বুঝলেন আইরিশ?'

'আমি চিনি সেটাকে। একেবারে বাজ পাখির মত থুবড়ে পড়লাম গিয়ে স্ত্রীর গায়ের উপর', রবিশঙ্কর বললে, পাইপ নিবে গিয়েছিল, জ্বালিয়ে নিতে-নিতে বললে, 'বালিশতে ক্যাত ক্যাত করছে—'

'কী?'

'আর কী! স্কটল্যাণ্ডের ওট সেদ্ধ করে রেখেছে কে যেন কেভেণ্টারের দুধ দিয়ে,' রবিশঙ্কর মরীয়া হয়ে পাইপ টানতে-টানতে বললে—'কোথায় পেলে

এই পরিজ, তোমার গায়ে—জিজ্ঞেস করলাম আমার স্ত্রীকে'—বলে হো হো করে হেসে উঠল রবিশঙ্কর—'পরিজ বানিয়ে রাখলে কী করে? পরিজ বানালে? কে দিল পরিজ পয়দা করে তোমাকে? ও-হো-হোঃ-হোঃ হোঃ—' গাড়ির গদি নেচে উঠতে লাগল। রবিশঙ্করের আপাদমস্তকের, পশ্চাদ্দেশেরও, কেমন একটা উন্মত্ত প্রফুল্লতায়। বেসামাল ভাবটা কেটে গেলে পাইপটা মুখে দিতে গিয়ে, ছুঁড়ে ফেলে দিল গদির এক দিকে, পকেট থেকে পাউচ বার করে নিয়ে বললে, 'আর-একদিন সাঁ করে দুপুরবেলা বাড়ি ফিরে এলুম অফিস থেকে'—পাইপের ভিতরে যা কিছু ছিল জানলা দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে-ফেলতে রবিশঙ্কর বললে, 'কোনোদিন দুপুরবেলা তো অফিস থেকে ফিরতুম না আমি। একেবারে বমাল ধরা পড়ে গেল।'

'কী হল?'

'একেবারে বমাল ধরা পড়ে গেল'—উত্তেজিত হয়ে বললে রবিশঙ্কর।

নিশীথ বললে,--'স্ত্রী যদি এ রকম হয়, কী করে তাকে নিয়ে ঘর করা যায়।'

পাউচের থেকে তামাক বার করে পাইপে ভরতে-ভরতে রবিশঙ্কর বললে, 'পাঁচদিনের ছুটি নিয়ে বম্বের থেকে সান্টাক্রুজে গেলুম, ভার্জিনিয়াকে বললুম, সান্টাক্রুজে জুহুর সমুদ্রে বেড়িয়ে চান করে লোনাভালা যাব, লোনাভালা থেকে বোম্বে ফিরতে আমার সাত দিনও দেরি হতে পারে। কিন্তু সান্টাক্রুজে না গিয়ে বোম্বের একটা ইরানি হোটেলে বিরিয়ানি মাংস, মদ, কিছুটা খেয়ে একটা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, খানকি ঠিক নয়, খুশকির সঙ্গে, অনেক রাত কাটিয়ে, বোম্বের সেই পার্শি ছেনাল মেয়েটা—কী নাম ওর—পেরিন—পেরিন, পেরিনের বাবার মখমলের জুতোটা পায়ে দিয়ে টিপিটিপি আমার ফ্ল্যাটে ঢুকতেই দেখি দরজা-জানলা বন্ধও করে নি, খানিকটা আবজে অন্ধকারের মধ্যে তিন জোড়া মানুষ আসকে পিঠে আর চাসকে পায়েসের ভিতর হুটোপুটি খাচ্ছে। সব আইরিশ স্কচ ছোঁড়াছুঁড়ি। বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে—এনতার মদ খেয়েছে।'

পাইপটা জ্বালিয়ে নিয়ে দু-চারটে ফুরফুরে টান দিয়ে রবিশঙ্কর বললে, 'এর ভিতর থেকে আমার নিজের স্ত্রীকে খুঁজে বার করবার কোনো প্রবৃত্তি হল না। তার চেয়ে ঢের ভাল জিনিস সেখানে ছিল—একেবারে মদে মালেতে একাকার হয়ে লুটিয়ে, মরিন, সেই মেয়েটির নাম—আইরিশ মেয়ে—নিশীথবাবু এমন জিনিস আর হয় না, মরিনকে পাঁজাকোলা করে তুলে আমার ঘরে

বিছানায় নিয়ে বাকিটা রাত তার সঙ্গেই কাটিয়ে দিলুম—'

'সে তো বেহুঁশ হয়ে ছিল—'

'কিন্তু সদরে খিড়কিতে কোথাও কুলুপ মেরে যায় নি তো।'

'কিন্তু মনের যোগাযোগ না থাকলে ওতে কী লাভ ?'

'যে মদ খেয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে, তার মন তো গোঁসাইকে সাক্ষী রেখে গুরুভাইয়ের ভোগে লাগাবার জন্যেই এমন চাপদানির মালপো হয়ে আছে। না হলে এমন গ্যাঁজ হয়ে পড়ে থাকে ? এটা করি, ওটা করি, সেটা করি, যেন ব্রহ্মত্ববোধ স্তরের থেকে স্তরে উঠে যাচ্ছে মরিনের। আঃ, সে কী ব্রহ্মস্বাদ নিশীথ ! সারাটা রাত। আমি দেখেছি ব্রহ্মাকে, আমি চিনেছি।'—কেমন যেন একটা দ্রিমি দ্রিমিকি হুঙ্কারে বলে উঠল রবিশঙ্কর। পাইপ টানতে গেল না আর। কোনো দিকে তাকাতে গেল না। কোনো কথা বললে না। কেমন একটা যোগনিদ্রায় যেন নিবিষ্ট নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে তার মন—মনে হল, রবিশঙ্কর অনুভব করছে যেন।

রবিশঙ্করকে দেখে নিশীথ কী ভাবছিল বুঝতে পারা গেল না,—'মরিন কি 'মিলফোর্ডের মত ?'

'না, মিলফোর্ড আলাদা।'

'কী হল তারপর মিলফোর্ডের ?'

'হয় নি এখনো। হবে। খোদ ডেলিভারির আগে মেল ডেলিভারি চলছে নিশীথ। রোজ চিঠি পাচ্ছি।'

'কোথায় আছে এখন সে ?'

'করাচিতে। পাকিস্তান স্টেট কী রকম হল দেখছে, শুনছে, ঘুরছে। আমেরিকায় কতকগুলো পেপারের করেসপণ্ডেণ্ট সে। করাচি পাঞ্জাব হয়ে সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানটা লেইড মেরে ঘুরে দেখবে। তারপর দিল্লি ফিরবে, কলকাতায় আসবে, মাদ্রাজে যাবে বড় বৃষ্টির সময়, আমি তখন মাদ্রাজে থাকব,' রবিশঙ্কর বললে, 'ভার্জিনিয়াকে নিয়ে পারা যাচ্ছে না। দেখছেন তো, শুনলেন তো, কেমন পরিজের কারবার করে।'

'মজুমদার নিজেও কম যান না,' নিশীথ চুলের ভিতর দিয়ে আঙুল চালাতে-চালাতে বললে।

একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে রবিশঙ্কর বললে—'ও আমার ব্রহ্মত্ববোধের

পথটা খুলে দিয়েছে বটে। কিন্তু ওকে স্কটল্যাণ্ডে চলে যেতেই হবে। একবার ভেবেছিলুম অনেক দিন তো ঘর করেছি এক সঙ্গে, থেকে যাক, আমরা ভারত-বাসীরা নির্বেদী লোক, থেকে যাক, যা-খুশি করুক, ওকে দিয়ে আর কুইট ইণ্ডিয়া করিয়ে কী হবে—ইউরোপিয়ান চেম্বার অব কমার্সের বড়-বড় চাঁইরা তো এখনো চুষছেন আমাদের দেশটা, কিন্তু,' কেস থেকে বার করে নিশাথকে একটা সিগারেট দিল রবিশঙ্কর, 'করাচিতে এক দিন বিকেলে কনে-দেখা-আলোতে মিলফোর্ডকে দেখে আমার জীবনটাই বদলে গেল নিশীথ—'

'কিন্তু বেশি ব্রহ্মাস্বাদ মানুষের জন্যে নয় রবিশঙ্কর—'

'সেটা মিলফোর্ড বুঝবে।'

'কী বলে সে? আমেরিকানদের তো মূলধন ঢের; তাকে বিয়ে করলে, সুচের ছ্যাঁদার ভিতর দিয়ে গলিয়ে ধনীর স্বর্গে নিয়ে যেতে পারবে তোমাকে?'

'নানা রকম কথা হয়েছে। মিলফোর্ডের তো এ দেশেই থাকবার কথা আমেরিকান পেপারগুলোর ইণ্ডিয়ার করেসপণ্ডেন্ট হিসেবে—কয়েকটা বছর। আমি মিলিকে বলেছিলুম যে স্ত্রীধন নিয়ে আমার স্ত্রী বাড়িতেই থাকুক, ছেলেপুলেরা নানা বাপের হলেও এক মায়ের তো, মাকে ঘিরেই থাকুক আমার বাড়িতেই, ঘর-ভাঙা ঝামেলার ভিতর গিয়ে লাভ কী; মিলি যে-কটা বছর এ-দেশে আছে তার সঙ্গে সহবাস করব, বিস্তর টাকা দেব সে জন্যে তাকে—প্রস্তাব করেছিলুম।'

'কী বলে?'

'তাতে সে রাজি নয়। বলে, ও-সব করে নি সে কোনোদিন—করবে না। বললে, আমার মুখে ও-রকম প্রস্তাব শুনে তার কী যে খারাপ লেগেছে। ভারতবর্ষের ভগবৎগীতার দেশের মানুষ এ-রকম কথা বলে? আমার দিকে বিতিকিচ্ছিরিভাবে তাকিয়ে বললে সে—বুঝলে নিশীথ?'

সিগারেটটা হাতেই ছিল; জ্বালিয়ে নিয়ে মুখ থেকে নামিয়ে চুপ করে রইল নিশীথ।

নিশীথ সিগারেট টানছিল, কথা ভাবছিল, সিগারেটটাকে মুখ থেকে নামিয়ে নিয়ে বললে, 'মেয়েটি তো তা হলে খুব ভাল। খুব ভাল তো মিলফোর্ড।'

'ভাল। মোটামুটি ভাল বটে। অবিশ্যি আমার স্ত্রীকে সরাতে চায়, ছেলে-পুলেদের কথা ভাবতে দেবে না আমাকে; চারিদিক দেখে শুনে ভেবে খুব স্পষ্ট করে কথা বলে সব সময়ই। আমার চেয়ে একটু উঁচু স্তরের লোক সে।

আমার পরিবারের একটা সুব্যবস্থা কী করে হয়।সে বিষয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছে সে'—রবিশঙ্কর বললে।

'মিলফোর্ড তোমাকে বেশ ভালবাসে তো রবিশঙ্কর।'

'ভালবাসে? আমেরিকার মেয়েরা মাঝে-মাঝে নিগ্রোদেরও তো ভজাতে চায়। ওরা তো জলমুর্গির মত আখখুটে, যা চায় আর না-চায় সে সব ব্যাপার নিয়ে।'

নিশীথ একটু হেসে বললে, 'হ্যাঁচকা নিগ্রো ভজানো, সে আলাদা জিনিস—এটা হচ্ছে—'

'শুনুন, হঠাৎ কোনো একটা জিনিসকে কোনো অজ্ঞেয় কারণে মনে ধরে যায় তাদের,' বাধা দিয়ে রবিশঙ্কর বললে, 'ঝোঁকটা যত দিন থাকে তত দিন সে জিনিস, ডলার, হলিউড, চীন, শিবলিঙ্গ, রবিশঙ্কর, যাই হোক না কেন সেটাকে নিয়ে ওদের উদোবুদো। আমাদের দেশের কোনো পোষা মুর্গিও গেরস্তের ধান খেয়ে এতটা কবুল করে না,' গাড়ির উইণ্ড গ্লাসের দিকে তাকিয়ে তর্জনী ও মধ্যমায় আটকানো সিগারেটটা একবার নাচিয়ে নিয়ে রবিশঙ্কর বললে, 'কিন্তু ঝোঁক কেটে যায়।'

'কেন, নিবেদিতার তো কাটে নি।'

'তিনি অন্য রকম ছিলেন। মিলফোর্ড কি সে জাতের?' ভুরুটাকে উসকে দিয়ে স্টিয়ারিং হুইলের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল রবিশঙ্কর, 'নিবেদিতা চোখ খুলেই এসেছিলেন। এরা চোখে নেশা লাগিয়ে মনে ভাবে যে তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং? এটা কি গীতার শ্লোক, নিশীথ?'

'না। উপনিষদের,' নিশীথ বললে, 'মিলফোর্ডের মুখে শুনেছ এটা?'

'না। কোথায় যেন শুনেছি; অনেক আগে; বাবার কাছে বোধ হয়; এ শ্লোকটার মানে খুব ভাল করে বুঝি না আমি।'

'গীতা পড়েছ?'

'কিছু-কিছু। মিলফোর্ডের মতন ও-রকম সাত সাগরের পারের বেজাত কী করে এত গীতার ভক্ত হয়? এটা কি ভাল নিশীথ?'

নিশীথ রবিশঙ্করের হাতের রিস্টওয়াচে কটা বাজল দেখে নিতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু হাতটা কেবলি ঘুরছে, কোটের হাতা কেবলি ঝাঁকুনি দিয়ে হটিয়ে দিচ্ছে, রবিশঙ্কর, মুহূর্তের মধ্যে ঝুলে পড়ে ঘড়িটাকে গ্রাস করছে। সময় কত

বুঝতে পারা গেল না। রবিশঙ্করকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করতে গেল না নিশীথ।

'ইউরোপ-আমেরিকা বেজায় কেমন একটা দুর্দান্ত তেজস্ক্রিয় মশালের ভিতরে, ঘুরে অতিশ্রান্ত শলভের মাংসে উজ্জ্বল এই অদ্ভুত অগ্নিসভ্যতার থেকে ছিটকে পড়তে চাচ্ছে। কিন্তু তবুও তাদের ভিতরে অনেকে একটা কিছু চাচ্ছে তারা, একটা স্থিতি ভিত্তিও চাচ্ছে যা মৃত্যু নয়, জীবন। উঠতির মুখে বিজ্ঞান যে-সব বড়-বড় আশা দিয়েছিল প্রায় সবই আজ ধূলিসাৎ। আমেরিকায় ইউরোপে যারা দিনরাত লোকায়ত চক্রে উড়ে বেড়াতে না ভালবেসে একটু সুস্থিরতা চায়, লোকায়তেরই গভীরতর ব্যাপ্ত আস্বাদ চায়, তারা গীতার ভিতর, কেমন একটা স্নিগ্ধ সুপরিসর নিশ্চয়তা উপলব্ধি করে।' আস্তে-আস্তে বলছিল নিশীথ, নিজের মুখের ভাষাবৈগুণ্য নিজের কানে বাধছিল তার, ধর্মতাই বুলি ব্যবহার করে মনটা খারাপ লাগছিল।

'মিলফোর্ড এই নিশ্চয়তা চায়?'

'সে কী চায় আমি জানি না। দেখি নি তো তাকে। তবে তাদের দেশের কেউ-কেউ এ রকম ঝুঁকে পড়ছে গীতা, চীন সভ্যতা, তিব্বতে নিসর্গ ও মানুষ, আমাদের দেশের পটের ছবি এই সব নানা রকম জিনিসের দিকে।'

'এ-সবের কিছুই আমাকে টানে না তো।'

'টানে না?'

'কী আছে কালীঘাটের পটে?'

'সেটা ভাল করে উপলব্ধি করে দেখতে হয়। চোখ উল্টে দেখলে চলবে না তো।'

'ও আমি ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছি। পটের মা দিদিমা সকলেরই যেন দশমাস চলছে। ডুলি টানা বাঁদর—হোক না পুরুষ—সকলেরই যেন পেট হয়েছে—দশমাসি পেট। অবশ্যি ভুঁড়ির অশ্লীলতাকে স্নিগ্ধ করেছে পেট, রেখার নমনীয়তা আছে, খুঁটে-খুঁটে দেখতে গেলে কটমটায় না কিছু। কিন্তু কেমন একটা যেন নির্দোষ জলপ্রদ মঙ্গল উদরি রোগে ভুগছে পটের ছবিগুলো। কী হিসেবে এ গুলো আমেরিকানদের পেটোয়া? কথাটা কি সত্যি? মিলফোর্ড পটের কথা বলে নি, চীনাদের কথা না, লামাদের কথাও না। গীতার একটা ভাল সংস্করণ বেছে নিতে হবে। জানাটানা আছে?'

'কার গীতা আছে তোমার কাছে ?'

'গীতাটীতা কিছু নেই। বেদ-উপনিষদ আমি কোনোদিন রাখি নি তো ভাই। জানি না কী আছে ও-সবের ভিতর। মিলফোর্ডের সঙ্গে মিষ্টি সম্বন্ধ পাতাতে গিয়ে ভগবৎগীতার যদি দরকার হয়ে পড়ে তা হলে তুমি আমাকে একটা ভাল তিলক-টিলক-রাধাকিষণ-গঙ্গারাম মুন্সী-টুন্সির এডিশন জোগাড় করে দাও।'

'গঙ্গারাম মুন্সী কে ?'

'কেউ নয়, তবে ঐ ধরনের মানুষেরা বেশ ফসকা গেরোয় বাজের আটুনি মেরে ব্যাখ্যা করতে পারে।'

'না, রাধাকিষণের তো গীতা নেই', নিশীথ বললে, 'করাচিতে কী দেখলে ?'

'যা আছে তাই দেখলুম। মুশকিলে পড়েছিলুম ওয়েস্ট পাঞ্জাবে। তখনো দাঙ্গা চলছে সেখানে। রোজই আমি বেহ্রাম কিংবা মেরি মিলফোর্ডের সঙ্গে বেরতুম, আমাদের কেউ রোখে নি। কিন্তু মুসলমান বনে গেছি ভেবে একদিন একটা পামবিচের সুট পরে বেরোলুম—পথে হেঁটে : দু জন মুসলমান এসে আমাকে চ্যালেঞ্জ করলে—আমি যতই বলি যে আমি বাঙালি মুসলমান, আমার নাম লালন ফকির, কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না, তখন একটা কথা মনে পড়ে গেল—একবারে নির্ঘাত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও হাসি পেল। বললুম, আমি সারকামসিশন মানে সুন্নৎ করেছি, সেটা দেখালে বিশ্বাস হবে তো ? কিছুটা নরম হল বটে কিন্তু তবুও দেখতে চাইল—'

'দেখতে চাইল ? ভোগা দিয়েছ বুঝতে পারল, খুব সেয়ানা—বলতে হবে, লালন ফকিরের মত চেহারা তো তোমার নয়।'

'যদি অগ্রভাগ কাটা না থাকে আমার মাথা কাটবে। দু জনের হাতেই ছুরির কী দুর্গন্ধ, রক্ত টসটস করছে ; কয়েকটা তরতাজা খুন করে এসেছে', রবিশঙ্কর বললে, 'আমাকে একটা পাশের বাড়িতে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে একটা চোরা কুঠরির ভিতর ঢোকাল—'

'তারপর ?'

'তারপর আমার স্ল্যাক্স খুলতে বললে,' একটু কাঁধ নাচিয়ে হেসে রবিশঙ্কর বললে, 'তাড়াতাড়ি কাজ সেরে আমাকে যাতে ছেড়ে দেয় রোখ চেতিয়ে দিলুম তাদের। লক্ষ্ণৌয়ানের মত সেঁটে উর্দু ঝেড়ে বললুম, আমার হাতে সময় নেই, জিন্না সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে করাচি, সুবে বাংলার খুব

জরুরি খবর পৌঁছিয়ে দিতে হবে—জিন্নার চেয়েও সুন্নতের কথা শুনেই মাথা ঠাণ্ডা হল তাদের। বললে, আলবৎ আলবৎ জরুর—

'সুন্নৎ করলে কবে তুমি ?'

'করেছিলুম। দশ বছর আগে আমার ফাইমসিস হয়েছিল'—

'ফাইমসিস ?'

'ফাইমসিস।'

'কাকে বলে ফাইমসিস ?'

'জায়গাটার মুখের দিকের মাংস বেড়ে যেতে-যেতে এমন হয় যে ছ্যাঁদাটা একেবারে বুজে আসে, ভারি কষ্ট হয় জল খালাস করতে ; অপারেশন না করলে, ছ্যাঁদাটা একেবারেই বুজে যায়।' রবিশঙ্কর কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে নিশীথকে দিল, দেশলাইয়ের মুখে সিগারেটটা জ্বলে উঠল নিশীথের। ঠোঁট চেপে ধরে নিজেরটা জ্বালিয়ে নিল রবিশঙ্কর।

'অপারেশন করতে হয়েছিল। ডাক্তার অবিনাশলিঙ্গম—এ সব ব্যাপারে স্পেশালিস্ট—তাকেই ডাকলুম। তখন ভারী গরম পড়ে গেছে মাদ্রাজে ; অবিনাশলিঙ্গম বললে যে এ সব অপারেশনের ব্যাপার শীতকালেই ভাল হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে বেগ এলে সেটা শীতকাল অব্দি মুলতুবি রাখব—সে-রকম অবিনাশলিঙ্গম নেই তো আমার। বললাম ডাক্তারকে। সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে হাজির হলেন। ক্লোরোফর্ম করিয়ে অপারেশন করেছিলেন। তারপর থেকেই এই দশ বছর কী যে নিস্তার পাচ্ছি। এটা করছি, ওটা করছি, সুন্নৎ করে কী যে নিস্তার তা আপনি বুঝবেন না নিশীথবাবু।'

রবিশঙ্কর কখনো আপনি, কখনো তুমি বলছে নিশীথকে, কখনো তুমি, কখনও আপনি বলছে রবিশঙ্করকে নিশীথ।

'ঠিক সময়েই ঠিক জিনিস করা থাকে আপনার মজুমদার—যখন যে এসে হাঁক দেয় অমনি নজির বার করে দেখান। ওনারা খিঁচড়ে উঠতেই এক পাসপোর্ট ঠুকে দিলেন আপনি।'

রবিশঙ্কর হাসতে-হাসতে বললে, 'অবিনাশলিঙ্গ যখন দশ বছর আগে অপারেশন করেছিল মাদ্রাজে, কে ভেবেছিল ওটা কাজে লেগে যাবে পাঞ্জাবে। আনডারওয়ার খুলতেই একটু নেড়ে-চেড়ে সমঝে দেখে তোবা তোবা বলে ছেড়ে দিল,' রবিশঙ্কর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'আমার মুখ দেখে হিন্দু মনে

করে ওরা জান উড়িয়ে দিতে এসেছিল, কিন্তু বাস্তবিকই জিনিসটার মুখ নেই দেখে ঠাণ্ডা হয়ে আদাব-আদাব করতে-করতে চলে গেল। কেমন যেন আমাদের এই পৃথিবী—ক্ষুরঘর্ষণ ক্ষুরবর্ষণ চিড়িক-চিড়িক পানি। এই পৃথিবীর মতিগতির কান টেনে মাথা পাকড়ে কাজ না করতে পারলে রক্ষা নেই মানুষের। সব সময়েই বান মাছের মত সটকে যাচ্ছে পৃথিবীটা, লেজে টেনে হাতের মুঠোর ভিতর রেখে দিতে হবে।'

রবিশঙ্কর কথাগুলো বলে ফেলে খুব একটা লম্বা টানে প্রায় আদ্ধেকটা সিগারেট শুষে নিয়ে ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় লাট করে ফেলল গাড়ির ভিতরটা।

'এই তো গেল পূর্বপক্ষের কথা, এখন উত্তরপক্ষের কথা শোনো নিশীথ, দিল্লিতে যখন খুব গোলমাল চলছিল তখন প্রায়ই আমায় দিল্লি যেতে হত', রবিশঙ্কর বললে, 'আমার হেড-কোয়ার্টার্স ছিল আগ্রায়, কিন্তু রোজই প্রায় ট্রেনে চড়ে দিল্লি গিয়ে টাঙ্গায় ঘুরে বেড়াতে হত অফিসের নানা কাজে। আমার নিজের মিনার্ভা গাড়িটা তখন মাদ্রাজে পড়েছিল, ট্রেনে দিল্লিতে অবিশ্রাম হিন্দুদের মধ্যেই চলতে-ফিরতে হত আমায়, কিন্তু নিজেকে মোটেই নিরাপদ মনে করতে পারতুম না, অবিনাশসিঙ্গের মুণ্ডপাত করতে-করতে দুর্গা বলে ঝুলে পড়তুম রোজ।'

'কেন? হিন্দুদের ভিতর ঘুরে-ফিরে কী ভয়?'

'দুটো মাস আমার জান খেয়ে নিয়েছে হিন্দুরা।'

'হিন্দুরা? হিন্দুর বাচ্চাকে?'

'কিন্তু অবিনাশ সিঙ্গের কারসাজির ফলে আমার হিন্দু অভিজ্ঞান তো পাচার হয়ে গেছে নিশীথ। একেবারে মরীয়া হয়ে ছুটে আসত গুণ্ডাদের দল। এই খেলে—এই বুঝি খেয়ে নিলে—যদি মুখিয়ে ঝাপটে ধরত জয়হিন্দ হাকড়ে, এই শালা হারামিকা বাচ্চা মুসলমান, কী বলে বোঝাতাম আমি মুসলমান নই। লাহোরে তো বুঝিয়ে এসেছি আমি হিন্দু নই, দিল্লিতে বোঝাতে হবে আমি মুসলমান নই। ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান দুটো জাত বলা হচ্ছে আজকাল; কিন্তু চেহারা তো একই রকম, এ দু জাতের পার্থক্য শুধু এক-আধটা জায়গায়। তা তো লাহোর জয় করে এসেছে।'

রবিশঙ্কর সিগারেটে একটা টান মেরে সেটাকে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে বললে, 'লাহোর জয় করে এসেছে, দিল্লিও জয় করতে হবে তাকে, একা বেচারি

কত পারবে? ওকে ঘুমোবার আগে আগ্রাওয়ালিদের জন্য রিসার্ভ ফোর্স হিসাবে রেখে আমি কপালে ত্রিশূল তিলক কাটতে আরম্ভ করে দিলুম মাদ্রাজিদের মত, মাদ্রাজি পাগড়ি আঁটতে শুরু করলুম—ভেবেছিলুম বেশিদিন দিল্লির দিকে থাকতে হলে দক্ষিণী খোঁপাটাও রপ্ত করে নেব, তা হলে আর মার নেই—লুঙ্গি পরলেও মার নেই। কিন্তু আগ্রাওয়ালিরা উত্তুরে মেয়ে, দক্ষিণী পুরুষ বলে যেতে দেবে না আমাকে, রোজ রাতে থুতু দিয়ে আমার ফোঁটা তিলক উল্কি চিতিয়ে ঘষে তুলে ফেলল সব। থুতুতে এ রকম আশ্চর্য চন্দনের গন্ধ পেয়েছ তুমি কোথাও?'

'থুতুতে?' নিশীথ গাড়ির থেকে নেমে পড়ে নিজের চরকায় তেল দিতে যাবে কি না ভাবতে-ভাবতে জিজ্ঞেস করল, 'আগ্রাওয়ালি মানে?'

'আগ্রার হিন্দু শিখ মুসলমান মেয়ে।'

'মুসলমান মেয়ে? ঐ দাঙ্গার সময়?'

'হ্যাঁ হে নিশীথ, তাদের মুখে জিভে কেমন একটা হরিচন্দনের গন্ধ যেন'—রবিশঙ্কর বললে।

তারপর সে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ল এমনি যে, কোনো কথা বলে বা ঠেলা দিয়ে তাকে জাগিয়ে দিতে ইতস্তত বোধ করতে লাগল নিশীথ।

'এখনো ফিরে এল না ড্রাইভার : আমাকেই যেতে হবে তা হলে'

'ড্রাইভার কি তোমার দাদার ছেলে, রবিশঙ্কর?'

'আমার দাদার ছেলে। ড্রাইভারি করছে। ওর নিজের ছ্যাকড়া মোটর আছে। মন্দ নয়। দু পয়সা—আমি এবার তা হলে স্টার্ট দিই নিশীথ সেন! তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে?'

'কোথায়? গ্রাণ্ড হোটেলে?'

'না, ড্রাইভার যেখানে গিয়েছে, এই তো কাছেই—'

'কার বাড়ি?'

'চলো, দেখো-না এসে।'

'কার কাছে যাচ্ছ?'

'বাড়ির মেমসাহেবের কাছে। সাহেব বাড়ি নেই।'

'কোথায় গেছে সাহেব?'

'দিল্লিতে।'

'কী হবে মেমসাহেবকে দিয়ে ?'

'আজ কিছু হবে না। তবে একটা-দুটো দিন—সময় ঠিক করে নিতে হবে।'

নিশীথ পা বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললে, 'আজ বুঝি মুখেভাত শুধ ?'

'ওকে নিয়ে একটু বজবজ-ব্যারাকপুর-ডায়মণ্ডহারবারের দিকে—সমুদ্রের দিকে যেতে হবে।'

হরিদাসকে অনেক ক্ষণ আগে একটা অজ্ঞাত বার্তা নিয়ে চলে যেতে দেখেছে নিশীথ। ব্যাপারটা সম্পর্কে মাঝে-মাঝে ভেবে দেখেছে। মেমসাহেবটি কে তাও ধরে ফেলেছে যেন: বললে, 'তোমরা দু জনে যাবে বেড়াতে ডায়মণ্ড-হারবারের সমুদ্রে ?'

'হ্যাঁ বেড়াতে। তা ছাড়া এক জন ছেলে এক জন মেয়ে দু জনে সারাদিন বিভুঁয়ে বিদেশে মোটরে ঘুরে কী করে আর ? নিশীথ সেন ?'

নিশীথ একটু গলা খাঁকরে বললে, 'কী করে আর রবিশঙ্কর, ভাগীরথীর বাঁধ ঠিক করে, ইঞ্জিনিয়ারি' করে, জুড়ি মিলবে তাদের ?'

রবিশঙ্কর স্টার্ট দিচ্ছিল, নিশীথ দরজা খুলে রাস্তায় নামল, রবিশঙ্কর হেসে বললে, 'কোথায় মিলবে আর তাদের জুড়ি, চালের কন্ট্রোল, কাপড়ের কন্ট্রোল, বোষ মিনিস্ট্রি, রায় মিনিস্ট্রি—দুনিয়ার হালচালের হদিস কোথায় মিলবে আর, যে-সমস্যাটা হাঁ করে তার ভিতর ঢুকে পড়তে না পারলে। ঢোকবার তারিপটা —হেঁই এই—এঁই রে হই হেঁই হোঁই হোঁই—ঘ্যাড়ড়ড়—ড ড় ড ড়—মোটর কী রকম তড়পাচ্ছে দেখছ—কোথায় যাচ্ছ নিশীথ—'

'অনেক দিকে যেতে হবে।'

'তা যেও এখন। গাড়িতে চলো।'

'কোথায় ?'

'মেমসাহেবকে দেখে আসবে।'

'আমার মুখ চেনা আছে।'

'বটে! বাড়িটা দেখে রাখবে, চলো। আখেরে কাজ দিতে পারে।'

'দেখা আছে বাড়ি,' নিশীথ হাসতে-হাসতে বললে 'সেই বাড়ির থেকেই তো বেরিয়ে এলুম আমি।'

'বাড়ির গোমস্তা বুঝি'—ঠাট্টা করে বললে রবিশঙ্কর।

'গোমস্তা নিয়েই তো পড়ল মিলফোর্ড,'- হাসতে-হাসতে বললে নিশীথ, 'নায়েব

মশাইকে বাদ দিয়ে।'

'নায়েব মশাই কে?'

'কেন। কত তো আছে করাচিতে; কত তো ওয়েস্ট পাঞ্জাবে।'

রবিশঙ্কর তা হলে জিতেন দাশগুপ্তর বাড়ি যাচ্ছে নমিতার খোঁজে? অবিশ্যি অন্য কোথাও যে না-যেতে পারে তা নয়; মেমসাহেব যে নমিতাই তা নাও হতে পারে। রবিশঙ্করকে জিজ্ঞেস করলেই নিশীথ জানতে পারত কার বাড়িতে যাচ্ছে সে, কিন্তু কিছুই জানবার দরকার নেই। নমিতা সম্বন্ধে যা জানে, যা অনুভব করেছে নিশীথ, তার নিজের পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। চল্লিশ বছর পেরিয়ে প্রায় পঞ্চাশের কাছে এসে পৌঁছেছে—মানুষের জীবনের ঢের কিছু না-দেখলেও কিছু-কিছু জেনেছে সে—উপলব্ধি করতে হয়েছে। না দেখে, বই পড়ে, অনুভব করে, মানুষের সঙ্গে মিশে, জলপাইহাটিতে যে-সব সিদ্ধান্ত করে রেখেছিল, কলকাতায় বৃহৎ ক্ষেত্রে এসে এ পথ থেকে সে পথে ফিরে সেই সবেরই সমর্থন কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে সে। মূল তত্ত্বগুলো জানা ছিল মোটামুটি। উদাহরণগুলো মিলছে এখন কেমন সহজ সজীব কৌতুকসম্ভব রক্তে আঁধারে কৌমুদীতে। নমিতার তো আজ বেলা বারটা অব্দি ঘুমোবার কথা হানিফ বলছিল। হরিদাস বসে আছে হয় তো নমিতার ড্রয়িং'রুমে, কখন মেমসাহেব জাগবে। জাগলে কাকা যে মোটর নিয়ে হাজির সে কথা জানাবে তাকে।

রবিশঙ্কর নিজেই তত ক্ষণে পৌঁছে গেছে জিতেনের বাড়িতে। জাগিয়ে তুলেছে নমিতাকে? জুলফিকারের ওখানে যাবে না নমিতা? রবিশঙ্করের সঙ্গে ডায়মণ্ড হারবার যাবে? কাঁচা ঘুমে জেগে কেমন লাগছে নমিতার? রবিশঙ্করের সঙ্গে কোথায় দেখা হল নমিতার? সম্পর্কটা কী রকম? রবি মজুমদারের চেহারা দেখেই ভাল লেগেছে নমিতার? বেশ লম্বাই-চওড়াই পুরুষালি আছে বটে মজুমদারের। মজুমদার সাহেবের মনটাও বেশ ভালই প্রতিভাত হয়েছে নমিতার কাছে। মজুমদার তার মনটাকে একেবারেই অন্য এক ভঙ্গিতে নতুন করে খুলে দেখিয়েছে নমিতাকে। নিশীথের চোখ দিয়ে দেখার কথা নয় তো নমিতার, ভার্জিনিয়া, মিলফোর্ড বা লাহোর দিল্লির দাঙ্গার গল্পগুলো নয়, অন্য সব। বিচিত্র গল্প পাড়বে রবিশঙ্কর, অনেক দিন আগের থেকেই ভজিয়েছে হয় তো; গল্পে, রসিকতায়, কথা বলার ঠাটে, প্রাণের খোলাখুলিতে মানুষের জীবনের

তিন বিস্তার ছাড়িয়ে একটা চতুর্থ বিস্তারেরও অবতারণা করতে পারে যেন রবিশঙ্কর। সে যাই পারুক আর না-পারুক, শেষ পর্যন্ত স্ক্রিমজারের ক্লাসের সেই বিমূঢ় বেতাল ছাড়া রবিশঙ্কর কিছুই নয় আর। কিন্তু কে বুঝবে তা? রবিশঙ্কর সম্পর্কে ত্রিশ বছরের হিসেব কার হাতে আছে? অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে রবিশঙ্করকে তলিয়ে দেখবার অবকাশ, রুচি আছে কার। দশটা বেজে গেছে। চার-পাঁচ দিন কলেজ ছুটি, গভর্নমেণ্ট অফিসগুলোও ছুটি। ছুটির দিনে নানারকম মানুষের কাছে যাওয়া যায়। বাড়ি বা চাকরির সুবিধে করে দিতে পারবে নিশীথের জন্য—এমন কোনো লোক অবশ্য কলকাতায় কোথাও নেই।

তবুও কলকাতায় থাকতে হবে নিশীথের। সে পুরুষ। কাজেই তার কাছ থেকে যে পুরুষার্থ প্রত্যাশা করে নারীরা ও পুরুষেরা, সে তো স্বাভাবিক; তার নিজের নিঃসংস্কারী মনও যে তাকে সুস্থির থাকতে দিচ্ছে না, কোথাও কারু কাছে গিয়ে কোনো একটা কিছু সংঘটিত করে নেবার জন্যে ক্রমাগত তাগিদ দিচ্ছে সেটাই কৌতুককর।

তিন-চার বছর ধরে কলকাতার কলেজগুলোতে চাকরির চেষ্টা করছে সে। প্রথম বছর প্রাণান্ত প্রয়াস করেছিল, অতটা হয়রানি চাকরির দিক থেকে কোনো ব্যবসার দিকে ঘুরিয়ে দিলে দাঁড়িয়ে যেত ব্যবসাটা। শেষ পর্যন্ত নাক দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। ফলে কলকাতার ডাক্তার বেশ মোটা টাকা মেরে নিল নিশীথের কাছ থেকে, কিন্তু কলেজের চাকরি হল না।

প্রথম বারের অত চেষ্টা-তদ্বিরে হতে-হতেও হল না যখন, প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল না যখন নানা রকম কলেজ প্রতিষ্ঠানের নামী লোকেরাও কেমন একটা অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, নিরাশায় পীড়িত হয়ে উঠল তার মন। এর পরে দু-তিন বার মন খোলা চোখেই সে চেষ্টা করেছে—কিছু হবে না জেনে, তবুও মনের মারাত্মক মুদ্রাদোষে, কলকাতার কলেজে উপযুক্ত অধ্যাপনার কাজ পাবার জন্যে। সঙ্গে-সঙ্গে খবরের কাগজে চেষ্টা করেছে, অন্য কয়েকটা দিকেও, কোথাও হয় নি কিছু। ভাল কিছু নেই কোথাও—তার জন্যে নেই।

কলকাতায় চাকরি কেন চাচ্ছে নিশীথ? জলপাইহাটিতে না হোক, মফস্বলের অন্য কোনো কলেজে কাজের চেষ্টা করলেই পারে; পেয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু না। মফস্বলের প্রকৃতি সে ভালবাসে, লোকজনদেরও ভাল

লাগে তার। কিন্তু এবারে কলকাতায় এসে নানা রকম প্রাণবনতা ও গহনতার ভিতর অন্তঃপ্রবেশ করতে চায় সে, অনেক দিন একা থেকেছে, এককও থেকেছে, এবার নিজেকে সরিয়ে নিয়ে জনমানুষদের আলোড়ন দেখবে সে, যদি পারে। মর্যাদা দিতে চেষ্টা করবে সে জিনিসটাকে, যেখানে-যেখানে সুযোগ হয়, সম্ভব হয়, যে-জিনিসের সহজাত শ্রী ও সম্ভার ও প্রতিভা দেখে নতুন করে হয় তো কিছু শিক্ষা করতে পারবে তার মন। একটা মহানগরের বিন্দু-বিন্দু অনন্ত মৃত্যুর থেকে জাত নিরবচ্ছিন্ন অব্যয় জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আগুনের থেকে আলোর দিকে, হয় তো কৃষ্ণতর অন্ধকারের ঘূর্ণির ভিতর, পথ খুঁজছে, খুঁজে দিতে সাহায্য করছে অন্যদের ; চার দিকের জন-জনতার থেকে নিরবচ্ছিন্ন প্রক্ষিপ্ত ইতিহাসের আশ্চর্য জননীগ্রন্থির সঙ্গে এক হয়ে চলতে চায় তার মানবাত্মা। সে যদি কলকাতার এত বড় মানব সমাজের ভিতরেও নিজেকে একা, নিরালম্ব, ক্ষিন্ন মনে করত তা হলে বলতে পারা যেত যে একান্তে বসে ধীরে-সুস্থে কলকাতা নগরীকে দুধ, মধু, মদের মত ব্যবহার করবার জন্যে এসেছে সে এখানে।

কিন্তু সেটা কী রকম হাস্যকর ব্যাপার? সেটা রবিশঙ্কর পারে, নিশীথ কী করে পারবে তার নিঃস্বার্থতার মন নিয়ে জীবনের ও উপলব্ধির এই প্রায় নিঃস্বত্ব অবস্থায়?

চলতে-চলতে নিশীথ কংক্রিট সিমেন্ট শক্তি সাহস নীরবতা বিবর্ণতায় কেমন যেন পরাৎপর একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল সে, ঘুরে দেখল এক তলায় ; ঢের বই, লাইব্রেরি, মানুষ নেই ; আরো ভিতরে ঢুকবার জন্যে দোতলায় সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিল।

'কে আপনি? কী চান? কোথায় যাচ্ছেন?' একটি ছেলে এসে বাধা দিল নিশীথকে।

'উপরে যাচ্ছিলাম, প্রফেসর ঘোষ কি ঘুমের থেকে জেগেছেন?' নিশীথ জিজ্ঞেস করল।

'এখন সোয়া দশটা বেজেছে, এখনও ঘুমোবেন?'

'আজ ছুটির দিন, তাই মনে হচ্ছিল—'

'ছুটির দিন বলে বেলা এগারটা অব্দি ঘুমোবেন?'

হবের সঙ্গে?'

'কোত্থেকে এসেছেন আপনি ?'

ঘুমের থেকে এখুনি ওঠে নি হয় তো কিন্তু তবুও ঘোর-ঘোর চোখে নিশীথকে একটু মজুত করবার ঠাটে উর্দিপরা ছেলেটি জিজ্ঞেস করল। এ কি এ-বাড়ির ছেলে, সৌখিন বাবুটি স্টেনোগ্রাফার, ছেলেদের টিউটর, প্রফেসর সাহেবের কোনো গরিব আশ্রিত আত্মীয় ? কে এ ?—'আমি হাটখোলার থেকে এসেছি', নিশীথ বললে।

'হাটখোলার থেকে বালিগঞ্জ। কী দরকার আপনার প্রফেসর ঘোষের সঙ্গে ?'

'দেখা হবে কি ?'

'কী দরকার বলুন ?'

'উনি আছেন কি বাড়িতে ?'

'আপনার দরকারটা না জানালে কী করে কী হবে ?'

'উনি উঠেছেন কি ঘুমের থেকে ?'

ছেলেটি একটু পিছে সরে হৃদ্দ মেনে নিশীথের দিকে তাকাল। বললে, 'উঠেছেন সাড়ে আটটার সময়। দাড়ি কামানো হয়েছে, চান করছেন। কী বলব গিয়ে ঘোষ সাহেবকে ? কে এসেছে বলব ?'

'উনি দোতলায় বসে চা খাচ্ছেন বুঝি ?'

'চা খাওয়া হয়ে গেছে। চান করছেন।'

'এক তলায় তো থাকতেন আগে। বাড়িতে ঢুকেই সোজা চলে যেতুম ওঁর কামরায়—'

'সে আপনি আট-দশ বছর আগের কথা বলছেন। তখন তো ইনি'—ছেলেটি একটু থেমে গিয়ে বললে, 'উনি আজকাল দোতলায়ই থাকেন। এই সমস্ত বাড়িটাই তো ওঁর।'

'আচ্ছা তা হলে আমি উঠি দোতলায়।'

'কী দরকার আপনার বলুন।'

'দেখা করতে চাই ওঁর সঙ্গে, এই তো দরকার।'

'এই শুধু ? কোনো বিশেষ দরকার নেই ?' ছেলেটি চোখ ঘুরিয়ে নিশীথের হাত-পা মাথার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল।

'হ্যাঁ, বিশেষ দরকার আছে বই কি।' নিশীথ একটা দম নিয়ে বললে, আস্তে-

আস্তে দম ছাড়তে-ছাড়তে।

'কী দরকার সেটা ?'

'ওঁর অসুবিধা হবে না তাতে।'

'ওঁকে গিয়ে জানাতে হবে তো আমার।'

'আচ্ছা, আমি নিজে গিয়েই জানাব। চলুন উপরে।'

'কী নাম আপনার ?'

'নিশীথ সেন।'

'হাটখোলার থেকে এসেছেন কলেজের কোনো কাজে ?'

'ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'ওঁর কলেজ-টলেজের কোনো ব্যাপার নাকি ?'

'ওঁকে কি কার্ড পাঠিয়ে দেব আমার ? যাঁরা দেখা করতে আসেন ঘোষ সাহেবের সঙ্গে কার্ড পাঠিয়ে দিতে হয় ওঁকে ?'

ছেলেটি এক পা পিছিয়ে গিয়ে নিশীথের দিকে ভাল করে তাকিয়ে বললে, 'না, সব সময়ে কার্ডের দরকার হয় না। কেউ-কেউ অবিশ্যি কার্ড দিয়ে দেখা করেন, কিন্তু ঘোষ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হলে কার্ড তো একটা কিছু কথা নয়, তিনি জানতে চান কে দেখা করতে চাচ্ছে, কেন দেখা করতে চাচ্ছে।'

নিশীথ বললে, 'শ্লেট পেন্সিল আছে এখানে ?'

'না। স্লিপ চাইলে দিতে পারি। লিখে জানাবেন আপনার দরকারটা ?'

'হ্যাঁ, সেইটেই ভাল। কাজের মানুষ ঘোষ সাহেব অযথা ওঁর সময় নষ্ট করে লাভ কি ? আমার যা দরকার সেটা ওকে লিখে জানিয়ে দিই, যদি মনে করেন আমাকে ডাকবেন, না হলে চলে যাব আবার সেই হাটখোলায়।'

নিশীথকে একটা স্লিপ পেনসিল দিয়ে ছেলেটি বললে, 'হাটখোলার থেকে এসেছেন শুধু ঘোষ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে ?'

'হ্যাঁ। না দেখা হলে ফিরে যেতে। এই দশ-বার আনা পয়সার মামলা তো শুধু, আর দশ-বার ঘণ্টা টাইমের। সে জন্যে ওঁর টাইম নষ্ট করা ঠিক হবে না। ওঁর পাঁচ মিনিট তো আমাদের পাঁচদিনের সমান; কোনো-কোনো সময়ে মাসেও কামিয়ে নিতে পারি না, তুকতাক করে পাঁচ মিনিটে যা সেরে দেন ঘোষ।'

স্লিপ লিখছিল নিশীথ, নিজের নামটাই লিখল শুধু, আর—আর কী লিখবে ?

লিখল যে প্রফেসর ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে চাই। কী লিখবে আর? লিখল যে, সে জন্য বেলগাছিয়া থেকে এসেছে বালিগঞ্জ অব্দি। ব্যাস। ছেলেটির হাতে স্লিপ তুলে দিয়ে নিশীথ জিজ্ঞেস করল, 'কী নাম আপনার?'

'আমার নাম রিপেন।'

'রিপেন?'

'হ্যাঁ, রিপেন।'

রিপেন, নিশীথ দু-এক মুহূর্ত মাথা খুঁড়ে ভেবে নিয়ে রিপেন, রীপেন, ঋপেন, কোনো কিছুর ভিতরেই কূলকিনারা না পেয়ে হয় তো রিপন ছেলেটির নাম, কিংবা রিপু+ইন্দ্র=রিপেন্দ্র—রিপেন ছেলেটির নাম—রিপেন—রিপেন—রিপেনের থেকে রিপেন হয়েছে—রিপেন—রিপেন ভেবে খানিকটা নিস্তার বোধ করতে লাগল।

'রিপেন আপনার নাম?'

'আমার নাম রিপেন।'

ছেলেটি স্লিপ পড়ে নিশীথকে বললে, 'প্রফেসর সাহেবের সঙ্গে কেন দেখা করতে এসেছেন তা তো লেখেন নি আপনি, আমাকে বলেছিলেন হাটখোলার থেকে এসেছেন, কিন্তু এখানে তো লিখেছেন বেলগাছিয়ার কথা।'

'হাটখোলার থেকেই এসেছি আমি, বেলগাছিয়ায় আমি থাকি।' রিপেন নিশীথের দিকে আড়চোখে একটু খটকায় বেধে তাকিয়ে থেকে বললে, 'কী দরকারটা আপনার লিখলেন না, ঘোষ সাহেব বড়-বড় প্রফেসর, অ্যাসেম্বলি মেম্বার, খানদানি অফিসার, মিনিস্টার ছাড়া কারুরই সঙ্গে দেখা করেন না আজকাল। বড্ড ব্যস্ত কাজ নিয়ে—'

'কী কাজ?'

'কী কাজ তা আমি কী করে বলব; অনেক বই ঘাঁটছেন, পড়ছেন লিখছেন। লিখছেন—'

'ও-সব তো বরাবরই লেগে আছে।'

'না বরাবর নয়। এক নাগাড়ে লিখছেন। আগে তো পড়তেন শুধু; কোথায় লিখতেন?'

'বই লিখছেন?

'না, শিক্ষা সম্বন্ধে কী একটা পরিকল্পনা লিখে দিতে হচ্ছে, চেয়েছে গভর্নমেণ্ট

থেকে।'

'এই গভর্নমেণ্ট থেকে?

'না, বোধ হয় সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট থেকে।'

'টাকা দেবে বুঝি ওঁকে?'

রিপেন মাথা নেড়ে বললে, 'না মশাই, টাকা দিয়ে কী হবে ঘোষ সাহেবের? মোটা রকম টাকার জন্যেও ও কাজ কে করে? তবে হ্যাঁ, বড় পদ পেয়ে যাবেন হয় তো। কত মান তাতে! কত মান। টাকা কী হবে? টাকা!'

'কোথায় পাবেন বড় পদ?'

'সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টে—'

'ওঃ, তা হলে চলি আজ আমি রিপেন দা।

'আপনি কি বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ থেকে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। কলেজের হাউস ফিজিসিয়ান আমি—বায়োকেমিস্ট্রির লেকচারার। ট্রপিক্যাল।'

'ওঃ—ওঃ—ওঃ', রিপেন হাত জোর করে বললে, 'ঘাট হয়ে গেছে ডক্টর সেন, আপনার ধুতি-পাঞ্জাবি দেখে বুঝতেই পারি নি আমি। চলুন-চলুন—অনেক সময় নষ্ট হল আপনার। নানা রকম লোক এসে বিরক্ত করে প্রফেসরকে, সে জন্য আমার উপর কড়া হুকুম যে গোলা লোককে যেন পাশ না করে দিই'—

'আমাকে ফর্দা মনে হয়েছিল বুঝি?'

'হাউস ফিজিসিয়ান, ট্রপিকালের প্রফেসর, সুট পরে এলেই তো হত। আজকাল অবিশ্যি পনেরই আগস্টের পর থেকে ধুতি-চাদর পরছে অনেকেই, গভর্নর মন্ত্রী সবাই প্রায়—কিন্তু—যাদের কাজই হাসিল হয় নি এখনো তাদের সুট পরে বেরনোই সুবিধে; রাজাজির সঙ্গে ধুতি নিয়ে টেক্কা দিলে তো চলবে না। রাজাজির তো সব ফল পাড়া হয়ে গেছে, এখন বসে-বসে কাস্টার্ড পুডিং বানাবার সময়। চলুন, চলুন ডক্টর সেন—'

'ঘোষ সাহেব লিখছেন—'

'চলুন কোনো ক্ষতি হবে না।'

'ক্ষতি হবে না?'

'চলুন, আপনার সময় নষ্ট হচ্ছে।'

'স্লিপটা রিপেন দা?'

'ওটা ছিঁড়ে ফেলেছি। লাগবে না।'

নিশীথ পকেট থেকে ক্যাকটিনা পিলের কৌটো বের করে কয়েকটা বড়ি খেয়ে ফেলে বললে, 'বেলগাছিয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই রিপেন। আমি বেলগাছিয়ায় থাকি বটে কিন্তু কলেজে নয়, অন্য জায়গায়। আমি কলকাতায় বেড়াতে এসেছি, আমি জলপাইহাটিতে থাকি। সেখানকার কলেজের ইংরেজির লেকচারার আমি। ঘোষ সাহেবের সঙ্গে আমার কি দেখা হবে রিপেন?'

শুনে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল রিপেন। সিঁড়ির উপরে দু-তিন ধাপ উঠে গিয়েছিল সে, নীচে নেমে এসে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে থেকে বললে, 'আপনি কী যে তাই আমি বুঝতে পারছি না। বললেন, হাটখোলার থেকে এসেছি, পরে লিখলেন, বেলগাছিয়া থেকে আসা হয়েছে। নিজেকে বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজের হাউস ফিজিসিয়ান, ট্রপিকাল স্কুল অব মেডিসিনের প্রফেসর, বলে চালিয়ে দিয়ে পরে বললেন ও-সব কলেজের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, অন্যত্র থাকেন।'

নিশীথের দিকে তাকিয়ে রিপেন বললে, 'কলকাতায় থাকেন না?'

'না।'

'বিশ্বেস করতে হবে? কোথায় জলপাইহাটি?'

'পদ্মার পারে।'

'পাকিস্তানে?'

'হ্যাঁ।'

'জলপাইহাটি কলেজের লেকচারার আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'বিশ্বেস করতে হবে?' রিপেন বললে, 'আর এক সময়ে আসবেন নিশীথবাবু। ঘোষ সাহেবকে আজ বিরক্ত না করাই ভাল। উনি সত্যিই আজ সকাল থেকে খুব ব্যস্ত আছেন।'

'আমার শুধু পাঁচ মিনিটের মামলা রিপেন।'

'কলেজ আজ ছুটি আছে। উনি সকাল থেকেই দোর বন্ধ করে লিখছেন। বলে দিয়েছেন কেউ যেন কাছে না ঘেঁষে। আজ উপরে না যাওয়াই ভাল। আপনি আর-একদিন সময় করে'—

'আমি আর একদিন আসব রিপেন।' নিজের মনেই খুশিতেই কেমন একটা সৌজন্য এসে পড়ল নিশীথের মুখে, বললে, 'আজ শুধু দোতলা হয়ে ওঁর সঙ্গে একটু দেখা করে চলে যাব।'

'এত করে বলছি, তবুও মানছেন না আপনি, বড্ড নাছোড়বান্দা আপনি নিশীথবাবু, সত্যিই উনি বিরক্ত হবেন আপনি গেলে। দু-কলম লিখতেই গাদা-গাদা রেফারেন্স ডিকশনারি দেখতে হয় ওঁর। এখন লোকজন গেলে খেই হারিয়ে ফেলবেন।'

নিশীথ উপরে যাবার পথে পা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'আমি এক জন কলেজ টিচার, আর একজন কলেজ টিচারের সঙ্গে দেখা করতে পারব না?'

রিপেন মরীয়া হয়ে বললে, 'কিন্তু দেখা করবার জন্যে ঠিক সময় বেছে না এলে চলবে কেন? এখন উনি—'

'বেলগাছিয়ার থেকে পাকা দেখার সময় বেছে কেউ কখনো বালিগঞ্জে আসতে পারে? আমি বেশি কিছু করব না শুধু একটু বুড়ি ছুঁয়ে চলে যাব।'

'যাবেন না, যাবেন না। কী দরকার আপনার ঘোষ সাহেবের সঙ্গে বলে যান। আসুন স্লিপ লিখে দিন।'

নিশীথ রিপেনের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে হেসে বললে, 'আমি একজন কলেজের টিচার, আর-একজন কলেজের টিচারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তিনি বাড়িতেই আছেন, ঘুমের থেকে উঠেছেন, দাড়ি কামিয়ে চা খেয়ে চান সেরে পড়ছেন, কিংবা লিখছেন একটা খসড়া সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টের জন্যে। আমার কাজ পাঁচ মিনিটের কিংবা মিনিট পনের-কুড়ি, বড় জোর। আমিও ঐ সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টের খসড়া সম্পর্কেই এসেছি।'

রিপেন কেমন নিরেট কটমট মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। নিশীথের মুখে শেষ কথাটা শুনে খানিকটা ধোঁয়া কেটে গেল যেন তার মুখ থেকে। কিন্তু তবুও সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারছিল না সে।

'ঘোষ সাহেব তো দেশের এখনকার শিক্ষাব্যবস্থা বদলে সব দিক দিয়ে কী সব সুব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারা যায় সেই সম্পর্কে সুপারিশ পেশ করবেন। জিনিসটার পক্ষে আমি খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছি রিপেন। নতুন শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে ঘোষ সাহেবকে কিছু বলতে হবে আমার। কিছুই হবে না হয় তো; ঘোষ হয় তো বুঝবেন না, কিংবা কেন্দ্র গ্রাহ্য করতে চাইবে না।

কিন্তু তবুও বলে যাই কথাটা।' নিশীথ উপরে চলে গেল।
'কাকে খুঁজছেন আপনি ?' প্রফেসরের স্ত্রী মোহিতা জিজ্ঞেস করল নিশীথকে।
'আমার নাম নিশীথ সেন। প্রফেসর ঘোষ কি বাড়িতে আছেন ?'
'আছেন।'
'দেখা হতে পারে তাঁর সঙ্গে ?'
'কোত্থেকে এসেছেন আপনি ?'
'বেলগাছিয়া থেকে।'
'ও, বহু দূর থেকে। উনি একটু ব্যস্ত আছেন আজ।' মোহিতা নিশীথকে তার নৈতিক কর্তব্য বুঝে উঠবার জন্য বললে, বেশ লাগসই কমনীয়ভাবে।
'তা হলে'—নিশীথ নিজের কামানো দাড়ির গালে একটু হাত বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'তা হলে উঠতে হয় আমাকে মিস ঘোষ।'
মোহিতা নিশীথের ভেতর দিয়ে দেয়ালের ভেতর দিয়ে চোখ চালিয়ে একটু হেসে উঠে বললে, 'কী ভেবেছেন আমাকে আপনি। ও মা আমি কেন তা হব ?'
নিশীথ মনের ভুলে নয়, মনের কী এক আকস্মিক সমুচ্চারণে কী বলে ফেলেছিল সেটা যে মোহিতা কানে তুলবে তা সে মনে করে নি। সে ভেবেছিল মিস ঘোষ সে বলবে বটে, কিন্তু উনি তা শুনেও শুনবেন না। ঘোষ সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে না এই বলেই গা-ছাড়া নমস্কার জানিয়ে চলে যাবে। কিন্তু তা তো হল না। মোহিতা শুনে স্বীকার করলেন যে শুনেছেন। নিশীথ একটু তামাশা বোধ করে দাঁড়িয়ে, মোহিতার দিকে নয়—দেওয়ালের কয়েকটি দেশী-বিদেশী ছবি, ঘোষ পরিবারের দু-একটি ( খুব সম্ভব পরলোকগত ) পুরুষ মহিলার ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্ট, দেখছিল।
'বসুন আপনি।'
'না। চলি। বেলগাছিয়া যেতে হবে।'
'বসুন। ওঁর সঙ্গে দেখা হবে আপনার।'
'উনি খুব ব্যস্ত আছেন বললেন।'
'ব্যস্ত আছেন। কাজের চাপ বেশি। লিখছেন হয় তো।'
'কলেজের নোট ?'
'না।'

'বই লিখছেন বুঝি? ঘোষ সাহেব কোনো বই লিখলেন না এটা আমাদের অনেক দিনের আফশোষ। লিখুন, দু-একটা বই লিখুন উনি। ওঁর লেখার সময় এসে পড়লুম।'

নিশীথ সোফা থেকে উঠবার আগেই মোহিতা বলে ওঠেন, 'বসুন, ঠিক আছে। বেলগাছিয়ার থেকে বালিগঞ্জ এসেছেন প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করতে। তা না-দেখা করে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না। অন্য কোনো কাজ ছিল আপনার এ পাড়ায়?'

নিশীথ মাথা নেড়ে বললে, 'অন্য কাজ কী থাকবে আর এ পাড়ায়, এই একটা কাজই তো একশখানা।'

'তা হলে? উঠবেন না আপনি। ওঁকে বলছি আমি।'

'আচ্ছা—বসছি আমি—তবে—'

'ভিতরে দু জন লোক আছেন তাঁরা চলে গেলেই আপনার কথা জানাব।'

'কারা আছেন ভিতরে?' জিজ্ঞেস করেই নিশীথ নিজের অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নটা চাপা দিয়ে বললে, 'লিখুন, বই লিখুন প্রফেসর। ওঁর এক-আধখানা বই অনেক আগেই প্রত্যাশা করেছিলাম আমরা। তবে এই বয়সের লেখা আরো ভাল হবে। সমস্ত জীবনের বিদ্যে অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা তো।'

'বিদ্যে কি জ্ঞান?' মোহিতা জিজ্ঞেস করে।

'বিদ্বান মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের জন্ম হয়।'

'সব সময়েই হয়?'

'না তা হয় না। জ্ঞান বিদ্যের চেয়ে ঢের বড় জিনিস বলেই জানি। হৃদয়ে জ্ঞানের কোনো অবস্থান না থাকলে মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো কেমন যেন অচল হয়ে পড়ে থাকে অদ্ভুত মূল্যনাশের ভিতর।'

'শুধু বিদ্যে থাকলেই হয় না বলছেন তো?'

'কী হয় না?' নিশীথ একটু আগ্রহভরেই জিজ্ঞেস করে মোহিতাকে।

'জিনিসের ঠিক মূল্য বোঝা যায় না।'

'না, তা বুঝতে বিদ্যের কী দরকার?'

'বিদ্যের চেয়ে বেশি কিছুর তো দরকার।'

'সেইটেই বলেছি আমি, তাকে আমি জ্ঞান বলেছি,' বলে নিশীথ বললে, 'কেমন বিমূঢ়ের মত কথা বলছি আমি।'

'কেন ? ঠিকই তো বলছিলেন।'

'এমনভাবে কথা বলছিলুম যে জ্ঞান কাকে বলে সে জিনিসটা আমিই প্রথম আবিষ্কার করেছি যেন। যেন উপনিষদের ঋষিদের মত বাণী।'

নিবিষ্ট ভাবে শুনে নিয়ে বোধগম্য হল কথাগুলোর অর্থ, মানুষটির আত্ম-দর্শনের রকমটি তো বেশ নতুন—ভেবেছিল মোহিতা। বেশ সরল গহন আত্মবিশ্লেষণ।

নিশীথের দিকে তাকিয়ে মোহিতা বললে, 'উপনিষদের ঋষিদের বেশ আত্মস্থতা ছিল।'

'ছিল,' নিশীথ বললে, বলে মুখ তুলে মোহিতার দিকে তাকিয়ে দেখল সে নিশীথের দিকে তাকিয়ে আছে, 'আজকালকার দিনে সে রকম আত্মস্থতা ফিরে পাওয়া কঠিন।'

'কেন ? কিসের জন্যে এ রকম হল ?'

'দু-একজনের মধ্যে অবিশ্যি বেশ একটা মনের প্রশান্তি আছে আজকালও, কিছুতেই তাদের অন্তিম মনের সুছন্দ নষ্ট হয়ে যায় না, নিজের ও চারদিককার জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য অনেক পরিমাণে ধ্বংস হয়ে গেলেও,' মোহিতার মুখের উপর চোখ বুলিয়ে একবার-আধবার চোখে চোখ রেখে বললে নিশীথ, 'প্রফেসর ঘোষ এই রকম একজন মানুষ।'

'প্রফেসর ঘোষ এই রকম মানুষ ?' সচকিত হয়ে নিশীথের দিকে তাকাল মোহিতা।

'হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়।'

'অনেক দিনের চেনা পরিচয় আপনার সঙ্গে প্রফেসরের ?'

'না। মাঝে-মাঝে এসেছি আমি তাঁর কাছে দু-বছর চার-বছর অন্তর। তিনি হয় তো প্রথম নজরেই আমাকে চিনতে পারবেন না। প্রতিবারই জিজ্ঞেস করেন কে আপনি ?'

তারপর হেসে বললে, 'মানুষের মুখ মনে রাখার কথা তাঁর নয়। তাঁর কাজ হচ্ছে অতীতে কী বিদ্যা ছিল, আজকাল, ভবিষ্যতকে সে সম্বন্ধে সজাগ করে রাখা। আমাদের মুখ মনে রেখে ও-রকম কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না। কিন্তু তবুও লোকজনের মুখ বারবার দেখলে ভোলা কঠিন, কিন্তু প্রফেসরের পক্ষে মনে রাখা কঠিন।- মনের কোনো দোষ নেই। এটা গুণ। প্রফেসর

ঘোষের মতন হয় না।'

মোহিতা শুনছিল, একটু হেসে বললে, 'তাই তো। নতুন কিছুর ভিতরে এসেই প্রফেসরের গোলমাল হয়ে যায়। তিনি অতীতের পক্ষে চলতেই অভ্যস্ত। কোনো কিছুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে দেখবার প্রশ্ন উঠলে তিনি বলেন যে তা অন্তত ত্রিশ বছর আগের অতীতের জিনিস হওয়া চাই, ত্রিশ বছর আগেকার সামাজিক সংস্থান বা রাজনীতি বা ধর্মের আন্দোলন।' মোহিতা প্রফেসরের ঘরের আটকানো দরজাটার দিকে একবার আড় চোখে তাকিয়ে বললে, 'আর সাহিত্যের ব্যাপার হলে তা অন্তত পঞ্চাশ ষাট বছর আগের কবিতা প্রবন্ধ সাহিত্য হওয়া চাই। একশ বছর আগের হলেই যেন ভাল হয়। রবীন্দ্রনাথকে তিনি আজকাল একটু-আধটু দেখছেন।'

'আজকাল—খুব হালে?'

'হাঁ, মানে উনিশশ সাতচল্লিশের সেপ্টেম্বর থেকে।'

'এর আগে ওঁর সাহিত্য তিনি পড়েন নি?'

'মন দিয়ে পড়েন নি, বলতেন জিনিসটা পাকুক—পাকতে থাকুক, পেকে নিক, পঞ্চাশ-ষাট বছর লাগে এক বোতল মদেরও তো ধাতস্থ হতে। রবীন্দ্রনাথ আজ যা লিখলেন আজই কি তাই পড়তে হবে!'

'ঠিকই বলেছেন, সাহিত্যের অধ্যাপক তো উনি।'

'ইংরেজি সাহিত্যের।'

'ঠিকই বলেছেন প্রফেসর। আমাদের মৃত্যুর পঞ্চাশ-ষাট বছর পর যারা পড়তে আসবে আমরা ধারণাও করতে পারি না এমনই একটা আশ্চর্য আস্বাদ পাবে তারা কবির সাহিত্যের থেকে। কেমন একটা অন্ধকার কোণে যেন পড়ে আছে মদের বোতলগুলো, মাকড়ের জালে ঢাকা পড়ে, একটা মস্ত ভাঁড়ারের দেশে নিরবচ্ছিন্ন ফুসলানি, খুনোখুনি, চশমখুরির ভিতর। বোতল টেনে-টেনে খাচ্ছে বটে, যারই মর্জি হচ্ছে। কিন্তু সৎ-অসৎ সনাতনী নিপাতনী উল্লুক জিরিয়ে নেবে খানিক—পঞ্চাশ-ষাট বছর পরে, মদের বোতলগুলো পেকে উঠবে—ভাঁড়ারের ঠাণ্ডা কোণে; যারা খাবে তখন—আঃ!'

নিশীথও ঠিক এই কারণেই রবীন্দ্রসাহিত্য পড়ছে না আজকাল। মাঝে-মাঝে চেষ্টা করে দেখেছে। কয়েকটা কবিতা ছাড়া আর-কিছু ভাল লাগে না। তবে পঞ্চাশ-ষাট বছর পর ভাল লাগবে। কিন্তু সে তখন বেঁচে থাকবে না।

প্রফেসর থাকবেন না। মোহিতাও নয়।

পঞ্চাশ-ষাট বছর পরে—প্রফেসর তো চলে গেছেন তখন। —কেমন একটা ভারী নিঃশ্বাস পড়ল মোহিতার।

'আপনি নাগাল পাবেন নিশীথবাবু পঞ্চাশ বছর পরে?'

'আমার বয়স তো পঞ্চাশ বছরই প্রায়, উনপঞ্চাশ তো ওঁর?'

'উনপঞ্চাশ পেরিয়ে ছ মাস হল।'

'সাড়ে উনপঞ্চাশ, আমার আটচল্লিশ।' হারীত বলে, তার বাবার বয়স উনপঞ্চাশ; নিশীথের হিসেবে আটচল্লিশ, সাতচল্লিশও হতে পারে, খুব সম্ভব আটচল্লিশই।

মোহিতা নিশীথকে দেখেছে এর আগে। এই ভদ্রলোকটির নাম যে নিশীথ, নিশীথ সেন, তাও জানা আছে তার। এ বাড়িতেই দেখেছে প্রফেসর ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল নিশীথ শেষবার যখন—উনিশশ ছেচল্লিশে, মে মাসে। মনে আছে মোহিতার। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ঘোষ সাহেবের ঘরে বসে ঘোষের সঙ্গে কথা বলেছিল সেবারে নিশীথ, সকাল বেলা তখন, আর কেউ ছিল না তখন ঘোষ সাহেবের ঘরে। মোহিতা ছিল, নিশীথ ছিল, ঘোষ ছিলেন। কলেজে গরমের ছুটি তখন। প্রফেসরের লাগেজ বাঁধাছাঁদা চলছে। দু-তিনদিনের মধ্যেই মুসৌরি যাবেন সপরিবারে। মোহিতা মাঝে-মাঝে ঘোষের ঘরে ঢুকছে, মাঝে-মাঝে বেরিয়ে পড়ছে; আবার এসে মিনিট পনের-কুড়ি বসে যাচ্ছে, মোহিতা প্রফেসরের ঘরে ঢুকে সোফায় বসলেই ঘোষের নজরটা মোহিতার দিকে হেলে পড়ছে। নিশীথ যেন নেই। এটা স্ত্রী-ঘেঁষা ভাব, বড়লোক-ঘেঁষা ভাবও বটে। মোহিতা ডিরেক্টর জেনারেলের মেয়ে আর নিশীথ মফস্বল কলেজের লেকচারার। এ সব বিষয়ে বেশ ওয়াকিবহাল ঘোষ। কিন্তু জিনিসটা ভাল না। মোটেই ভাল না। একজন কৃতী মানুষ টাকাকড়ির দিক থেকে অকৃতী বলে তাকে উপেক্ষা করা ঘোষের মত অধ্যাপকের উচিত কি? কিন্তু তিনি তো তা করেন। নিশীথের মুমুক্ষু চোখ ঘোষ সাহেবের দিকেই শিকেয় তোলা, তবু, অতি কচিৎ কোনো কথার উত্তর দিতে মোহিতার দিকে ঘাড় ফেরাচ্ছে নিশীথ, চোখ ফেরাচ্ছে না; কেমন একটা সম্ভ্রমের বোধে মোহিতার চেয়ে নিজেকেই হয় তো বেশি সম্ভ্রান্ত করে তুলবার চেষ্টা করে। সেটা যে রীতির ভুল, মনেরও অসঙ্গতির পরিচয়

বুঝেছিল কি তা নিশীথ ? নাকি বুঝেও যা করেছে ইচ্ছে করেই করেছে। ঘোষ সাহেব যে প্রতিবারই নিশীথের পরিচয় জানতে চান, এমন ভাব দেখান যে তিনি নিশীথের মুখ চেনেন না, সেটা নিশীথের পক্ষে বাস্তবিকই একটা অত্যাচার। এটাকে কী নাম দেবে মোহিতা ? এর কি কোনো সুনাম আছে ? ভাঁড়ামো ছাড়া একে কী আর বলবে সে। ভণ্ডামিটাকে আড়াল করে প্রফেসরের আশ্চর্য অধ্যাপকীয় সুসম্বিৎ।

ঘোষের আত্মস্থতার কথা বলছিল নিশীথ। সে কী রকম আত্মস্থ। সত্যিই কতদূর মহৎ বোঝে হয় তো নিশীথ, জানে সব, কিন্তু না-জানার ভানটাকে ঢেকে কেমন একটা মানানসই দীনতার আলো ছড়িয়ে। এ বিষয়ে প্রফেসর ঘোষের ঠিক উল্টো নিশীথ ; না কি নিজের অধীনস্থদের কাছে সে নিজেও একটি ঘোষ। না, তা হয় তো না। নিশীথকে দেখে তা মনে হচ্ছিল না মোহিতার।

'আপনাকে তো এর আগে এ বাড়িতে দেখেছি আমি।'

'মাঝে-মাঝে ঘোষ সাহেবের কাছে আসি আমি। আমাকে দেখেছেন আপনি, মনে আছে আপনার ?'

'বেশি তো আসেন না।'

'আমি তো কলকাতায় থাকি না।'

'গেল বছর আসেন নি। ঘণ্টা দেড়েক ছিলেন প্রফেসরের ঘরে তার আগের বছর। আমরা তখন মুসৌরি যাচ্ছি, বাঁধাছাঁদার পাঠ চলছে। ঘোষ অবিশ্যি শালগ্রামের মত বসে আছেন তাঁর ঘরে। মোটরের পা-দানিতে একবার পা রাখবেন, রিজার্ভ গাড়ির ফুটবোর্ডে আর-একবার—'

'খুব বড় জ্ঞানস্থবির মানুষ—সকলে ধন্য বোধ করেন'—নিশীথ একটু নুনের ছিটে মেখে সদন্তঃকরণে হেসে বললে, 'প্রফেসরের এ বাড়িতে ঢুকলেই যেন সেই আগেকার প্রাচীন সভ্যতা খুঁজে পেয়েছি মনে হয়। কেমন একটা স্তব্ধতা প্রশান্তি এখানে ; চারিদিককার বর্বরতার থেকে নিজেকে সংরক্ষণ করে রেখেছে।'

'সেটা বেশি মিশলে বুঝতে পারবেন। বছরে, চার-বছরে একবার উঁকি দিয়ে কী করে—' কিন্তু কথাটা শেষ করল না মোহিতা, হাসির ফোঁড় ঠোঁটের কোণায় আটকে রইল।

'উনিশশ চুয়াল্লিশেও আপনি এসেছিলেন প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করতে'—

'চুয়াল্লিশে'? নিশীথ, মোহিতার সূচিমুখ হাসি মিলিয়ে যাচ্ছিল-তাকিয়ে দেখতে-দেখতে বললে, 'হ্যাঁ চুয়াল্লিশেও এসেছিলাম আমি।'

'মে মাসে?'

'হ্যাঁ মে মাসে। কী করে তারিখটা মনে রইল আপনার?'

'প্রফেসরেরও মনে আছে বটে, কিন্তু তিনি তা স্বীকার করতে চান না।'

'মনে আছে? তা থাকতে পারে। গত চার বছরে আমি দুবার এসেছি এ বাড়িতে, দুবারেই দেখা হয়েছে প্রফেসরের সঙ্গে। আপনি তো দুবারই ছিলেন প্রফেসরের নিজের ঘরে বসে। সকালবেলাই উনি পড়ছিলেন, লিখছিলেন, কলেজের গরমের ছুটি তখন।'

'হ্যাঁ আমরা তখন নীচের তলায় থাকতুম।'

'উপরে এলেন কবে?'

'গত বছরে।'

নিশীথ বললে, 'এবারেও নীচে খুঁজেছিলাম'—

'নীচে আজকাল জিনিসপত্রের গুদাম; ওঁর লাইব্রেরির বেশির ভাগই নীচে এখন।'

'খুব বড় লাইব্রেরি দেখলুম।'

'খুব সম্ভব বেনারস ইউনিভার্সিটিকে দিয়ে দেবেন।'

'সব বইগুলো? আমাদের বাংলাদেশে থাকবে না?'

'সেটা বলেছিলুম ওঁকে, উনি নারাজ। অনেক বলতে শেষে বললেন, মালবীয়াকে কথা দিয়ে এসেছি, কোনো লেখাপড়া নেই, মুখের কথা। পণ্ডিত মালবীয়া আর ঘোষ সাহেব ছাড়া জানেও না কেউ। মালবীয়াজি তো মরে গেছেন। কিন্তু উনি কথার খেলাপ করতে পারবেন না।'

'কিন্তু উনি তো কলকাতা ইউনিভার্সিটির লোক।'

'কিন্তু বেনারসকে দেবেন।'

'কিন্তু উনি তো বাঙালি?'

'কিন্তু হিন্দুস্থানী প্রদেশগুলোর দিকেই দেখেছি ওঁর ঝোঁকটা বেশি।'

'কিন্তু ওঁরা কি পড়বে বই? পড়ে বই?'

'আজকাল পড়ছে শুনছি।'

'কোথায় পড়ছে আর?' একটু বিক্ষুব্ধ হয়ে নিশীথ বললে।

'ঘোষ সাহেব নিজের মনকে পড়াচ্ছেন।'

'আপনি একটা কাজ করুন,' নিশীথ বললে, মোহিতার দিকে তাকিয়ে, 'কলকাতা ইউনিভার্সিটিকে যদি উনি না দিতে চান ওঁর বইগুলো, ওঁর বাবার বা আপনার নামে এই লাইব্রেরিটা রেখে দিন না কেন, আপনাদের বাড়ির নীচের তলায়। এমন কোনো-কোনো বই আছে ওঁর লাইব্রেরিতে যা আমাদের দেশে নেই, ভারতবর্ষে নেই, কোথাও নেই। তা ছাড়া এমনিই লাইব্রেরিটা সারালো, অন্তঃসারালো জিনিসে ভরপুর। বাঙালি কি উপকার পাবে না?'

'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি তো এখন কলকাতাতেই আছে নিশীথবাবু। পড়ে নিক বাঙালি,' মোহিতা বললে, 'আপনি যান ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে?'

'আমি কলকাতায় থাকি না।'

'যখন আসেন, গরমের ছুটি কাটাতে।'

'ও', নিশীথ বললে, 'ঘোষ সাহেবের সঙ্গে আপনার ভারি মজার সাঁট রয়েছে দেখছি তো।'

'কেন?' বড় হাসিটা আরো ছড়িয়ে পড়তে গিয়ে খানিকটা বাধা পেল মোহিতার মুখে।

'বাঙালির জন্যে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির দোহাই পেড়ে সরিয়ে ফেলতে চাচ্ছেন ঘোষ লাইব্রেরি বাংলার বাইরে—আপনার স্বামীর সঙ্গে জোট পাকিয়ে?'

'তা হবে। আমাদের মনস্তাপ আছে।'

'কিসের?'

'ঘোষ সাহেবকে জিজ্ঞেস করুন।'

'কেন, কলকাতা ইউনিভার্সিটি কোথাও কিছু কার্পণ্য করেছে কি, খুব ধনী ইউনিভার্সিটি তো নয়। কী দেবে আর এর চেয়ে বেশি, দেবার সামর্থ নেই।'

'টাকাকড়ির কথা বলছি না আমি।'

'ওঃ!' নিশীথ চুপ করে রইল। টাকাকড়ির কথা নয়, মান-সম্মানের কথা তা হলে, পদমর্যাদার ব্যাপার। ভাল আমির-ওমরাহের পদ জুটছে না হয় তো সাহেবের।

ঘোষকে ভাইস চ্যান্সেলার করে দিলে হত? ভাবছিল নিশীথ।

'আপনাকে যা জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে কথার কোনো উত্তর দিলেন না তো?'

'কে, আমি? কী জিজ্ঞেস করেছিলেন?'

'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির কথা।'

'ওঃ, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি—'

কলকাতায় থাকতে পড়ত মাঝে-মাঝে সে। কিন্তু অনেক দিন তো কলকাতা ছাড়া। বই-টই পড়ার চাড়ও কমে যাচ্ছে। নিশীথ মাথা নেড়ে বললে, —'না, ওখানে আমি অনেক দিন যাওয়া-আসা বন্ধ করে দিয়েছি। আমি বই পড়ি না, পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আমাকে দিয়ে বাংলার পাঠক-সমাজকে বিচার করলে তো চলবে না। তারা পড়ে। আপনাদের লাইব্রেরিটা এ দেশের লোকের কাছে কলকাতা শহরে থেকে গেলে ভাল হত।'

মোহিতা একটু ভেবে চুপ করে থেকে তার পরে নিশীথকে, পিছনের দেয়ালকে, স্বচ্ছ কাচের মত যেন মনে করে, অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে থেকে নিশীথের চোখের ভিতর নিজের চোখ ফিরিয়ে আনল যেন, হঠাৎ কোনো এক সময় বললে, 'কেন তা সম্ভব হচ্ছে না বুঝতে পেরেছেন হয় তো?'

নিশীথ চিন্তিত মুখে বললে, 'হ্যাঁ পেরেছি, ঘোষ সাহেব যা চাচ্ছেন তা পাচ্ছেন না। কেন তিনি অন্যদের দিয়ে যাবেন যা তারা চাচ্ছে।'

'এই-ই তো কথা। ওঁর মনের কথা এই। এই মনের ভিতরই ঘোষ সাহেবের আত্মস্থতা।'

নিশীথ এক-আধ মিনিট চুপ করে থেকে বললে, 'টাকাকড়ি তো চাচ্ছেন না ঘোষ; সেটা আমি বুঝেছি—'

'বলেছিলুম টাকাকড়ি ততটা চান না,' মোহিতা কী বলবে না-বলবে একটু ইতস্তত করে অবশেষে বলে ফেলল, 'চান। কিন্তু মান বেশি চান।'

'সম্মান তো প্রচুর পাচ্ছেন ঘোষ।'

'পাচ্ছেন,' মোহিতা একটু থেমে বললে, 'সে রকম পাচ্ছেন না, ইউনিভার্সিটি সার্কেলেও—তেমন পাচ্ছেন কই আর।'

'নিজের কাজ নিয়ে নিমগ্ন হয়ে থাকবেন নাকি অধ্যাপক সাংসারিক অভাব অনটন মিটে গেলে?'

'আমি তো তাই ভাবতুম।'

'আমরাও তো তাই ভাবতাম, অধ্যাপক ঘোষ সম্পর্কে।'

'তিনি তো আত্মসমাহিত নন।'

'আজকালকার পৃথিবীতে সে রকম আত্মসমাধি ফিরে পাওয়া কঠিন।'

নিশীথ মোহিতার দিকে তাকিয়েছিল। এমন ভাবে যে মোহিতা হয় তো ভাবতে পারত, কেমন যেন অস্বাভাবিকভাবে তাকিয়ে আছে নিশীথ।
'পুরনো পৃথিবীর সেই অধিকার ফিরে পাওয়া কঠিন এখন।'
'সেই চীন সভ্যতার দিন নেই এখন, আর সব রকম বিশৃঙ্খলার থেকে মানুষের মনটাকে সংবরণ করতে জানা, সৌম্য চৈতন্যে সব সময়েই স্থির হয়ে থাকতে পারা ; চীনের মতন আমাদেরও যা ছিল, নেই এখন আর।'
নিশীথ একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'নেই। কলকাতা ইউনিভার্সিটির কাছ থেকে কোনো ডেপুটেশন এসেছিল ঘোষের কাছে ?'
'না তো। কেন ? আসবার কথা ছিল ?'
'তা তো জানি না আমি। জিজ্ঞেস করছিলাম।'
'কেন আসবে ? কী জিনিস সম্পর্কে ?'
'আপনাদের এই লাইব্রেরির ব্যাপারটা নিয়ে।'
মোহিতা তার মুখোমুখি দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'না আসে নি। এলেও কিছু হত না। ওরা তা জানে।'
'ভাইস চ্যান্সেলার হতে চেয়েছিলেন কি ঘোষ ?'
'কী চেয়েছিলেন তা জানা নেই ঠিক, মানুষ তো চ্যান্সেলার হতেও চায়'—
'সে জিনিস অবিশ্যি ইউনিভার্সিটি কাউকে দিতে পারে না।'
'বড় জোর কনভোকেশনের গাউন দিতে পারে চ্যান্সেলারকে। তাঁর লেখা বক্তৃতা পড়িয়ে শোনাবার জন্য মাইকের সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে,' মোহিতা হাসতে-হাসতে বললে, হাসি নিবে এলে বললে, 'একটা কিছু হতে চাচ্ছিলেন ঘোষ, কিন্তু এখন কিছু চাচ্ছেন না আর।'
নিশীথ বললে, 'কেমন যেন হ্যাঁচকা মনে হয় আমার—এই ব্যাপারটার সঙ্গে ঘোষ সাহেব লাইব্রেরির ব্যাপারটা কেন জড়িয়ে ফেললেন—'
'তা তো করলেন। ঠিকই করেছেন হয় তো,' মোহিতা সত্যিই যেন নিজের মতের ভিত্তি থেকে একটু না নড়েচড়েই বললে।
'এর একটা বিহিত করুন।'
'আমার শক্তি নেই।'
দু কাপ চা নিয়ে এল রিপেন। দুখানা-দুখানা বিস্কুট। নিশীথের মুখের দিকে তাকালই না সে। প্রফেসর সাহেবের স্ত্রীর সঙ্গে এত ক্ষণ ধরে কথা বলছে

লোকটা, যাকে সে নীচের তলায় রুখে রেখেছিল অনেক ক্ষণ। কিন্তু রিপেনের মুখে বেকুবির কোনো লক্ষণই দেখতে পেল না নিশীথ। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ছেলেটি। দুটো ছোট তেপয় দুজনের সামনে রেখে বেরিয়ে গেল আবার।

'কে এই ছেলেটি?'

'ও নৃপেন।'

'নৃপেন? আমাকে তো বলেছিল ওর নাম রিপেন।'

'নিজের নাম সংক্ষেপ করে নিয়েছে। এম-এ পাশ করেছে নৃপেন।'

নিশীথ একটু চকিত হয়ে বললে, 'তাই নাকি? কী বিষয়ে?'

'ইকনমিকসে, ছেচল্লিশে, সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছে, সেই জন্যেই মুশকিল।'

'কিসের মুশকিল?'

'কোনো কলেজে ঢুকে পড়তে চাচ্ছে।'

'ঢুকিয়ে দিতে পারেন তো প্রফেসর?'

'ঢুকিয়ে তো দিয়েছিল। পর-পর তিনটে কলেজে। দুটো গভর্নমেণ্ট কলেজে, একটা প্রাইভেটে।'

'তারপর।'

'কোথাও পাকাপাকি হল না কিছু।'

'কেন?'

'কী জানি। পড়াতে সুবিধা পায় না হয় তো। এখন মোটর ড্রাইভিং শিখছে।'

'সেটা শিখতে পারলে ছোটখাট প্রফেসরের থেকে ভাল হবে,' নিশীথ চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, 'প্রফেসর গভর্নমেণ্ট কলেজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন রিপেনকে! বেশ তো সুযোগ তা হলে পেয়েছিল ছেলেটি। প্রফেসরের মত একজন মুরুব্বি ছিলেন। বাঃ।'

দুটো বিস্কুটই খেয়ে ফেলেছে নিশীথ।

'দেখা হবে আজ প্রফেসরের সঙ্গে?'

'হবে।'

'কটা বাজল আপনার ঘড়িতে?'

মোহিতা কব্জি ঘুরিয়ে বলল, 'সাড়ে এগারটা।'

'কটার সময় উঠবেন প্রফেসর?'

'তিনটে নাগাদ। আজ ছুটির দিন তো।'

নিশীথ চায়ের পেয়ালাটা দু-তিনটে চুমুক দিয়ে শূন্য পেয়ালাটা তেপয়ের উপর রেখে দিল।

'আমি গত আট-দশ বছরের ভিতর কয়েকবার বলেছিলাম প্রফেসরকে,' নিশীথ বললে, 'কলকাতার কোনো কলেজে আমার একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে।'

'কী বললেন উনি?'

'প্রত্যেকবার বললেন, আমি দেখছি। জলপাইহাটিতে ফিরে গিয়ে প্রফেসরকে মনে করিয়ে দিয়ে চিঠি লিখেছি, দরখাস্তর কপি পাঠিয়েছি কিন্তু কিছুই তো হল না।'

'কেন?'

নিশীথ হাসতে-হাসতে বললে, 'আমার মুখই তো চেনা হল না। অথচ আমরা একসঙ্গে পড়েছি।'

'একসঙ্গে। কোথায়?' মোহিতা একটু চমকে নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললে।

'একসঙ্গে পড়েছি বলেই তো কলকাতায় এলেই ঘোষের এখানে একবার আসি। খুব মিশুক নই বটে আমি। বেছে-বেছে মানুষ দেখে মেলামেশা করি যে তা ঠিক নয়। আমার সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই খুব বড়-বড় কাজ করে, তাদের কারো কাছেই যাই না আমি। ঘোষ কলেজ-ইউনিভার্সিটির কাছেই আছেন বলে তাঁর কাছে আমি আসি। ভারী উৎসাহ ছিল ঘোষ সম্পর্কে এক সময় আমার। খুব কম লোককেই এমন শ্রদ্ধা করেছি'—

'একসঙ্গে পড়েছেন অথচ ওঁকে সেটা মনে করিয়ে না দিলে মনে থাকে না? তাই?'

প্রফেসরের ঘরের আবদ্ধ দরজাটার দিকে মোহিতা তাকিয়েছিল, মোহিতার দিকে তাকিয়েছিল নিশীথ। বললে নিশীথ, 'ওর সঙ্গেই স্কটিশে পড়েছিলুম—ফোর্থ ইয়ারে। এক বছর। আগের তিন বছর ঘোষ হয় তো প্রেসিডেন্সিতে পড়েছিলেন। স্কটিশ থেকে বি-এ পাস করে আবার প্রেসিডেন্সিতে চলে যান। এক বছর পড়েছিলুম এক সঙ্গে। সেই জন্যেই হয় তো কেমন বাধো-

বাধো ঠেকছে ঘোষের। তবে স্কটিশে থাকতে বেশ মেলামেশা হয়েছিল আমাদের সঙ্গে। বিনয়েন্দ্র মুখুজ্যে, শুভ্রাংশু, বরুন দত্ত, সীতেশ ভটচাজ, সোমেন মহলানবিশ, আমি—খুব মিশেছিলেন তো ঘোষ আমাদের সঙ্গে।'

'এই তো তিনবারের বার দেখা আমার সঙ্গে'—মোহিতা বললে।

'কার ?'

'আপনার।'

সোজাসুজি মোহিতার দিকে না তাকিয়ে, তার মিহি ঘোমটার আড়ালে খোঁপার দিকে তাকাল। তার ভুরুর দিকে, টিকলো নাকের দিকে। সমুদ্রফেনার মত শাড়িটাকে প্রকৃতির সাদা জিনিসের মত দেখাচ্ছিল, মানুষটির অন্য রকম রঙের প্রেতপরায়ণতার পাশে, প্রকৃতিতে এ রঙ নেই।

'হ্যাঁ গতবার ঘোষের ঘরে বসেছিলুম আমরা। অনেক কথা বলেছিলেন আপনি। ঘোষের স্ত্রী যে তা আমি বুঝতে পারি নি, অবাক হয়ে ভাবছিলুম ভারী চমৎকার; জমিয়ে রেখেছে সব—স্নিগ্ধ করে দিচ্ছে; কেমন সুন্দর বাড়ন্ত গড়ন। বিশেষ কোনো কথা বলছিলেন না ঘোষ। চিনতে পারছিলেন না যেন আমাকে। আমতা-আমতা করছিলেন। বুঝেছিলেন সব আপনি, নিজের কলেজি সতীর্থের মুখোমুখি বসে যে-অস্বস্তি বোধ করছিলাম সেটাকে সহজ করে রাখবার জন্য সজলতার ঘের পরিয়ে দিলেন তো সে দিন আপনি। কথা বলে, হেসে, গল্প করে।'

'এর আগেরবার উনিশশ চুয়াল্লিশে, মে মাসে,' নিশীথ বললে, 'ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম, ওঁর ঘরেই বসেছিলুম আমরা তিনজনে। সে দিন বেশি কথা বলেন নি আপনি। খুব চওড়া একটা বই-এর পাশে-পাশে মার্জিনে নোট টুকছিলেন। মাঝে-মাঝে প্রফেসরের কাছে জিজ্ঞেস করে নিচ্ছিলেন। ভেবেছিলুম প্রফেসরের মেয়ে, কলেজে পড়েন। সকাল বেলা বেশ ঝড়বিদ্যুৎ, অনেক ঠাণ্ডাকালের মেঘ ছিল, সে দিন। বৃষ্টি বেশি হয় নি।'

মোহিতা বললে, 'একটা কথা আমি ভাবছি নিশীথবাবু।'

নিশীথের মনে হচ্ছিল, বড় বেশি কথা বলে ফেলেছে সে। কী দরকার ছিল এত কথা বলবার ? ঘোষের সহপাঠী যে নিশীথ সে কথা ঘোষ জানলেও তাকে তো এতদিনের ভিতরও একবার জানাতে যায় নি নিশীথ। যে-মানুষ মগডালে উঠে গেছে তার লেজটা নিয়ে সামলাতে পারছে না বলেই কি তার লেজে হাত

দিতে হবে ; লেজে মোচড় দিয়ে তাকে টেনে আনতে হবে নীচের দিকে। ঘোষকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না নিশীথের। কেন বারবার কবে স্কটিশে একসঙ্গে পড়েছিল সেই অছিলায় তাঁর বাড়িতে ঢুকে তাঁর স্ত্রীকেও চমকিত করে দিতে আসে নিশীথ ? এটা মানুষটাকে বেকায়দায় ফেলে দেওয়া। যারা পায়ে হেঁটে বড় লোকের বাড়িতে গিয়ে ঢু মারে তাদের মত কেমন একটা বেকুব বেআব্রু অন্যায়ের ভিতর ধরা পড়ে গেছে যেন নিশীথ।

'একটা কথা আমি ভাবছি নিশীথবাবু।'

পকেট থেকে ক্যাকটিনা পিলের কৌটো বের করেছিল নিশীথ। মোহিতা এমন ভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে যে ঢাকনি খুলতে ইতস্তত করছিল, পিল এখন খাবে না সে। কৌটোটা তেপয়ের উপর রেখে দিয়ে মোহিতার দিকে তাকাল নিশীথ।

'আপনি কলকাতার কলেজে কাজ চান ?'

'চাচ্ছিলাম তো।'

'গভর্নমেন্ট কলেজে ?'

'গভর্নমেন্ট কলেজে পাওয়া যাবে না এখন।'

'কেন ?'

'বয়স বেশি হয়ে গেছে।'

'কত বয়স ? সাতচল্লিশ ? তাতে ঠেকবে না।'

'না, গভর্নমেন্ট কলেজে কাজ নেব না এখন আর।'

'কেন ? এখন তো দেশ স্বাধীন। বিদেশী সরকারের গোলামি একে তো বলতে পারেন না আর।'

'বাকি যে-কটা দিন বাঁচি একটু নিজের মনে থাকতে চাই। গভর্নমেন্টের চাকরিতে এখনো মানুষের হাত-পা ঢের বাঁধা। কলকাতার কোনো প্রাইভেট কলেজ হলেও চলবে। কিন্তু সেটাও দুর্ঘট।'

'যদি বলেন গভর্নমেন্ট কলেজে কাজ নেবেন, তা হলে প্রফেসরকে বলে দেখতে পারি।'

'প্রফেসর প্রাইভেট কলেজে পারে না কিছু ?'

মোহিতা আঙুল মটকাতে-মটকাতে বললে, 'চেনেন তো অনেককে। নৃপেনের জন্যে বলেছিলেন। কিন্তু কেন, গভর্নমেন্ট কলেজে ভাল চাকরি পেলে আপনি

নেবেন না ?'

'ভাল চাকরি কী রকম মিসেস ঘোষ ?'

'সুপিরিয়র গ্রেডে।'

'পাওয়া যাবে কি ?'

'প্রফেসর চেষ্টা করলে না-পারার কিছু নেই তো। গভর্নমেণ্ট কলেজে চাকরিতে পেনশন আছে, চাকরির নিশ্চয়তা রয়েছে। একবার ঢুকতে পারলে সাংসারিক দিক থেকে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারে মানুষ।'

নিশীথ তেপয়ের উপর থেকে ক্যাকটিনা পিলের কৌটাটা তুলে নিয়ে বললে, 'তা তো ঠিকই,' ঢাকনি খুলে একটা পিল খেয়ে নিয়ে নিশীথ বললে, 'কিন্তু আমি তো সেকেণ্ড ক্লাস মিসেস ঘোষ।'

'কিন্তু আপনি তো প্রফেসরের ক্লাসফেলো—অনেক অভিজ্ঞতা আপনার। সেকেণ্ড ক্লাশেও ঠেকবে না।'

'গভর্নমেণ্ট কলেজে চাকরি পাওয়া দুষ্কর।'

'প্রফেসরকে আমি বলবই আপনাকে একটা জুটিয়ে দিতে।'

'প্রফেসরের নিজের কলেজ তো নয়।' নিশীথ হেসে বললে।

'মিনিস্ট্রিতে বিশেষ খাতিরের লোক আছে।'

'প্রফেসরের ?'

'প্রফেসরের। অ্যাসেম্বলিতে আছে। উপরে, সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টে আছে।'

ক্যাকটিনা পিলের কৌটোটা তেপয়ের উপর রেখে দিয়েছিল নিশীথ। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বললে, 'কিন্তু এটা কি ভাল হবে, মুরুব্বি জুটিয়ে দরবার করে খাতিরের ব্যাপারে পিছু দুয়ার দিয়ে কলেজের সুপিরিয়র গ্রেডে ঢোকা ? আর, কী ভাববে তারা, যাদের সঙ্গে কাজ করব আমি ? কী মনে করবে প্রিন্সিপ্যাল—কী বলাবলি করবে ছেলেরা ?'

মোহিতার চোখে কাচের আবরণের মতই যেন প্রতীয়মান হল ঘরের দেওয়াল-গুলোই শুধু নয়, নিশীথ যে বাধা-বিপত্তিগুলোর কথা তুলেছে সেই সবও। সব ভেদ করে মর্মদৃষ্টি তার অনেকদূর চলে গেছে।

'জলপাইহাটির মনের জড়িবড়ি এ সব ভুলে যাবেন নিশীথবাবু।'

'এটা কি জলপাইহাটির মনোভাব ?'

'পঁচিশ বছর দেশগাঁয়ের শান্তিতে কাজ করে এসেছেন, আপনি বুঝতে পারছেন

না কলকাতা দিল্লির রকমটা। কলকাতায় যদি কাজ করতে চান তা হলে সোজা নাকবরাবর মুখিয়ে চলতে হবে। যা পাওয়া দরকার—টাকাকড়ির কথা বলছি—সেটা পেতেই হবে। দরকার হলেও দশজনের হাত থেকে ছিনিয়ে। নিজেকে রক্ষা করে পরিবারকে রক্ষা করতে হবে। অন্য পাঁচজনের কথা তো পড়েই রইল। নিজের স্ত্রী-সন্তানের চেয়ে নিজেকে বাঁচাতে হবে আগে। এ না হলে কোথায় তলিয়ে যাবেন আপনি নিশীথবাবু।'

নিশীথ বিস্মিত হয়ে মোহিতার দিকে তাকিয়ে বললে, 'এ কি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অর্জুনের জড় মারবার—'

দরজা খুলে এ ঘরে ঢুকে দাঁড়ালেন প্রফেসর। মোহিতার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি এখানে বসে আছ মোহিতা, আমি ভাবছিলুম কোথায় গেলে, বড্ড ব্যস্ত আছি।'

'লিখছ?'

'না, লেখায় এখনো হাত দিতে পারি নি।'

'এখনো রেফারেন্স ঘাঁটছ বুঝি?'

'হ্যাঁ, সারাদিনই আজ এই সব চলবে আর-কি।'

'চা?'

'হ্যাঁ, চা। তাই ভাবছিলুম, মোহিতা কী করছে? মোটে তো দু কাপ চা খেয়েছি, আরো দু-চার কাপ দাও, ছুটির দিন, তিনটের আগে দরবার ভাঙবে না।'

'কারা আছেন ভিতরে?'

'আছেন, খুব শাঁসাল লোক আছেন। কৈকেয়ী আছেন, কিন্তু নন্দীগ্রামের ভরতও আছেন বাবা, শায়েস্তা করতে তাকে। রামচন্দ্রের চটিজোড়াও আছেন।'

প্রফেসর একবার আড় চোখে নিশীথের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'কী যে এক রামধুন গান বার করেছে', স্ত্রীর দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে কী যেন বলতে গিয়ে থেমে একটু পিছিয়ে গেলেন প্রফেসর ঘোষ।

'এই যে নিশীথবাবু এসেছিলেন তোমার কাছে,' মোহিতা বললে।

'কে, নিশীথবাবু', নিশীথের দিকে মুখোমুখি না তাকিয়ে ঘোষ সাহেব বললেন।

'ওঁকে চেনো না তুমি, নিশীথ সেন এর নাম, মাঝে-মাঝে আসেন তোমার

কাছে। ইনি জলপাইহাটি কলেজের প্রফেসর।'

'ও'—

'বসো. তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

'না, আমার বসবার সময় নেই। এখুনি যেতে হবে। তা কী আপনার? আমার কাছে কেন?' নিশীথের দিকে না-ফিরলে না-তাকালেও চলে, স্ত্রীর দিকে ফিরেই বললেন ঘোষ।

মোহিতা বললে, 'তোমার আগে বসতে হবে, বলতে হবে এঁকে তুমি চেনো কি না।'

'এঁকে আমি দেখি নি তো কোথাও', ঘোষ একটা সোফার এক কিনারে বসলেন, 'কী নাম আপনার?'

'নিশীথ সেন।'

'নিশীথ সেন?'

'এই নামে কেউ কোনো দিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে?'

'আমার তো মনে পড়ছে না,' ঘোষ মোহিতার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় কপালে-মুখে দু-চারটে খিচ জাগিয়ে তুলে বললেন।

মোহিতা স্কটিশ চার্চ কলেজের কথা পাড়তে গেল না আর। বিনেয়ন্দ্র মুখুজ্জে, শুভ্রাংশু, সীতেশ ভটচাজের কথা বলতে গেল না। এদের কথা যদি মনে না থাকে ঘোষের, নিশীথকে সে যদি কোনোদিন দেখে না থাকে তা হলে, একচোখা হরিণের লাটের দিকে দাঁড়িয়েছিল পৃথিবীর এ সব জিনিস; দেখে নি এ সব ঘোষ।

মোহিতা বললে, 'নিশীথবাবু কলকাতায় আসতে চাচ্ছেন। কোনো একটা গভর্নমেণ্ট কলেজে এঁকে ঢুকিয়ে দিতে হবে।'

'কাকে বলছ তুমি মোহিতা?'

'তোমাকে'

'কাউকে কোনো কলেজে ঢুকিয়ে দেবার আমি কে?'

'এটা তোমার অতিরিক্ত বিনয়।'

'আমার নিজের কোনো কলেজ আছে?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে মোহিতা বললে, 'এঁর জন্য কারু কাছে তোমায় খোশামোদ করতে হবে না। নিশীথবাবু কৃতী মানুষ।'

'নিশীথ বললে, 'আমি সেকেণ্ড ক্লাশ এম-এ—'

প্রফেসর উঠবার উপক্রম করে বললেন, 'কলেজে কাজ করতে গেলে তো আমাদের ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রি থাকা চাই-ই, তা ছাড়া—'

মোহিতা বাধা দিয়ে প্রফেসরের কথা কেটে ফেলবার চেষ্টা করে বললে, 'কোন ক্লাস পেয়েছে তা দিয়ে টিচারের গুণ যাচাই করবার মত মনের ঢিলেমি তোমার নিশ্চয়ই নেই।'

বাধা দিয়ে প্রফেসর বললেন, 'আছে।'

'আছে ?'

'হ্যাঁ, আছে।'

মোহিতা বিক্ষুব্ধ হয়ে বললে, 'নিশীথবাবুর পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে কলেজে কাজ করবার—'

প্রফেসর মোহিতার কথা শেষ না-করতে দিয়েই বললেন, 'বেশ ভাল জিনিস, কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস পেলে আরো ভাল হত।'

'এ কেমন কথা হল ? এ কথা আমাদের কোন দিকে নিয়ে যায় ?'

'ফার্স্ট ক্লাশ ডিগ্রি থাকলেই ঠিক হত', প্রফেসর বললেন, 'শুধু পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের বিশেষ কোনো দিকে নিয়ে যায় না।'

'কী মূল্য আছে এ সব ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ক্লাসের ?' মোহিতা যেন সিংহের উপর লাফিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, যেন মহিষাসুর এ সব ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ক্লাশ ডিগ্রিগুলো।

প্রফেসর হেসে বললেন, 'নেই ? সেকেণ্ড ক্লাসের বুঝি বেশি জেল্লা ?'

'মূল্যের কোনো যাচাই হয় না আমাদের দেশে।'

প্রফেসর গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমার ভিতরে কাজ আছে।'

'নিশীথবাবুকে তো তুমি কোনো কথা দিলে না।'

'নিশীথবাবু আর-একটা এম-এ দিন। ইংরেজির টিচার, হ্যাঁ, তবে ইংরেজিতেই দিন। একটা ফার্স্ট ক্লাশ জোগাড় করুন, ফার্স্ট না হলেও হবে।'

প্রফেসর কারুর দিকে না-তাকিয়ে নিজেরই জ্ঞান-শালীনতার হিম্মতে তৈরি বাড়ির বিচিত্র গালচেগুলোর দিকে, মেঝের ভিত্তিরেখাগুলোর স্বর্গীয় জ্যামিতির দিকে, তাকাতে-তাকাতে বললেন।

মোহিতা আগে একটু উত্তেজিত হয়েছিল, এইবারে ঠাণ্ডা স্থিরতায় ফিরে এসেছে ; আস্তে-আস্তে বললে, 'উনি কৌটো খুলে ক্যাকটিনা পিল খাচ্ছেন, আমি দেখলুম। হার্টে অসুখ নিশীথবাবুর। এই বয়েসে এই শরীর নিয়ে এম-এ পরীক্ষা দিয়ে ফার্স্ট´ক্লাশ পেলে তবে তোমরা ওঁর সম্বন্ধে চিন্তা করবার সুযোগ পাবে ? তোমরা এক-একটা বড়-বড় প্রতিষ্ঠান অধিকার করে আছ বলেই এত অবাস্তব হয়ে পড়েছ ?'

প্রফেসর মোহিতার কথা শুনছেন বলে মনে হল না।

'আজকাল ইংরেজির দাম কমে যাচ্ছে', প্রফেসর বললেন, 'কয়েক বছরের মধ্যেই ইংরেজির বিশেষ কোনো দরকার থাকবে না। বাংলা তো রাষ্ট্রভাষা হল পশ্চিমবাংলায়, নিশীথবাবু যদি সাহিত্যের টিচার থাকতে চান তা হলে বাংলায় এম-এ দিয়ে ফার্স্ট´ক্লাশ পেলে সুবিধে হবে তাঁর।'

নিশীথ খুব একটা তামাসা বোধ করে বলে, 'আমার নিজের জন্য আপনার কাছে আসি নি প্রফেসর ঘোষ। এসেছিলুম আর-একজনের জন্য। আমাদের কলেজের নয়ন দত্ত ইংরেজিতে ফার্স্ট´ক্লাস ! কলকাতার কোনো কলেজে কাজ চাচ্ছে সে ; আপনি তাকে ঢুকিয়ে দিলে বড্ড উপকার হয়।'

প্রফেসর মোহিতার দিকে তাকালেন ; মোহিতার মুখে থমথমে প্যাঁচ কষার বা লেগ পুলিঙের কোনো আভাস দেখতে পেলেন না ; নিশীথের দিকে তাকাতে গেলেন না তিনি। একটু তাল কেটে গেছে যেন ; প্রফেসর একটা হাই তুলে বললেন, 'ফার্স্ট´ক্লাস, কী পজিশন' ?

'সেকেণ্ড'

'ফার্স্ট´ক্লাস ফার্স্ট´ হলেই তো ভাল হত নয়ন দত্তের,' মোহিতা একটু সুড়সুড়ি দিয়ে যেন বললে।

'ওদের বারে যে ফার্স্ট´ হয়েছিল সে সুসাইড করেছে,' নিশীথ আক্ষেপ করে।

'কেন, সে ট্রাভেলিং ফেলোশিপ পায় নি বলে ?' কে যেন বললে।

'না ফার্স্ট´ ক্লাস ফার্স্ট´ হয়েছিল সেই উত্তেজনায়।'

মোহিতা বললে, 'যে ফার্স্ট´ হয়েছিল সে এখন নেই আর। নয়ন দত্ত তা হলে সত্যিই ফার্স্ট´ এখন। ইংরেজিতে ফার্স্ট´ ক্লাস ফার্স্ট´ নয়ন দত্ত। ওকে চোখ বুজে চাকরি দিতে পার তুমি। নিশীথবাবুকে কথা দাও তা হলে।'

প্রফেসর মাথা নেড়ে বললেন, 'না, নয়ন দত্তকে ফার্স্ট বলতে পারা যায় না, যে ফার্স্ট, সে মরে গেলেও সেই তো ফার্স্ট হয়েছিল। নয়ন দত্ত সেকেণ্ড। নয়ন দত্ত যদি ফার্স্ট হতে চায়, তা-হলে আবার এম-এ দেবার দরকার তাঁর।'

মোহিতা নিঃসহায়ভাবে হাসতে-হাসতে বললে, 'মানুষ এইই করবে বসে-বসে? কেবল এম-এই দেবে।'

প্রফেসর কারু কথা কানে না তুলে, কিছুই গায়ে না মেখে, কারুর দিকে না তাকিয়ে, চোখ দুটো সিলিঙের দিকে তুলে গম্ভীরভাবে, আস্তে-আস্তে বললেন, 'নয়ন দত্ত ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাশ। কিন্তু ইংরেজির গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। কয়েক বছরের মধ্যে ইংরেজির আর-কোনো টিচারের দরকার হবে না কলেজে। কলেজে কাজ করতে হলে নয়ন দত্ত ইকনমিক্সে কিংবা বাংলায় ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হয়ে নিক।'

'তা হবে নয়ন দত্তর,' মোহিতা বললে, 'কিন্তু ইংরেজি নাকচ হতে এখনো দেরি আছে, নয়ন দত্তকে কলকাতার কলেজে একটা ভাল কাজ দাও তুমি।'

'নয়ন দত্ত ক বছর কাজ করেছে নিশীথবাবুদের কলেজে?'

'একুশ বছর।'

'এতদিন পড়েছিল কেন ও-রকম একটা কলেজে?'

'মফস্বলে শান্তি সুস্থিরতা আছে। ভাল মনে হয়েছিল সেটা।'

'কলকাতায় আসতে চাচ্ছে কেন?'

'মফস্বলে উন্নতি হচ্ছে না। জীবন বড্ড থোড় বড়ি খাড়া হয়ে পড়েছে। কলকাতায় নানা রকম সম্ভাবনা আছে। বড়-বড় লাইব্রেরি, স্টাডি সার্কেল, সভা-সমিতি আছে—জীবনটাকে জ্ঞান, সংকল্প, সামাজিকতার দিক দিয়ে—'

বাধা দিয়ে প্রফেসর বললেন, 'ভাইস চ্যান্সেলারকে গিয়ে ধরুক।'

'কে?'

'নয়ন দত্ত।'

'কিসের জন্য?'

'কলকাতার কোনো কলেজে কাজ ঠিক করে নেবার জন্য। আমি তো ভাইস চ্যান্সেলার নই।'

'বেশ তো নয়ন দত্ত, যাবে নয়ন দত্ত ভাইস চ্যান্সেলারের কাছে, তুমি নিশীথ-

বাবুর জন্যে একটা কিছু ঠিক করে দাও।'

'নিশীথবাবু তো সেকেণ্ড ক্লাশ এম-এ।'

'কত সেকেণ্ড ক্লাশ এম-এ প্রফেসরি করছে, থার্ড ক্লাশ এম-এদের ভিতর প্রিন্সিপাল আছেন', মোহিতা বললে।

'নিশীথবাবু তো সেকেণ্ড ক্লাশ এম-এ', বললেন প্রফেসর।

এর চেয়ে বেশি কিছু বলার মিছে পুনরুক্তির ভিতর গেলেন না তিনি। তারপর প্রফেসর উঠে দাঁড়ালেন।

'কিন্তু নৃপেনও তো সেকেণ্ড ক্লাশ ছিল, তাকে তুমি কী করে ঢোকালে কলেজে?'

'আমি ঢুকিয়েছি? নৃপেনকে তো মিসেস কেসি কাজ ঠিক করে দিয়েছিলেন গভর্নমেণ্ট কলেজে। নৃপেন মিসেস কেসিকে তো সেকালের পট ও অবন ঠাকুর আর তার স্কুল বাদ দিয়ে আধুনিক বাংলা ছবির পটল-চেরা পীঠস্থানে ঢুকিয়ে দিয়েছে, ফলে তিনি ঢুকিয়ে দিলেন বড় কলেজে নৃপেনকে।'

'সে কলেজের কাজ যখন গেল নৃপেনের, তখন তো মিসেস চলে গেছেন ভারতবর্ষ থেকে। নৃপেনকে আর-একটা গভর্নমেণ্ট কলেজে ঢুকিয়েছিল কে?'

প্রফেসর একটা ঢেকুর তুলে বললেন, 'সেটা নিজের চেষ্টা-তদ্বিরে জোগাড় করে নিয়েছে নৃপেন।'

'নিজের তদ্বিরের জোরেই ঢোকে সকলে', মোহিতা বিমুগ্ধ হয়ে বললে, 'যদি ঘোষ সাহেবের সঙ্গে চুক্তি করা থাকে। কী, হবে নাকি চুক্তি আমাদের সঙ্গে?'

'কিসের চুক্তি?'

'নৃপেনের সঙ্গে যা হয়েছিল'—

প্রফেসর স্পষ্ট শান্ত মেজাজে বললেন, 'ভাইস চ্যান্সেলারের সঙ্গে দেখা করুক নয়ন দত্ত।'

'আর নিশীথবাবু?'

'নিশীথবাবু তো সেকেণ্ড ক্লাশ এম-এ।'

'তুমিও তো সেকেণ্ড ক্লাশ এম-এ,' মরীয়া হয়ে বললেন মোহিতা।

'নিশীথবাবু তো সেকেণ্ড ক্লাশ এম-এ', প্রফেসর একটু কাঁধ নাচিয়ে হেসে নিজের ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন।

উনি কি সেকেণ্ড ক্লাশ? প্রফেসর ঘোষ সেকেণ্ড ক্লাশ?' জড়বুদ্ধির মত নিশীথ মোহিতাকে জিজ্ঞেস করল।

'আপনারা তো একসঙ্গে পড়েছিলেন; জানেন না?'

'উনি আমাদের সঙ্গে এম এ পরীক্ষা দেন নি। সেবার কী অসুবিধা হয়েছিল। তৈরি করে উঠতে পারেন নি। আমাদের পরের বার, নাকি তার পরেব বার দিয়েছিলেন। আমি তখন কলকাতা ছেড়ে চলে গেছি। তার পর থেকে ইউনিভার্সিটির কোনো খোঁজখবর রাখি নি আমি। সেকেণ্ড ক্লাশ। আচ্ছা উঠি মোহিতা দেবী, দুপুর হয়ে গেছে। বেঁচে থাকলে আবার আসব। যারা নীচে পড়ে আছে, ঠিক সময় ঠিক কাজ করতে পারে নি, দেরি করে ফেলেছে, সময়ের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে নি, তারা কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে আজ একটা অদ্ভুত পৃথিবীতে পাক খাচ্ছে।'

'সে পৃথিবীটাকে কি ভাল করতে হবে?'

নিশীথ একটু চমকিত হয়ে মিসেস ঘোষের দিকে তাকাল। এ রকম কথা উনি জিজ্ঞেস করছেন মনের বিলাসিতায় নয়, স্বাভাবিকতায়। মোহিতা দেবীর চোখ, মুখ, গলার আওয়াজ অনুভব করছিল নিশীথ। মোহিতাকে ঘোষ হয় তো বলবেন প্যাথলজির কেস। কিন্তু তা নয়। তা নয়। প্যাথলজির কেস ঘোষ নিজেই হয় তো। কিন্তু নির্মল রাষ্ট্রসমাজের দিকে চোখ রেখে শুদ্ধ মন নিয়ে কোথায় সে বিজ্ঞানী, ঘোষ সাহেবদের যে পরীক্ষা করে দেখবে। দেখলে হত। ঘোষ ঘোষই থেকে যাবে হয় তো, শিক্ষাদীক্ষা কলেজ-ইউনিভার্সিটির শীর্ষে বসে থেকে। কিন্তু শীর্ষে বসে থাকবার জোর কমে যাবে ভবিষ্যৎ ঘোষদের। জোর বেড়ে যাবে ভবিষ্যৎ নিশীথ সেনদের। ক্রমে-ক্রমে রাষ্ট্রের গ্লানি কেটে যেতে থাকবে উত্তরোত্তর এই পরিচ্ছন্নতার পথে চলে; সত্যিই প্রাণ-ঘন হয়ে উঠবে জীবন।

'পৃথিবীটাকে ভাল করা কঠিন। সময় সাপেক্ষ। পাঁচ, সাত, এক হাজার বছর তো লাগবেই। তারপর কী হবে বলতে পারা যায় না। আমার ছেলে হারীত তো বিপ্লবের চেষ্টা করছে।'

'কত বড় ছেলে আপনার?'

'উনত্রিশ-ত্রিশ হবে।'

'কী কাজ করছে?'

'আণ্ডারগ্রাউণ্ড কাজ।'

'ও কোনো চাকরি করছে না ?'

'না।'

'আণ্ডারগ্রাউণ্ড আপনার বাড়িতে বসে ?'

'না, আমার সঙ্গে থাকে না।'

'কোথায় আছে ?'

'কলকাতায়ই। জানি না। আমার সঙ্গে দেখা করে না।'

'কেন করবে ? রক্ত বিপ্লব করছে। নিজেই মারা পড়বে রক্ত রক্তাক্ত হয়ে ?' —মোহিতা গলা নামিয়ে নিয়ে বললে, 'ও-সব বারীন ঘোষ কানাইলালের দিন নেই তো আজকাল, দেশ স্বাধীন হয়েছে। বিপ্লবের দরকার নিশীথবাবু। দেখছেন তো ভাবগতিক সব চারদিকে। দরকার বিপ্লবের, বেশ বড় রকমের। কিন্তু মহাত্মাজির মত অহিংস বিপ্লব করুক হারীত।'

'কোথায় পাচ্ছি হারীতকে মোহিতা দেবী ?'

'দেখাই দেয় না ?'

'না।'

'দেখা হলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন তো ?'

'নিশ্চয়। নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেব,' নিশীথ বললে।

'পৃথিবীর ভাল হবে না নিশীথবাবু ?'

'ঘোষ কী বলেন ?'

'উনি বড় ব্যস্ত আছেন ক্যাবিনেটে কাজ পাবার জন্যে।'

'কোন ক্যাবিনেটে ?'

'কোনো একটায়—'

নিশীথের পাঞ্জাবির গলা খোলা ছিল এত ক্ষণ। গলার বোতাম আঁটতে-আঁটতে বললে, 'আমার মনে হয় মানবসমষ্টির মঙ্গল হবে, এ রকম একটা ধারণা নিয়ে ব্যক্তির দুঃখ কষ্ট দুর্দশা চলবে আরো অনেকদিন নানা রকম, তেজী মন্দি গভর্নমেণ্টের মারফৎ, বিপ্লবের রক্ত বিপ্লবের মারফৎ। মানবের ভাল মুখে-মুখে চাইবে হয় তো অনেকে। মনে চাইবে না মুখেও চাইবে না কেউ-কেউ। ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যেতে থাকবে অনেকদিন।'

'নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না ব্যক্তি ?'

'অসম্ভব অসম্ভব।'

'কেন ?'

'কী সে চায় তা জানে না ; অব্যবস্থিত মন ; তার প্রতিনিধি হয়ে কেউ দাঁড়ায় না ; অন্যদের প্রতিনিধিকে ভোট দিয়ে আসতে হয়। এ তো গেল স্থিতিভিত্তির সময়ে। রক্ত বিপ্লবের সময়ে ব্যক্তিও বিপ্লব করে ; আগুন দেখে মাছি যেমন করে। দিনরাত ব্যক্তি নিপাত হয়ে যাচ্ছে। মানুষের শেষ দিন পর্যন্ত যদি এ রকম হয় তবে আশ্চর্য হব না।'

মোহিতা দ্বিধা প্রকাশ করে বললে, 'আপনি যা বলেছেন সেটা হয় তো সত্য, হয় তো তা নয়। কিন্তু সত্য হলেও সেটাকে এ রকম কালি মাড়িয়ে দেখানো কি উচিত ?'

'আপনার কাছে জিনিসটা অন্ধকারবাদ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তবুও চোখের সামনে অনবরত তো ব্যক্তি নষ্ট হচ্ছে ; শেষ হয়ে যাচ্ছে। দেখে শোক করবার মত লোক কই। সেও তো রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে।'

'আমি আছি আর ঘোষ আছে ; রক্তাক্ত হই নি এখনো', মোহিতা হাসতে গিয়ে ভিতর থেকে আটকে রাখতে-রাখতে বললে, 'ব্যক্তি মানে কি ব্যক্তিসাধারণ ?'

'হ্যাঁ।'

'কোনো পার্টিতে নেই তারা ?'

'কোনো পার্টিতে, নেই, থাকতে নেই।'

'এ রকম ব্যক্তি হিসেবেই তো দাঁড়িয়ে আছেন আপনি ?'

'হ্যাঁ,' নিশীথ বললে, 'আমাদের সংখ্যা পৃথিবীতে শতকরা পঁচানব্বই জন।'

'এ রকম ভাবে নিজেকে ধ্বংস হয়ে যেতে দেবেন ?'

'শতকরা পাঁচ জন তো বাঁচছে,' নিশীথ বললে, 'বেঁচে থাকবার চেষ্টা করব খুব। আমার এ চেষ্টা ব্যক্তিসাধারণেরই চেষ্টা সেটা অনুভব করি। বেঁচে থাকলে কাজ করবার সুযোগ পাওয়া যাবে, হারীতের মত নয়, অন্য ভাবে, দরকার হলে দৃঢ়ভাবে, কিন্তু রক্তারক্তি করে নয় ; গান্ধীজির মত মনের মূল নির্মলতা ও নিরন্তর সৎ প্রেরণার দিকে বেশি ঝোঁক না দিয়ে। ও জিনিস অনেকেরই নেই, কোনো দিন হবে না। কিন্তু তবুও', নিশীথ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'ভাল জিনিস হতে পারে পৃথিবীতে।'

মোহিতা বলছিল না কিছু, নিশীথ আরো কিছু বলবে ভেবে প্রতীক্ষা করছিল।

'কিন্তু সময় লাগবে, আমরা বেঁচে থাকতে কিছু দেখে যেতে পারব না।'

'আপনি তো বলছেন এক হাজার বছরও লেগে যেতে পারে মানুষের ভাল হতে—'

'এক হাজার—দু হাজার—মিশরের ফ্যারাওদের সময় যে-লোকগুলো কষ্ট পাচ্ছিল তারা আজকের উনিশশ আটচল্লিশের পৃথিবীটাকে দেখবার সুযোগ পেলে ভাবত না কি! হাজার-হাজার বছর পরেও এ রকম। কী হবে তবে মানুষের, কবে হবে?'

'কবে হবে তা হলে?'

বলবার ইচ্ছে ছিল, কথা বলবার ইচ্ছে ছিল আরো ঢের, কিন্তু নিশীথকে উঠে দাঁড়াতে দেখে অগত্যা উঠে দাঁড়িয়ে মোহিতা বলল, 'হবে-হবে, আজই হবে এই কথাই ভাবে মানুষ, এই কথা ভেবেই জোর পেয়ে কাজ করে।'

প্রফেসর ঘোষের বাড়ির থেকে নিশীথ যখন বেরিয়েছে তখন প্রায় একটা বাজে। কলকাতায় অনেকগুলো ভাল-ভাল বড়-বড় কলেজ। ইচ্ছে করলে ঘোষ তাকে কোনো একটা ভাল কলেজে ঢুকিয়ে দিতে পারত, খুব বেশি বেগ পেতে হত না ঘোষের। পুরনো সহপাঠী হিসেবে নয়, কোনো বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আশা করে নয়, এমনিই নিশীথের নিজের কলেজি অভিজ্ঞতা ও কৃতিত্বের গুণে প্রফেসর অভয়েন্দ্র মোহন ঘোষের দক্ষিণমুখ নিশীথের দিকে ফেরানো হোক এটা আশা করেছিল নিশীথ।

খুব বড় ফার্স্ট ক্লাস বা বিলেতি ডিগ্রি না থাকলে শুধু পড়াবার গুণপনায় কলকাতার কোনো কলেজে ভাল কাজে ঢোকা কঠিন—অসম্ভব—প্রফেসর ঘোষের মতন মুরুব্বি ছাড়া। কিন্তু প্রফেসর কিছু করবেন না। আর কোনো দিকপাল সহপাঠী নেই নিশীথের কলেজ ইউনিভার্সিটি লাইনে। মামা নেই, শ্বশুর নেই—কোনো মুরব্বি নেই এ দিকে; কলেজে ঢোকা কঠিন, অসম্ভব। ভবানীপুরের দিকে একটা বাস যাচ্ছিল, চড়ে কুলদাপ্রসাদের বাড়ির কাছে গিয়ে নামল নিশীথ। ঢুকে গেল বাড়ির ভিতরে; কুলদাকে ডেকে পাঠাল।

'কে তুমি, নিশীথ নাকি? কলকাতায় এলে কবে?' একটা আধময়লা সোফায় আঁট হয়ে বসে কুলদা বললে।

'এই তো কয়েক দিন।'

'কোথায় আছ আজকাল? কোন কলেজে?'

'মফস্বলের কলেজের কাজ ছেড়ে দিয়েছি। কলকাতার কোনো একটা কলেজে কাজ পেলে ভাল হয় কুলদা।'

কুলদাপ্রসাদ নিশীথের সঙ্গে একেসঙ্গে পড়ে নি কোনোদিন, কুলদার সঙ্গে নিশীথের আলাপ অনেকদিন—অন্য সূত্রে। নিশীথের চেয়ে দু বছরের ছোট কুলদা। কলকাতার একটা বড় কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল সে। কলেজের কলকাঠি সব কুলদার হাতে। প্রিন্সিপ্যাল হবার সম্ভাবনা আছে কুলদার, গভর্নিং বডির খুব ঘোড়েল মেম্বার সে।

কুলদা হতচকিত হয়ে বললে, 'কেন কলকাতায় আসতে হচ্ছে কেন, বেশ তো ভাল ছিলে মফস্বলে।'

'যাবে তুমি মফস্বলে কুলদা?'

'কেন, আমার যাবার কী?'

'খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কুলদা? বেলা করে তোমার বাড়িতে এসেছি, দেড়টা বাজে।'

'এই তো খেলুম, ছুটির দিন আজ, দেরি হয়ে গেল।'

নিশীথ খেয়েদেয়ে এসেছে কি না জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেল কুলদা। কলকাতার এ সব লোক কতকগুলো বিশেষ জিনিস এই রকমই ভুলে যায়—জানে নিশীথ।

'অথচ, ঠিক টাইম মত খাওয়া না হলে চলে না আমার।'

নিশীথ বললে, কুলদার অনাতিথেয়তাকে বেশ সেয়ানার মত তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে, 'সাড়ে দশটার সময় বেরিয়েছি বাড়ি থেকে, ডাল, ভাত, মাছের ঝোল, মাংসের চচ্চড়ি, আবার আমসত্ত্বের টক—আর ছ্যাঁচড়া খেয়ে। ভাল খাওয়া-দাওয়া চাই, চব্বিশ-পঁচিশ বছর তো প্রফেসরি করলুম—'

কুলদা একটু ওজন করে নিশীথের দিকে তাকাল, আগাপাশতলা তাকিয়ে দেখল, লোকটা কিছু জমিয়েছে বটে মফস্বল কলেজে ভিটকেলেমি করে টিঁকে থেকে। মফস্বলে টাকা জমাবার সুবিধে ঢের, ভাবছিল কুলদা; কলকাতায় কত খরচ। মোটে সাতচল্লিশ হাজার টাকা আছে কুলদার ব্যাঙ্কে। তিনটে লাইফ ইনসিওরেন্স পলিসি আছে পঁচিশ হাজার টাকার। প্রফিডেণ্ড ফাণ্ডে আছে বটে কিছু টাকা। সব টাকাই তো কলেজের মাইনে থেকে নেওয়া নয় —আরো কত রকম ধড়িবাজি করতে হয়েছে তাকে।

'সাড়ে দশটার সময় বেরিয়েছ বদ্রিনাথের খ্যাঁট মেরে', বললে কুলদা, 'ঐ ইজি-

চেয়ারটায় উঠে বসো, দুদিন ধরে ডি-ডি-টি দিয়ে ছারপোকা মেরে চেয়ারটা ঠিক করেছি। কোথায় আছো কলকাতায় ?'

ইজিচেয়ারে বসে নিশীথ বললে, 'আছি বৌবাজারে ফিয়ার্স লেনে।'

'ফিয়ার্স লেনে ? জায়গাটা বেছে নিয়েছ বটে।'

'এখন তো দাঙ্গা নেই।'

'কী রকম হালচাল এখন ফিয়ার্স লেনে ?'

'এখন আর-কী, সব সাপ কেঁচো হয়েছে।'

'আর যারা কেঁচো ছিল ?'

'খুরকিনা মাছ হয়ে গেছে ?'

'হয়েছেই তো। দেশ স্বাধীন হয়েছে।'

'স্বাধীন বলে স্বাধীন,' নিশীথ পায়ের উপর পা চড়িয়ে দিয়ে বললে, 'বৌবাজারের বাজারে যা কিনি তাই ঝাল, যা রাঁধে তাই খ্যাঁট। এমন খ্যাঁটনদার করে দিয়েছে আমাকে আমার বাবুর্চিরা।'

কুলদা একটা সিগারেট মুখে দিয়ে বললে, 'এই তো ভাল, মফস্বলে কাজ করে গরমের ছুটিতে কলকাতায় এসে ফুর্তি করা। কেন বার মাস কলকাতায় এসে পচে মরতে চাইছ ?' মুখের সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিল কুলদা।

নিশীথের দিকে টিনটা এগিয়ে দিয়ে কুলদা বললে, 'কী রকম বাঁধলে-টাঁধলে মফস্বলে কাজ করে ?'

'পঁচিশ হাজার।'

'বাঃ, বাঃ, মওকা! বেশ ফেঁদেছ বেটাচ্ছেলে। কোথায় রেখেছ টাকা, পাকিস্তান ব্যাঙ্কে ?'

'না, কলকাতায়। লয়েডসে।'

'লয়েডসে!' কুলদা একটা মিহি ছুঁচ ফুঁড়ে নিশীথের দিকে তাকায়, 'কেন, বিলিতি ব্যাঙ্কে রাখতে গেলে কেন ? কী ইন্টারেস্ট দেয় ওরা ? সুদের জন্যেই আমাদের এত বড়-বড় দিশি ব্যাঙ্ক রয়েছে সব।' কুলদা সিগারেটে চোঁ-চোঁ টান মেরে ধোঁয়ার হুড়োহুড়ির থেকে নিজের চোখ দুটোকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে-করতে বললে।

'লয়েডসে রেখেছি তার একটা কারণ আছে। ওতে টাকাটা জমা থাকবে, টাকায় হাত পড়বে না সহজে।'

'কেন ?'

'ও-সব ব্যাঙ্কে ঢুকে টাকা তুলবার মত মনের জোর আমার নেই। ঢুকতেই ভয় করে। কী যেন কী মনে ভাবে, ব্যাঙ্ক লুট করতে এসেছি নাকি। থমথমে ভাব। আমি আট-দশ বছর আগের কথা বলছি। এর ভেতরে আর ঢুকিনি লয়েডসে। খুব বেশি মরীয়া না হলে ও-সব ব্যাঙ্কে ঢুকে টাকা তুলবার কোনো তাগিদ থাকে না। টাকাটা বাঁচে,' নিশীথ নিজের হাতের সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিল, 'এই রকম করে পঁচিশ হাজার টাকা জমিয়েছি। না হলে পঁচিশ টাকাও আমার থাকত না। বড্ড খরচের হাত আমার। পথে দাঁড়াতে হত আমাকে।'

কুলদা বললে, 'ক-বছর চাকরি হল তোমার কলেজে ?'

'চব্বিশ-পঁচিশ বছর।'

'কী—ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হয়েছ নাকি ?'

'এইবারে হব।'

'কত মাইনে ওখানে ভাইস প্রিন্সিপালের ?'

'তিনশ, ডি-এ পঞ্চাশ।'

'বেশ তো, খুব ভাল তো, বেশ ঢালাও হাত তো তোমাদের কলেজ কর্তৃপক্ষের ?' কুলদা আড় চোখে তাকিয়ে বললে। কেমন যেন একটু মফস্বলিদের শ্রীসচ্ছলতায় কাতর বোধ করে। সিগারেট টানতে লাগল।

'এইবারে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হবে ?'

'হ্যাঁ।'

'তার পরে প্রিন্সিপ্যাল ?'

'সেটা বলতে পারি না।'

'কেন বলতে পারবে না নিশীথ ? ভাইস হতে পারলে আপসে হয়ে যাবে ; কে ঠেকাবে তোমাকে ? কত মাইনে প্রিন্সিপালের ?'

'পাঁচশ টাকা—'

'ডি-এ ?'

'পঞ্চাশ—'

'থাকো, মফস্বল কলেজে থাকো ; কলকাতায় এসে কোনো লাভ নেই। আমি তো ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হয়েছি, মোটে চারশ পঁচাত্তর টাকা মাইনে আর একশ

টাকা আন্দাজ অ্যালাউন্স আছে কলেজ পেটান দু-চারটে বকলম সেঁটে দিই বলে। ওতে কি আর চলে কলকাতার মত শহরে'—

'চালাচ্ছ তো বেশ তুমি, বাড়ি তো করেছ ভবানীপুরে।'

'এটা ভাড়াটে বাড়ি, আমার নিজের বাড়ি টালিগঞ্জে।'

'বাড়ি তো করেছ।'

'তা এতদিন কলকাতায় আছি, বাড়ি এমনিই হয়ে যায়, চারশ পঁচাত্তর টাকা করে কাঠা কিনেছিলুম টালিগঞ্জে উনিশশ বত্রিশে, সে কাঠা এখন চার হাজার সাতশ বিরানব্বই টাকায় বিকোচ্ছে। বার হাজার টাকা লেগেছিল আমার বাড়ি করতে।'

'কেন, নিজের বাড়ি ছেড়ে এ বাড়িতে আছ ?'

'আছি, কলকাতায় থাকতে হচ্ছে বলে।'

'তার মানে ?'

'বদমায়েসি না করে কলকাতায় টিঁকে থাকা যায় না '—

'এ বাড়িতে বদমায়েসি করার সুবিধে কুলদাপ্রসাদ ?'

'লোচ্চামি ? না, আমি সে কথা বলছি না, সে আলাদা ; সে হবে এখন পরে ; এই যে ললিতা'—

'কী বলছ কুলদা ?'

একজন ফর্শা, লম্বা, ভারী নিখুঁত শরীরিনী ঘরে ঢুকে কুলদাকে ঘেঁষে দাঁড়াল ; দাঁড়িয়েই কুলদার মাথার চুলের ভিতর হাত চলে গেল ললিতার ; পাকা চুল বাছবার চেষ্টা হয় তো ; নাকি বিলি কাটা হচ্ছে ? নিশীথের দিকে তাকিয়ে দেখছিল ললিতা, মেয়েটি সপ্রতিভ তো নিশ্চয়ই—বেশ সহজও বটে।

কুলদাও কম স্বাভাবিক নয়, 'আমাদের দু জনকে দুটো পান এনে দাও তো ললিতা।'

'ইনি কে ?' নিশীথের দিকে তাকিয়ে ললিতা বললে

'আমিও ভাইস, ইনিও ভাইস।'

'ভাইস ? কোন কলেজের ?'

'মফস্বলের।'

'মফস্বলের ? কোথায়, কেষ্টনগরের ?'

'আহা, না ললিতা, সবাই কি কেস্টনগরের জিনিস হবে, তুমি নিজে কেষ্টনগরের

পুতুল বলে। আহা, চুলে টান মারছ কেন? আঃ ললিতা!'

'মফস্বলের কোন কলেজের?'

'আছে এক কলেজের। পদ্মার পারে। পাকিস্তানে। তুমি দেখেছ কোনোদিন পাকিস্তান?'

'আমি কী করে দেখব পাকিস্তান কুলদা? আমি ঘুঘুডাঙ্গা পেরিয়ে গেলুম না কোনোদিন। আমার খুব ইচ্ছে করছে, আমাকে নিয়ে যাবে পাকিস্তানে? এই ঝিমিয়ে পড়েছে—এই কুলদা।'

'কুলদার কানের ওপর একটা মিঠে ঘুঁষি মেরে ললিতা বললে, 'চুল বিলি কাটছি আর ঘুমিয়ে পড়ছে, এই কালনাগ! বেহুলার ঘরে ঢুকে—'

'আমাকে তুধরাজ বলো ললিতা।'

'এই তুধরাজ! বেহুলার ঘরে ঢুকে—'

নিশীথ বললে, 'আপনি ঘুঘুডাঙ্গার বাইরে কোনোদিন যান নি?'

'আমি কেষ্টনগরের মেয়ে, কলকাতায় আছি আজ বিশ বছর ধরে। কোথাও যাব না আমি কলকাতা ছেড়ে।'

'পাকিস্তানে যাবে ললিতা?'

'তুমি নিয়ে যাবে?'

'নিশীথবাবু নিয়ে যাবেন। পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, চাও তো ভোগবতী, ঘুরিয়ে আনবেন। ঝুলে পড় নিশীথবাবুর সঙ্গে।' কুলদা ঘাড হেঁট করে মাথার চুল সব ছেড়ে দিয়েছিল ললিতার হাতে, 'মাথাটাকে ফিঙের ঠ্যাং ঝিঙের ক্ষেত করে ফেলেছে ললিতা।'

ধীরে-ধীরে মাথা তুলে খোঁয়ারি ভাঙার মত চারদিকে তাকাতে লাগল কুলদা। চার-পাঁচদিন কলেজ ছুটি; এর পর গরমের ছুটি এসে পডবে। কেমন যেন ছুটির, ঢিলেমির, সোহাগের রেশ কোকেনের মত কঁকিয়ে-ঝিমিয়ে কথা বলতে চাচ্ছে কুলদার শরীরে ও তার রক্তের কণিকাগুলোতে।

'এই তুধরাজ।' আর-একটা ফিনফিনে ঘুঁষির ফিনকি ভাইস-প্রিন্সিপালের কানের উপর গিয়ে পডল। একেবারে ভিরমি খেয়ে পড়বার গতিক হতে-হতে সত্যিই ভিরমি খেয়ে পড়ল যেন কুলদা, গাঁজাখোরের মত চোখ লাল করে, গোল করে, নক্সা করে নিশীথের দিকে ঠিকরে মারতে-মারতে।

'যাও প্যান ন্যোসো ন্যে সো ললিতা' বললে কুলদা শরীরটাকে একটু ছাউ

নাচ নাচিয়ে, বর্ষাকালের মিষ্টি কুমড়ো ক্ষেতের চিংড়ির চোখ মেরে ললিতার দিকে।

'না আমি পান আনব না, তুমি বলো পাকিস্তানে নিয়ে যাবে আমাকে'।

'নিয়ে যাব।'

'কবে?'

'কলেজ ছুটি হলেই।'

'নিশীথবাবু আমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন তো? সান্তাহার পেরিয়ে গেছ কোনোদিন ও লাইনে?'

'সান্তাহার নয়, বনগাঁ দিয়ে, নাকি নিশীথবাবু? এ লাইনে বনগাঁর পরই তো পাকিস্তান আরম্ভ হল?'

'হ্যাঁ। বনগাঁ লাইনে না গিয়ে—'

'না। আমরা বনগা লাইন দিয়ে যাব' কুলদার চুলের ভিতর হাত ঢুকিয়ে কেমন যেন হঠাৎ হাওয়ার ঘর্ষণে বাঁশপাতার তরঙ্গ তুলে ললিতা বললে, 'নিশীথবাবু আমাদের পথ দেখাবেন। তুমি আমাকে ভোগবতী দেখাবে।'

'ঠিক আছে, কুলদা বললে, 'পান দেবে না?'

"দিচ্ছি।'

'কটা পাকা চুল হল ললিতা?'

'একটাও না, তোমার মাথার সব পাকা চুল কেঁচে আমার মাথায় যাচ্ছে—'

'পাকা চুল নেই তোমার মাথায় নিশীথ?' কুলদা জিজ্ঞেস করল।

'এই তো রয়েছে রগের ধারে কয়েকটা—'

ললিতা কুলদার চুল বাছতে-বাছতে বললে, 'পান এনে দেব, কিন্তু সেই রকম করে বল তো সেই—'

'ম্যাও, প্যান ন্যাসো, প্যান ন্যাসো ললিতা', কুলদা ব্যাঙবাজির মত গলাটাকে বাজিয়ে নিয়ে বললে। খুব মজা লাগছিল বটে নিশীথের। রাজা-রাজড়াদের তাকিয়া তাউসে গড়িয়ে একটু বেসামাল হয়ে আছে যেন, কলেজের গভর্নিং বডির জাস্টিস তরফদারের মোটরের হর্ন গেটের কাছে বেজে উঠলেই বেশ ঝেড়ে ঝর্ঝরে হয়ে যাবে কুলদা; ঝেড়ে ঝর্ঝরে হয়ে উঠে দাঁড়াবে। লোকটার সর্বাঙ্গের দিকে তাকালেই বোঝা যায় সেটা—বেশ স্পষ্ট বুঝতে

পারা যায়, কিছু না, মাস্টারমশাই ছুটির দিনে একটু ঘোড়া-ঘোড়া খেলছেন।
'তুমি কেন প্রিন্সিপ্যাল হলে না কুলদা?' ললিতা বললে।
'আমি প্রিন্সিপ্যাল হলে কী হবে তোমার?'
'তোমার কলেজে পড়ব আমি।'
'আমার কলেজে মেয়েরা পড়ে না।'
'কেন, যে-কলেজে মেয়েরা পড়ে', একরাশ রোদে বাতাসে ফুলন্ত শেফালির ডাঁটের মত ঝরে ঝাঁকুনি খেয়ে ললিতা বললে, 'কেন সে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হলে না তুমি।'
'সে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তো হয়েইছি।'
'কোথায়?'
'আমার বাড়িতে।'
'এই দুধরাজ,' কুলদার থুতনির ওপর, গালের ওপর, টোপাকুলের মত ছিটকে পড়তে লাগল ঘুঁষি, ঘুঁষির পর ঘুঁষি। ললিতা সাঁ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।
'কে এই মেয়েটি?' জিজ্ঞেস করল নিশীথ।
টিন থেকে সিগারেট বার করে নিয়ে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'আমার বিধবা শালি ললিতা।'
'তোমার এখানেই থাকে?'
'হ্যাঁ।'
'কবে বিধবা হল?'
'বছর তিনেক হয়েছে।'
'খুব যে কচি মনে হচ্ছে।'
'আমার চেয়ে আটাশ বছরের ছোট ললিতা'।'
'তোমাকে কুলদা ডাকে কেন? নাম ধরে ডাকে?'
'ঠিকই ডাকে, কুলে-দাদা ডাকত আগে, তার থেকেই কুলদা হয়েছে।'
'ঠিকই হয়েছে। দাদা ডাকে কি ঠাকুর্দা সম্বন্ধে? নাতনির মত ব্যবহার করল তো তোমার সঙ্গে'—
কুলদা একটা সিগারেট বার করে জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'মফস্বল কলেজে থেকে সব কিছু একেবারে গোগ্রাসে গিলে রেখেছ নিশীথ। তোমার কি শালি-টালি

নেই ? কী করে কাটে তা হলে ছুটির দুপুর ? শীত রাত কাটে কী করে ?' মাথার চুলের অপর্যাপ্ত এলোমেলো কাল স্বাস্থ্য নিয়ে নিশীথের দিকে তাকাল কুলদা।

'বিধবা শালি নেই।'

'সধবা ?'

'নেই।'

'কে আছে তা হলে ?'

নিশীথ আস্তে টান দিয়ে সিগারেটটা নামিয়ে এনে বললে, 'মফস্বলে প্রফেসরদের আর-এক রকম। মেয়েদের দিকে ঘেঁষতে পারে না। যারা ঘেঁষে তাদের বদনাম হয়। সিনেমা-থিয়েটার বেশি দেখা যায় না।'

'এ সব দিক দিয়ে খুব লাট মাহিন্দারি তা হলে তোমার।'

'আছে বলেই তো মনে হয়।'

'বেশ চুটিয়ে পড়াও ক্লাসে ?'

'সেটা হয় না। দম রেখে পড়াই।'

'নিজে টের পাও না কিছু, কেমন পড়াচ্ছ ?'

কুলদাপ্রসাদ ঘাড় কাত করে কিছু ক্ষণ টেনে—এইবারে নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বললে, 'মফস্বলে মাস্টারকে চব্বিশ ঘণ্টা মাস্টারই থাকতে হয়। ঐটে বড় অসুবিধে। পেট ফুলে মরে যেতে হত আমার। কলকাতা একটা মহাদেশ, কোনো ঘুপসি ঘাপটিতে কে কী করছে, কে খোঁজ রাখে তার। নাঃ, মফস্বলে আমার চলত না। সাড়ে পাঁচশ টাকায় সেধেছিল আমাকে—'

'কোথায় ?'

'একটা প্রিন্সিপ্যালের কাজ নিয়ে সেধেছিল—কোয়ার্টার্স দেবে—হ্যান করবে ত্যান করবে—, গেলুম না আমি। কলকাতা ছেড়ে কে যায় ? চব্বিশ ঘণ্টা মাস্টার সেজে টঙে চড়ে বসে থাকব ? পাহারা দিতে হবে বুঝি কে কোথায় বজ্জাতি করছে তাকে শায়েস্তা করবার জন্যে ? ঘি খেলে লোম পড়ে যাবে বুঝি ? রেড়ির তেল খেতে হবে, কিন্তু ভদ্দর-অভদ্দর দু-চারটে রাঁড়ি থাকবে না ?'

'রাঁড়ি ?'

'এখানে সে সব বালাই নেই গো ; দিনের বেলা কলকাতার উত্তর দিকে জয়হিন্দ বলে ধর্মতলার ম্যাজিনো লাইন পেরিয়ে—ব্যস—কে টের পাবে

গান্ধী টুপি জহর কোট পিঠে কোন কলকাতায় তুমি তলিয়ে আছ—'

'ব্ল্যাক মার্কেটিং করতে ?'

'সব রকম বাঞ্চোতি ।'

'করছ ? কত কাল ধরে ?'

'চিরটা কাল । কড়ায়া, চীনে টাউন, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট—'

'জুতো বাইরে রেখে মন্দিরে প্রবেশ বুঝি ? মাস্টার মশাইয়ের জুতোরও নাগাল পায় না ছেলেরা ? ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে, চীনে টাউনে, মোঙ্গল নাক-চোখ ভাল লাগে তোমার ?'

'সব ভাল লাগে, সব দেখতে হয় । আমাদের ইউনিভার্সিটির খোদা বক্স সাহেব বলতেন ।'

পান নিয়ে ঘরে ঢুকল ললিতা ! 'সিক্সটিন ডিফারেণ্ট ন্যাশন্যালিটিজ ।'

'কী বললে কুলদা, কী ইংরেজি কথাটা বললে ?' ললিতা পান বনের বাতাসের মত শাড়িতে শরীরে নির্ঝরিত হয়ে বললে ।

বললাম, 'সিক্সটিন ডিফারেণ্ট ন্যাশন্যালিটিজ,' চোখ পাকিয়ে গর্জন করে বলল কুলদা ।

মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে-হাসতে ললিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । খোদা বক্সের ব্যাপারটা ললিতারও জানা আছে তবে ?

'তোমার টালিগঞ্জের বাড়ির কথা হচ্ছিল ; সেটি ভাড়া খাটিয়ে পরের বাড়িতে পড়ে আছ কেন ?'

'এ বাড়িতে আমি ত্রিশ টাকা ভাড়া দিচ্ছি মাত্র ।'

'মাত্র ?'

'সেই জাপানি বোমা হিড়িকের সময় এ বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলুম আমি কুড়ি টাকায় । হিড়িক কেটে যাবার পর থেকেই আমাকে উৎখাত করতে চেষ্টা করছে, কিছুই করতে পারে নি । পারবেও না । তবে দোতলা বাড়ি—দুটো তলাই আমার, দয়া করে দশটি টাকা বাড়িয়ে দিয়েছি । কেন ছাড়ব এ বাড়ি ?'

'টালিগঞ্জের বাড়িতে কারা আছে ?'

'যারা ছিল তাদের বার করে দিয়েছি ।'

'করেছ ? কিন্তু নিজে হাঁসের নলি কামড়ে আছ বোকা বাড়িওলার, একেই বুঝি যুযুৎসু প্যাঁচ বলে । মাস্টাররাও এটা পারে ?'

'না হলে কী করে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হয় মাস্টার?'

মাথার ওপর ফ্যান রয়েছে, সেটা খুলে দেওয়া হয় নি। বাইরের হাওয়ায় উড়ে যায় ঘরটা মাঝে-মাঝে, ঘর গরম হয়ে উঠছে বটে; এখন হাওয়া নেই। এই এবারেই এসে পড়বে।

'কত সেলামি নিলে নতুন ভাড়াটের কাছ থেকে?'

ফ্যানটা খুলতে ভুলে গেছে কুলদা।

'পাঁচ হাজার টাকা।'

'তা হলে বেশ ভাল বাড়ি তোমার।'

'হ্যাঁ, দোতলা, ভেনেশ্যান পেন্টের বড় বাড়ি; খোলা জায়গা চার দিকে।'

'কত ভাড়া?'

'সাড়ে তিনশ টাকা—গোটা বাড়ির।'

'সাড়ে তিনশ!' নিশীথ চোখ খাড়া করে কুলদার দিকে তাকাল।

'চারশ, সাড়ে চারশ, পেতে পারতুম; কুমড়ো কেটে দু ফালি হবার মুখে তোবা-তোবা করে তুলে দিলে—'

'কুমড়ো কেটে দু ফালি হওয়া কাকে বলে কুলদা?

কুলদার কথা শেষ হতে না-হতেই ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে ললিতা বললে, 'এক ফালি হল পশ্চিমবাংলা, আর এক ফালি পাকিস্তান ও—আমি ভেবেছিলুম, ললিতা বললে।

'কী ভেবেছিলে?'

'বলতে লজ্জা করে,' কুলদার গা ঘেঁষে তন্বী উমার মত মুখে ঠোঁটে পাঁচি পটলির পোঁচড় মেরে কেমন বেঢপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন ললিতা।

'লজ্জা করে, তা হলে থাক এখন। তোমাতে আমাতে তোমার দিদিতে রাতের বেলা শুনব এখন।'

'আমি বলি কুলদা? যা ভেবেছিলুম বলে ফেলি?'

কুলদা একটু বিব্রত হয়ে বললে, 'না থাক, দরকার নেই। তোমার শ্বশুর-বাড়ির লোক মুখোমুখি বসে আছেন, তোমার ভাসুর ঠাকুরের বড় শালা, ওদের সামনে এয়োতি হয়ে সরে থাকতে হয়।'

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ললিতা বললে, 'তোমার ইউনিভার্সিটির খাতার নম্বর গুনছিলাম আমি—দুটো ভুল বেরিয়েছে।'

'কটা খাতার ভেতর ?'

'চারটে দেখেছি। ভুল শুধরে দেব ?'

'তুমি একটা দাগ দিয়ে রাখো, আমি দেখব গিয়ে।'

'আমাকে বিশ্বাস হয় না ?'

'কিন্তু ইউনিভার্সিটির খাতায় তুমি আঁক কাটবে ?'

'পাকিস্তান ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের থেকে ফাঁক হয়ে কুমড়োর মত গড়িয়ে পড়েছে, সেটা বনগাঁ গেলে টের পাওয়া যাবে ? চলো আজই যাই, দুটো ফালি দু দিকে কেমন গড়াচ্ছে দেখে আসি', ললিতা কুলদার থেকে খানিকটা দূরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললে।

'গড়াচ্ছে তো আমাদের মনে-মনে। কোথাও কিছু দেখবার নেই ললিতা।'

একটা পান মুখে দিয়ে ললিতা বললে, 'তা ঠিক। পৃথিবীর বুকে কোনো চিড় নেই। আমি চললুম।'

'কোথায় যাচ্ছ ?'

'তোমার খাতার নম্বর গুনতে।'

'হ্যাঁ। বেশ যোগ বসাতে পার তুমি ললিতা'—

'যোগবল আছে আমার তা হলে—শিবকে পটিয়ে নেবার মত ?'

'শিব তো পায়ে পড়ে আছে', কুলদা গলার আওয়াজে ময়াম মাখিয়ে বললে।

'কটা খাতা দেখেছ তুমি ?'

'তা দেড়শ হবে।'

'দেখি, নম্বরগুলো মিলিয়ে দেখি, তুমি যোগ দিতে বড় ভুল কর কুলদা।'

ললিতা চলে গেলে নিশীথ বললে, 'বাড়ি ভাড়া পেয়েই তো তোমার কলকাতার খরচ পুষিয়ে যায়, কেন মিছিমিছি চাকরি কর ?'

'তা হতে পারত যদি সাড়ে চার শ টাকার দাঁওটা মারতে পারতুম। ব্যাঙ্কে তো জমেছে হাজার পঞ্চাশেক, টেনেমেনে হয়ে যেত। গরিবানা চালে থাকতে হত। কী দরকার সে রকম থাকবার। কলেজের কাজ জলভাত হয়ে গেছে, ওটা না করলেই খারাপ লাগে। ওটা তো গোলামি নয়। ইয়ার্কি আড্ডা মেরে সাড়ে পাঁচশ টাকা পাওয়া।'

এতই সহজ ? নিশীথ অবাক হয়ে ভাবছিল। কোন জিনিসে দাঁড় করিয়েছে ওরা প্রফেসরিকে ? পড়াশুনো করতে হয় না ? কোন আদিকালে একটা

নোট লিখেছিল ইকনমিকসের, সেইটেই কপচে চব্বিশ-পঁচিশ বছর কলেজ চালাচ্ছে, আর আছে। চেহারার ভারিক্কেপনা আছে, গলার জোর আছে। কাছেই ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, কড়ায়া, চীনে টাউন, ললিতা, কলেজ সবই এদের দ্রাক্ষাক্ষেত্র—বিনে প্রতিভায়, বিনে পরিশ্রমে। আশ্চর্য, আশ্চর্য, কী আকাশ-পাতাল তফাত কুলদাপ্রসাদ আর নিশীথের জীবনে। কুলদা লক্ষ্মীর ঝাঁপি কোলে করে বসে আছে। মরীচিকার মত যার আঁচলের পিছে ছুটেছে নিশীথ, সে লক্ষ্মী নয়ই, সরস্বতী নয়, প্রফেসর ঘোষের নিশীথবাবু তো সেকেণ্ড ক্লাসের নিরবচ্ছিন্ন একটা দেয়ালের মত যেন। বিপ্লব, রক্তবিপ্লব, হারীত, অর্চনা, মোহিতা, নমিতা থিওজফির এস্ট্রাল প্লেনের মত যেন। হাতের কুড়ি-বাইশটা টাকা চব্বিশ বছর কলেজে কাজ করার পর উনিশ-কুড়িটা এক টাকার নোটে, বেশ খানিকটা দলে ভারী হয়ে শেষ রক্ষা করছে —এই যা রক্ষা।

'আমাকে কলকাতার কলেজে একটা কাজ দিতে হবে কুলদা।'

'এত দিন পরে এ বয়সে কলকাতায় কাজ নিলে সেই প্রথম থেকে শুরু করতে হবে তো তোমাকে নিশীথ। ডুবে মরবে।'

'প্রথম থেকে কী রকম?'

'মফস্বলে তো তুমি ভাইস প্রিন্সিপ্যাল।'

'তা তো আছি।'

'পাচ্ছ সাড়ে তিনশ। এখানে কত আশা কর তুমি?'

'কত দেবে?'

'কোন ক্লাস এম-এ তুমি?'

'সেকেণ্ড ক্লাস।'

কুলদা একটু দমে গিয়ে বললে, 'সেকেণ্ড ক্লাস—'

'তুমিও তো সেকেণ্ড ক্লাস কুলদা—'

কুলদা খানিকটা কৌতুক বোধ করে নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমার সেকেণ্ড ক্লাস নিয়ে চব্বিশ বছর আগে এ কলেজে ঢুকেছি। ফার্স্ট ক্লাসের বাবা তো আমি আজ। কিন্তু তুমি তো সেকেণ্ড ক্লাস'—

'কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসের বাবা হলাম না কেন আমি! আমিও তো চব্বিশ বছর কলেজে কাজ করেছি।'

'তা করেছ, কিন্তু আমাদের কলেজে কর নি তো।'

'ওঃ, তুমি আমির, নিজেদের কলেজে তোমাদের ?'

'বুঝেছ তুমি', কুলদা সিগারেটের ধোঁয়া ঘনিয়ে ছাড়তে-ছাড়তে বললে।

'রিপনে না, প্রেসিডেন্সিতে না, স্কটিসে না ?'

'ও-সব জায়গায় আলাদা উজির-আমির সব।'

'সেকেণ্ড ক্লাস ডিগ্রি নিয়ে ?'

'সেকেণ্ড ক্লাস—থার্ড ক্লাস—ফার্স্ট ক্লাসও আছে কম না।'

'ও—তা এই রকম বুঝি,' নিশীথ বললে, 'এর চেয়ে ঢের ভাল হতে পারত, কিন্তু এ যা হয়েছে এও খুব বেশি খারাপ নয়।'

টিনের থেকে একটা সিগারেট খসিয়ে নিয়ে দেশলাই খুঁজছিল ; সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে নিশীথ বললে, 'এ কলেজের ভাসুর ও-কলেজে কাজ নিতে গেলে ও-কলেজের ভাদ্রবৌদের মধ্যে ওরা ভিড়িয়ে দেবে বুঝি তাকে।'

'তাই তো দেবে, মফস্বলের ভাসুরদের একেবারে ন-বৌরা এসে চেপে ধরবে। নেবে নাকি কলকাতার কলেজে কাজ ?'

'কী রকম মাইনে পাওয়া যাবে ?'

'সকালে নেবে. না রাত্তিরে ?'

'তার মানে ?'

'মানে আমাদের কমার্স ডিপার্টমেণ্টের কথা বলছি।'

নিশীথ বিরক্ত হয়ে বললে, 'কমার্স ডিপার্টমেণ্টে কেন কাজ করব আমি। এমনি জেনেরাল ডিপার্টমেণ্টে চাই।'

কুলদা বাটার থেকে একটা পান তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে বললে, 'জেনেরাল ডিপার্টমেণ্টে কোনো ভেকেন্সি হয় না। হলেও ফার্স্ট ক্লাস, বিলিতি ডিগ্রি, ডক্টর এ ছাড়া নেওয়া হয় না কাউকে।'

'কলেজের এক্স-স্টুডেন্টদের নেওয়া হয় না ?'

'ফার্স্ট ক্লাস না পেলে—'

'গভর্নিং বডির শালা ভায়রা-ভাইদের নেওয়া হয় না ?'

'সেকেণ্ড ক্লাস পেলে ?'

'থার্ড ক্লাস না পেলে ?'

'তা নেওয়া হবে বইকি। নানা রকম কোড আছে কলেজে। কলেজ তো

একটা উচ্ছৃঙ্খল জায়গা নয়। তোমাকে এখন দুশ টাকায় আমাদের কলেজে ঢোকালে সেটা বিশৃঙ্খলা হবে।'

'কেন?'

'তুমি তো সেকেণ্ড কাস এম-এ নিশীথ।'

'তুমিও তো সেকেণ্ড ক্লাস কুলদা।'

'আ মল যা!' কুলদা একটু ঝেঁজে উঠে বললে, 'তোমাকে এত ক্ষণ তা হলে বোঝালুম কী।'

নিশীথ এক খিলি পান তুলে নিয়ে পানের লঙ্গটা খসিয়ে মুখে ফেলে দিয়ে বললে, 'মানে তুমি মাগ-ভাসুর হয়ে গেছ কলেজের আর আমি যমপুকুরের ব্রত করছি—সেই কথাটা।'

কুলদা পান চিবুতে-চিবুতে একটা চুরুট বের করে জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'সেই কথাটা। তা ছাড়া কলেজের গভর্নিং বডির লাডলি চাটুজ্যে, লর্ড মুখুজ্যে, বোকা বাঁড়ুজ্যের কেউ নও তো তুমি? নাকি, কেউ হও তুমি?'

'ওদের কে আমি?'

'তবে কী করে দু শ টাকায় ঢোকাব তোমাকে?'

'কত টাকায় ঢোকা যেতে পারে?'

'একশ টাকায়।'

'দেবে? জেনেরালে?'

'না। নাইটে; কমার্সে। টেম্পরারি হিসেবে।'

নিশীথ একটা নিশ্বাস ফেলে চুপ করে থেকে, তারপর বললে, 'সব জায়গায়ই এই রকম কুলদা? কলকাতার সব কলেজেই?'

'সব কলেজেই। তোমাকে রেখে-ঢেকে কথা বলে ধোঁকা দিয়ে কী লাভ। একই দেশের মানুষ তো আমরা। আমি আজ করে খাচ্ছি কলকাতায়। তুমি গোঁফ চুমড়ে পথ খুঁজছ। কোনো পথ পাবে না কলেজে—একশ টাকায় কমার্সে কাজ নিয়ে মান খোয়াবে তুমি নিশীথ?'

কুলদা পান তুলে নিয়ে চিবুতে লাগল। বেশ পান বানিয়েছে ললিতা। ললিতার দিদি, কুলদার স্ত্রী, গেছে নর্থ ক্যালকাটায় ভাইয়ের বাড়িতে। আজ রাতে ফিরবে না হয় তো। শ্যালিকাকে গল্প শোনাতে হবে আজ বেশি রাত অব্দি। বেশ ছাই জমেছে চুরুটের মুখে; ভারি আমেজ লাগছিল কুলদার।

'খবরের কাগজের অফিসে দেখ তুমি নিশীথ। দেড়শ-দুশ পেলে ঢুকে যাও। নাঃ পাকিস্তানে গিয়ে আর কী করবে। কলকাতায় থাকো, কলকাতায় থেকে যাও।'

কুলদাপ্রসাদের বাড়ি থেকে যখন বেরিয়েছে নিশীথ তখন চারটে বেজে গেছে। সকাল বেলা চা, দু-একটা স্যাণ্ডউইচ-ডিম ছাড়া কিছু খায় নি; প্রফেসর ঘোষের বাড়িতে এক কাপ চা, দুটো বিস্কুট, কুলদার এখানে কতগুলো পান খেল নিশীথ। বেশি সিগারেট খেয়ে, চা খেয়ে, ভাত না খেয়ে শরীরটা কেমন ঝিমঝিম করছিল নিশীথের। এখন শুয়ে পড়তে হয়, কোথাও দাঁড়াতে পারা যাচ্ছে না যেন আর; কেউ যদি কিছু না মনে করে তা হলে ফুটপাথেও শুয়ে পড়তে রাজি সে। একটা বেশ ঝাঁকড়া গাছ দেখে নিয়ে তারই তলায় ফুট-পাথের ওপর শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করছিল, গায়ের থেকে পাঞ্জাবিটা খুলে একটু বিছিয়ে নিয়ে তার ওপর মাথাটা রেখে। কিন্তু মুশকিল, তাকে কেউ ভিখিরিও মনে করবে না, পাগলও ভাববে না; কেন সে এ রকমভাবে শুয়ে পড়ল বুঝে দেখবার জন্য তার চারিদিকে লোক জড়ো হয়ে যাবে। শুলেই ভাল হত কিন্তু এটা-সেটা ভেবে নিশীথ ফুটপাথের একটা গাছের গুঁড়ির ওপর গিয়ে বসল। গুঁড়ি বলে ঠিক কোনো জিনিস নেই, দু-চারটে বেশ মোটা শেকড় ওপরে চাগিয়ে আছে; মাটি শেকড়ের ওপর বসে জিরিয়ে নিতে লাগল। গাছে ঠেস দিতেই ঘুম এল। মিনিট পনের-কুড়ির মধ্যেই ঘুমের চটকা ভেঙে গেল নিশীথের। নানা রকম লোকজন ফুটপাথে গাছের চারদিকে এসে হল্লা করছে, কোত্থেকে একটা চারপাই নিয়ে এসেছে, সেখানে গড়াচ্ছে দেশোয়ালি দু-চার জন; নীচে ময়লা কাঁথা-কাপড় ছড়িয়ে দোসাদ, কাহার, মাহাতো মেয়ে, বুড়ি, ছোট ছেলেপিলেরা বসেছে, কাঁদছে, গড়াচ্ছে, ল্যাং মারছে, ডিগবাজি খাচ্ছে, পেটে গিঁট মাজায় গিঁট মেরে বিশ্বকর্মা পুজোর ঘুড়ির মত পাতা ফচ্-ফচ্ বন্‌বন্ করে তোলপাড় করে তুলছে সব। কেউ-কেউ শুকনো ডাল-পালা, রাস্তার এঁটো কাগজ, রাবিশ জোগাড় করে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করছে। বোধহয় রান্নাবান্না চড়বে এখন।

নিশীথ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্রফেসর ঘোষকে দেখা হল, কুলপ্রসাদকে দেখা হল, এখন কার কাছে যাওয়া যায়? কলেজের চাকরির কথা এখন আর ভাবা উচিত নয়। চার-পাঁচ বছর ধরে কলকাতার কলেজ কর্তৃপক্ষদের কাছে

ঘুরে দেখেছে তো সে। বিশেষ কোনো আশা-আশ্বাস পাওয়া যায় নি কোথাও; দু-একজন গাছে চড়িয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত মই টেনে নিয়েছে; নিদারুণভাবে আশা ভঙ্গ করেছে।

ঠিকই বলেছে কুলদাপ্রসাদ, সেকেণ্ড ক্লাস ডিগ্রি নিয়ে কোনো মুরুব্বির কেউ না হয়ে কলকাতার কলেজে ভাল চাকরি পাওয়া অসম্ভব; পেতে পারে একশ টাকায়, কমার্স ডিপার্টমেণ্টে, রাতের বেলা। কুলদা কলকাতার সব কলেজের সব খবরও জানে। এ দিক দিয়ে কলকাতায় সত্যিই কিছু হবে না নিশীথের। কলেজে কাজ করতে হলে জলপাইহাটি ফিরে যেতে হয়, কলকাতায় থাকতে হলে অন্য কোনো চাকরির জোগাড় দেখতে হয়। কুলদা খবরের কাগজের কথা বলছে। কিন্তু কলকাতার খবরের কাগজের চাকরিতে মন উঠছে না নিশীথের। পলিটিকসে তার কৌতূহল আছে বটে, কিন্তু রোজকার পলিটিকস নিয়ে এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মাথা ঘামাতে পারে না সে; যারা ঘামায় তাদের কথাবার্তা শুনে বমি আসে তার। তা ছাড়া কাগজের সম্পাদনার ভার কে দিচ্ছে নিশীথকে? কে দেবে তাকে সত্যি স্বাধীনভাবে সম্পাদকীয় লিখতে? সহযোগী, না কি সহকারী, সম্পাদকের কাজ পেতে পারে সে নীচের দিকে—মুরুব্বির জোর থাকলে। সেই জন্যে দিন-রাত তাকে গলা জলে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে—পলিটিকসের পতরি পুকুরে—উদয়াস্ত কাঁথাকাচার গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে। বিদেশী ইউরোপ-আমেরিকার পলিটিকসও নয়, একেবারেই ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে কলকাতার কলতলার নিরেট আসর জমিয়ে বসতে হবে তাকে। রোজ যেতে হবে কাগজের অফিসে, রোজ লিখতে হবে; বাংলা-দেশের রামমোহন-লালমোহন কী করছে, পদিপিসি কী ঘুন্বল দিচ্ছে—যাদের কথা দিনান্তেও একবার প্রবেশ লাভ করতে পারে না নিশীথের জনে-নির্জনে বাস্তবে, আখ্যানিক জীবনে, তারাই হবে নিশীথের নিত্যনৈমিত্তিক লেখার বিষয়। তাদের তারিফ করতে হবে, যেটা কাগজের পলিসি।

নিজেরা খাওয়াখায়ি করে মরে রামমোহনরা কাগজের পলিসি বদলে দেয়। কিন্তু জন-প্রয়োজন রামমোহনদের উৎখাত করতে পারে না, এ দেশে অন্তত না, আজ পর্যন্ত না। খবরের কাগজও জনসাধারণের বিশেষ কেউ নয় আমাদের দেশে। এ হেন জিনিসের সেবা করতে হবে কয়েকটা টাকার জন্যে। লালমোহন-রামমোহন যদি সহচর হয় শূন্য-শূন্যান্তের অভিযানে তা হলে তাদের ঘোড়ার

পিঠে মখমলের বালামটির কাজ করতে হবে নিশীথকে—লালমোহনদের স্থূল পশ্চাদ্দেশকে প্রভূত আরাম দেওয়ার জন্যে সারগর্ভ সম্পাদকীয় লিখে। গম্ভীর হয়ে ভাবছিল নিশীথ। কটা টাকা দেবে এ জন্যে নিশীথকে ওরা? দেড়শ দুশ সোয়া দুশ। দেড় হাজার-দু হাজার টাকা পেলেও এ কাজে মন বসবে না নিশীথের। এ তার নিজের কাজ নয়, এ সব কাজের জন্য জন্মাতে হয় মায়ের পেটে থাকতে-থাকতেই; পেটের থেকে পড়ে শিখলে চলবে না।

নিশীথ পায়ে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কোথাও একটা কাজ জুটিয়ে নেওয়া দরকার। খুব তাড়াতাড়ি কিছু করে নিতে না পারলে পকেটের কুড়ি-বাইশ টাকা দিয়ে কত দিন চলবে তার কলকাতায়—কত দিন চালাবে সে মানব-জীবনটাকে, সপরিবারে?

একবার শেষ চেষ্টার মত অমুক কলেজের সত্যিকারের বাবা জয়নাথের সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়? জয়নাথের সঙ্গে এর আগেও কয়েক বার দেখা করে-ছিল নিশীথ গত পাঁচ-সাত বছরে। কলেজের কাজের ব্যাপার নিয়ে। জয়নাথ আশা দিয়েছে সব সময়েই, কিন্তু আসল কাজের সময় হয় নি। সই করে দিয়েছে, মুখে বলেছে, কিছু করে উঠতে পারি নি দাদা। বাবার হোটেলে বাবাই যদি কিছু করে উঠতে না পারে তা হলে দুগ্ধপোষ্য শিশুরা দাঁড়াবে কোথায়, এ রকম মুখের ভাব নিয়ে সে কলেজের প্রফেসররা জয়নাথকে ঘিরে থাকে সব সময়। তাদের সেই বাবা নিজে নিশীথকে বারবার 'এই হচ্ছে', 'এই হল আর-কি' বলে, অবশেষে জয়নাথবাবুর নিতান্তই সঙ্কটাবস্থার সময় তাকে গোরু খোঁজা করে বার করতে পারলে আক্ষেপ করে বলত, আমার হাতে তো কিছু নেই, মতিমোহনবাবুর ছেলেকে নিতে হল কিংবা জস্টিস ভড় নিজে তাঁর মিনার্ভা কার হাঁকিয়ে এসে বললেন, আমি ধরণী ভড়কে না নিয়ে করি কী; ইদানীং বলেছিলেন, শহিদ বটব্যালের জামাই ফাঁসির রসিকলালের শালা এসে ধরে পড়েছিল, কী করি, শহিদদের ওপর তো একটা কর্তব্য আছে আমাদের (পনের আগস্টের পর থেকে), তোমাদের না দিয়ে ভল্টুকেই দিলুম। সেকেণ্ড ক্লাস, তা যাক, হোক ফাঁসির রশ্মির উবগার, একসঙ্গে তো পড়েছিলুম আমি আর রমি। কিন্তু ভল্টুকে ষাট-সত্তর টাকা মাইনেয় পাওয়া গেছে, নিশীথকে তো একশ সত্তর দিতে হত, কিংবা দেড়শ অন্তত; ফাঁসির রশ্মি তো আসল কথা নয়। আসল কথা হত যদি সেটা, জয়নাথকে কুলদার

চেয়েও বেশি শ্রদ্ধা করত নিশীথ। কিন্তু এমনই মিনমিনে মিটমিটে জিনিস জয়নাথ যে তাকে প্রফেসর ঘোষের চেয়েও শ্রদ্ধা করে নিশীথ।

কিন্তু তবুও তার, তার বাবার এবং তার আধ্যাত্মিক খুড়ো-জ্যাঠাদের চেষ্টায় কলেজটির উৎপত্তি। এতগুলো লোকের হাতে একটা জিনিসের জন্ম হলে সেটার ভেতরে খানিকটা অসঙ্গতির দোষ বুঝি না বর্তে পারে না, ভাবছিল নিশীথ। কিন্তু সে দোষকে শোধিত করে নিচ্ছে অহরহ জয়নাথ, কলেজের জন্য নানা দিক থেকে চাঁদা তুলে, ডোনেশন সংগ্রহ করে, গভর্নমেণ্ট ও ইউনিভার্সিটির আর্থিক ও পারমার্থিক সাহায্যে ও পরামর্শে, পরামর্শগুলো যদি বাতাসার মত বোধ হয় তা হলে আশ্চর্য প্রক্রিয়ায় সে গুলো বাতাবি লেবুতে পরিণত করে সরবৎ বানিয়ে খেয়ে ফেলে। এখন জয়নাথই কলেজের একমাত্র পিতা। আগেকার পিতারা অনেকেই মৃত; যারা আছে তারা নিজেদের ঔরসের পূর্বস্মৃতি সম্বন্ধে সন্দিহান।

আজকাল পাকিস্তানের হিন্দু ছেলেরা দল বেঁধে কলকাতায় পালিয়ে এসে জয়নাথের বড় সুবিধে করে দিয়েছে। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত অধ্যাপক-দের নিয়ে মাথা ঘামাবার খুব ইচ্ছে জয়নাথের; কিন্তু পথ পাচ্ছে না এবং হাজার-হাজার ছেলে বাড়ছে, পুরোন কলেজ-বাড়িতে আঁটছে না কোথাও আর, নতুন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরি হচ্ছে কলেজের; ইঁটতে-ইঁটতে রাজমিস্ত্রিদের কাজ দেখছিল নিশীথ। রাজমিস্ত্রিদের দেখতে-দেখতে নিজের অজান্তেই যেন জয়নাথের ঘরে এসে ঢুকল নিশীথ; কলেজের থেকে ঢের দূরেই তো জয়নাথের বাড়ি—ঢের নিভৃতে; একটা কলকাতার উত্তর দিকে, আর-একটা দক্ষিণে বালিগঞ্জে। এত তাড়াতাড়ি কী করে এল সে!

বালিগঞ্জের বাড়ির নীচের তলায় একটা কার্পেট-বেছানো সোফা-ছড়ানো চমৎকার কামরায় বড় গদি-আঁটা ইজিচেয়ারে বসেছিল জয়নাথ।

জয়নাথ চার-পাঁচ বছরের বড় নিশীথের চেয়ে। একান্ন-বাহান্ন হবে জয়নাথের। জয়নাথের কাছে বছর খানেক পড়েছিল নিশীথ—কোন কলেজে তা ঠিক মনে পড়ছে না। তবে এই কলেজটায় নয়। এ কলেজে নিশীথ পড়ে নি কোনো দিন।

জয়নাথ একটা তাঁতের ধুতি পরে, স্যামুয়েল ফিটজের বাড়ির রেডিমেড শার্ট গায়ে দিয়ে বসেছিল, মুখে চুরুট, চুরুট আজকাল জয়নাথ চব্বিশ ঘণ্টাই প্রায় খায়;

নেড়েচেড়ে দেখছিল একটা মস্ত বড় ঢাউস বাংলা দৈনিক ; স্টেটসম্যানও আছে, ভাঁজ এখনো খোলা হয় নি ; অমৃতবাজারও আছে।

'কে আপনি ?' কাগজের শিটটা মুখের ওপর থেকে একটু সরিয়ে জয়নাথ বললে।

'রাতে কাগজ পড়ছেন ?'

'দিনের বেলা সময় হয় নি। সারা দিন বড্ড ব্যস্ত ছিলুম।'

'আজ তো কলেজ ছুটি ছিল।'

'হাঁা, কলকাতায় ছিলুম না। খুব ভোরেই বসিরহাট যেতে হল ; গাড়িটার সব্বনাশ হল আর-কী। গাড়িটা না নিলেই পারতুম, বাসই তো ছিল। এই তো এলুম বসিরহাট থেকে'—

'বসিরহাট গিয়েছিলেন', নিশীথ শুরু করতেই সে দিকে কান না দিয়ে নিজের কথার জের টেনে জয়নাথ বললে, 'ওরাই গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যাবে বলেছিল, গরজ তো ওদেরই। কেন আর গরিব-গুরবোদের কষ্ট দেওয়া, নিজের গাড়িতেই গেলুম, পেট্রোল খরচটা দিয়েছে, জোর করে গছিয়ে দিল।'

'বসিরহাটে টিচারদের মিটিঙে'—

'না, না, ও-সব অনেকবার করেছি। না, দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখন সকলেরই পায়া বাড়বে। অনেক মিটিঙ-ফিটিঙ হবে। আমরাও মিটিঙ করব। কিন্তু কিছু হবে না শিগগির।'

জয়নাথ চুরুটে একটা টান মেরে বললে, 'আসল জিনিসটা তো হয়েছে। আমরা স্বাধীন হয়েছি। এখন ও-সব ফিচেল জিনিসগুলো ধরে টিচারদের স্টেটাস, টিচারদের মাইনে বাড়ানো, টিচারদের বেড়ানো-টেড়ানো, বিয়ের বাদ্যি বাজনা ও-সব কিছুদিনের জন্য মুলতুবি থাকুক গে বাবা—'

জয়নাথ কিছু ক্ষণ নিজের মনে চুরুট টেনে নিল। খবরের কাগজের শিট পড়ে গেল কার্পেটের ওপর।

'না, বসিরহাট গেছলুম মেজ শালির মেয়ের বিয়েতে। আমরা বদ্যি। মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে মোড়লের ছেলের সঙ্গে। ছেলেটি যদি বড় ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হত তা হলে বিশেষ কোনো গোলমাল ছিল না। কিন্তু স্বদেশী আমলে স্বদেশী করেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখনো স্বদেশী করছে সোদপুরে আর নোয়াখালিতে। এ যাবৎ কানাকড়ি রোজগার করছে না, ও দিকে জেতে চাঁড়াল।

শালি তো কেঁদেই আকুল। বলে রমলার বিয়েতে এ যাবৎ প্লেগের ইন্দুরের মাছিও পড়ছে না আমার বাড়িতে। সব ভোঁ-ভোঁ! তুমি এস, তুমি এস, তুমি এলে সব সুড়সুড় করে—একটা কলেজের মাথায় তুমি, বহু বড় মর‍্যাল সাপোর্ট তোমার। কেউ না এলে শুধু তুমি এলেই আমাদের মর‍্যাল ভিক্টরি হবে।'
জয়নাথ চুরুটটা দাঁতে কামড়ে নিয়ে বললে, 'এই তো মর‍্যাল সাপোর্ট দিয়ে ফিরলুম বসিরহাট থেকে।'
'হয়ে গেছে বিয়ে?'
'হ্যাঁ। মোস্ট ডিসাইসিভ মর‍্যাল ভিক্টরি। আমি গিয়ে দেখলুম আট-দশজন ফ্যা-ফ্যা করছে বিয়ে বাড়িতে। আমি যেতেই সোরগোল পড়ে গেল। দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেই লোকে তলিয়ে গেল বিয়ের আসর। ওরাই করল-কম্মাল সব, জিনিস কিনল, ভোজ লাগাল; দলে-দলে এসে কুকুরের মত পাত চেটে জিগির দিচ্ছে—এখনো তো।'
'বেশ ভালই হল।' নিশীথ বললে।
'আপনি বদ্যি তো?'
'হ্যাঁ।'
জয়নাথ মুখের চুরুট নামিয়ে ঠোঁট চেটে একটু হেসে বললে, 'আমরাও বদ্যি। মজুমদার বদ্যি। লোকে বলে হ্যাঃ, ওরাও আবার বদ্যি, ওরা তো মহেশ্বরদির, ওরা তো চাটগাঁ সিলেটের, কালীকচ্ছের, সেখানে বদ্যি-কায়েতে বদ্যি-চাঁড়ালে, প্রতিলোম বিয়ে হয়।'
'হলে হবে,' নিশীথ বললে, 'জাত-ফাত দিয়ে কী হবে।'
'কিছু হবে না,' জয়নাথ চুরুট কামড়ে ধরে বললে, 'তবে জেনে রাখুন, যার সঙ্গে দেখা হবে, কথায়-কথায় ফাঁসিয়ে দেবার ইচ্ছে যদি হয় তবে দেবেন। বলবেন জয়নাথবাবুরা মহেশ্বরদির বদ্যি নয়। ওদের এক সঙ্গে সেনহাটির এক সঙ্গে ভট্ট-প্রতাপের'—জয়নাথ বংশের গরিমায় রক্তের চাপ প্রায় দুশর দিকে পাঠিয়ে দিয়ে খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে নেবার প্রয়োজনে রয়ে-সয়ে আস্তে-আস্তে চুরুট টানতে লাগল, পেঁচার মত বড়-বড় বিষয়ী বিশেষিত চোখের কেমন একটা চিৎপ্রকটে নিশীথের দিকে তাকিয়ে।
'আপনার নাম আমার মনে আছে।'
'মনে আছে? এসেছিলাম কয়েক বার আপনার কাছে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, সব মনে আছে আমার', কার্পেটের ওপর থেকে কাগজের একটা শিট কুড়িয়ে এনে পাশে একটা মোড়ার ওপর রেখে দিয়ে জয়নাথ বললে, 'আপনার নাম তো নিশীথ সেনগুপ্ত।'

'হ্যাঁ, নিশীথ সেন।'

'সেন? গুপ্তটা কেটে কি বাহাদুরি হল? এমনি সেন তো ছোটকায়েত, শুদ্দুর, সোনার বেনে'—

'আমি ও-সব জাত-টাত নিয়ে মাথা ঘামাই নে, সবই তো সমান; অন্তত একই রকম সুযোগ-সুবিধা পাওয়া উচিত সকলের। মানুষকে ছোট জাত বানিয়ে চেপে রেখে কী হবে?'

'না, ওতে কিছু হবে না। আমরা অন্তত মানছি না। মোড়লের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি। দিয়েছেন আপনারা?'

নিশীথ পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'আমার কোনো মেয়েরই বিয়ে হয় নি এখনো। ভাল পাত্র পেলে দেব বই কি—মোড়লে আটকাবে না।'

জয়নাথ চুরুটের ছাইয়ের দিকে তাকিয়ে নিস্তব্ধ মুখে বললে, 'সমাজ এই রকমই হচ্ছে। ভালই। আমিও তো ব্রাহ্মসমাজ ঘেঁষা এ সব বিষয়ে; আমার বাবা তো ব্রাহ্মই ছিলেন। আপনি বদ্যি তো নিশীথবাবু?' কেমন একটা খটকায় বেঁধে নিশীথকে জিজ্ঞেস করলে জয়নাথ।

'জন্মেছিলুম তো বদ্যির ঘরে।'

'কোথাকার বদ্যি? সেনহাটির?'

'না।'

'মহেশ্বরদির?'

'না। আমরা কোথাকার বদ্যি আপনার বাবা গয়ানাথবাবু তো জানতেন।'

জানে জয়নাথ নিজেও। নিশীথদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে জয়নাথদের বাবাদের কী নিকট সম্বন্ধ ছিল সেটা গয়ানাথবাবুর মুখেই শুনেছে এরা। শুনে ভুলে গেছে (ও-সব কথা মনে করে রাখার দায়িত্ব অনেক)। এখন কিংবদন্তী হিসেবে মাঝে-মাঝে মনে পড়ে।

জয়নাথ একটু সতর্ক হয়ে সামলে নিয়ে অন্য কথা পেড়ে বললে, 'আপনারও সিগারেট খাওয়া অভ্যেস আছে নাকি?'

'হ্যাঁ, খাই মাঝে-মাঝে।'

'আমি তো প্রিন্সিপ্যাল মানুষ,' জয়নাথ বেশ সদাশয়ের মত হেসে বললে, 'খান আমার সামনেও ?'

নিশীথের খেয়াল ছিল না বটে, একেবারে আত্মীয়ের মত জয়নাথ এমন ঘিরে বসতে থাকে যে এ সব খুঁটিনাটি ব্যাপারে হুঁস থাকে না যেন মুহূর্তের তরে। মনে হয় যেন সমানে-সমানে বসা হয়েছে প্রায়—দুজন ঘাগি মাস্টার। কিন্তু জয়নাথ তো উঁচুআলা, সদরালা।

'আমার কলেজের প্রফেসররা আমার সুমুখে সিগারেট খান না।'

'আচ্ছা আমি রেখে দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে নিশীথবাবু।'

'কোথায় অ্যাসট্রে আপনার ? দেখছি না ত ?'

'ঠিক আছে নিশীথবাবু, ঠিক আছে, খান সিগারেট খান আপনি।'

জয়নাথের মুখের দিকে না তাকিয়েই নিশীথ উপলব্ধি করল যে বেশ সদন্তঃকরণে কথা বলছে জয়নাথ। এ রকম সনির্বন্ধ আশ্বাস পেয়ে বেশ ভরপুর আত্মিকভাবে টান দিল সিগারেটটায় নিশীথ।

'এটা তো আমার কলেজের প্রিন্সিপালের কামরা নয় নিশীথবাবু, আপনিও আমাদের কলেজের মাস্টার নন। কেন খাবেন না সিগারেট ?'

'পড়েছিলুম এক বছর আপনার কাছে।'

'কে, আপনি ? কোন কলেজে ?'

নিশীথের মনে পড়ছিল না। নিশীথ সিগারেটে আর-একটা মোটা টান মারবার ইচ্ছেটাকে দমিয়ে রেখে মুখ এড়িয়ে ভেবে দেখছিল।

'এ কলেজে ?'

'না, এ কলেজে না।' নিশীথ বললে।

'আপনি তো স্কটিশের ছেলে।'

'তা কী করে জানলেন আপনি ?'

'বাঃ, জানব না। আপনার থেকে তো মাত্র বছর তিন-চারের সিনিয়র আমি। আপনি ইউনিভার্সিটির ফিফথ ইয়ারে যখন—তখন তো ইণ্টারমিডিয়েট ল পড়ছি আমি, আমি নিজে তো স্কটিশ চার্চ কলেজের ছেলে। আমাদের পরে —পর-পর তিন-চার বছর কারা স্কটিশ চার্চ থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে এল সে সব

নতুন-নতুন ছেলেদের মুখ চিনে রাখতুম না আমি কলেজে পড়বার সময় ?'

'সেটা কি সম্ভব ?' নিশীথ একটু অবাক হয়ে ভাবছিল।

'তা ছাড়া' জয়নাথ কী যেন বলতে গিয়ে, না বলে, মুখে চুরুট গুঁজে দিয়ে দেয়ালের একটা নন্দলাল বোসের ছবির দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

পরপর তিন-চার বছর স্কটিশ চার্চ কলেজের থেকে ক্রমাগত পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছেলেদের মুখ চিনে রেখেছে জয়নাথবাবু এম-এ পাশ করে বেরিয়ে ইউনি-ভার্সিটির করিডরে বেড়াতে-বেড়াতে, এও বিশ্বেস করতে হবে ? থাকতে পারে খানিকটা মুখ চেনা জয়নাথবাবুর।

নিশীথের সিগারেট নিভে যাচ্ছিল, আস্তে দুটো টান দিয়ে জয়নাথের বাবা গয়ানাথবাবুর কথা ভাবছিল, যিনি নিশীথকে সঙ্গে করে নিয়ে একদিন উত্তর কলকাতায় গয়ানাথবাবুর দোস্ত মহম্মদ লেনের বাড়িতে সকলের সঙ্গে তার আলাপ করাতে গিয়েছিলেন প্রায় সাতাশ-আটাশ বছর আগে। দোস্ত মহম্মদ লেনের আধোভাঙা গলির গয়ানাথবাবুর বাড়িতে তারপরেও দু-তিনবার গিয়েছিল নিশীথ। গয়ানাথবাবুর মৃত্যুর পর সে বাড়িতে আর যায় নি সে। একুশ কাঠা জমির ওপর বালিগঞ্জ প্লেসের এই অনির্বচন বাড়ি যে দোস্ত মহম্মদ লেনের গয়ানাথের ছেলেরা একদিন সম্ভব করে তুলবে এমন দুঃস্বপ্ন গয়ানাথের ধারণার ত্রিসীমানায়ও কোনোদিন ছিল না। কিন্তু তা তো হল। গয়ানাথ বেঁচে থাকতে হল না। সেটা হলে খুব খুশি হত নিশীথ। গয়ানাথবাবু তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় ঝালিয়ে দিয়েছিলেন নিশীথের ; তাঁর মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর ছেলেদের সঙ্গেও। গয়ানাথবাবুর স্ত্রী স্বামীর আগেই মারা যান, মেয়েদের কথা বিশেষ কিছু মনে নেই নিশীথের, ছেলেদের প্রকোপ এখনো কিছু-কিছু চোখে পড়ে ; জয়নাথ, অজয়নাথ, বিজয়নাথ, সুজয়নাথ—এই চার ছেলেই তো গয়ানাথের। না আর-কেউ আছে ?

'আপনার বাবা গয়ানাথবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল।'

জয়নাথ চুরুটের মোটা ছাইটা ঝেড়ে ফেলে দিল। চুরুট নিভে যায় নি, জ্বলছে।

'তা শুনেছি আমি'—

শুনেছে শুধু ? চোখে দেখে নি ? চোখে দেখা জিনিস মনে নেই জয়নাথবাবুর ?

'আপনারা তখন দোস্ত মহম্মদ লেনের একটা বাড়িতে ছিলেন।'

ও-সব পুরনো কথা শুনতে ভাল লাগে না জয়নাথের। চার ভাইয়ে মিলে তারা

রাতকে দিন করে দিয়েছে ; জলের ওপর দিয়ে নৌকো চালিয়ে নিয়ে গেছে ; বালিগঞ্জে পঁচিশ-ত্রিশ কাঠা জমি কিনেছে, ডি-কে ব্যানার্জি কণ্ট্রাক্টরকে লাগিয়ে চমৎকার জ্যামিতিক প্রাসাদ তুলেছে, চোখ জুড়িয়ে যায় দেখলে ; পুরনো কলেজটাকে চার ভায়ে মিলে হাতড়ে নিয়ে সেটাকে নবরক্ত দান করেছে—এখনই সেই দোস্ত মহম্মদ লেনের কথা পাড়া ?

'তা ছিলুম আমরা', ক্ষোভ, বিক্ষোভ, খানিকটা ভৎর্সনার বশে আগুনে গনগন করছিল জয়নাথের মনটা। ছাইচাপা আগুনের মত অস্পষ্ট চোখ নিয়ে নিশীথের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল জয়নাথ।

'অজয়নাথ কী করছে এখন ?'

'আপনার চেয়ে ছোট বুঝি অজয় ?'

'আমার সমান ; বিজয় আর সুজয় আমার ছোট।'

'অজয় ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এসেছে বিলেত থেকে। বিয়ে করে শ্বশুরের টাকায় বিলেত গিয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম খুলে বসেছে।'

'বিজয়নাথও তো ইঞ্জিনিয়ার ?

'না, সে ডাক্তার, এখানকার এম-বি, বিলেত যায় নি। পসার জমিয়ে বসিয়েছে। বিলেত যাবার দরকার করে না। কোনো-কোনো মাসে আট হাজারও তো পায়। বোকামি করেছে। যুদ্ধে গিয়ে নার্স বিয়ে করে এসেছে। গ্রীক-ইহুদি। দেখতে বেশ সুন্দর, বেশ ছিমছাম, বেশ ঘরজোড়া ; হেলেসপণ্ট সমুদ্রের মত। কিন্তু ও-সব ফিরিঙ্গি কি আমাদের ঘরে মানাবে। আমরা চার ভাইয়ে মাগ নিয়ে এক সংসারে থাকতে চাই তো এক হাঁড়িতে।'

'ফিরিঙ্গি কি করে হল ? গ্রীক তো। গ্রীস তো আমাদের ইংরেজির প্রফেসরদের গয়াতীর্থ জয়নাথবাবু।'

'গ্রীক-ইহুদি।' জয়নাথবাবু একটু বিরক্ত হয়ে বললে। গয়ানাথবাবুর ছেলে তিনি। নিশীথের গয়াতীর্থের কথাটা কানে বেজেছে তাঁর।

'ইহুদি তো ফিরিঙ্গি নয়,' জয়নাথকে বলতে গিয়ে নিজেকেই যেন বললে নিশীথ।

'সুজয় ব্যারিস্টারি পাশ করে এসেছে বছর দশেক হল।'

'হাতযশ জমিয়েছে হাইকোর্টে ?'

'না। হ্যাঁ, যায় হাইকোর্টে। তবে হচ্ছে না কিছু হাইকোর্টে, পেটিকোটে

একটু বেশি আটকে গেছে কিনা। আমি ওকে আমাদের কলেজের হিস্ট্রির প্রফেসর বানিয়ে দিয়েছি। সাড়ে চারশ মাইনে।'

'ল পাশ তো সুজয়নাথ।'

'ভাল পড়াতে পারে হিস্ট্রি।'

'হিস্ট্রিতে ট্রাইপসও তো বটে?'

'না, ওখানকার বার-অ্যাট-ল সুজয়, আর-কোনো পরীক্ষা দেয় নি। ও কলকাতা ইউনিভার্সিটির এম-এ, হিস্ট্রিতে।'

'গোল্ড মেডেলিস্ট তো হিস্ট্রিতে?'

'কে?'

'সুজয়।'

'সুজয়নাথ পড়ায় ভাল।' জয়নাথ বললে।

'ঈশান স্কলার তো হিস্ট্রিতে?'

'কে?'

'সুজয়নাথ।

'বেশ পড়ায় সুজয়। বেশ পড়ায়। স্যাডলার কমিশন এখন এলে বড় সুবিধে হত সুজয়নাথের। পরে মাইকেল স্যাডলার', চুরুটের আগুন নিভে গেছে জয়নাথের, চুরুটটাও শেষ হয়ে গেছে আর, সেটাকে অ্যাশট্রের ভিতর ফেলে দিয়ে একটা কড়কড়ে জাভা চুরুট বের করে ফেলে জয়নাথ।

'বেশ জমিয়ে রাখতে পারে ক্লাসটাকে সুজয়নাথ,' সুজয়নাথ ঈশান স্কলার কিংবা গোল্ড মেডেলিস্ট কি না সে সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করতে গেল না জয়নাথ। নিশীথও খোঁচাতে গেল না আর; প্রফেসর ঘোষকে খুঁচিয়েছে, কুলদাকে খুঁচিয়েছে, কেন খোঁচাতে যাবে জয়নাথকে মিছিমিছি আর। সুজয়নাথ হয় তো ফার্স্ট ক্লাস থার্ড কিংবা থার্ড ক্লাস ফার্স্ট; একই তো কথা, আর এ সব আমাদের দেশে ডিগ্রিদার মাল পয়দার ব্যাপারে। তবে আর কেন মিছিমিছি সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট ক্লাস কি না জিজেস করা। সেকেণ্ড ক্লাস পেয়ে প্রফেসর ঘোষ, কুলদারা তো জাঁকিয়ে আছে। কত ফার্স্ট ক্লাস তো মোটা মাইনে পেয়ে মজতে-মজতেই কাটাল চিরটা কাল।

'গয়ানাথবাবুর সঙ্গে আমার বাবার খুব ভাব ছিল।'

জয়নাথবাবু চুরুট টানতে-টানতে অস্ফুট স্বরে বললে, 'শুনেছি।'

'গয়ানাথবাবু যখন সস্ত্রীক ব্রাহ্ম হলেন তখন হিন্দু সমাজের আত্মীয়েরা তো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল গয়ানাথবাবুকে। পথে বেরুলেই দুয়ো দিত স্বামী-স্ত্রীকে সেকালের হিন্দুরা। কোনো চাকরি নেই বাকরি নেই, এক বস্ত্রে বেরিয়ে যেতে হল। আমার ঠাকুর্দা তখন হালিশহরে চাকরি করতেন; তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠলেন গয়ানাথবাবু, শুনেছি বাবার কাছে। গয়ানাথবাবুর আত্মীয়েরা হালিশহর পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল গয়ানাথবাবুকে, হানাবাড়ি হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠাকুর্দার ঘর কখানা। তেড়িয়া হয়ে ছুটে এসে আত্মীয়েরা পচা মুর্গির ডিম নাকে-মুখে ছুঁড়ে গয়ানাথবাবুকে নাকাল করত; বলত, বেম্মো হয়েছিস, নে খা হোমাপাখির ডিম খা; একদিন একশটা পচা ডিম দিয়ে গয়ানাথবাবুকে গঙ্গাস্নান করিয়ে দিলে; তিনি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সহ্য করলেন সব। ঠাকুর্দা সে দিন বাড়ি ছিলেন না। আশ্চর্য, মহানুভব মানুষ বটে গয়ানাথবাবু। অহিংসা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, প্রচার করেছিলেন গান্ধীজিও! সে কালের ব্রাহ্মরাও নিজেদের জীবনে এ সব খুব দেখিয়ে গেলেন বটে।'

'কী হবে এ সব কথা বলে এখন?'

'শহিদদের অগ্নিযুগের কথা বলা হয়, এও আর-এক রকম অগ্নিযুগের কথা— নানা রকম সমাজ ও ধর্মসংস্কারের দিক দিয়ে।'

'কী হবে এ সব কথা এখন আমাকে শুনিয়ে নিশীথবাবু?'

নিশীথ এক টিপ নস্যি নিয়ে বললে, 'গয়াবাবুর কথা বলছিলাম। এমন লোক অনেক দিন দেখি নি।'

'আমি যা বললাম সে কথার উত্তর দিন,' জয়নাথ চুরুটটা তার মুখের কাছে তুলতে-তুলতে বললে, 'আমার বাড়িতে এসে এ সব কথার পাট নিয়ে বসেছেন, নিশীথবাবু আপনি।'

'দু বছর রুখেছিলেন ঠাকুর্দা আর বাবা, গয়ানাথবাবুর ড্যাকরা আত্মীয়দের। পচা ডিম, পাঁকাল মাছ, কুকুর-শুয়োরের, মানুষের বিষ্ঠা ছোঁড়া দেহজিপনা একা হাতে লড়ে শায়েস্তা করেছিলেন ঠাকুর্দা। সমুৎ হল, ঠাণ্ডা হল সব। দু বছর গয়ানাথবাবুদের ভাত, কাপড়, সব কিছুর ব্যবস্থা করলেন ঠাকুর্দা তাঁর নিজের বাড়িতে। আস্তে-আস্তে শান্তি এল তার পর। গয়াবাবু আর তাঁর স্ত্রী ব্রাহ্ম সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলেন। আপনি, অজয়নাথ, মনোরমাদি, আপনার বাবা-মার সঙ্গে আমার ঠাকুর্দার বাড়িতেই ছিলেন তখন। দু বছর আমাদের বাড়িতে

থেকে গয়াবাবুরা কলকাতার ব্রাহ্ম সমাজে চলে যান। কলকাতার ব্রাহ্ম সমাজে ঢুকে খুব নাম করেন গয়াবাবু। দোস্ত মহম্মদ লেনে থেকে খুব কঠিন সংগ্রাম করেন দারিদ্রের সঙ্গে। একটি ছেলে, আর একটি মেয়ে হয়েছে তখন। দোর্দণ্ড লড়াই করেন জীবনের সঙ্গে গয়াবাবুরা। সে সব ছেলেমেয়েরা বেশ বড়সড় হয়ে খুব লায়েক হবার আগে মরে গেলেন তিনি আর তাঁর স্ত্রী। বাঙালি কি সত্তর-পঁচাত্তর বছর বাঁচে না? না মরে গেলে বালিগঞ্জ প্লেসের এ বাড়িতে এসে কত ভাল লাগত তাঁর। অজয়নাথের গ্রীক-ইহুদি বৌকে দেখে তিনি অখুশি হতেন না, কক্ষনো না। ভারী একটা দামাল আহ্লাদে জাক্কর দিয়ে উঠতেন গয়াবাবু। ওঁকে চিনি না আমি?'

নিশীথ ঘাড় হেঁট করে নিজের মনে বলে যাচ্ছিল, সোফার ওপর আসন কেটে বসে সাত্ত্বিক সরলপ্রাণাদের মত ভঙ্গিতে। সত্যার্থী আশ্রমে মানুষদের তো এমনি করেই কথা বলতে দেখেছিল নিশীথ। সে ভঙ্গি অনুকরণ করে নি নিশীথ, আশ্রমের সে সব সরল সত্যাগ্রহীদের দেখবার-শোনবার আগে এ রকম চালে সে আরো অনেক কথা বলেছে। নিজেরই একান্ত ধরন সবই তার। গয়াবাবুদের কথা আরো বলতে যাচ্ছিল নিশীথ, জয়নাথের কয়েক বার মোটা গলা খাঁকারি শুনে ঘাড় তুলে প্রিন্সিপ্যালের চোখে বাঘের চোখে কেমন যেন মগডালের ময়ূরের চোখের মত তাকিয়ে রইল সে।

'তার পর, নিশীথবাবু। কী মনে করে?' খানিকটা লেজ নেড়ে চাপা গর্জ্জন করে বললে যেন জয়নাথ।

'আমি জলপাইহাটি কলেজে কাজ করছি,' ওপরের থেকে বললে যেন ময়ূর।

'তা জানি আমি।'

'কুড়ি-বাইশ বছর কাজ করেছি—সেখানে।'

'জানি আমি, জানি সব।'

'কলকাতায় এলুম, মফস্বলে এখন আর মন টিঁকছে না।'

'কেন, সেটা পাকিস্তান হয়ে গেছে বলে?'

'না। চার-পাঁচ বছর ধরেই তো কলকাতার কলেজে কাজের ঘোঁৎ-ঘাঁৎ হাতড়ে দেখছি। তখন তো পাকিস্তানের কোনো সম্ভাবনাও ছিল না।'

'আমার কলেজে কাজ চাচ্ছেন আপনি?' জয়নাথ বললে।

'শুনলুম পাকিস্তান থেকে পারানি পাখির ঝাঁকের মত ছেলে আসছে আপনার

কলেজে। কলেজের নতুন ঘরদোর তৈরি করছে রাজমিস্ত্রিরা, দেখে এলুম তো'—
'এই-ই বুঝি দেখছে পাকিস্তানের ছেলেরা আর প্রফেসররা', জয়নাথবাবু চুরুটে ধীরে-ধীরে দুটো নিট নিঃঝুম টান মেরে বললে, 'নাঃ, বেশি কী আর ছেলে এসেছে পাকিস্তান থেকে আমাদের কলেজে ; যত রব রটে তার আঁশ বাতাসে কিছু এসেছে। না, সে সব কিছু না।'
'কত এল ?'
'বেশি হলে হাজার দুই-আড়াই। তাতে কি আর মাল হয় ?'
'কত ছেলে আছে কলেজে ?'
'কী হবে তা জেনে ? ভাইস চ্যান্সেলারকে গিয়ে বলবেন যে পাকিস্তান থেকে চলে এসেছি, সঙ্গে দু হাজার ছেলে ঝেঁটিয়ে এনে জয়নাথের কলেজে ঢুকিয়েছি ; ওকে কাজ দিতে বলুন, এই তো বলবেন ?'
নিশীথ পকেট থেকে নস্যির কৌটোটা বার করে এক টিপ নস্যি নেবার জোগাড়ে ছিল। জয়নাথ নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে এক বার নিজের চুরুটের দিকে তাকাল, এ চুরুটটারও বারটা বাজাচ্ছে প্রায়।
'না, ভাইস চ্যান্সেলারের কাছে আমি যাব না।'
'হয়ে এসেছেন তো তাঁর কাছ থেকে।'
'না। আমি যাই নি।'
জয়নাথের সন্দেহ হচ্ছিল। অবিশ্যি ভাইস চ্যান্সেলার কিংবা অন্য বড়-বড় লোক—এমন কি অ্যাসেম্বলির—এমন কি মিনিস্ট্রির—জয়নাথের কলেজের ভেতরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আসবেন না। দূর থেকে সামান্য একটু চাপ দিতে পারেন হয় তো। দূর থেকে। সে চাপের কোনো অর্থ হয় না। জয়নাথের কলেজ তার নিজের কলেজ। আর-এক রকম চাপ আছে বটে। দুয়ারে মোটর দাঁড় করিয়ে, বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়ে, ওপরওয়ালারা যা ছিনিয়ে নেন। কিন্তু সে প্যাঁচ নিশীথের হয়ে কষতে আসবে বুঝি কেউ ? ও জানে কি কলকাতার! পোছে কে ওকে ? ও তো মফস্বলে কুড়ি-চব্বিশ বছর পড়েছিল। নিশীথ আড়াই চাল মারবে ভেবেছে জয়নাথকে গয়ানাথের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে! খাজা। চারপেয়ে খাজা। মফস্বলেরই। নিশীথের ঠাকুর্দার বাড়ি দুটো বছর খেয়েছে-পরেছে বটে জয়নাথের বাবা গয়ানাথ মজুমদার আর তাঁর পরিবার, তাঁদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল যখন। সেটা

মিথ্যে কথা নয়। কিন্তু জয়নাথরা ব্রাহ্ম সমাজে আছে কি নেই ঠিক বলতে পারে না জয়নাথ। বিশ-চল্লিশ বছর আগে বাবার সেই আদর্শ, যেমন পচা ডিমের পিচকিরিতে গোঁদ ভিজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, নিশীথের ঠাকুর্দার বাড়িতে খেয়ে-পরে ধর্মের লড়াই করা, এ সব জিনিসের বিষ মরে গেছে আজকাল ; বাবা যদি আজ বেঁচেও থাকতেন তা হলে নিশীথকে জয়নাথের কলেজের কাজে ঢুকিয়ে দিতে বলবার মত মুখ থাকত কি আর তার ? কিন্তু তিনি তো বেঁচে নেই, সমাজে জীবনে কলেজে কোথাও কোনো প্রতিপত্তি আছে কি তাঁর ? দেখছে না তো কোনো দিকে তাঁর কোনো প্রভাব। দিন-রাত চুরুট-সিগারেট টানছে জয়নাথ, নিয়মিতভাবে মদ খাচ্ছে জয়নাথ, কলেজের টাকা তিন ভাইয়ে মিলে পাচার করছে, তবুও জ'াকিয়ে রয়েছে কলেজটা। খুব বাহবা পাচ্ছে তাই তারা। পুব বাংলার কলেজগুলো ফতুর হয়ে পশ্চিমবাংলার কলেজগুলোকে ছেলেতে-ছেলেতে ফাঁপিয়ে তুলল, খুব ঢাকে কাঠি নাচছে জয়নাথদের ; জয়নাথের মেজ শালির বড় মেয়ে, মোড়লের সঙ্গে বিয়ে হল যার, সে মেয়েটির বাবা তো জয়নাথ, মেসোও বটে, কিন্তু মেসোর চেয়ে বাবা বেশি বলেই নিজের কাজ, ঘরের কাজ, গুষ্টির কাজ, কলেজের একশ রকম দাঁও মারবার কাজ ফেলে, সেই ভোরে বাসি মুখে নিজের মোটর হাঁকিয়ে বসিরহাট গিয়েছিল তো সে। বিয়েটা ভাঙবার চেষ্টায়ই গিয়েছিল, পারল না, মেজো শালি সুনয়নী কিছুতেই দিল না। নানা কথা ভেবে দেখছিল জয়নাথ। জয়নাথের নিজের পরিবারের, সমাজের, কলেজের এ সব কোনো রকম ব্যাপারে বাবার কোনো গাঁউখুরি টের পাচ্ছে না আর জয়নাথ। নেই। নেই-ই তো। কিছুই নেই আর।

'গত বছরে আপনার কলেজে মাস্টারি কাজটা পেয়ে যাব ভেবেছিলুম।'

'পেলেন কোথায় আর', একটু চিন্তিতভাবে জয়নাথ বললে। নিশীথের বিষয় নয়, অন্য কথা ভাবছে জয়নাথবাবু। সুনয়নী কেমন বুড়ো হয়ে গেছে ; তবুও মন্দ নয়। কিন্তু বালিগঞ্জ প্লেসে কিছুতেই আসতে চায় না। কিছুতেই এল না। এক রাতের জন্যেও না। রমলা কার মেয়ে সেটা একেবারেই ভুলে গেছে সু।

'সে কাজটা মতিমোহনবাবুর ছেলেকে দিতে হল।'

'মতিমোহনবাবু কে ?'

'আমার মাথা আর মুণ্ডু। শোরহাওয়ার্দি মিনিস্ট্রির সময় একটা বড় চাঁই

ছিলেন। এখন তো গড়াচ্ছেন। দশ বাঁও জলের নীচে তলিয়ে গেছেন।'

'মতিমোহনবাবুর ছেলেকে রেখেছেন আপনাদের কলেজে ?'

'নাঃ। তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, পনেরই আগস্টের আগেই স্যাডো মিনিস্ট্রি হতে না-হতেই।'

'তাড়িয়ে দিতে হল!' নিশীথ একটু বিক্ষুব্ধ হয়ে বললে।

'সেকেণ্ড ক্লাস তো।'

'ঢুকেছিল কি ফাস্ট'ক্লাস ভাঁওতা দিয়ে ?'

'চোখ মেলেই ঢুকিয়েছিলুম। কিন্তু স্যাডো মিনিস্ট্রির রাজ্যি; আর-একজন লোককে নিতে হল তার শাশুড়িকে খুশি করবার জন্যে।'

'শাশুড়ি ?' নিশীথ জয়নাথকে না বলে নিজেকেই যেন বললে আস্তে—কোনো উত্তর দাবি না করে—'শাশুড়ির সঙ্গে স্যাডো মিনিস্ট্রির কী সম্পর্ক ?'

'তা হলে কি শ্বশুরের সঙ্গে হবে ?' জয়নাথ চুরুটে আস্তে টান দিয়ে বললে, 'পিসশ্বশুর তো সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, মাসিশাশুড়ির পেছনে।'

নিশীথ নস্যির কৌটোটা খুলে নাকের বাঁ ছ্যাঁদায় ডান ছ্যাঁদায়, ডান ছ্যাঁদায় বাঁ ছ্যাঁদায়, বিদ্যুৎক্ষিপ্রতায় ঘন-ঘন খানিকটা সাঁটিয়ে নিয়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মাথাটাকে খাড়া করে, লালচে চোখ পাকিয়ে, চারদিকে এক বার তাকিয়ে, রুমালে মুখ-নাক ঝেড়ে নিল।

'ছায়া মিনিস্ট্রি তো বাস্তব হল, ঘোষ মিনিস্ট্রি গিয়ে রায় মিনিস্ট্রি এল। কী হল এই সব এলোমেলো ব্যাপারে সেই প্রফেসর লোকটির ?'

'এক জন কি আর, কত প্রফেসর বহাল করছি, বিদায় দিচ্ছি আমরা। আপনার ইংরেজি ডিপার্টমেণ্টের কথা বলছিলুম, ইংরেজির সেই প্রফেসরটি ভাল কাজ পেয়ে চলে গেছে ঘোষের আমলেই।'

'কেউ এসেছে সে জায়গায় ?'

'রাখতে হয়েছে। লোক রাখতে হয়েছে।'

'আরো তো লাগবে প্রফেসর আপনাদের।'

'ছেলে বেড়ে গেছে, টিউটোরিয়াল ক্লাসও বেড়েছে,' নতুন আর-একটা চুরুট হাতে নিয়ে জয়নাথ বললে। এখন তার একটু ড্রাই জিন খাবার সময়।

'তা ছাড়া জেনারেল ক্লাসে এক-এক সেকশনে দুশ মেয়ে দুশ ছেলে, এটাও কি ঠিক ?'

'দেখা যাক দেড়শ-দেড়শ করে বাড়িয়ে দিতে পারা যায় কি না। আরো প্রফেসর লাগে তাতে। বড্ড খরচ।' জয়নাথ চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে।
'আমার একটা ব্যবস্থা করে দিন আপনার কলেজে।'
'সত্যিই আসছেন কলকাতায়?' চুরুটে টান দিয়ে সহানুভূতি সাজিয়ে বললে জয়নাথ।
'আপনার কলেজে কাজ পেলে তো গত বছরেই আসতুম।'
তাই মনে করে বুঝি লোকটা? ড্রাই জিনের কটা বোতল তো ফুরিয়ে গেছে, না কি একটা আছে? হুইস্কি আছে—খুব ভাল স্কচ। সুজয়নাথ আসে নি এখনো, হয় তো রাতের বারফট্টাই শেষ করে। এ পাড়ার, জয়নাথের নিজের এলেকার, কয়েকটি মেয়েকে যে লেত্তির মত হাতে বাগিয়ে রাখতে চাচ্ছে সুজয়নাথ সেটার কী হবে? তাকে কী দেওয়া হবে তা? রাষ্ট্র, সমাজ, কলেজ সব তো সব। সম্প্রতি খাগড়ার কথা ভাবছিল জয়নাথ।
'আপনি তো সেকেণ্ড ক্লাস নিশীথবাবু।'
বাক্স থেকে সিগারেট বার করে জ্বালিয়ে নিয়ে নিশীথ বললে, 'কত তো সেকেণ্ড ক্লাস থার্ড ক্লাস রয়েছে কলকাতার প্রফেসরদের মধ্যে। চারশ-পাঁচশ টাকাও তো পায় তারা।'
'অনেক আগে ঢুকেছিল তারা।'
'এখনো তো ঢুকছে।'
'জুতে দিতে পারে এ রকম মানুষ সঙ্গে করে নিয়ে আসুন আপনি, আমি আমার কলেজে আপনাকে ঢুকিয়ে দেব। ঘোষকে আনুন না, চাকলাদারকে আনুন।'
'প্রফেসর ঘোষকে? প্রফেসর অভয়েন্দ্রমোহন'—
'হ্যাঁ হ্যাঁ। তিনি মোটরে এসে একটু চেপে ধরলেই তাঁকে চেপে ধরব আমি। আপনারও হয়ে যাবে, আমারও হবে।'
নিশীথ সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলল, 'ঘোষ কি ভাইস চ্যান্সেলার হচ্ছেন?'
'বেনারস ইউনিভার্সিটির?'
'কোন ইউনিভার্সিটির জানি না—'

'তা হতে পারেন। সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টে যেতে পারেন।'

'কে পাচ্ছে ঘোষকে? তাঁকে আমি পাব কী করে?'

'মোহিতা ঘোষকে বলে দেখতে পারেন।'

'কে মোহিতা ঘোষ?'

'জানেন না? ঘোষের স্ত্রী!'

নিশীথের হাতে সিগারেট জ্বলে যাচ্ছিল, একটু ঝাঁকি দিয়ে ছাই ঝেড়ে ফেলে বললে, 'অনেক ওপরের লোক তো এঁরা। এঁদের নাগাল পাওয়ার সাধ্যি আমার নেই।'

জয়নাথের এখন নিতান্তই এটা-ওটার দরকার—তামাকের ধোঁয়ায় সুঁটকি মাছের গন্ধ পাচ্ছে সে।

জয়নাথ কয়েকবার জোরে শুষে চুরুটটা টেনে নিয়ে রাশি-রাশি ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বললে, 'প্রফেসর ঘোষের চেয়ে মোহিতা ঢের কঠিন। কিন্তু কেউ-কেউ তাকে বেশ হাত করে নিতে পারে। ওদের বাড়িতে নৃপেন বলে একটা ছোকরা থাকে। শুনেছি তার সঙ্গে মোহিতার কী সব অদ্ভুত সম্বন্ধ।'

জয়নাথ একটু চোখ টিপে, হেসে, মুখ ভার করে, চুরুট টানতে গিয়ে চুরুটটা নামিয়ে, কেমন নিঃশব্দ মাংসলোলুপ মুখে বসে রইল।

'কে বলেছে, কোথায় শুনলেন এ কথা জয়নাথবাবু?' নিশীথ তার পাঞ্জাবির গলার বোতামটা খুলতে আর-একটা বোতামও খুলে ফেলল।

'আপনি তো কলকাতায় থাকেন না। কী করে জানবেন। আমরা কেউ-কেউ জানতে পারি সব।'

এইবার জয়নাথ উঠবে হয় তো। নাকি আরো গেড়ে বসবে। কিন্তু নিশীথকে উঠতে হবে বোধ হয়। জয়নাথের এখন অন্য নানা রকম আয়োজনের সময় এসে পড়েছে। ধরাছোঁয়ার ভেতরে কিছু নেই যেন চারদিকের আবহাওয়ার ভেতর, কিন্তু তবুও ধোঁয়াটা কেমন ফলাও করে পেকে উঠছে জয়নাথের চুরুটে। রাত বাড়ছে। ধোঁয়া পাকছে। একটা চুরুট চেয়ে নিলে হত জয়নাথের কাছ থেকে। চাকরি সে নিশীথকে কিছুতেই দেবে না, প্রফেসর ঘোষ বা মহিলাদের কাউকে সঙ্গে করে এনে তাকে দিয়ে জয়নাথকে বেশ ভাল করে মকরধ্বজ না-মাড়িয়ে দিলে। খুব সম্ভব চেষ্টা করলে মিসেস ঘোষকে আনা যায় এ বাড়িতে নিশীথের কাজের সুরাহা করে দেবার জন্যে?

না, না, মোহিতা ঘোষের সঙ্গে আর দেখাই করবে না হয় তো নিশীথ। দেখা করলেও অন্য অনেক দূরের জিনিস নিয়ে। চাকরি-বাকরির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

'আমিও একটা সম্বন্ধ পাকাতে চেষ্টা করছিলুম মোহিতা ঘোষের সঙ্গে, জয়নাথ বললে, 'কিন্তু কিছুতেই পারলুম না। ভারী চমৎকার মেয়ে। কিন্তু বড় কঠিন।' মোহিতার সঙ্গে বেশি মেশে নি নিশীথ। প্রফেসর ঘোষের চেয়ে উঁচুদরের মেয়ে মোহিতা। কিন্তু জয়নাথ তাকে নীচের দিকে ঠেলতে চাচ্ছে বুঝি? সেটা সম্ভব হচ্ছে না বলে কঠিন মনে হচ্ছে মোহিতাকে? নৃপেনের সঙ্গে মোহিতার কোনো সম্বন্ধের কথা সেই জন্যেই বুঝি জুড়ে দিচ্ছে জয়নাথ!

'একটা কাজ দিতে হবে আমাকে আপনার কলেজে।'

'আপনি তো সেকেণ্ড ক্লাস এম-এ নিশীথবাবু।'

'কত সেকেণ্ড ক্লাস তো কলেজে প্রিন্সিপ্যালি করছে—'

'অনেক আগে ঢুকেছিলেন ওঁরা। আমাদের কলেজে কমার্সে কাজ নেবেন?'

'কত মাইনে হবে জয়নাথবাবু? দুশ পাওয়া যাবে?'

'না, একশর বেশি দিতে পারব না আমরা; টেম্পরারি বেসিসে। তবে এখন কোনো ভেকেন্সি নেই। পরে হতে পারে, শকুনের বাচ্চারা ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে খোঁজ নেবেন আপনি, আচ্ছা?'

জয়নাথবাবু উঠে ভেতরে চলে গেল। সুজয়নাথ ঢুকে পড়ে নিশীথকে বাইরে যাবার জন্যে অনুরোধ জানাল, ঘরে মেয়েরা আসবেন। নিশীথকে চেনে বটে সুজয়নাথ, কিন্তু চিনতে চাইল না। জয়নাথের মত বোকা সে নয়। দোস্ত মহম্মদ লেনের আবহাওয়াটা এখনো ভাল করে কাটিয়ে উঠতে পারে নি জয়নাথ, কিন্তু কোনো মা ছিল না যেন কোনো দিন, জয়নাথের বৌয়ের মত, সুজয়নাথের। বালিগঞ্জ প্লেসের হল-ড্রয়িংরুমের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে যেন সে। একে দিয়ে অন্তত 'কি নিশীথবাবু কেমন আছেন, বসুন', বলিয়ে নেবার জন্যে মোহিতা ঘোষকে সঙ্গে করে এ-বাড়িতে এক দিন ঢুকতে ইচ্ছে করে নিশীথের। এই ছেলেটিকে দেখলে এমনই ছেলেমানুষ হয়ে পড়ে মানুষের মন। কিন্তু তবুও মিসেস ঘোষ ছেলেমানুষ নন, নিশীথও নয়, সুজয়নাথও টেস্ট টিউব নয় এখন আর—জয়নাথের কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল।

'দাদা ওপরে চলে গেছেন। এইবারে দরজা বন্ধ করব,' সুজয়নাথ বললে।
'হ্যাঁ যাচ্ছি,' নিশীথ বললে।

জলপাইহাটি মন্দ লাগছিল না হারীতের। কলকাতায় হারীতের মন যে-দিকে ঝুঁকেছিল সে সব বিপ্লবের, রক্ত-বিপ্লবের কোনো কাজ যে এখানে নেই তা নয়। তবে কোনো দল নেই, এমন কোনো বিশেষ লোককে সে দেখছে না যার কাছে গিয়ে নিজের মনের আগুনের ওপর আলোর কথাগুলো পড়তে পারে হারীত। কলকাতায়ই হারীতের মনটাকে বুঝে দেখবার মত, মতটাকে অনুসরণ করবার মত মানুষ খুব কম ছিল। অনেক কষ্ট করে তাদের খুঁজে বের করতে হয়েছে, কোনো-কোনো জায়গায় বেশ সহজেই যেন হারীতের বক্তব্যটা বুঝতে পেরেছে তারা, অনেক ক্ষেত্রেই দুঃসাধ্য সাধন করতে হয়েছে হারীতকে —একে, ওকে, তাকে, নিজের কথাটা ধরিয়ে দেবার জন্যে। কাজে অবিশ্যি হয় নি কিছু, কবে কোনো দূর ভবিষ্যতে খুব বৃহৎভাবে কাজ হবে সেই জন্যে অল্প-অল্প সংগঠন চলছিল কলকাতায়। হারীতের অভাবে কলকাতায় তার হাতে গড়া মানুষগুলোর অবস্থা কী রকম দাঁড়িয়েছে কে জানে? ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে হয় তো সব। আজ কাল কেউই আর দেশের, ঠিক বলতে গেলে মানুষের, খাঁটি স্বাধীনতা ও শান্তির জন্যে নতুন করে স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। অনেকেরই মনের ভাব এই যে, স্বাধীনতা পাওয়া হয়ে গেছে, আবার কী, এবার সকলেই সবচেয়ে আগে যে-যাকে পারে, পায়ে মাড়িয়ে মুখে রক্ত তুলে, ছুটে আস্বাদ করবে, উপভোগ করবে চারদিককার সাতসুতরোর ভেতর অফুরন্ত ভালুকের মত। কিন্তু সেটা কি কোনো ভাল রাষ্ট্র-ব্যবস্থা হল? কিন্তু এও তো হচ্ছে না। আমাদের দেশে, আমেরিকায়, হয় তো এ রকম, কিন্তু পৃথিবীর প্রায় অন্য কোনো জায়গায়ই এ টুকু মজা লুটবারও অবসর নেই। বিশৃঙ্খল প্রতুলতায় মরছে না তারা, উচ্ছৃঙ্খল অত্যাভাবে নিকেশ হয়ে যাচ্ছে। দেখে এসেছে সে কলকাতায়—পশ্চিমবাংলায়—ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে। থামাবে কে এ সব? মানুষকে বোঝার সোজা পথটা নয় কঠিন, নইলে পথটা দেখিয়ে দেবে কারা? সত্যিই সুবিচার, তৃপ্তি, শান্তি, স্বাধীনতা এনে দেবে? জানা যাবে সেই জলপাইহাটিকে, যাকে নিজের আশা-ভরসার পীঠস্থান বানানো সম্ভব নয়

হারীতের পক্ষে। তাকে চলে যেতে হবে আবার কলকাতায়, কিংবা আরো দূরে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের অন্তস্তলের আবহাওয়ার ভেতরে, যা ভাল নয় তাকে শোধিত, বিদূরিত করবার জন্যে, যা ভাল তাকে সঞ্চারিত করে দেবার জন্যে। এখানে জলপাইহাটিতে কেমন একটা অদ্ভুত অনিশ্চয়তার ভেতর নিরবচ্ছিন্ন নিঃস্ব হয়ে ঘুরে ফিরছে সমস্ত অবুঝ ও বুদ্ধিমান। এদের অনেকেই দেশ ছেড়ে চলে গেছে, রোজই যাচ্ছে—এখনো যাচ্ছে। এদের এখানে থাকতে বলেছে হারীত—রোজই একবার তার রোঁদে ঘুরে আসবার সময় এইখানেই এদের থেকে যেতে বলছে। হারীতের কথা শোনবার মত মনের অবস্থা এদের নয়। মন পশ্চিমের দিকে ছুটছে, এখন কি এরা আর পদ্মার পাড়ে পড়ে থাকবে? কি আশ্চর্য অবর্ণন সমৃদ্ধি আছে এই পদ্মা-মেঘনার দেশে, মানুষ যদি আতঙ্ক ঝেড়ে ফেলে একটু সুস্থির ভাবে বুঝে দেখবার চেষ্টা করত, কাজ করতে শুরু করে দিত, এ-দেশের ও দেশের নয়, পৃথিবীর আশ্চর্য মানবধন্য নাটাটাকে ভাল-বেসে; কিন্তু এরা আছে কি নেই, সেই হুঙ্কার শুনে, ছিটের ফতুয়া-জামা পরে, দেখ, ডোরাকাটা জেব্রার মত ছিটিয়ে-ছিটকে হাওয়া দিচ্ছে সব। দুরন্ত জেব্রার মত এরাই না, না, সে রকম প্রাণবন্তভাবে ছুটে গিয়েছিল আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ার ওজস্বী উপনিবেশীরা, এরা কীটপতঙ্গের মত আগুনের থেকে বড় আগুনের দিকে ঝাঁপিয়ে চলেছে। কলকাতায় বাড়ি নেই, চাকরি নেই, খাদ্য নেই। মৃত্যু আছে—তবুও পেঁচোয় পাওয়া বাচ্চাদের মত মুখ থুবড়ে পড়ছে গিয়ে কলকাতার অলিতে-গলিতে ফুটপাতে।

তা হলে জলপাইহাটিতে হারীতের সবচেয়ে বড় কাজ কি এখন এদের থামিয়ে রাখা? হারীত ভেবে দেখছিল কিছু কাল থেকে। এ কাজটা সে নিলেও নিতে পারত তার হাতে। কিন্তু তবুও নিচ্ছিল না। কলকাতায় যেন সবচেয়ে ভাল কাজ নিয়ে ডুবে ছিল সে। দেশ স্বাধীন হলেও তাকে সত্যিই স্বাধীন ও সফল করে তোলা বড় বিপ্লবের ভেতর দিয়ে, দরকার হলে বিপ্লবকে অব্দি শুধরে সফল করে আশ-পাশে নিয়ে আসা। এখানে এসে বিশ্রাম করছে হারীত, কথা ভেবে নিচ্ছে, সবচেয়ে ছোট-ছোট জিনিসে হাত দিচ্ছে সে। সবচেয়ে প্রথম ছোট জিনিস, নিজের শরীরটিকে সারিয়ে নিতে হবে, মাকে সারিয়ে তোলার চেয়েও বেশি সনির্বন্ধ হয়ে। পরিশ্রমে, অখাদ্যে, রোগে হারীতের শরীর ভেঙে পড়েছিল কলকাতায়। প্লুরিসি হয়েছিল কয়েকবার। যক্ষ্মা

হয়েছে বলে মনে হয় না। রোজই রাতে জ্বর হয় এখনো যদিও, তবুও এ উপসর্গটা কমে এসেছে, শরীরে আগের চেয়ে বেশি স্বাদ পাচ্ছে সে। কাল রাতে জ্বর হয় নি। অর্চনা যে থার্মোমিটারটা দিয়েছিল বার-বার জিভের গোড়ায় ঠেলে বেশ হুঁশিয়ার হয়ে দেখে নিয়েছে সেটার টেম্পারেচার কয়েকবার কাল রাতে। জ্বর হয় নি। টিউবারকুলোসিস হয়েছে কি না, এ বিষয়ে নিজের মনে সন্দেহ হয়ে গিয়েছিল তার, নরেন ডাক্তারেরও; কিন্তু দু-একদিন হল হারীতের মনে হচ্ছে যে টি-বি সত্যিই হয় নি তার; হয় নি যে এ বিষয়ে তার নিঃসন্দেহ উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। ভাল লাগছে তার। কথা ভাবতে-ভাবতে হাঁটতে-হাঁটতে অনেক দূরে চলে গেল সে—লালপুরের রাস্তার পাশে মস্ত বড় একটা মাঠের কাছে নিরিবিলির দেশে, কাছেই ঘনিয়ে আসছে সুলেখাদের বাড়ি। কৃষ্ণচূড়ার গাছ আগুন জ্বালিয়ে উড়ছে রোদের বোশেখের বাতাসে। এক রাশি বোলতা ভীমরুল মৌমাছি রোদে ঝিকমিক করে জিন পরীদের মত উড়ে বেড়াচ্ছে যেন; এদেরই রক্তের বিষাক্ত সুধার উষ্ণতা উছলে উঠে যেন অবাধ অঝোর রক্তিম ক্যানাফুলের উজ্জ্বলতায় সুলেখাদের বাড়ির সামনের অনেকখানি সবুজ ঘাসকে নিবিড় করে রেখেছে। আঃ, কী চমৎকার এই পৃথিবীর বসন্ত ঋতু, গ্রীষ্ম ঋতু, কী চমৎকার ঐ খণ্ড নীলে সাদা মেঘ। বড়-বড় সাদা মেঘ ডাবের জলে মেশানো দুধের উষ্ণতার মত এই রৌদ্রের ভেতর—দুপুর এসে পড়েছে, জমে উঠেছে, দুপুর ফুরিয়ে যাচ্ছে যেন, বিকেল কথা বলছে যেন কৃষ্ণচূড়ার ছায়ার ভিতর। কোনো বেদনা নেই, মানুষের হৃদয়কে সৌরভ দিয়ে মৃত্যুর যে-ধ্বংসকীট রেখে যায়, সময়, থেকে-থেকে তার ছায়াপাত ছাড়া। শুঁড় আছে এই কীটের; শুঁড় আছে, ছায়া পড়ে। কোনো বেদনা নেই, এই সরস নিঃশব্দ বিপদের কালিমা ছাড়া।

'তুমি যে আসছ আমি দেখছিলুম হারীত—'

'আমি ক্যানাফুল দেখছিলুম তোমাদের বাগানের। কী চমৎকার সবুজ ঘাস ঘিরে বোলতা-মৌমাছির হুলের জ্বলুনি-পুড়ুনির ভেতর থেকে ফুটে বেরিয়েছে যেন এই সব ক্যানাফুল—ইস! কী লাল।'

'রক্ত রঙই ভাল লাগে তোমার হারীত। বিপ্লব করছ।'

'কোনো রক্ত ঢেলে বিপ্লব না করতে পারলেই তো ভাল। মানুষের ভাল করাই তো উদ্দেশ্য, মানুষকে খুন করা হবে কেন তার জন্যে?' বললে হারীত।

'ক্যানাফুল খুব ভাল লাগে তোমার ?' সুলেখা বললে।

'কিন্তু দেখা গেছে যে অনেক মানুষই বিশেষত যারা গেড়ে বসেছে, সমাজ চালাচ্ছে, রাষ্ট্র চালাচ্ছে, লুটছে, তারা এত অবোধ যে তাদের হৃদয়ের মোড় ঘুরিয়ে ঠিক দিকে নেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কী করে উন্নতি হতে পারে তাদের ধ্বংস না করে ?'

'বাবা, কেমন মারমুখ হয়ে কথা বলছে, ছেনি-টেনি সঙ্গে নিয়ে এসেছ নাকি, হারীত ?'

সুলেখার দু বছরের বড় বোন মনোলেখা ওরফে জুলেখা এসে বললে, 'ছুরির মত দুটি বোন। ভাই নেই, বাবা নেই, নেই কোনো আত্মীয়-স্বজন, শুধু মা আছেন, এক-আধটি চাকর আছে।'

'আমি আসছি হারীত, এখুনি আসছি, তুমি কিন্তু পালিয়ে যেও না', বলতে-বলতে জুলেখা পাশের ঘরে চলে গেল। পাশের ঘরের কিনার দিয়ে সিঁড়ি চলে গেছে দোতলার দিকে—ছাদের দিকে ; সেই দিকে চলে গেল নাকি জুলেখা ?

চোত-বোশেখের রোদ বাতাস, বাতাস রোদের ঝাঁঝের সঙ্গে সত্যিই কেমন মানিয়েছে এই ফুলগুলো। পাশে সবুজ ঘাস রয়েছে, মাথার ওপরে নরম নীল, সব সময়ই হুড়-হুড় করে ছুটে আসছে অশরীরী বাতাস। বেশ দেখায় কিন্তু এ সবের ভেতর এই আগুনের জাত ফুলগুলো—

'কলকাতায় এত বড় একটা দাঙ্গা হয়ে গেল বছর দেড়েক আগে। আমরা ছিলুম সে সময় কলকাতায়। মা, জুলেখা, আমি'—

'জুলেখা তোমার দিদি তো'—

'ওকে আমি জুলেখা ডাকি,' সুলেখা বললে, 'তোমাকে তো হারীত ডাকি, জুলেখা আর আমি। কত বয়স তোমার ?'

'আমার ত্রিশের কাছাকাছি—'

'দিদির তো একুশ, আমার উনিশ। তুমি কি আমাদের চেয়ে অনেক বড় হারীত ?'

'কী মনে হয় তোমার ?'

'তোমাকে যদি খুব বড় মনে হত, কাছে ঘেঁষতে বাধো-বাধো ঠেকত, তা হলে তোমাকে হারীত কাকা ডাকতুম। কিন্তু তা তো নয়। তবে, তুমি যদি চাও তোমাকে হারীতদা ডাকতে পারি, জুলেখা তো মনে-মনে ডাকে,' সুলেখা বললে, 'কিন্তু তোমাকে হারীত ডাকি বলে তুমি আমাদের ভিতর এক জন হয়ে

গেছ মনে করো না কিন্তু'—

'তোমাদের ভেতর এক জন হয়ে গেছি? মানেটা ঠিক বুঝলাম না সুলেখা।'

'তোমাকে হারীত ডেকে খেলো করছি না। তোমাকে আমরা মর্যাদা দিচ্ছি।'

'জোর করে?' হারীত মুখ ভারী করে হেসে বললে।

'না। যা প্রাপ্য তার চেয়ে কম দিচ্ছি; আমি অনেক কম, জুলেখা আমার চেয়ে বেশি দিচ্ছে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'তুমিও তো দাঁড়িয়ে আছ।'

'চল, ঘরের ভেতরে যাই।'

'এই বারান্দায়ই ভাল, বেশ বাতাস, আলো, ঘাস, আকাশ, ক্যানাফুল। গোটা তিনেক বেতের চেয়ার এনে বসলে হয় এখানে।'

'তিনটে কেন? আমরা তো দু-জন।'

'জুলেখা তো আসছে বলে গেল।'

সুলেখা একটু ঘাড় কাত করে দু-তিনটে লম্বা কাল চুল মাথার থেকে মুখের, গালের, ওপর দিয়ে নীচের দিকে টেনে বীণার তারের মত টান করে রাখতে-রাখতে বললে, 'ও, তার কথা ভাবছ বুঝি তুমি?'

'কোথায় গেল তোমার দিদি?'

'আমি দেখি নি তো!'

'এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও?'

'আমি দেখি নি'—বীণার তারের মত টান-টান রেশমি চুল কটা ছেড়ে দিয়ে মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সুলেখা বললে।

'আসবে তো জুলেখা?'

'তুমি যদি সকালবেলা আসতে—জুলেখা তো ছিল বাড়ি সমস্তটা সকাল।'

কেমন যেন অত্যধিক সারল্যে জুলেখার কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল হারীত; ঠিক ততটা সরল না হয়ে উত্তর দিয়ে হারীতের অতীত ঐ বাইরের পৃথিবীটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল সুলেখা।

হারীত তাকিয়ে দেখল, অনেকগুলো বোলতা ওড়াউড়ি করছে রোদের ভেতর। বাতাসে টাল সামলাতে না পেরে হিল্লোলিত হচ্ছে, ছটকে যাচ্ছে, ছিটকে পড়ছে, একেবারে সুলেখার মুখের ওপরেই এসে পড়েছে যেন একটা; ঠিকরে পড়ল বাতাসের আর-একটা ঝটকায় সুলেখার গালের ওপর—

'ধরো না ধরো না সুলেখা, কিছু বলবে না, টিপে ধরো না।'

'উ-হু-হু-উ-উ—আমাকে হুল ফুটিয়েছে হারীতদা।'

'কেন ধরতে গেলে ?'

'আ-আ, বড্ড জ্বালা করছে। আঙুলে কামড়েছে,' গালে আঙুল ঝাড়তে-ঝাড়তে সুলেখা বললে, 'না, বেশি কামড়ায় নি, আমি একটা পাতার রস ঘষে আসি—'

'স্পিরিট আছে ?'

'কেরোসিন আছে। আমি একটু পাতা ছেঁচে ঘষব, আচ্ছা ঐ ক্যানাফুলের ঝাড়ের পাশে এমন সুন্দর ঘাস—ঘষলে আরাম পাওয়া যাবে না ? পাওয়া তো উচিত। ও-রকম স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা জিনিস কেন মানুষের জ্বালা জুড়িয়ে দেবে না ?'

'কেরোসিন আছে বললে ?'

'আমার ব্যথা কমে গেছে। আচ্ছা দেখো তো, আঙুলটায় হুল ফুটিয়েছে না কি ?'

সুলেখার ডান হাতের অনামিকাটা ধরতে গেল না হারীত। মধ্যমা অনামিকা কনিষ্ঠা তিনটেকেই হারীতের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল সে, যে-আঙুলে বিষ ঝেড়েছে সেটাকেই নির্দেশের মত ঝাড়ছে।

হারীত এগিয়ে এল না, মাথাটাও একটুও ঝুঁকে পড়ল না তার, যেখানে দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থেকে সুলেখার আঙুলের ওপর চোখটাকে বুলিয়ে বিঁধিয়ে রেখে বললে, 'না, হুল ফোটায় নি।'

'তোমার কি চিলের মত চোখ হারীত ?'

'বেশি ফোটায় নি—'

'আঙুলটা ফুলেছে -'

'বেশি ফোলে নি।'

'কম ফুলেছে ?'

'তোমার কি ব্যথা আছে ?'

সুলেখা হাত সরিয়ে নিয়ে গ্লিব প্লিব ক্লিব্‌ল্‌ ক্লিবল খিখি ক্লি খি করে হাসতে লাগল।

'তোমার ব্যথা কমে গেছে,' হারীত যেন নিজেকে, কলকাতার ও বাইরের

ব্যথিত পৃথিবীটাকেও, আশ্বস্ত করে শান্ত স্নিগ্ধ গলায় সুলেখাকে বললে। হাসি পেল সুলেখার।

সুলেখার ব্যথা কমে গেছে, বলছে কী হারীত? হারীতের কণ্ঠস্বরের ও মনের বড় বিচ্ছিন্ন ব্যাসভূমিটাকে উপলব্ধি করে সুলেখার আঙুলের প্রতীকভূমিতে কথাটা লেগে আছে যেন, রক্তমাংসের আঙুলে ব্যথাটা কমে বাড়ে বটে।

'চলো, ঘাসের ওপর গিয়ে বসি।'

'কোথায়? ঐ সব থোকা-থোকা রাধাফুলের পাশে?'

'কোথায় গিয়েছে জুলেখা? হ্যাঁ, ক্যানাফুলের ঝাড়ের কাছে বাগানের ঘাসে। চলো।'

চারদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে ভাল করে তাকিয়ে দেখে সুলেখা বললে, 'সকলের চোখ পড়বে ওখানে বসলে। ওটা তো একেবারে খোলা জায়গা। লালপুরের পথ এ দিকে। পুবে সদর রাস্তা। চারদিকে নানা ধাঁচের লোকের ঘরবাড়ি। দিন-কাল বড় খারাপ হারীত।'

'তা তো জানি,' হারীত বললে, 'মানুষ চাইলে কী হবে, মানুষই তাকে কিছু করতে দিচ্ছে না।'

'কোথায় বসবে তা হলে, বারান্দায়?'

'চলো, ভিতরে যাই,' ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে সুলেখা বললে, 'তুমি কি এখানেই থাকবে, জলপাইহাটিতেই থাকবে হারীত?'

'আমার আসল কাজ তো কলকাতায়—'

'ছোট কাজগুলো হয়ে গেছে?'

'না, শুরুও তো হল না।'

'সেগুলো শেষ করে কলকাতায় যাবে তো?'

'তাই তো হচ্ছে—'

'এই দিকে এসো—'

'ঐদিকে? দোতলায় যাবে?'

'হ্যাঁ, চলো, দোতলার চিলেকোঠায় বসি গে।

'জুলেখাকে দেখেছিলাম দোতলায় যেতে? দেখেছিলে তুমি?' সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে-উঠতে হারীত বললে।

'না, দিদি অবনী খাস্তগিরের বাড়িতে গেছে'—

'অবনী খাস্তগির কে ?'

'নাম শোনো নি ? অনেক দিন তো দেশ ছাড়া ! অবনীবাবুর কলকাতায় বাড়ি আছে, ভুবনেশ্বরে আছে, রাঁচিতে আছে, জামতাড়ায় আছে। পরিবারের লোকজন ওঁর সবই কলকাতায়, রাঁচিতে, জামতাড়ায় আর ভুবনেশ্বরে। উনি নিজেও কলকাতায়ই থাকেন, এখানে মাঝে-মাঝে আট-দশ দিনের জন্যে এসে নেতাগিরি করে যান। সবাইকে আশ্বাস দেন, ভয়ের কিছু নেই বলেন, স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করবার উপদেশ দেন—সত্য পথে চলে, শান্ত অহিংস হয়ে, নির্ভীক মনে, সকলেরই যাতে উপকার হয় সকলকেই সে দিকে দৃষ্টি রেখে চলতে বলেন। ঘর-বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় বা ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে সরে যেতে দু-হাত তুলে নিষেধ করছেন সবাইকে অবনী খাস্তগির। সঙ্গে ওঁর সেক্রেটারি আছে। রোজই প্রায় খাস্তগিরের বিবৃতি পাঠানো হচ্ছে কলকাতার প্রেসে, প্রাণ ভরে ছাপাচ্ছেও তো প্রেস,' সুলেখা হাসতে-হাসতে বললে, 'কেন ছাপাচ্ছে হারীত ?'

'ভাল কথাই তো বলছে খাস্তগির, কেন ছাপবে না ?'

'ভাল কথাই বটে হারীত !' সুলেখা চিলেকোঠায় ঢুকে একটা বেতের চেয়ার হারীতকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'ভাল কথা হলে উনি নিজে থাকেন না কেন এখানে ? দু-চারটে বোলচাল ঝেড়ে আট-দশ দিনেই তো হয়ে যায় খাস্তগিরের। কেন এ রকম ? কেন এ রকম হারীত ?'

হারীত চেয়ারে বসে বললে, 'ওদের কথা নিয়ে তুমি এত মাথা ঘামাও কেন ? ওদের ওপর নির্ভর করলে কি আমাদের চলে ? জুলেখা কি খাস্তগিরের ওখানে গেছে ?'

'কাদের ওপর নির্ভর করতে হবে ?'

'আমাদের নিজেদের ওপর।'

একটা কাঠের চেয়ার টেনে জানালার কাছে বসল সুলেখা। চিলেকোঠা এর নাম বটে কিন্তু ছাদের ওপরে এই ঘরটা বেশ বড়, আলো হাওয়ায় ভরপুর, আকাশের কাছে যেন। বোশেখ আকাশের চিলের মত, খণ্ড নীল সাদা মেঘের ভেতরে হারীত এসে পড়েছে, যেন সময়ের আরো কাছে এসে পড়েছে।

'জলপাইহাটির ছোট-ছোট কাজগুলো শেষ করে নিতে তোমার বছরখানেক লাগবে ?'

'লাগবে।'
'কাজ না সেরে তুমি তো যাবে না ?'
'না।'
'কেমন আছেন তোমার মা ?'
'আগের চেয়ে ভাল।'
'শুনেছিলাম নরেন মিত্তিরের রক্ত নেওয়া হচ্ছে।'
'সেটা আমি বন্ধ করে দিয়েছি।'
'কেন ?'
'লোকটার সম্বন্ধে অনেক খারাপ কথা শুনেছি। আমি দেখেছিও নিজের চোখে। আমি আর-এক জন লোক ঠিক করেছি।'
'রক্তের জন্যে ?'
'হ্যাঁ। এ দেশে একটা ব্লাড ব্যাঙ্ক করলে হত। কত লোকের দরকার তো রক্তের। পথে-ঘাটে চাষাভুষোদের ভিড়ে কত লোক হাঁস-হাঁস চেহারা নিয়ে ধুকধুক করছে। মরা ব্যাঙের সাদা পেটের মত হয়ে গেছে মুখ-চোখ ; কত দেখলুম এ দেশের দুটো জাতের মধ্যেই, একটার মধ্যে তো খুবই বেশি। কে করে ব্লাড ব্যাঙ্ক। কোথায় টাকা ? কোথায় কী ?'
হারীত জানালার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে বললে, 'দুটো জাত নাকি সুলেখা ?'
'বলছে তো।'
'বেশি রক্ত লাগবে না আর মার।'
'কী করেছিল নরেন মিত্তির ? দিচ্ছে না তো রক্ত—'
সুলেখার চোখে চোখ রেখে হারীত বললে, 'চেনো নাকি নরেন মিত্তিরকে ?'
নরেন মিত্তিরকে চিনতে হচ্ছে সুলেখার। ইদানীং নরেন, বরেন মিত্তির—দু-জাতের অনেকেই, একটু বেশি ঘোরাফেরা করছে সুলেখাদের বাড়ির আশে-পাশে। কোনো পুরুষমানুষ নেই তো সুলেখাদের বাড়িতে। তবে অনেক দিনের পুরোন বাবুরাম আছে—সুলেখাদের বাবার আমলের লোক—লোকটি বাড়ি করে নি, বয়স ষাটের কাছাকাছি ; যেন কেউ নেই এখন তার ; এখানেই সে থাকবে, এখানেই মরবে। বাস্তবিকই যাদের কোনো দরকার থাকতে পারে না বাড়ির ভেতরে—বাবুরামকে না ডিঙিয়ে তারা ঢুকতে পারে না ; নরেনরাও পারছিল না ; এ ছাড়া কলেজ কমিটির ব্রজমাধববাবু খোঁজখবর

নেন রোজই প্রায় সুলেখাদের। একেবারে লাগাও বাড়ি ব্রজমাধববাবুদের। ডাক দিলেই শোনা যায়। এ বাড়ির খবরদারি করেন নবকৃষ্ণবাবুও, তার চেয়েও বেশি ওয়াজেদ আলি সাহেব। কাজেই নরেনরা বিশেষ ভরসা পাচ্ছে না।

'চিনি নরেন মিত্তিরকে আমি। দিদিকে চিঠি লিখেছিল।'

শুনে একটু অবাক হয়ে হারীত বললে, 'কবে?'

'এই তো কয়েক দিন হল—'

'কী লিখেছিল?'

'আমি দেখি নি। ছিঁড়ে ফেলেছে চিঠি দিদি।'

'কাকে দিয়ে পাঠাল চিঠি?'

'পোস্টে পাঠিয়েছে।'

'এইবারে লোক মারফৎ পাঠাবে,' হারীত জানালার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে বললে, 'হয় তো নিজেই ঢুকে পড়বে। একটু দেখেশুনে চলতে বলো জুলেখাকে। অবনী খাস্তগিরের সঙ্গে দেখা করতে গেল?'

'তোমাকে বসিয়ে গেছে, হারীত। ও না এলে তুমি উঠবে না কিন্তু। কেন গেছে অবনীবাবুর কাছে কী করে বলব আমি। দিদির ঢের সদ্দারি আছে, কলকাতা থেকে নেতা এসেছে, ব্যস হয়ে গেল। নেতা কী না জেনে নাও আগে, কী বলে বুঝে দেখো, কী করে চেয়ে দেখো; নাকি নেতা এলেই নোলা সকসক করতে থাকবে?'

'নেতাদের দিন শেষ হয়ে গেছে। নেতারা যা চেয়েছিল তা পেয়েছে। কোথায় এখন আর নেতা,' হারীত একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'জুলেখা তো নেতা হয়েছিল বিয়াল্লিশে।'

'আমিও হয়েছিলুম', হারীত একটু আত্মধিক্কার দিয়ে হেসে বললে, 'ওটাকেই একটা বড় রুশ রেভল্যুশনের মত দাঁড় করানো উচিত ছিল, শুধু ইংরেজ তাড়াবার জন্যেই নয়, আমাদের দেশে যারা ইংরেজের চেয়েও অধিক তাদের নিঃশেষ করে ফেলবার জন্যে। ইংরেজ গেছে, তারা আছে; তারা তো জাঁকিয়ে বসেছে! কেবলই সন্দেহ চারদিকে, কেবলই বিদ্বেষ, কেবলই তিক্ততা; যেটুকু সুবাতাস ছিল একেবারে কাল হয়ে উঠল তো স্বায়ত্তশাসন আসতে না-আসতেই—কী হল কয়েকটা সরকারি ঘরবাড়ি পুড়িয়ে,

টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে, রেলওয়ে ব্রিজ ভেঙে ফেলে'—

'তুমি কোন পার্টির ?'

'কোনো পার্টির না।'

'তুমি যে কম্যুনিস্ট তা আর বলে দিতে হবে ?'

'কম্যুনিস্টদের কেউ আমাকে চেনে না।'

'তবে কি একলব্যের মত তাদের পুজো করছ ?'

'আমি কি স্ট্যালিনের মত কথা বলছি সুলেখা ?'

'কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কথা বলছ তুমি।'

হারীত সুলেখার দিকে তাকিয়ে অবসন্ন হয়ে বললে, 'ছিলাম তো কংগ্রেসে অনেক দিন। অহিংসার দিনেও হিংসে করেছি। রিভলভার হাতে নিয়ে ঘুরেছি-ফিরেছি তো অনেক দিন, বোমা তখনও আসে নি। অণু ফাটে নি। কিন্তু বিরুদ্ধ শক্তিটা যে অ্যাটম বোমার মতই, রিভলভারের মুখে সেটা উপলব্ধি করেছিলাম দশ-বার বছর আগেই। কিন্তু তবুও কি নিরেট আত্মশ্রদ্ধা ছিল। এইটেই দরকার—চোখ মেলে চেয়ে, সব বুঝে-শুনেও, বেহেড আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া —নিজের জীবনটাকে পায়ের নীচে রেখে; না হলে আজকের দিকচিহ্ন ডিঙিয়ে, কালকের বড় কাজ কিছুতেই ঘটতে পারে না ইতিহাসে। যারা ঘটাচ্ছে তারা এই রকম লোক।'

'ইতিহাস তো নিজের বেগে চলেছে।'

'কে বলেছে তোমাকে ? নিজের বেগে—মানুষকে বাদ দিয়ে ?'

'ইতিহাস তো অ্যাটম বোমার মত। কী করত মানুষ তার রিভলভার নিয়ে ?'

হারীত হেসে বললে, 'তুমি আমার বাবার মত কথা বলছ সুলেখা,' হারীতের বাবা—নিশীথবাবুর কথা বলছে হারীত। এ কলেজে নিশীথবাবুর ছাত্রী ছিল সুলেখা। প্রফেসরের মনোভাব যতটা সম্ভব অনুচিন্তন করে দেখেছে সুলেখা। কিছু প্রভাব পড়েছে বটে তার জীবনে নিশীথবাবুর।

'বাবা চিন্তা করে উপলব্ধি করেন, কিন্তু চিন্তাই করেন শুধু, এত বেশি তলিয়ে ভেবে মরেন যে শূন্যতা ছাড়া কোনো মীমাংসাই নেই তাঁর পৃথিবীতে।'

'নিশীথবাবু'—সুলেখা একটু অন্যমনস্ক হয়ে বাইরের দিকে তাকাল, 'শুনলুম নিশীথবাবু আমাদের কলেজ ছেড়ে চলে গেছেন।'

'তাই তো দেখছি।'

'খুব ভাল পড়াতেন আমাদের, কথাবার্তা তাঁর তোমার চেয়ে নরম ছিল হারীত।'

'তা হবে, তিনি বিদগ্ধ মানুষ, আমি তো'—

'প্রলেটারিয়েট?' সুলেখা হেমন্ত-শীতের, প্রফেসর সেনের, সেই আশ্চর্য ক্লাস-গুলোর কথা ভাবতে-ভাবতে চিন্তিত চোখে হারীতের দিকে ফিরে তাকাল।

'না না, তা হলে তো হতই। আমি হচ্ছি, ফরাসীরা যাকে upasle বলে তাই।'

'কী করে এত বেশি আত্মভজা হতে পার তুমি, সেইটেই আশ্চর্য। বিশেষত এই যুগে। বই পড়ছ না আর, বলছ। চিন্তা-টিন্তা করে লাভ নেই, এইটেই তোমার মনের কথা দেখছি তো। এর সুফল তুমি পাচ্ছ—দশ কাহন বিশ্বাস, তোমার নিজের ওপরে। হাড় কালিয়ে দিচ্ছে কিন্তু তোমার বিশ্বাস।'

'হাড় কালিয়ে দিচ্ছে আমার?'

'দিচ্ছে ছাড়া আর কী?'

'খুব বিচ্ছিরি চেহারা হয়ে গেছে আমার?'

সুলেখা ঘাড় কাত করে জানালার ভেতর দিয়ে মাঠের রক্ত ক্যানাগুলোর দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু ক্যানার দাউ-দাউ আগুন তার চোখের মণির ভেতরে মণিকণিকা জ্বাললেও মনে কোনো দাগ কাটছিল না। কী ভাবছিল সুলেখা? হারীতের কথা নয়। হারীতের কথাটা মাটির নীচে পাইপের ভেতর জলের মত তার অজান্তেই যেন কানে ঢুকল তার, জলের মত কোনো দিক দিয়ে কোনো দিকে চলে গেল তার পর, টের পেল না সে। পাইপের মত হয়েছিল মনটা তার।

'কিছু বলছিলে আমাকে?'

'কী ভাবছিলে তুমি?'

'দেখছি তো ভেঙে পড়ছে তোমার শরীর।'

'আগের চেয়ে ভাল হচ্ছে জলপাইহাটিতে এসে।'

'ভাল হলেই ভাল,' হারীতের শরীর নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করছিল না সুলেখার, 'বিশ্বাস তোমার দৃঢ়। কিন্তু বিশ্বাসটা কী? আমাদের দেশে স্বায়ত্ত শাসন কিছু হচ্ছে না, কিছু নেই আর কংগ্রেসে। ফোঁপরা হয়ে গেছে কংগ্রেস—এই তো।'

সুলেখার কথার কোনো উত্তর দিতে গেল না হারীত। এ মেয়েটি একান্তই একবগ্‌গা পলিটিক্সের। যদি কোনো দিন নির্বিশেষে মরে যায় কংগ্রেস, তা হলে তার শেষকৃত্য করবার জন্যে যারা রয়ে যাবে তাদের মধ্যে থাকবে, পাশে কোনো বৃহৎ বিরাট জীবনের দার্ঢ্যকেও জীবন বলে স্বীকার করবে না, মনে হয় যেন ঠিক এই রকম সুলেখা। তবে ভাবে বোঝা কঠিন। কথা বলতে-বলতে কোথায় চলে যায় সুলেখা, কী বলে, কী ভাবে, যা ভাবে তাই কি বলে, হোয়াইট হেডের ঈশ্বরের চেয়েও মাঝে-মাঝে অবতার মনে হয় সুলেখাকে।

'কংগ্রেস পথ খুঁজে পাচ্ছে না এখন আর,' হারীত বললে, 'কোন দিকে তোমার নিজের পথ ?'

'সময় আমাদের যতটা জানতে, বুঝতে দেয়, তার চেয়েও বেশি উপলব্ধি করে পাবার মত কিছু হবে না। জিরিয়ে নাও, তাকিয়ে দেখো, প্রকৃতিকে আস্বাদ করো, যেমন ঐ ক্যানাফুল, সবুজ মাঠ, সাদা বাতাস, রোদ, বোলতা, মৌমাছিগুলোকে, মানুষকেও যেমন—ইতিহাসের তোড়ে মানুষ কেমন তলিয়ে যাচ্ছে কলকাতার কত জায়গায় নিঃসম্পর্ক হয়ে, তাকিয়ে দেখো।'

'এই সবের দিকেই আমার ঝোঁক এসে পড়ে মাঝে-মাঝে, টের পাই রক্তের সহজ টান কোন দিকে। কিন্তু এ সব, মুক্ত মানুষকে হটিয়ে দেবার জন্যে সময়ের আশ্চর্য চোখঠার ছাড়া আর-কিছু নয়, এটা স্বীকার করে নিয়ে এটাকেই শ্রেয় চিন্তা হিসেবে বুঝে নিতে হবে, মানুষের ভাল হবে বিশ্বাস করতে হবে; কাজ করতে হবে, পরিগঠন করতে হবে।'

'কিসের পরিগঠন হারীত ? বাংলার গ্রামগুলোর ?'

'না। এখন নয়।'

'তবে ?'

'বলেছিই তো তোমাকে বড় আয়োজনটা চালাতে হবে বিপ্লবের জন্যে।'

'খুব একটা বড় বিপ্লবের জন্যে তো বটেই।'

'তাতে রক্ত এসে পড়বে না ? এসে পড়বে তো প্রপাতধারায়।'

'পড়ে যদি তা হলে পড়বে। মানুষের উপকারই চাই আমরা। খুব বড় বীতরক্ত বিপ্লবে যদি সেটা হয় তা হলে তাইই চাই। রক্তের ওপর কে জোর দেয়, রক্তের দিকে মানুষের কোনো স্বাভাবিক ঝোঁক নেই।'

'বিপ্লবটা হবে ফরাসি ধরনে ?'

'রুশ ধরনে বলো।'

'রুশ বড় ফরাসির চেয়ে ?'

'বেশি সংহত ; বেশি আধুনিক বলেও মনে হয় আমার।'

'তুমি কম্যুনিস্ট হারীত।'

'আমি কম্যুনিস্ট নই, যোশীর থেকে মুজাফফর আহমদ অব্দি কেউ আমাকে চেনে না, আমার নামও শোনে নি, আমাকে চোখেও দেখে নি।'

'তোমাকে স্ট্যালিনিস্ট বলেই তো মনে হচ্ছে ?'

'স্ট্যালিনিস্ট আছে নাকি ? জানি না তো। তাদের কাউকেই কোনোদিন দেখি নি আমি'—

'দেখো নি ? কী তবে তুমি ?'

'নিজেকে খাঁটি ভারতবর্ষীয় বলতে পারি না আমি। আজকালকার দিনে কেউই কোনো দেশের নেহাৎ স্বদেশবাসী হয়ে থাকতে পারে না। পৃথিবীর সাধারণ এক জন মানুষ আমি—তুমিও সুলেখা ; সকলের ভাল চাচ্ছি আমরা, একটা বড় বিপ্লবে হাত দিচ্ছি—'

সুলেখা সবেগে হাত নেড়ে হারীতের কথা হটিয়ে দিয়ে বললে, 'না, না, আমি না। আমি ও-সবে নেই।'

'নেই তুমি ?'

'না। নেই। কংগ্রেসে। আমি কংগ্রেসে।'

হারীত একটু হেসে বললে, 'কংগ্রেস যদি বিপ্লব করতে বলে ?'

'তা বলবে না কখনো।'

'বলবে না ?'

'খুব সুচিন্তিতভাবে কাজ করে কংগ্রেস। আমরা নতুন স্বাধীনতা পেয়েছি। প্রথম দিক দিয়ে একটু গোলমাল হবে, খানিকটা বিশৃঙ্খলা আসবেই তো। কিন্তু সে জন্যে আবার ঘোষ ব্রাদার্সের মত রিভলবার বোমা নিয়ে খেপে উঠতে হবে নাকি ?'

'কে ঘোষ ব্রাদার্স ?' একটু বিস্মিত হয়ে বললে হারীত।

'এই তো আজকালকার ঘোষেরা ; হালে মিনিস্ট্রি গেছে যাদের—আবার আসছে ; সেই সব ঘোষ—'

হারীতের খুব কাছে এগিয়ে গেলে তার চোখের তারায় সুলেখার মুখ দেখা

যেতে পারে। কিন্তু তবুও সে শখ মেটানো খুব কঠিন কিন্তু তবুও কেমন দেখাচ্ছে তার মুখ হারীতের চোখের মণির ভেতরে—ঘোষেদের কথা বলতে কী বলছে ভুলে গিয়ে আবার কথার খেইটা মনে পড়ল তার।

'এঁরা তো গান্ধীজির উত্তরমীমাংসার দেশের ; পূর্বমীমাংসার কথা বলছ তো তুমি। তুমি বলছ লালমোহন ঘোষ, রাসবিহারী ঘোষের কথা,' দাঁত বের করে হেসে বললে হারীত। সোজা হাসি। কিন্তু হারীতের খাঁড়া নাকের ওপর একটা বাঁকা ভাঁজ এসে পড়ল। দেখল সুলেখা।

'কে ঘোষ ব্রাদার্স তবে হারীত ?'

বাইরের প্রজ্জ্বলন্ত ক্যানাফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে হারীত একটু চুপ থেকে বললে, 'নাঃ, অরবিন্দ, বারীনের সে সব জিনিস ওদের সময়ে হয়ে গেছে। এখন অন্য জিনিস হবে।'

বাতাসে চুল উড়ছিল সুলেখার, খোঁপা বাঁধে নি ; স্নান করা ঠাণ্ডা জলদেবীদের মাথার অফুরন্ত কাল সোনালি সাপ যেন তার মাথার চুল সব। পৃথিবীর বাতাসে রোদে এখন ক্রমেই স্থলদেবীর চুলের মতন দেখাচ্ছে। গোছার চুল গালের দিকে টেনে এনে মুখের ওপর বুকের ওপর দিয়ে কাল চুলের অমৃতের দিকে তাকিয়ে সুলেখা বললে, 'ও-সব কোনো জিনিস হবে না আমাদের দেশে। এটা আমাদের ভারতবর্ষ, এর প্রাণ আলাদা। এখানে রোবস্পিয়েরের ছাঁদে লেনিন, স্তালিন, বুখারিনের জিনিস চলবে না। স্বায়ত্তশাসন পেয়েছি ; অনেক কাজ এখন দেশের মানুষের হাতে। কোনো একটা গড়বার কাজ হাতে নিতে হবে তোমায় হারীত। কোম্পানি বাগানের মাস্টারদার, অনন্ত সিংদের, উনিশশ বেয়াল্লিশের ভাঙনের দিন নেই এখন আর, সত্যিই নেই। কংগ্রেস চারদিক থেকে গঠন করবার, নির্মাণ করবার জন্যে, শীতের শেষে কুমোর পোকার মত কেমন বুঁ বুঁ করছে শুনছ না ?'

'হাসছ কেন সুলেখা ?'

'হাসছি, তুমি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছ কেন হারীত ?'

'শীতের শেষে কুমোর পোকার মত বুঁ বুঁ করছে ?' হাসতে-হাসতে চোখ ঠিকরে ঠিকরে উঠছিল হারীতের, 'ভারী মজার কথাই বলেছে সুলেখা ; শীতের শেষে কুমোর'—

'বড় বিপদেই পড়েছে কংগ্রেস', সুলেখা বললে, 'এমনি তো ভালই হচ্ছিল সব,

জোয়ার ক্ষেতের থেকে ব্রিটিশদের পাখির মত তাড়িয়ে উড়িয়ে দেওয়া হল,
প্যাটেল বললেন, কিন্তু কাশ্মীর বড্ড গোলমালে ফেলল'
'কেন ইউনোর কাছে ধরে দেওয়া হল কাশ্মীরকে ?'
'তার পরে হায়দ্রাবাদ—'
'এর মীমাংসা কি হওয়া উচিত ছিল না এত দিনে ?'
'তারপরে এই কম্যুনিস্টদের লক্কা বজ্জাতি।'
হারীত চুপ করে ছিল।
সুলেখা বললে, 'এই বারে আঁতে ঘা পড়েছে হারীতের। যেই কম্যুনিস্টদের কথা বলেছি অমনি মুখে বড়াপিঠে গুঁজে বসে রইল। তুমি তো কম্যুনিস্ট হারীত।'
'আমি নই। কিন্তু কম্যুনিজমের দিকে চলেছে কংগ্রেস—'
'কংগ্রেস ? কে বললে তোমাকে ?'
'জয়প্রকাশ নারায়ণ সে দিন সি-এস-পি-কে—'
বাধা দিয়ে সুলেখা বললে, 'ও-সব কংগ্রেসি জিনিস নয়।'
'জওয়াহরলাল মনেপ্রাণে কম্যুনিজমকে সার্থক করে তুলতে চান। কিন্তু চারদিক থেকেই সবাই আটকে রাখছে তাকে। কিন্তু তবুও বিশোধিত হয়ে আজ হোক কাল হোক মার্কসিজমের দিকে না গিয়ে পারে না কোনো দেশের কোনো সৎ প্রতিষ্ঠান'—
'কম্যুনিস্টদের কথা হচ্ছিল, তুমি চলে গেলে কম্যুনিজমে, দুটো এক জিনিস নয় ; এখন মার্কসিজমের কথা বলছ। ওটা আরো আলাদা ধরনের। জওয়াহরলাল মনে প্রাণে কী তা আমি জানি না ; এলাহাবাদ যাই নি কোনোদিন। কৃষ্ণা হাতী সিং-এর সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল, জিগ্যেস করি নি পণ্ডিতজির কথা ; তিনি তো অনেক দিন থেকে দিল্লিতে ; কিন্তু আমি যখন গিয়েছিলুম পাই নি তাঁকে। দিল্লিতে আছেন, না বাইরে গেছেন, জিগ্যেস করতে ভুলে গেছলুম। কম্যুনিজমের দিকে কংগ্রেস চলেছে বড-বড শিল্পপতিরা বেঁচে থাকতে ? নেহরুর স্বয়ংসম্পূর্ণ নেতৃত্ব পাচ্ছে না তো কংগ্রেস। পেলেও রুশ কম্যুনিজম বা যোশী কম্যুনিজম আসত না কোনোদিন কংগ্রেসে। কংগ্রেস নেতাদের ভেতর মহানুভব লোক আছেন এখনো, যেমন…যেমন', সুলেখা একটু ঢোঁক গিলে বললে, 'যেমন…এঁরা শ্রেণীবৈষম্য চান না। মালিক-মনিবদেব বদমায়েসি সত্যিই ভালবাসেন না। যারা বড়দের পায়ে চাপা

পড়ে নীচে পড়ে আছে তাদের বাঁচিয়ে উন্নত করে সকলের জন্যে সুবিচার, সুব্যবস্থা, কল্যাণ, আলো আনতে চান। কংগ্রেসের প্রকৃত প্রাণ এইই তো চায়। এটা কি রুশ কম্যুনিজম-সংগীত। না। তার ভেতর আরো অনেক ঝাঁঝালো খামির রয়ে গেছে।'

'কাজের প্রণালীও আলাদা। একটা ক্যাবিনেট মিশনের কাছ থেকে তারা স্বাধীনতা পায় নি, বড়-বড় রাষ্ট্র-বিপ্লবের আগ্নেয়গিরি ঠেলে বেরুতে হয়েছে।'

'ওর কোনো মানে নেই।'

'নেই?'

'না। স্বাধীনতার কী সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে. না হচ্ছে, সেইটেই আসল। কংগ্রেস তা হলে রুশ কম্যুনিজমের থেকে ঢের দূরে তো হারীত?'

'ঢের দূরে।'

'কংগ্রেসের সদাত্মা এ-দেশী কম্যুনিজমের থেকেও দূরে তো?'

হারীত একটু ভেবে বললে, 'কংগ্রেসের সদাত্মা? সেটা মার্কসিজমের খুব কাছাকাছি।'

'গান্ধীবাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তবুও?'

দুই জনে কিছু ক্ষণ চুপ করে বসে রইল। হারীতের এ কথাটায় সুলেখারও সায় আছে মনে হচ্ছিল।

'মার্কসিজম। পড়েছ ডাস কাপিটাল তুমি?'

'পড়েছি,' হারীত বললে।

'ঐ গোটা বইটা? আমিও পড়েছি বটে। বিশ্বজ্ঞান মার্কস যা লিখেছেন। দর্শন। আমাদের আদি ভারতীয়দের থেকে শুরু করে কারু কোনো দর্শনই আজ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারলুম না আমি।'

'ঠিকই তো। যে ভাবতে শিখেছে, এমন কি যে মনে করে যে সে ভাবতে শিখেছে, তার দর্শন তার নিজের কাছে, কিন্তু নিজের দর্শনটা পৃথিবীর ওপর আরোপ করে লাভ নেই। পৃথিবীটাকে গান্ধীর মত, কিংবা মার্কসের মত, এক জন বড় মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল?'

'কিছু দিনের জন্যে অন্তত।'

'কিছু দিনের জন্যে।'

'এর পরে কী হবে?'

'জীবনের ইতিহাসের আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যা হবে মনে হয়। আরো স্পষ্টতর জ্ঞানীর হাতে। কিন্তু তাই বলে সাধারণ মানুষের জীবনের আরো উন্নতি হবে কি না আমি বলতে পারি না', হারীত চকিত হয়ে বললে, 'শ্রীযুক্ত সেনের মত কথা বলছি আমি।'

'সেন কে ?'

'আমার কথাটা প্রত্যাহার করছি। বলেছি সাধারণ মানুষের উন্নতি হবে কি না বলতে পারি না।'

'বলেছ তো।'

'উন্নতি হবে। ইতিহাসের ব্যাসকূট নিরসন হোক, বা না হোক, সৎ কর্মীদের হাতেই উন্নতি হবে।'

'সেন কে ? তোমার বাবা নিশীথবাবু ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় তিনি ?'

'কলকাতায়।'

'কলকাতার কলেজে চাকরি করছেন ? আমাদের কলেজ ছেড়ে চলে গেলেন কেন ?'

'কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনে নি শুনেছিলাম।'

'কেন বনে নি ?'

'টাকাকড়ির ব্যাপার নিয়ে। বাবা আরো পঞ্চাশ টাকা বেশি চেয়েছিলেন।' সুলেখা বললে, 'হরিলালবাবুরা দিলেই তো পারতেন। কলেজের তো অনেক টাকা আছে। হরিলালবাবুর জামাই কামাখ্যাবাবুকে তো পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কলেজ কমিটির হিমাংশু চক্রবর্তীর শালাকেও চল্লিশ-পঞ্চাশ। প্রিন্সিপ্যাল কালীশঙ্করবাবু যদি পাঁচ শ পান তা হলে নিশীথ-বাবুও তো পেতে পারেন। না-দেওয়া হয় যদি, তিন শ সাড়ে তিন শ দেওয়া হোক। দেড় শ পাচ্ছিলেন, দু শ চাচ্ছিলেন তাও দেওয়া হল না। ওয়াজেদ আলি সাহেবের এটা করে দেওয়া উচিত ছিল।'

হারীত বললে, 'কে কী করবে কার জন্যে ? কলেজ তো একটা দৃষ্টান্তস্থল শুধু। যে আচার-ব্যবস্থায় কালীবাবু পাঁচ শ টাকা পান, আর সবাইকে এক শ দেড় শ টাকায় গড়াতে হয় সেটার গিঁট কোথায় ? কলকাতায়ও ঠিক এ রকম, সব

জায়গাতেই তো। গেঁড়টাকে উৎখাত না করতে পারলে এখানে ওয়াজেদ আলি সাহেব কী করবেন ?'

'কলকাতার কলেজে ঢুকেছেন নিশীথবাবু ?'

'কী জানি বলতে পারি না।'

'চিঠিপত্র পাচ্ছ না ?'

'না।'

সুলেখা মাঠের ঘাস, ক্যানাফুল, বোলতা, রৌদ্র সমস্ত চক্রবলয়টা পেরিয়ে অনেক দূর তাকিয়ে রইল। কলেজের ক্লাসে তিন বছর পড়েছে সে নিশীথবাবুর কাছে। নানা রকম কথা-কথিকা মনে পড়ে লেকচার রুমের, রুমের বাইরের নিশীথ সেনের। এই সে দিন তো, কিন্তু এক হাজার বছর আগে যেন—আজ দুপুরে কত শত নিঃশব্দতার ভেতরে এসে পড়ে মনে হচ্ছে।

'কে কত মাইনে পায়, কার কত বেড়েছে না-বেড়েছে এত বৃত্তান্ত জানলে কী করে তুমি ?'

'জেনে ফেলেছি তো', সুলেখা জিভ দিয়ে একটু টাগরা টিপে হেসে বললে, জানেওয়ালা মানুষের মত রহস্যের কৌটো নিজের আঁচলের আঁধারে লুকিয়ে রেখেছে যেন।

'কে বলে যায়, ওয়াজেদ আলি ?'

সুলেখার দৃষ্টি অবাক দূরের থেকে গুটিয়ে কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুল ডালপালার বাতাসের ভেতর ঘুরছিল, 'ওয়াজেদ আলি, ইয়ুসুফ, সেরাজুল হক, নূরুল হুদা, সুজন খাঁ, বসিরুদ্দিন, মুনার গাজি, মমতাজ আলি, মহম্মদ ইসমাইল, গোলাম হোসেন, আবদুস সত্তর, আবদুল করিম—অনেকেই তো এখানে আসেন। এঁদের কাছ থেকে নানা রকম খবর পাওয়া যায়।'

কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে তাকাল হারীত চোখ তুলে—কেমন থলো-থলো সারাৎসার রক্তের অবদানের মত ফুলের রাশি সব—বাতাসের অবিরাম শুশ্রূষার ভেতর।

'তোমার তো এবার ফোর্থ ইয়ার সুলেখা ? কলেজ ছেড়ে দিলে যে ?'

'নাঃ, আর যাব না কলেজে, কেমন ভাঙন ধরেছে যেন।'

'কোথায় ? কলেজের প্রফেসরদের ভেতর ? নাকি তোমার মনে ?'

'প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে দেব। এবার যদি না হয়, পরের বার দেব।'

'এক তো বাবা চলে গিয়েছেন, এ ছাড়া প্রায় সব প্রফেসরই তো আছেন কলেজে।'

'জানি না। যাই না কলেজে', বিরস ভাবে বললে সুলেখা, 'নিশীথবাবুর এটা বড় অন্যায় হল।'

'কেন ?'

'পাকিস্তান হতে না-হতেই তিনি ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে চলে গেলেন।'

'একটা চিঠি লিখে দাও বাবাকে।'

'কে, আমি ?'

'লিখে দাও আপনি না এলে আমি ক্লাসে যেতে পারছি না, চলে আসুন।'

পৃথিবীর চারদিকের সমস্ত রোদ শুষে এনেছে যেন কৃষ্ণচূড়া গাছটা, ঝিলমিল করছে ফুলগুলো কড়া দুপুরের রোদের ভেতর। রোদের ঝিলিক এসে পড়েছে ঘরের আনাচে-কানাচে মানুষের বুকে কানে, মেয়েলোকের হাতে চুলে। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ মাঠে, বাড়িতে, জলের শব্দে, ভীমরুলের চাকে, তেপান্তরের ধোঁয়ার মত আকাশটার মাথায়-মাথায় উড়ন্ত বক, ফিঙে, হরিয়াল, ওয়াক পাখিদের ডানা-ঠ্যাঙের অফুরন্ত আঁকিবুকির ভেতর। সুলেখা টেবিলের থেকে তার সান-গ্লাসটা পেড়ে এনে বললে, 'চোখে পরবে হারীত ?'

'তুমি পরো। যে জায়গায় বসেছ সুলেখা সেখানে সূর্যের তাত বেশি।'

ধোঁয়া রঙের চশমাটা চোখে এঁটে নিয়ে সুলেখা বললে, 'মা-ও গিয়েছেন অবনী খাস্তগিরের বাড়ি। দিদি যাব-যাব করছিল। আমাকে একা ফেলে যেতে পারে না তো, বাবুরাম বাড়ি নেই। তোমাকে আসতে দেখে কেমন বান মাছের মত সটকে পড়ল, দেখলে তো!'

'তোমারও যাবার ইচ্ছে ছিল, আটকে রাখছি।'

'ক্ষ্যাপা নাকি! আমি যাব অবনী খাস্তগিরের বাড়ি! ওদের দানোয় পেয়েছে। দুড়দাড় করে ছুটে যায় আর আসে। আসে আর যায়, মনকে বলে, সাবাস। অবনীবাবু স্ত্রীকে এনেছেন শুনলাম।'

'ক-দিন হল এসেছেন ?'

'দিন ছ-সাত। পাঁচ-ছয় দিন থাকবেন আরো হয় তো।

'দুপুরে কি ফ্ল্যাশ খেলা হয় অবনীদার বাড়িতে ?'

'হতে পারে। কী করে না হলে সময় কাটাবে।'

'কাটাচ্ছি তো।' সুলেখার মুখ খুঁজে নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে হারীত বললে।
'এ রকম করেই রক্তবিপ্লব করবে তুমি হারীত?' এ রকম একটা প্রশ্ন তুলে হারীতকে যে জব্দ করে দেওয়া যায় সে খেয়ালটার বিশেষ কোনো মূল্য রইল না হঠাৎ যেন সুলেখার কাছে, নিমেষে মুছে গেল তার মনের ভিতর থেকে, চারদিকের পৃথিবীর থেকে নির্লিপ্ত হয়ে রইল এর চোখ ওর চোখকে বিষয়াসক্তির জিনিস বলে মনে করে আধ মিনিট, এক মিনিট, দেড় মিনিট—
সানগ্লাস খুলে ফেলল সুলেখা, টেবিলের কেসে আটকে রেখে এল।
'রোদ সরে গেছে এখান থেকে হারীত। বাইরে কেমন?'
'খুব ঝাঁঝ বাইরে।'
'ঘরের ভেতরটা এখন ঠাণ্ডা।'
'জুলেখারা বাজি রেখে বসে খেলছে বুঝি?'
'হ্যাঁ। বেশ কড়কে জুয়ো না খেললে ভাল লাগে কি এমন দুপুরে। একটা মোটা নেশা চাই তো, বিকেলে চা খেয়ে মহড়া দেবে সকলে মিলে। আজ বিকেলে মিটিঙ তো হবে। রোজই তো হচ্ছে। যাও না তুমি? মিটিঙে কে কী বলবে, কী বলা উচিত, তার আলোচনা চলবে চায়ের বৈঠকে।'
'কোথায় হবে মিটিঙ?'
'মহম্মদ মতিজেদ হলে।'
'যাবে নাকি সুলেখা?'
'ইচ্ছে করে না মিটিঙে যেতে আমার। খাস্তগির মশাই তো ডামাডোল করে আমাদের এখানে থাকতে বলে চার-পাঁচ দিন পরেই সস্ত্রীক কলকাতায় চলে যাবেন, সুবিধে বুঝে ফিরবেন হয় তো আবার ন-মাস ছ-মাস পরে; না হলে ফেরবার দরকার নেই। এ সব লোকের মিটিঙ তো চেঁচিয়ে কথা বলা। অনায়াসেই বলে যায় কিছু তেজী, কিছু ভারিক্কে, ডারডেলার কত কথা সব। কিন্তু শুধু কথা বললে তো হয় না—চরিত্র কোথায়?'
'অবনী খাস্তগিরের স্ত্রীও বলবেন নাকি?'
'জানি না, ওয়াজেদ আলি সাহেব হয় তো বলবেন। খাস্তগিরের চেয়ে বেশি জিনিস আছে জনাব ওয়াজেদ আলির ভেতর।'
হারীত চোখ বুঁজে সায় দিয়ে, চোখ মেলতে, হুড়হুড় করে বেশি বাতাস ঘরের ভেতর ঢুকে পড়তেই, চোখ বুঁজে-বুঁজে বললে, 'কী করে আলাপ হল ওয়াজেদ

আলির সঙ্গে তোমার ?'

'এলেন তো এক দিন আমাদের বাড়িতে ; এসে আলাপ করলেন আমাদের সকলের সঙ্গে। পাকিস্তান ছেড়ে চলে যেতে নিষেধ করলেন, কোনো মুশকিল হবে না আশ্বাস দিলেন, কোনো রকম অসুবিধে হলে তাঁকে, মহম্মদ ইয়ুসুফকে, আমির আলি সাহেবকে জানাতে বললেন। অনেক মানুষকে বিশ্বাস করা কঠিন,' সুলেখা বললে, 'কিন্তু আলি সাহেব ওদের মতন নন।'

'ওয়াজেদ আলি সাহেব ? তাঁকে দেখি নি আমি কোনো দিন।'

'এ দেশে ছিলেন না।'

'কেন ? এখানকার মানুষ নন ?'

'না। কলকাতার ওদিক থেকে এসেছেন।'

'ওয়াজেদ আলি সাহেবের সঙ্গে এক দিন আলাপ করতে হবে আমায়।'

'জনাব মহম্মদ ইদরিসের সঙ্গেও করো, জনাব ইয়ুসুফ আলির সঙ্গে, জনাব সাহাদাত হোসেন সাহেবের সঙ্গে, জনাব বরকতুল্লা সাহেবের সঙ্গে, জনাব মোবারক আলির সঙ্গে, জনাব আমির চৌধুরীর সঙ্গে, চাঁদ মিঞা সাহেবের সঙ্গে, মানিক মিঞা, লাল মিঞা, সোনা মিঞা সাহেবদের সঙ্গে ; জনাব—'

হারীত উঠে দাঁড়াল।

'উঠছ তুমি ?'

'এইবারে উঠি, বাবুরাম এসে বসে আছে রোয়াকে। আধ-ঘণ্টাটাক হল এসেছে ; আমি দেখছিলুম। দেখ নি তুমি ?'

'বসো তুমি। তোমায় বসতে হবে। কোথায় যাবে এই ঝাঁ ঝাঁ রোদে। এ বাড়িটা তোমার খুব নির্জন লাগছে না কি হারীত ?'

'নির্জন ?'

'মা নেই, জুলেখা নেই। জুলেখা নেই—সে জন্যে একটু ফাঁকা লাগছে হয় তো তোমার হারীত।'

হারীত ঘরের ভেতর দু চারবার পায়চারি করে বেরিয়ে চলে যাবে ভাবতে-ভাবতে চুপচাপ আটকে বসে রইল তবু।

'নির্জনতাই আমার ভাল লাগে। কলকাতায় এটা একেবারেই নেই। কত-জনকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেছি আমিই তো, কত মানুষের শান্তিভঙ্গ করেছি। এমন একটা জায়গা খুঁজে পাই নি কলকাতায়, এমন এক জন মানুষ পাই নি, যার

কাছে বসে সময় নেই জেনেই সময়টাকে ভাল লাগে। শেষ পর্যন্ত সময় নেই তো সুলেখা, সময় নেই কোথাও—এই বাড়িতে এ রকম দুপুরের নিঃশব্দতায় এসে বুঝতে পারি যে বহতা সময়ের বয়ে যাবার চেয়ে তার সম্পূর্ণ উচ্ছেদের পরিসর কত বেশি, আস্বাদ কত বেশি উজ্জ্বল। তবুও যতটা দিন বেঁচে আছে মানুষ, প্রতি মুহূর্তে সময় আছে, আছে, ছুটে চলেছে এ রকম একটা উদ্বেগে অতিষ্ঠ হয়ে ভয়াবহভাবে ধ্বংস করে ফেলছে সময়কে, নিজেকেও।

সুলেখা একটু হেসে বললে, 'এ কি তোমার নিজের কথা হারীত?'

'তবে কার কথা বলছি আমি?'

'নিশীথবাবু তো এই রকম বলতেন।'

হারীত নিজের চুলের ভেতর দু-একবার আঙুল চালিয়ে নিয়ে বললে, 'বলতেন বুঝি? বলবেনই তো, আমার বাবা তো। সন্তান যা ভাবে, পিতাতেও তা বর্তায় না?'

'কথা তো। কিন্তু দেখছিলুম তো তাঁর চেয়ে তুমি একেবারেই আর-এক রকম। এখন আবার দেখছি তুমি অনেকটা তাঁরই মতন।'

'আমরা দু জনেই এক রকম। দু জনেরই মনে দুটো ধারা আছে, বাবা একটার ওপর ঝোঁক দিয়েছেন আমি অন্যটার ওপর। কোন দিকের ঝোঁকটা ভাল লাগে তোমার?'

'আমার মনের মিল মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে—তাঁর কাছ থেকে সব শিখেছি, যা শিখেছি ভালবেসেছি।'

'কেন? তা তো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।'

'কলকাতায় তুমি যে রেভল্যুশন ফাঁদছ, সেটা সফল হবে?'

'সফল হবে।'

'নিশীথবাবু কুড়ি-পঁচিশ বছর আমাদের যা পড়ালেন, আজীবন যা করলেন, সেটা ব্যর্থ?'

'ব্যর্থ।'

'এত সহজেই মীমাংসা হয়ে যায় সব কিছুর?'

'হ্যাঁ, সহজেই,' হারীত বললে, 'সুলেখাও কি নিশীথবাবুকে'—কথাটা শেষ করল না হারীত।

'আমি উঠি সুলেখা।'

'তোমায় বসতেই হবে।'

'এখন তোমার বই পড়ার সময়।'

'আমি এবার বি-এ এগজামিন দিচ্ছি না।'

'সে সব বই নয়, বাইরের বই পড়বে তো তুমি এখন—'

'আমি রুটিন করে পড়ি বুঝি হারীত? এটা আমার পড়বার সময় কে বললে তোমাকে?'

হারীত বাইরের বাতাসের বড় সাড়া শুনছিল, অনেক পাতার গুচ্ছে অনেক পাখির ডানার পালকে, নীচে, দিকে-দিকে জলের রাশির ভেতরে, পৃথিবীর টনক নাড়িয়ে আঘাত করছে, বাতাস যেন নীলিমার বুকে গিয়ে ফেটে পড়ছে দক্ষিণ পূর্ব উত্তর বাতাসের আনন্দে, পৃথিবীরই জননীনিকুঞ্জের ভেতরে আবার।

'তোমার সানগ্লাসটা আমাকে একটু দাও তো।'

'কেন, এটা চোখে এঁটে খাঁ-খাঁ রোদের মধ্যে বেরিয়ে পড়বে তো?'

'না, আমি এখানেই রয়েছি। বাইরের কড়া রোদের দিকে তাকিয়ে চোখ কেমন ধাঁধিয়ে উঠছে। সাদা-সাদা বড় মেঘগুলোও কী ভীষণ জ্বলন্ত কাচের মত উজ্জ্বল।'

'এদের পেছনে সূর্য রয়েছে।'

'ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে কিন্তু মেঘগুলোকে। যেন ভেঙে গেছে সুয্যি; রাশি-রাশি সাদা মেঘে জ্বল-জ্বল করে বেড়াচ্ছে। আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি এ রকম। আমাদের মৃত্যু হয়ে গেলেও থাকে ওরা। দেশ থেকে দেশ চলে যায়; কেমন অভিমানবের মত মনে হয় যেন সব। আমরা ওদের মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিয়ে আমরাই মিথ্যে হয়ে উড়ে যাই; ওরা টিঁকে থাকে কী রকম স্বচ্ছ আগুনের অন্তঃশীল আনন্দে।'

সুলেখা ভৎর্সনার সুরে হেসে উঠে বললে, 'এ কেমন স্ট্যালিনের মত কথা হল?

'স্ট্যালিন?'

'এ কেমন বুখারিনের মত কথা বললে তুমি হারীত?' নিজেকে শুধরে নিয়ে সুলেখা বললে।

'বুখারিনের মত? কথাটা বলেছি হোরেন্ডের নিজের মত, নিশীথ সেনের মত, লুক্রেসিয়সের মত: এরা বুখারিনদের এলাকার বাইরে। সে যা হোক,

বুখারিনের কথায় অন্য কথা মনে পড়ে গেল—বিপ্লব করতে গিয়ে একটা মস্ত ট্র্যাপের পাকে জড়িয়ে পড়তে হয় বুঝি মানুষকে সব দেশে সব কালেই ?'

সুলেখা কথা বলবার আগে মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখল এক-আধ মুহূর্ত, তার পর ঘুরিয়ে এনে একটু চুপ থেকে পরে বললে, 'সব কালেই সব দেশেই। ভারতবর্ষেও তুমি যদি বিপ্লব কর, সবাই যদি বিপ্লবী হয়েও যায়, তা হলেও ওদেরই হাতে তোমার, তোমাদের মত লোকের বিচার হবে। তাতে তুমি টিঁকে থাকতে পারবে বলে মনে হয় না।'

হারীত আকাশের চিলের ডানার সঙ্গে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে, চোখটাকে স্থির করে আনতে-আনতে বললে, 'তা হবে খুব সম্ভব। তা আমি জানি। বুখারিনদের ভাগ্যের জন্য আমি প্রস্তুত আছি।

'তা তো প্রস্তুত আছ। সানগ্লাসের দরকার ?'

'না।'

'মেঘ দেখছ তো।'

'মেঘ আরো জমাট বেঁধেছে।'

'সূর্য আছেন মেঘের পেছনে ?'

'মেঘের সামনে তো সূর্য, একটা মস্ত বড় সাদা মেঘের মতন।'

'কে মেঘ, কে সূর্য বুঝতে পারছি না—'

'আকাশের এ-পার ও-পার জুড়ে মেঘটা সূর্যের মতন', বললে হারীত।

'এত জ্বলন্ত ?'

'তুমি নিজে উঠে দেখ সুলেখা,' হারীত বলে উঠল।

'আমি তো সূর্য পূজারী নই হারীত।'

'চোখ বুঁজলে যে ?'

'ভেতরে সূর্যটাকে দেখছি। তুমি সানগ্লাস নাও হারীত।'

হাত বাড়িয়ে চশমাটা সুলেখার হাত থেকে তুলে নিয়ে হাতেই রেখে দিল হারীত; ক্যানাফুল, কৃষ্ণচূড়া, বোলতা, মৌমাছি, হরিয়াল, ওয়াক, রৌদ্র-নীলের দিকে খোলা চোখেই তাকিয়ে রইল সে। এর পরে কলকাতায় গিয়ে বড় মুশকিলে পড়তে হবে, হারীত ভাবছিল। খুব ভাল লাগছিল তার, খুবই খারাপ লাগছিল। সুলেখার কাছে বসে থেকে চোত-বোশেখ বসন্ত ঋতুর এই সুদূর নীলিমার বাতাস, রোদ, পাখি, ছাদ, নিস্তব্ধতার ভেতর—ঘড়ির থেকে

সময়কেই খসিয়ে নিয়ে এ রকম অমৃত হয়ে বসে থাকবার কী অধিকার আছে তার। সময় যে বাস্তবিকই একটা ওতপ্রোত নিরবচ্ছিন্ন বাধাবিমুখ বিরাট ঘড়ির আবর্তন, কী অধিকার আছে হারীতের—নিজেকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর দীন-দুর্বল মানুষগুলোকে সেই অকৃতার্থ সমরোৎসবের ভেতরে ছেড়ে দেবার? যে-লোকগুলোকে কলকাতায় সে জড়ো করেছিল তার আত্মার সহোদর হিসেবে—কিংবা সৎ ভাই সৎ বোন হিসেবে হয় তো তার নিজের আত্মার—বিপ্লবের সেই সব কর্মীরা কী করছে এখন এমন, দুপুরে, তার অভাবে? জোট পাকাচ্ছে কি তারা আগের মতন এখনো, আলোচনা করছে, কথা ভাবছে, দল বাড়াতে পারছে, ঠিক করতে পারছে কার্যসূচি, নেতার অভাব বোধ করছে, না কি তারা ছত্রখান হয়ে ভেঙে পড়ছে?

একটা দুটো তিনটে চারটে বালি হাঁসের মত হারীত নিজেই যখন উড়ে চলে এল জলপাইহাটিতে, তখন বাকি হাঁসগুলো কেমন অদ্ভুত যূথসংস্কারের বশে ঘুরে উড়ে হারিয়ে যাবে না কেন শূন্যের ভেতর? হারিয়ে গেছে হয় তো সব। এত দিন বসে যা সে ঠিক-ঠাক করে আনছিল, কলকাতায় ফিরে গেলে—এক বছর পরে ফিরে যাবার কথা তো তার—সে সবের খড় উড়ছে, মাটি ঝরছে, দেখতে পাবে সে। কোথাও কোনো মানুষ খুঁজে পাবে না। কলকাতায় গিয়ে তা হলে নতুন করে আরম্ভ করতে হবে আবার সব—এক বছর পরে। তাই হোক।

হারীতের অনুভূতি মননের দুটো ধারার যে-দিকটার ওপর নিশীথ সেন ঝোঁক দিয়েছিল—ও-দিকে হঠাৎ নীল আকাশকে নাকচ করে দিয়ে আরো বড় আশ্চর্য আকাশ, এই দিকে রৌদ্র, ভীমরুল, ক্যানাফুল গাছের ছাদের এই নিটোল মণিকা—দুপুরের ভেতর বসে থেকে প্রকৃতি, ও প্রকৃতির চেয়ে এক তিল বেশি বিশোধিত আরোপিত জিনিসের মতন নারীর, আবহাওয়ার সঙ্গে একাত্ম হয়ে, সেই দিকেই ঝোঁক পড়ল হারীতের।

আরো পঁচিশ-ত্রিশ বছর বাঁচবে হয় তো সে, কিংবা পনের, দশ। বছরগুলো জাবদা খাতায় হাড়ের কালি দিয়ে কালো করে লিখতে-লিখতে মাঝে-মাঝে রক্ত দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে; এই রকম সব বছর পড়ে আছে হারীতের সামনে। জলপাইহাটির এই একটা বছর শুধু অন্য রকম হবে। যা হচ্ছে এখানে এখন তাই হবে। সাদা মেঘের দিকে তাকাল হারীত, ঘাস, রোদ,

কৃষ্ণচূড়ার দিকে। খারাপ ভাবটা কেটে যাচ্ছে—চোখ বুঁজে আসছে তার, মনের ওপর শরীরেই যেন বেশি ভাল লাগা তর্কাতীত তার।

'তুমি গগ্‌ল্‌স পরছ না হারীত?'

'না। এখন আর দরকার নেই।'

'সূর্যের আঁচ খুব ভাল লাগে তোমার। স্কাইলাইটের ভেতর থেকে রোদ আসছে এবার—'

'একটা পুরু মেঘের নীচে চাপা পড়েছে সূর্য। নীচের মেঘের ওপরে আর-একটা পাতলা মেঘ ছড়ানো রয়েছে তোমার এই চশমার রঙের মত।'

'কী করে টের পেলে তুমি? জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে না তো।'

'জানালার ভেতর দিয়ে সাদা মেঘের পাকিস্তানের দিকটাকে দেখা যাচ্ছে, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের দিকটা ছাদের ওপরে,' হারীত বললে।

'ইউনিয়নকে ছায়ায় ঘিরেছে?'

'বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে।'

'এক টুকরোও কালো মেঘ নেই তো আকাশে। গুমোট নেই। নীল আকাশ থেকে বাতাস লাফিয়ে-লাফিয়ে বেশি নীল, বেশি মধুর করে ফেলছে যেন সব। কী করে বৃষ্টি হয়,' সুলেখা বলতে-বলতে চোখ বুঁজে কথা বলা শেষ করল।

'আজ হবে না বৃষ্টি। অবনী খাস্তগিরের মিটিঙও তো রয়েছে।'

'আকাশ যদি কালো করে আসে সেটা ভাল লাগে, কিন্তু এখন নয়।'

'কেন এখন নয়?'

'এখন এই রোদ, বাতাস, ঘন নীলের হরিয়াল ভীমরুলদের নিঝুম দুপুরটাকে ভাল লাগছে আমার। ক্যানাফুলদের দুপুর এমন আশ্চর্য নিরালা—এখন যদি ডেকে ওঠেন তিনি—'

'তিনি?'

'আর কে? যিনি কালো মেঘ ফাটিয়ে কথা বলেন—'

'ডাকবেন না। আজ ওয়াজেদ আলি সাহেবের কথা বলবার কথা।'

হারীতের কথাটা কানে গেল না যেন সুলেখার। সে অন্যমনস্ক হয়ে অনেক দূরের একরাশি জলের দিকে তাকিয়েছিল। উঁচু-উঁচু গাছের ফাঁকের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে—বাতাসে-বাতাসে ছুটে চলেছে জলগুলো, কোনোদিন যেন শেষ হবে না এমনি একটা শাশ্বত ইশারার ঝিলিক, কোনোদিন যেন নিভে

যাবে না এমনি এক অবিনশ্বর সূর্যের। সূর্য নয়, সূর্যদেবীরই যেন প্রেমিক হারীত। তার নিজের মনও তো, ভাবছিল সুলেখা, এমন উজ্জ্বলন্ত দিনের সঙ্গে—দিনের নক্ষত্র আগুন জল সূর্য নীলিমার সঙ্গে মিশে যেতে চায় যেন মানুষের মন।

'কটা বেজেছে সুলেখা ?'

'একটা হয় তো।'

'আন্দাজে বলছ ? ঘড়ি নেই তোমাদের বাড়িতে ?'

'কেন, সূর্যের দিকে তাকিয়ে বেলা বলে দিতে পার না তুমি ?'

'হাঁসেদের মত ? পার তুমি ? দেশ গাঁয়ের লোকেরা পারে। আমিও কলকাতার লোক নই।'

'শালিধানের চিড়ের মত ধূসর ডানা-পালকের একটা গেরস্তের হাঁসের মত আকাশের দিকে চোখ তাকিয়ে হারীত বললে, 'দেড়টা তো বেজেছেই, বেশিও হতে পারে।'

'তাকালে তো ওপরের দিকে, সূর্যটাকে দেখলে কোথায় ? এ জানালা ও-জানালা কোনোদিক দিয়েই তো সূর্য দেখা যাচ্ছে না। কী করে বেলা ঠিক করলে তুমি হাঁসের মত ঘাড় কাত করে আকাশের দিকে চোখ মেরে ?'

'সূর্য দেখা যাচ্ছে না বলেই তো বুঝতে পারলুম দেড়টা বেজেছে। দুটো আড়াইটে হলে, পশ্চিম দিকের কৃষ্ণচূড়ার ওপরে দেখা যেত সূর্যটাকে।'

'মেঘে ঢাকা পড়ে নি তো সূর্য ?'

'মেঘ তো সব পুবদিকে এখন। এ দিকে যা ছিল সব সরে গিয়েছে।'

জানালার ভেতর দিকে তাকিয়ে সুলেখা বললে, 'পশ্চিম-দক্ষিণেও তো মেঘ আছে—'

'আছে, অনেক দূরে। ও-দিকে যাবে না তো সূর্য।'

সুলেখা আবার আকাশের দিকে তাকাতে-তাকাতে বললে, 'বাঃ, এই তো কত মেঘ পশ্চিমের দিকে, কত সাদা মেঘ—প্যাটরাভরা মেঘ সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে চোখ ধাঁধিয়ে জ্বলছে পশ্চিমের দিকে। পুবের দিকের মেঘগুলো তো সাদা ঠাণ্ডা।'

'আর মাথার ওপরের মেঘগুলো ?,

'সাদা, চুপচাপ।'

'হ্যাঁ,' হারীত ভাল করে তাকাতে-তাকাতে বললে, 'ঐ মেঘগুলো, আমরা কথা বলতে-বলতে, এই মাত্র এসে পড়েছে। হ্যাঁ, আছে সূর্য এ দিকেই। খুব জ্বলছে তো অনেকখানি আকাশের মেঘ।'

'সূর্য তা হলে পশ্চিমে এসে পড়েছে ?'

'ঠিক পশ্চিমে নয়।'

'মাথার ওপরও নয়।'

'এই দেড়টা-দুটো বাজালে পশ্চিমে এসে পড়েছে বটে সূর্য', সুলেখা একটু টিটকারি দিয়ে হেসে বললে, 'আকাশ-ঘড়ি দেখে টাইম বলে দিল বুঝি পাখি ?'

'কে পাখি ?'

'কত পাখিই তো টাইম বলে দেয় দাঁড়িয়ে থেকে, উড়ে যেতে-যেতে, সূর্যকে চোখ ঠার দিয়ে।'

'কিন্তু হাঁস যেমন টাইম বলে কেউ আর তা বলতে পারে না ভাবছ বুঝি সুলেখা ? আমি একটা পাখির কথা বলব তোমাকে, সে পাখি—হাঁস, কিন্তু দময়ন্তীর হাঁস নয়। কিন্তু দময়ন্তীর হাঁস যদি বল তাকে, তা হলে বলব সে জুলেখার হাঁস, সুলেখার হাঁস নয়।'

'মানে ? কেমন ভাঁড়ের মত কথা বলছ তুমি হারীত,' খুব মনোযোগ দিয়ে হারীতের মুখের দিকে তাকিয়ে হারীতের কথার তাৎপর্যটা বুঝে নিতে চেষ্টা করছিল সুলেখা।' কথা-ভাবা চোখ নিয়ে মশালের আগুনের মত ক্যানাফুল-গুলোর দিকে তাকাল সে।

'দময়ন্তী হাঁসটাকে ভালবেসেছিল বটে, কিন্তু বেশি ভালবেসেছে কাকে ?'

'যে হাঁস নয় তাকে', ক্যানাফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বললে সুলেখা, 'সব ক্যানাফুলগুলোই লাল কেন, এ রকম মানুষের ছুরি-বসানো মানুষের বুকের রক্তের মত লাল, গত আগস্টের আগের আগস্টের কলকাতার ? তার আগের এক আগস্টের বাংলাদেশের ?'

কিন্তু এ কী ভাবছে সুলেখা—মানুষের মারাকাটা বোকা রক্তের সঙ্গে এর কখনো তুলনা হয় ? এ বড় ভাল জিনিস, বড় জিনিস, সৃষ্টির নিহিত অর্থের কাছের জিনিস এই লাল, এক দিন মানুষের রক্ত শোধিত হয়ে-হয়ে এই স্থির পবিত্র রূপ পাবে।

'জুলেখাও হাঁসটাকে দরকারি মনে করে, কিন্তু তবুও ভালবেসেছে কাকে ?'

বললে হারীত।

'অবনী খাস্তগিরকে তো নয়। কী হবে তাদের সঙ্গে কনট্রাক্ট ব্রিজ খেললে? মিলেমিশে বক্তৃতা দিলে? কী হবে অবনীবাবু জুলেখাকে সত্যিই ভালবাসলে?' জীবনের চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর যে দেখেছে তেমনি একটি বয়স্ক মহিলার অভিজ্ঞতার আঁটসাঁটের ভেতর থেকে বললে যেন সুলেখা, খুব স্থির মনোভাবে অল্পস্বল্প হেসে।

'অবনীবাবু জুলেখাকে ভালবাসে কে বলেছে তোমাকে?'

'ইয়ুসুফ বলেছে।'

ক্যানাফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে হারীতের মনে হচ্ছিল, হলদে ফিকে গোলাপি ফুটফুটে ক্যানার ঝাড় চার দিকে থাকলে কেমন হত? নিস্তার পেত না কি তাতে চোখ? সঙ্গতি অনুভব করত না কি সুলেখা, জুলেখা, তাদের মা আর হারীতের অনুভূতি? কেবল এক বগগা জিনিসই থাকবে?

'আর ওয়াজেদ আলি সাহেব কী বলেছে?'

'কী বলবেন তিনি? তাড়াহুড়ো নেই আলি সাহেবের। চার-পাঁচদিনেই কলকাতার গাড়িতে চড়বার কথা নয়। এখানকার মানুষ তিনি।'

'আসছেন যাচ্ছেন?'

সুলেখা একটু গালে টোল ফেলে হেসে বললে, 'কে, উড়ে গেল নাকি দময়ন্তীর হাঁস, তার কথা বলছিলে না?'

'বলেছিলাম দময়ন্তীর মতনই জুলেখা হাঁসটাকে পিঠ চাপড়াচ্ছে। কাজ তার অন্য মানুষকে নিয়ে। কিন্তু সুলেখার কোনো হাঁসটাস নেই, কাজ তার মানুষটাকে নিয়ে।'

'কী মানে হতে পারে তার?'

'কী মানে হতে পারে?'

'এ সব হচ্ছে রাতের—বেশি শীতের রাতের হেঁয়ালি-জেয়ালির মত; এখন কোনো মানে বেরুবে না।'

'শীত এসে নিক পৃথিবীতে, তার পর মানে বোঝা যাবে?'

'বেশি শীত বেশি রাত হয়ে গেলে এ সব কথা ভাবা যাবে এক দিন হারীত।'

'এখন তো গরমের কাল, চোত-বোশেখ। একেবারে অঘ্রান-পৌষ না এলে কথাটার তল পাওয়া যাবে না বুঝি সুলেখা?'

'আরো দেরি হতে পারে।'

'আরো দেরি? কত দেরি?'

'ঢের দেরি। এক একটা জিনিস বুঝে ওঠা বড় কঠিন।'

সানগ্লাসটা সুলেখাকে ফিরিয়ে দিয়ে হারীত বললে, 'আসছে শীতে বোঝা যাবে?'

সুলেখা কেমন যেন উৎসাহ হারিয়ে ফেলে আস্তে-আস্তে বললে, 'আসছে শীত কি আজই এল দেশে?'

'কিংবা তার পরের শীতে?'

'সে তো আরো পরের কথা। আজ তা দিয়ে কী হবে,' সানগ্লাস চোখে এঁটে বললে সুলেখা, 'তুমি তো চান করে এসেছ দেখছি। খেয়ে এসেছ?'

'না, আমি তিনটে-সাড়ে তিনটের সময় বাড়ি গিয়ে খাব।'

'তার মানে?'

তার মানে, রাতে আর খাবে না হারীত। এক বেলা ভাত খাচ্ছে। রাতে দুধ খায়, দু-একটা দেশী ফলপাকড় যোগাড় করে আনে। কোনো রোজগার করছে না হারীত। নিশীথ তো দেড়শ টাকা দিয়ে গেছেন সুমনাকে। তাই দিয়ে মাস তিনেক অন্তত চালাতে হবে তো। কোনো একটা উপায়ের পথও দেখতে হবে জলপাইহাটিতে। বছর খানেক থাকবে তো সে এখানে। দিনে এক বার খেয়ে শরীর ভালও আছে তার, টাকাও কম খরচ হচ্ছে।

'কলকাতার নিয়মটা ভাঙি নি। কলকাতার আস্তানায় ফিরে খেতে-খেতে সাড়ে তিনটে-চারটে বেজে যেত। কেমন হয়েছে, তার আগে ক্ষিদেও পায় না। নিয়মটা বদলাতে সময় লাগবে।'

'ক্ষিদে পায় না তিনটের আগে?' কেমন একটু আস্বাদ বোধ করে বললে সুলেখা।

'না।'

'তা হলে রাত কটার সময় ভাত খাও?'

'এগারটা-বারটা।'

'অত দেরি? তা হলে খুব দেরিতে রান্না চড়ে তো!'

'হ্যাঁ। বাতিও অনেক ক্ষণ জ্বালিয়ে রাখতে হয়।'

শুনে সুবিধে বোধ করছিল না সুলেখা। সকাল বেলা তাদের সাড়ে দশটা-এগারটায় খাওয়া শেষ হয়ে যায়, রাতে সাড়ে আটটা-নটায়। এর ব্যতিক্রম

কি স্বাস্থ্যেরও ব্যতিক্রম নয় ? বিশৃঙ্খলা তো খুব। কেমন শরীর ভেঙে পড়েছে হারীতের ; নিশীথবাবুর চেয়েও বয়স্ক দেখায় যেন হারীতকে আচমকা তাকিয়ে দেখলে, নিশীথবাবুর দাদার মত মনে হয় প্রৌঢ়তায়, জীর্ণতায়। অথচ চার বছর আগে কী আশ্চর্য চেহারা ছিল হারীতের।

'এই সব অনিয়মে শরীরটা খারাপ হয়ে পড়েছে তোমার।'

'এখন ভাল হবে।'

'কলকাতায় মদও খেতে তুমি ?'

'কে বলেছে ?'

সুলেখা হেসে চিপটেন কেটে বললে, 'সব কথাই তো আমাকে ওয়াজেদ আলি সাহেবেরা বলে। কিন্তু এটা বলে নি।'

'মদ খাব ভাবছিলাম কলকাতায়, কিন্তু পয়সায় কুলল না। ইকবালের হিন্দুস্থান হামারা, সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা গানটা বেশ একটা নাম করা পাড়ার মেয়ে গাইছিল, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে-যেতে শুনেছিলাম। পয়সা ছিল না বলে বাড়িতে ঢুকে সে মেয়েটার সঙ্গে রাত কাটাতে পারলাম না।

'খুব ইচ্ছে করছিল ?'

'গানটা গাইতে পার তুমি ?'

'লক্ষ্ণৌর মুসলমানিদের মত পারি না,' সুলেখা নিজের অন্তর্কর্ণকে শুনিয়ে গানটা গাইবার চেষ্টা করতে-করতে একবার হারীতের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বললে, 'এখানে গলা ছেড়ে গাইতে হলে হিন্দুস্তানের জায়গায় পাকিস্তান বলতে হবে।'

হারীত কুঁড়েমি ভাঙতে-ভাঙতে বললে, 'গানটা লিখেছেন তো পাকিস্তানের কবিগুরু ইকবাল, তিনি কী বুঝে হিন্দুস্তান লিখেছেন তিনিই জানেন, তুমি জনাব ওয়াজেদ আলি সাহেবকে না জিজ্ঞেস করে পাকিস্তান করে দিও না।'

সুলেখা গুনগুন করে অন্য একটা উর্দু গানের সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে থেমে গেল।

'বসো তুমি, চা করে আনছি।'

'তুমি খাও। আমি এখন খাব না। তিনটে সাড়ে তিনটের সময় তো ভাত খেতে হবে। এমনিই ক্ষিদে কম। চা খেলে ক্ষিদে একেবারে মরে যাবে। কত বাকি তিনটে বাজবার বলতে পার ?

'নীচের বড় ঘড়িটা তো বন্ধ হয়ে আছে। হাতঘড়ি দুটো ওরা নিয়ে গেছে।'

আমাদের চেয়ে তো ওদের দরকার বেশি, ওরা মিটিঙ করছে। তোমাকে বলব আমি সময় হলে। কেন সাড়ে তিনটের সময় ভাত খাওয়া ; ব্যবস্থাটা বদলে ফেল হারীত।'

'আস্তে-আস্তে বদলাচ্ছি।'

'ভেবেছিলুম রাত অব্দি এখানে থাকবে।'

'কটায় ফিরবে ওরা ?'

'মিটিঙ হবে, মিটিঙ আরো টেনেটেনে হবে, ভেঙে গেলে ওখানে বসেই আরেকটা বৈঠক হবে ; অবনীবাবুর বাড়িতে ফিরে আসা হবে, কথা হবে, খাওয়া-দাওয়া হবে, আবার কথা হবে, তার পর বাড়িতে ফিরে আসার কথা। রাত বারটার এ দিকে হবে বলে মনে হয় না।'

হারীত মাথা হেঁট করে একটু চিন্তা করে বললে, 'তা হলে আমি অবনীবাবুর বাড়িতে তোমাকে দিয়ে আসি, চলো।'

'না। ওখানে আমি যাচ্ছি না তো।'

'কোথায় যাবে তা হলে ?'

'এখানেই থাকব।'

'একা থাকবে ?'

'ভাত খেয়ে ফিরে আসবে তুমি এখানে ?'

'কে, আমি ?' হারীত একটু চিন্তিতভাবে হেসে বললে, 'আজ আর ফিরতে পারব না। আমার একটু কাজ আছে বাইরে।'

'কী কাজ ?'

'কিছু-কিছু ছোট কাজ করতে এসেছি জলপাইহাটিতে আমি। আজ বাড়িতেও ফিরতে পারব না।'

'কী কাজ হারীত ?'

'আমি একটু সাহাদের আড়তে যাব চালের জোগাড় করতে। শুনলাম চামার-পট্টির ও-দিকে ছোটলোক ভদ্রলোক অনেকেই না খেয়ে আছে। দেখি কতদূর কী করা যায়'—

'কেন, সাহাদের ওখানে যাবে কেন, ডিস্ট্রিক্ট অফিসারকে বলবে না কেন ?'

'বলেছি। গভর্নমেন্টের তো সব ফাইল, পোর্টফোলিও ব্যাপার। সময় লাগে। বিরাজ সাহার কাছ থেকে বোধ হয় চট করে জিনিস পাওয়া যাবে।'

'টাকা দিতে হবে না ?'

'সে পরে বোঝা যাবে।'

'কে দেবে টাকা ?'

যতটা ভাল হারীত নয়, সুলেখাও নয়, সে সবের চেয়েও যথার্থই একটা ভাল নিরপরাধ হাসি হেসে হারীত বললে, 'পরে বোঝা যাবে।'

'তা ছাড়া আর-একটা জিনিস ভুলেই যাচ্ছিলাম,' হারীত সুলেখার দিকে তাকিয়ে বললে, 'এখানে তো শাড়ি কাপড় একদম পাওয়া যাচ্ছে না, ইউনিয়ন থেকে জিনিস এনে ব্ল্যাক মার্কেটিং হচ্ছে। কিন্তু কালবাজারে কাপড় কিনবার শক্তি আমার নেই, রুচিও নেই, এখানকার কালবাজার শায়েস্তা করতে গেলে যে অনেক বড়জাল-বেড়াজালে গিয়ে হাত পড়বে। এক দিনের কাজ নয়, এক জন মানুষেরও নয়, ক জন মানুষের কত দিনের কাজ সেটা অঙ্ক কষে বার করো তুমি ; এক জীবন বসে কষতে হবে। শুনলাম, অনেক ছোটঘরের মেয়েরা কাপড়ের অভাবে হেঁসেলে ঢুকে থাকে কোথাও যেতে পারছে না, লোপাট হবার জোগাড় সব'—

'ছোটঘরের মেয়েরা ? আর ভদ্রদের কী ?'

'ভদ্রঘরের মেয়েদের কে আর হাতে পাচ্ছে,' সুলেখার বেনারসির দিকে তাকিয়ে চোখটা একটু ঝিকিয়ে নিয়ে হারীত বললে।

'ছোটঘর বলছ কাদের, মাস্টারদের বৌদের ঝিদের ?'

'তা তো আছে। আরো নীচে—'

'তার নীচে তো মুচি, মুদ্দফরাস, কামার, চামার, জোলা, তাঁতি, ধোপা, নাপিত, জেলে, চাষাভুষো। এদের অনেকে মাস্টারদের চেয়ে বেশি কামায়। মাস্টারদের মত অত ভব্যতা রক্ষা করবার দরকারও হয় না এদের ঝি-বৌদের। কাদের শাড়ি দেবে তুমি হারীত ?'

'চাষা-চামারদের পরিবারদের দেব।'

'আর মাস্টারদের ঝি-বৌদের কী হবে ?'

'সেটা পরে দেখা যাবে।'

'চাল কাদের জন্যে যোগাড় করছ ?'

'যাদের কাপড় দেওয়া হবে তাদের জন্যেই।'

'খুব ভাল কথা তো। কিন্তু নিশীথবাবুর দেড় শ টাকা ফুরিয়ে গেলে তুমি নিজে

কী খাবে ?'

কোনো উত্তর দিল না হারীত। একটা উত্তরের জন্যে হারীতের দিকে শক্ত কপালে থুতনি কঠিন করে তাকিয়ে থেকে সুলেখা বললে, 'এ তো গেল কলেজের মাস্টারদের কথা। কিন্তু ইস্কুলের মাস্টারদের কী হচ্ছে না হচ্ছে, কী খায় কী করে, সে হিসেব রেখে আর কী হবে তোমাদের ; কিষাণ-মজদুরের বন্ধু তোমরা। কলকাতার মত বড়-বড় শহরের মজদুরদের চেয়ে মফস্বলের বেসরকারি সেকেণ্ডারি প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারদের অবস্থা ঢের খারাপ। অথচ দেশ তাদের কাছ থেকে, খাওয়ার না হোক, পরার ভদ্রতা বেশি দাবি করে, আর পড়াবার মর্যাদার পাণ্ডিত্যের। এত বড় বেইজ্জতের জিনিস পনেরই আগস্টের পরেও টিঁকে আছে ইউনিয়নে আর পাকিস্তানে। মাস্টারদের শিক্ষা-দীক্ষা চরিত্র স্বার্থত্যাগের সঙ্গে যাদের কোনো তুলনাই হয় না তারা তো তারা, তাদের পিওন পেয়াদারাও পে-কমিশনের দৌলতে ডার্বি টিকিট কিনছে, রেঞ্জার্স টিকিট কিনছে, রেসে বাজি ধরছে, ইনসিওরেন্স করছে, ক্যাশ সেভিং সার্টিফিকেট কিনছে, কলকাতার সেক্রেটারিয়েটের ক্যাণ্টিনে মেয়েমানুষ নিয়ে ঢুকে খেয়ে ডিসপোজাল থেকে শখের জিনিস কিনে দিচ্ছে তাকে—আমি নিজের চোখে দেখেছি হারীত—হয় তো কোনো মাস্টার কেরানির মেয়ে বা শালি হবে—পিওনের পে-কমিশন খাচ্ছে এখন ; ব্ল্যাক মার্কেট থেকে শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ-ফলনা-দফনা কিনে দিয়ে পেয়াদারা স্ত্রী ভজাতে ছাড়বে কেন, দেখছে টাকায় ভাল স্ত্রীদেরও ভজানো যায়, হাতিবাগান আর শেয়ালদা বাজার থেকে ডাল-মাছ-তরকারি-দুধ খেয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নিলে, পে-কমিশন পিঠ চাপড়ে লেলিয়ে দিলে কেন সে সব স্ত্রীলোকদের হাতড়াবে না তারা, এদের স্বামীরা শিক্ষিত উন্নত হলেও টাকার অভাবে বৌকে খাওয়াতে পারছে না, ছেঁড়া ন্যাকড়া পরতে দিচ্ছে। এ তো গেল পেয়াদা পিওনের পে-কমিশন। তাদের মাথার ওপরে যারা পে-কমিশন পাচ্ছে তারা তো মাচায় চড়ে খাচ্ছে। কে পে-কমিশন বসাল ? কেন বেসরকারি ইস্কুল-কলেজের মাস্টাররা পে-কমিশনের সুবিধে পাচ্ছে না। কেন বেসরকারি ইস্কুল-কলেজ আজও টিঁকে আছে ? সেগুলোকে হামান-দিস্তায় ছেঁচে ফেলা হচ্ছে না কেন ? কেন সব ইস্কুল-কলেজ স্টেটের হাতে নেওয়া হচ্ছে না ? গভর্নমেণ্টের কেরানি তো ভাল, গভর্নমেণ্টের পিওন-পেয়াদাদেরও আজ

ধনে-মানে মাস্টারদের চেয়ে বড় করে দেওয়া হচ্ছে। কী প্রমাণ করা হচ্ছে? ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট চলে যাবার পর এ কাদের হাতে রাজত্ব দেওয়া হয়েছে। তারা লোকের সামনে মুখ দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু ভাল করে তাদের মুখ দেখে নেবে সে রকম লোক নেই বুঝি দেশে? সব ইস্কুল-কলেজ ভেঙে ফেলে পুলিশ হয়ে যাওয়া উচিত তোমার বাবাদের। সমস্ত ইউনিয়ন ভরে পুলিশ আর সেপায়ের ছাউনি উঠুক, বরবাদ হয়ে যাক সমস্ত ইস্কুল-কলেজ।'

'সে হবে। সে সবের তোড়জোড় চলেছে। আমরা আছি সব; মেশিনগান ভেঙ্গে ট্র্যাক্টর বানিয়ে হলায়ুধের মত চষে ফেলব সব; সব সব—ইস্কুল-কলেজ সব চেয়ে আগে। ট্র্যাক্টর ভেঙে মেশিনগান বানিয়ে উড়িয়ে দেব সব; ইস্কুল-কলেজ সব চেয়ে আগে। চেনো না আমাদের। তোমার কাছে কয়েকটা শাড়ি চাই,' হারীত বললে।

সুলেখা কিছু ক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে থেকে শেষে হাসতে-হাসতে বললে, 'লেত্তিটা ঠিক ধরে আছে হারীত। মাস্টারের ছেলে হয়ে আজ-কাল পিতৃরক্তে তর্পণ করার দিন; এ যদি তুমি না করবে হারীত!'

'কটা শাড়ি দিতে পারবে সুলেখা?'

সুলেখা মাথা নেড়ে বললে, 'শুধু কিষাণ মজদুরের হবে না; কিষাণ মজদুর মাস্টার এদের জন্যে আমাদের লড়াই—এ জিনিসটা সি-পি-আই-এর হাই কমাণ্ডের থেকে পাস করিয়ে দস্তুর মত কাজে না লাগালে তোমাকে আমি কিছু দেব না।'

'সি-পি-আই-এর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'তবে তুমি কোথাকার?'

'আমি কোথাওর নই। কলকাতায় একটা সঙ্ঘর মতন গড়েছিলাম, সেটা ভেঙে গেছে হয় তো আমি চলে আসার পর। এখানে আমি লিগ, কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট পার্টি সুস্থ অবস্থায় যেটা যে-রকম দাঁড়িয়ে আছে নেড়েচেড়ে দেখতে পারি—সত্যিই তাতে যদি কিছু উপকার করতে পারা যায় বাস্তবিকই যাদের উপকারের দরকার তাদেরকে। বড় চালে কিছু করতে পারা যাবে না। এখানে-ওখানে তালি মারার কাজ চলবে কিছু-কিছু।'

'এখানে তালি মারার ঘুনচি চাই না, কেন বিপ্লব করছ না? এখানে নয়, ইউনিয়নে বড় বিরাট ভাগাড় পড়ে রয়েছে। পে-কমিশন যারা ফাঁদল তারা

মাস্টারদের পথে ছেড়ে দিল—সরকারি আই-সি-এস থেকে পিওন অব্দি যারা রক্ত জল করে পুষছে, বেসরকারি ইস্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠানের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না, তারা কি পায়ের পাতায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ?'

'সেটা তারা জুতো না খুললে কী করে বোঝা যাবে সুলেখা ?'

সুলেখাদের ওখান থেকে ফিরে হারীত বাড়ি পৌঁছাল প্রায় চারটের সময়।

সুমনা বললে, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ, সেই তো সাত-সকালে বেরিয়েছ।'

'কত রকম কাজ থাকে।'

'কাজ থাকে! নাওয়া নেই, খাওয়া নেই—'

'চান করে বেরিয়েছি তো। ক্ষিদে পায় না, খাব কী ?'

'তোমার ক্ষিদে পায় না, আমার তো পায়। কী রোগ হয়েছে তোমার যে ক্ষিধে পায় না ?'

'তুমি খেয়েছ ? কী খেয়েছ মা ? রাঁধল কে ?'

'কী রোগ হয়েছে তোমার, হারীত, যে বেলা চারটে না বাজলে ক্ষিধে পাবে না। এতে মানুষ বাঁচে ?' সুমনা অপ্রীত হয়ে বললে, 'এখন ভাত খেলে রাতের বেলা ক-টার সময় খাবে ?'

'রাতে খাব না।'

'সারা দিন রাতে শুধু এক বার খেয়ে বেঁচে থাকবে তুমি ? এই করতে তুমি কলকাতায় ?'

'আজ শরীরটা কেমন লাগছে তোমার ? আগের চেয়ে ভাল লাগছে ?'

সুমনা বললে, 'আমি যা জিজ্ঞেস করলাম সে কথার উত্তর দিলে কোথায় ? এক বার করে খাচ্ছ কেন ? এখন কি তোমার রমজান মাস চলছে হারীত ? কলকাতায় এ রকম ছিল ? কী ব্যাপার ?'

'ব্যাপার কিছু নয়', হারীত তার বাবার পুরনো চেয়ারটা টেনে বসে বললে, 'আমার ক্ষিধে পায় না। পেলে খাব।'

'ক্ষিধে পায় না। এ তো বিষম রোগ। কেন ক্ষিধে পায় না ? সোমত্ত বয়স তো তোমার, এ বয়সে ক্ষিধে পায় না ? তোমারও কি ন্যাবা হল নাকি হারীত ? দেখিয়েছিলে ডাক্তারকে ?'

'ন্যাবা হয় নি, ন্যাবা হয় নি, আমি নয়নবাবুকে দেখিয়েছিলাম তাঁর ডিস-পেন্সারিতে গিয়ে। তিনি বললেন,' হারীত কথা শেষ না করে সুমনার খাটের থেকে হাতপাখাটা খুঁজে নিয়ে বাতাস খেতে লাগল, 'কেমন গুমোট হয়েছে মা, বৃষ্টি পড়লে বাঁচি।'

'কী বলেছে নয়ন ডাক্তার?'

'বলেছে, ও কিছু না, ও-রকম হয় মাঝে-মাঝে, তার নিজেরও তো হয়েছে কত বার। বলেছে বাঙালির আবার ক্ষিধে!'

'কেন, বাঙালির ক্ষিধে পেতে নেই? দেখ না গিয়ে নরেন মিত্তিররা কী রকম খায়। এই মহিমবাবু আর তার ছেলে আর অর্চনা কী রকম গুষ্টির পিণ্ডি গিলছে দেখ না গিয়ে। তোমার বাবাও খেতে পারতেন বেশ; তোমার এ রকম হল কেন?'

'হল তো', হাতপাখাটা রেখে দিয়ে বললে হারীত। নিম, জাম, জামরুল নাচানো চোত-বোশেখের বাতাসে ঘরদোর ভরে গিয়েছে হারীতদের। হারীত উঠে গিয়ে ঠাণ্ডা ভাত, ডাল আর খানিকটা উচ্ছে-আলুর তরকারি খেয়ে এল।

'দুধ খেয়েছিলে হারীত?'

'না, রাতে খাব।'

'কী দিয়ে?'

'এমনি গরম করে খেয়ে নেব। রাতে ক্ষিধে পায় না একদম।'

'অর্চনা একটা পেঁপে দিয়ে গেছে, সেটা কেটে খাস দুধের সঙ্গে।'

'আচ্ছা।'

'তোমার বাবার তো কোনো চিঠি পেলুম না।'

'লেখেন নি বুঝি তোমাকে?'

'আমাকে না, অর্চনাকে না।'

'তা হলে আর-কাকে লিখবেন?'

সুলেখাকে হয় তো লিখলেও লিখতে পারতেন নিশীথ সেন। হারীত কাঠের চেয়ারে বসে জামরুল বনের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, যদি তিনি জানতে পারতেন যে তাঁর এ রকম এক জন মহাজন জলপাইহাটিতে লালপুরের রাস্তার পথে সেই আশ্চর্য দেড় তলা ঠাণ্ডা চালতে ফুলের রঙের বাড়িটার ভেতর রয়ে গেছে। কী নির্জনতা সেখানে, কী সান্ত্বনা। পৃথিবীর রক্তে, ইতিহাসের রক্তে,

নিজের ব্যক্তিজীবনের মূর্খতায়, আর মহাজনদের কৃতঘ্নতায় যারা পথ খুঁজে পাচ্ছে না, তাদের যেতে হয় কলকাতায় ? তারা এখানে ফিরে আসুক, এখানে ফিরে আসুক ; উপলব্ধি, বেশি উপলব্ধি বেশি নিষ্প্রিয়তা, কেমন একটা নিষ্কাম স্বস্তিকামনার হাতে আত্মদান, খানিকটা শান্তি—এই সব সাধ সিদ্ধির জন্যেই তো নির্মিত তাদের জীবন। কোথায় পাবে এ সব কলকাতায় নিশীথ সেন ? কী করছে সেখানে সে ? খুব সম্ভব ভাল নেই। নাকি ভাল আছে ? কাজ পেয়েছে এবং কোনো মহিলাকে ? বাবাকে চেনে নি বুঝি হারীত ? কপাল ফুঁড়ে হঠাৎ আর-একটা চোখ বেরিয়ে পড়তে পারে এ রকম একটা প্রচ্ছন্ন আভাস নিয়ে-নিয়ে নিশীথ সেন যেন সব সময়ই ঘুরে বেড়াত : নিম আর জামবনের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ভাবছিল হারীত। সুলেখাকে বলে এসেছে হারীত, সে একটু চামারপট্টির দিকে যাবে সাহাদের ওখান থেকে কিছু চালের জোগাড় করবার জন্যে। যেতে ইচ্ছে করছে না আজ ; শরীরটা ভাল নেই। ভাল নেই ? কিন্তু গত তিন বছরের ভেতর কবে ভাল ছিল শরীর ? এই প্রায় টি-বি রুগির মত শরীর নিয়ে কত দুর্দান্ত কাজ সে করেছে। যাবে চামারপট্টিতে সে, আগে বিরাজ সাহার কাছে যাবে, জোগাড় করে নেবে চাল ডালের। একটু রাত হবে যেতে। বেশি বেলায় বাসি জিনিসগুলো খেয়ে কেমন যেন অম্বল হয়েছে হারীতের। ঢেঁকুর তুলছিল।

পিওন পেয়াদা পে-কমিশন মাস্টারদের সম্বন্ধে যা বলেছে সুলেখা সেটা কেমন হিংস্র বাঘিনীর মত লাফিয়ে উঠে বলেছে, অথচ সুলেখাকে বিপ্লব করতে বললে কংগ্রেসের শান্তি আর সংহতির ভেতর গা-ঢাকা দিয়ে হারিয়ে যাবে সে। মিথ্যে কথা বলে নি সুলেখা, কিন্তু সত্যি কাজ করবে কি সে ?

'উনি চিঠি লিখছেন না কেন হারীত ?'

'তোড়জোড় করছেন।'

'কী বলছ বুঝছি না।'

'কোথায় আছেন কলকাতায় ?' একটা ঢেকুর তুলে জিজ্ঞেস করল হারীত।

'বলেছিলেন তো জিতেন দাশগুপ্তের ওখানে থাকবেন কিছু দিন। গিয়ে একটা পৌঁছ-সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল না ? কী হল, কলকাতায় যেতে পারলেন কী না ?'

হারীত বললে, 'কলকাতা ছাড়া এ গাড়ি বেশি জিরোয় না কোথাও। বেশি না

'জিরোলে তিনি কি গাড়ি থেকে নামেন ?' হারীত বললে, 'কলকাতায় জিতেন দাশগুপ্তের বাড়িতেই আছেন।'

'লিখছেন না কেন ?'

'লিখবেন। কলেজে কাজ জোগাড় হলেই লিখবেন।'

'কোন কলেজে ?'

'যে-কোনো কলেজে, কলকাতার যে-কোনো কলেজে।'

'হবে কাজ ?'

'উঠে-পড়ে লেগেছেন বলে মনে হয়। হওয়া আশ্চর্য নয়! না হওয়াও অস্বাভাবিক নয়,' হারীত বিকেলের বড় আকাশের মেঘগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বললে।

'কী যে হেঁয়ালিতে তুমি কথা বলছ হারীত।'

'আচ্ছা তা হলে ভেঙে বলছি,' হারীত বললে, 'কলকাতার কোনো কলেজে বাবাকে ভাল কাজ জুটিয়ে দেবার মত কোনো মুরুব্বি নেই, খবরের কাগজে পারবেন না, সরকারি চাকরির বয়স কই, পাবলিক সার্ভিস কমিশন ডাকবে না বাবাকে, দাশগুপ্ত সাহেব পিঠ চাপড়ে বিদায় দেবেন—না, হবে না কিছু।'

'বড্ড কুবাতাস ছড়াচ্ছ হারীত।'

'জলপাইহাটিতে ফিরে আসতে হবে বাবাকে।'

'হরিলালবাবুদের কলেজে ?'

'হরিলাল, কালীশঙ্কর, হিমাংশু চক্রবর্তী, এই নিয়েই তো দেশ। কলকাতায় গিয়ে এদের এড়াবেন ? সেখানে তো আরো চেকনাই বেড়ে গেছে এদের। এদের বিশেষ কোনো দোষ নেই। অনেক সময়ই সজ্ঞানে পাপ করে না এরা। অনেক দিনের বাসি রক্ত জমেছে এদের—চার দিকে এত দিন ধরে এত অসদ্ব্যবস্থা বলে। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে তাই। নাকে কাপড় দিয়ে সরে গেলে লাভ নেই ; বদ রক্তগুলো বের করে দিতে হয়।'

'বের করে দিতে হয় ? রক্ত ?' সুমনা বিরক্ত হয়ে বলল, 'ও-সব কথা আমাকে বলো না। কলকাতায় থেকে কেমন গুণ্ডার মত হয়ে গেছ যেন তুমি।'

হারীত অবাক হয়ে ভাবছিল এই লোককে নিয়ে ঘর করতে হয় নিশীথ সেনের মত মানুষকে। একটা অদ্ভুত অনিন্দ্য কুয়াশার ঘুমের ভেতর দিয়ে যেন বিশ-

পঁচিশ বছর কাটিয়ে দিয়েছে তার বাবা তার মাকে নিয়ে জলপাইহাটিতে। এখন নিস্তার চাচ্ছে, কিন্তু যে-পথে গিয়েছে সেখানে নিস্তার নেই, সেখানে এক-রাত্তিরের সুলতানি থাকতে পারে হয় তো, কিন্তু আজীবনের শান্তি তৃপ্তি নেই ; নিস্তার যে-পথে আছে সেটা ভারী ভয় ও বিমূঢ়তা ও শোকের পথ মনে হবে নিশীথের মত মানুষের কাছে এই বয়সে আজ।

'এখানে আসতে বলছ, তুমি তোমার বাবাকে খাওয়াবে ?'

'কলকাতায় পথ কেটে নিতে পারলে, বেশ তাই হোক ; এখানে যে আসতেই হবে এমন কিছু নয়। এখানে যে-ভাবের ঘোরে বাইশ-চব্বিশ বছর কেটে গেছে তাঁর, সেটা টেঁসে গেল যেন। নতুন করে এখানে মন বসানো কঠিন। ও-সব মানুষের টনক সহজে নড়ে না, কিন্তু এক বার টলে উঠলে মনের মতন কোনো নতুন আশ্রয় না পেলে মৃত্যুকেও ভাল মনে হয় জীবনের চেয়ে। বেশি বিদারক বিশৃঙ্খল অশান্তিকেও ভাল মনে হয়, জলপাইহাটির বোকা নিরেস শান্তির চেয়ে।'

'আমি তোমার কোনো কথার কোনো মানে বুঝি না হারীত। তুমি পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল। বলি, তুমি খাওয়াবে আমাদের—কলকাতায় তোমার বাবার সুরাহা না হলে ?'

'হ্যাঁ। খাওয়াব বইকি ?' হারীত আস্তে-আস্তে বললে।

'এখানকার কলেজে একটা চাকরি জুটিয়ে নাও তুমি। দেখা করো হরিলাল-বাবুদের সঙ্গে।'

'দেখা করব।'

'কী রকম চাকরি পেতে পার ?

'আমি তো এম-এ দিই নি। একটা লাইব্রেরিয়ানের কাজ হয় তো দিতে পারে। কিংবা টিউটরের কাজ।'

'দেখা করো, দেখা করে ফেল হারীত মেম্বারদের সঙ্গে, প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে।'

'এই তো যাচ্ছি', হারীত বললে, 'তোমাকে বাবা দেড়শ টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন, সোয়াশ আছে এখনো। আমিও কিছু এনেছিলাম টাকা, কিন্তু গচ্ছা দিচ্ছি।'

'কী করে গচ্ছা গেল ?'

'এই চাষাভুষো মেথরদের দিয়ে দিয়েছি।'

সুমনা ক্লান্ত হয়ে বললে, 'আমার টাকাটা আমাকে ফিরিয়ে দাও।'

'আমার বাক্সে আছে ; এক্ষুনি দেব ?'

'হ্যাঁ। এখনই।'

টাকা হাতে নিয়ে, সোয়াশ টাকা গুনে, নোটগুলো আঁচলের খুঁটে বাঁধতে-বাঁধতে সুমনা বললে, 'তুমি নাকি ডাক্তার মজুমদারের কাছে কী একটা রফা করতে গিয়েছিলে ?'

'কে বলেছে তোমাকে ?'

'কানে আসে। নরেন বলছিল।'

'কোন নরেন ? নরেন মিত্তির ?'

সুমনা মাথা নেড়ে বললে, 'হ্যাঁ।'

'নরেন আবার এখানে এসেছিল। এত বড় পায়া বেড়েছে তার।'

'কেন আসবে না ? আমাকে যে-রক্ত দিয়ে ঋণে বেঁধে রেখেছে। আমার পেটের সন্তানরা যা করে নি আমার জন্যে, সে তা করেছে। কী করছ তোমরা আমার জন্যে, পেটের ছেলেমেয়েরা ? কী করছ তোমার বাবার জন্যে, তিনি তো কলকাতায় থুবড়ি খেয়ে একশেষ হচ্ছেন। নরেনের মত ছেলে থাকলে ও-রকম হত তাঁর ?'

অম্বলই হয়েছে হারীতের, পেট জ্বলছিল, বুক জ্বলছিল, গলা জ্বলছিল। ডাল খাওয়াটা উচিত হয় নি, বেশি খেয়ে ফেলেছে, উচ্ছের তরকারিটায় একটু ঝাল ছিল। নিজেই তো রেঁধে গিয়েছে তরকারিটা সকালবেলা। কেন ঝাল দিতে গেল হারীত ? নাকি, অর্চনা এক ফাঁকে এসে ঝাল মিশিয়ে গেছে রান্নায় ?

'কী বলেছে নরেন ?'

'যা বলবার তাই বলেছে,' সুমনা বললে, 'আগেই শুধোই তোমাকে, কেন নরেনের রক্ত নিচ্ছ না ?'

হারীত একটু অবাক হয়ে বললে, 'কেন, রক্ত দেবার কথা বলছিল নাকি ? রক্ত দিতে চাচ্ছে ? সেধে দিতে চাচ্ছে ?'

'তা চাচ্ছেই তো। কেন চাইবে না। সে তো দিচ্ছিল। তোমার বাবা ঠিক করে গেছলেন। আমার উপকার হচ্ছিল। তুমি বদলাবার কে হারীত ?'

হারীত সুমনার দিকে তাকিয়ে বললে, 'উপকার হচ্ছিল ? এখন যে দিচ্ছে তার রক্তে কোনো জোশ নেই মনে হচ্ছে তোমার ? উপকার বোধ করছ না ?'

'কেন নরেনের রক্ত বন্ধ করা হল? সে আমার কাছে এসে বলে গেছে।' শুনছ হারীত? নরেনের রক্ত নেয়া হোক। সে আমাকে নিজের দিদির মত মনে করে।'

'কিসের মত মনে কর?' একটু খোঁচা খেয়ে বলল হারীত।

'আমার এই খাটে এসে বসেছিল, বললে, আমাকে আপনার নিজের দেওরের মত মনে করবেন বৌদি। নিশীথদা ঠিক করে গেলেন সব। আর হারীত এসে পাল্টে দিলে—'

'কখন এসেছিল নরেন?'

'দুপুর বেলা।'

'আজ?'

'হ্যাঁ। তুমি তখন জুলেখাদের বাড়ি গিয়েছিলে।'

'জুলেখাদের বাড়ি গিয়েছি কে বললে তোমাকে?'

'নরেন দেখে এসে বলে গেছে। নরেন, আজিজুদ্দিন, আব্দুল গনি, বরকত আলি, রজ্জক মিঞা, ইসমাইল, চাঁদ মিঞা, মোনতাজ সব্বাই দেখছে ক দিন ধরে ওদের বাড়িতে তুমি ঘন-ঘন আসা-যাওয়া করছ হারীত। এই তোমার কাজ জলপাইহাটিতে এসে? এর চেয়ে ভাল কাজ ছিল তোমার কলকাতায়। জুলেখাকে মুখোমুখি বসিয়ে মাকে ফাঁকি দিয়ে তুমি—তোমার সব আগড়ম-বাগড়ম মনুষ্যত্বের কাজ হাসিল করে ফিরছ বুঝি এই রকম, জলপাইহাটিতে এসে?'

শুনে চিন্তিত হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল হারীত। নিস্তব্ধ হয়ে আরো বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ছিল সে। শোক নেই, দুঃখ নেই, ভয় নেই, রাগ নেই, কেমন একটা গহ্বরের মতন অবস্থা মনের ভিতর, বাইরের লোকচলাচলের দেশে; বাইরের প্রকৃতিকেও যেন নষ্ট করে দিতে চাচ্ছে। নিম, জাম, জামরুল বন, ছোট-ছোট পাখি, চোত-বোশেখের বাতাস—অনবচ্ছিন্ন বাতাসের ভিতর মাঝে-মাঝে একটা মৌমাছির মত উড়ে যেতে দেওয়া মানুষকে; সব সময়ই যে সে মানুষের মত বসে থেকে জীবনের সমস্যাগুলো ঘাঁটাবে সেটা ঠিক কথা নয়। চারদিককার অবচেতনার আকাশ-পৃথিবীকে তবুও তার পর কী এক সুচেতা নারীজিনিসের মত লক্ষ্য করে যেন রসিয়ে উঠল তার মন আনন্দে, কেমন একটা তামাসারত চেতনায়। ঠোটের কোণায় হাসির রেখা

দেখা দিল হারীতের।
'আমি ঠিক করে ফেলেছি নরেনের সঙ্গে।' সুমনা বললে।
'কী ঠিক করেছ?'
'আমাকে রক্ত দেবে।'
'রক্ত চাইলে বুঝি তার কাছ থেকে?'
'না, সে নিজেই এসেছিল, আমি তো ডাকি নি তাকে। মনটা আমার কেমন-কেমন করছিল যেন, নরেন এল না, নরেন এল না, হারীত এসে বড় অন্যায় করল নরেনের ওপর। ভেবেছিলুম, মনটা ভাবছিল ছেলেটাকে। এল তো!'
'টেলিপ্যাথি বলে একে,' মনের পীড়িত ভাবটাকে চাপা দিয়ে একটু হেসে নেবার চেষ্টা করে হারীত বললে, 'কিন্তু—'
'তা হলে কথাটা রইল?'
'কোন কথাটা?'
'নরেনের সঙ্গে আমি ঠিক করে ফেলেছি।'
কেমন একটা লোলুপতা যেন সুমনার চোখে। নাকি অনির্মল দৃষ্টি তুলে মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখছে হারীত। সমীচীনতা নেই সুমনার কোনোদিন, মনের দিক দিয়ে বিকাশের বৃত্তান্ত বিশেষ কিছু নেই। হৃদয়ে বিশৃঙ্খলার তাড়না রয়েছে সব, নিশীথের জীবনটাকে কেবল পিছনের দিকে টেনে হয়রান করে ফেলে। কিন্তু এ ছাড়া আর-কিছু বাড়াবাড়ি নেই। না, ওটা নেই, ওটা কিছু নয়।
'তুমি একা কী করে ঠিক কর কাউকে জিজ্ঞেস না করে?'
'ডাক্তারকে বলে এসেছে নরেন।'
'রক্ত দেবে আবার?'
'কাল থেকে দেবে।'
'ওরই রক্ত চাই তোমার?'
'তাতে ভাল হবে। তাড়াতাড়ি সেরে উঠব। কেমন তাগড়া ছেলে তো নরেন। নতুন যেটিকে জুটিয়েছ তুমি সে তো ভিজে বেড়ালের মত, হারীত। যাকে যার ভাল লাগে তার জিনিসেই তার তিলে তাল মিলে যায়, শাকের কণায় পঞ্চশস্য।'
'কী বলেছেন ডাক্তার?'

'তার সায় আছে।'

'জিজ্ঞেস করে দেখব এক বার ডাক্তারকে।'

'কাল তো রক্ত লাগবে।'

'আজ যাব ডাক্তারের কাছে।'

'নরেনকে আমি কথা দিয়েছি।'

'আজ যাব ডাক্তারের কাছে।'

'যেখানেই যাও খোদার ওপর খোদকারি করতে পারবে না। ব্যবস্থা উনি করে দিয়ে গেছেন। ব্যবস্থা আমি করছি। তুমি কে হে?'

কোথাকার একটা নিচু ঝোপের থেকে উড়ে এসে বেশি বাতাসে-বাতাসে বড় শিমূল গাছটার লম্বা পাতা আঁকড়ে ধরবার জন্যে দুটো বুলবুলি কী রকম উড়ছে-ঘুরছে, তাকিয়ে দেখছিল হারীত।

'নরেনের সঙ্গে যে-সব হিন্দু-মুসলমান ভাইরা এসেছিল তারা কি আমাদের ঘরে ঢুকেছিল?'

'ঢুকেছিল।'

'আমি ছিলাম না, তবুও ঢুকল?'

'আমি তো ছিলাম।'

'কোথায় বসল তারা?'

'আমার খাটে এসে বসেছিল চার-পাঁচজন, বাকিরা তোমার বাবার তিন-চারটে চেয়ারে বসেছিল।'

'এত লোক সব? গনি বসেছিল কোথায়? আব্দুল গনি?'

'গনি খাটে এসে বসেছিল, আমার পাশেই তো; বড্ড প্যাঁজের গন্ধ পাচ্ছিলাম।'

'জলপাইহাটি কলেজের বেয়ারা তো গনি।'

'তা জানি আমি। তোমার বাবা থাকতে গনি আমাদের ঘরে ঢুকত না। কিন্তু এখন ঘরে ঢুকে আমার খাটে এসে বসল তো।'

'কেমন হল সেটা? তুমি খাটে বসে আছ, অথচ—অবিশ্যি সব মানুষই এক,' হারীত বললে, 'বসবে বইকি, কিন্তু পুরুষরা চিরকাল পুরুষদের সঙ্গে বসলেই ভাল। বিড়ি-টিড়ি চাইল গনি?'

'আমার কাছে? না, তা চায় নি তো।'

'অর্চনা মাসির কাছে চেয়েছিল—'

'কে ? গনি ?'

'না, মোনতাজ।'

'কোন মোনতাজ ? ঐ যে ঘড়ি-আলা আস্তাবলের গাড়োয়ান ?'

'ইস। মহিমবাবু তখন কলেজে গেছেন, ছেলে ইস্কুলে গেছে—মোনতাজ সজনে গাছের পাশের সদর রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে, সওয়ার নামিয়ে দিয়ে, এদিকে চলে এল, সোজা মহিমবাবুর ঘরে ঢুকে, চেয়ারে বসে, জিজ্ঞেস করল বিড়ি আছে কি না'—

'জিজ্ঞেস করল মোনতাজ ?'

'কেন জিজ্ঞেস করবে না, বিড়ির দরকার তার।'

'চেয়ারে চড়ে বসেছিল ?'

'চেয়ার তো মানুষের জন্যে, মানুষ তো চেয়ারের জন্যে নয়'। এটা বুঝতে চাচ্ছে না সুমনা, বোঝানো বড় কঠিন, ভাবছিল হারীত।

'কী করল অর্চনা ?'

'বলছি তোমাকে,' হারীত একটা বিড়ি জ্বালিয়ে তৎক্ষণাৎ সেটা নিভিয়ে সরিয়ে রাখল। কী বলছে, কী করছে, কোথায় আছে—খেয়ালই ছিল না কিছু তার।

'কবে হল এ সব ?'

'এই তো পরশু দুপুরবেলা। আমি বাড়ি ছিলাম না, তুমি ঘুমুচ্ছিলে'—

'কী হল তার পর—বিড়ি চাইল মোনতাজ ?'

'মহিমবাবু তো তামাক খান না। কিন্তু মহিমবাবুর ছেলে ক্লাস সিক্সে পড়ে, সে একতাল চাঁদ-তারা মার্কা বিড়ি কিনে এনে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল। মাঝে-মাঝে ব্যাঙের আধুলির মত বার করে খেয়ে নেয়, বাপ তো টেরই পায় না, মা সেটা বুঝতে পেরেছে, বামাল ধরেও ফেলেছে। তবে পয়সার মাল, ফেলে দেয় নি, নিজের হেফাজতে লুকিয়ে রেখেছে। সেখান থেকে বের করে দুটো বিড়ি দিয়ে দিল মোনতাজকে।'

'এ রকম দিচ্ছে আজকাল ভদ্রঘরের বৌরা, শুনছি তো!' সুমনা জানালা দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে ফুরফুর করে যে-বাতাস আসছিল সেটার দিকে তাকিয়ে নিল যেন এক বার, 'কী করলে মোনতাজ ?'

'বিড়ি জ্বালিয়ে ধোঁয়া ওড়াল, অর্চনা মাসিকে জিজ্ঞেস করল তার কোনো বোন-টোন আছে না কি মোনতাজের ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার মত।'

'ও ম্মা। ও ম্মা! তাই বললে মোনতাজ? ও ম্মা! এ আবার কী রকম ঘটকালির ছিরি!'

'এ রকম ঢের সম্বন্ধ হচ্ছে তো আজ কাল।'

'ও ম্মা! জলপাইহাটিতে?'

'সব জায়গায়। অর্চনা মাসির মেয়ে-বোন-টোন কেউ নেই বলাতে মোনতাজ বিড়ির ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় মনসার মুখে-চোখে ধুনোর সুগন্ধ ছড়াতে-ছড়াতে বেরিয়ে গেল। জিনিসটা মকবুল চৌধুরী সাহেব কিংবা শাহাদাৎ হোসেন সাহেবকে জানাবে কি না জিজ্ঞেস করেছিল আমাকে অর্চনা মাসি। আমি "না" করে দিয়েছি। মোনতাজরা ছেলেমানুষ। স্বাধীনতা পেয়ে ছেলেমানুষি একটু বেড়ে গিয়েছে হয় তো, কিন্তু সে সব গুনা-টুনা নিয়ে রাও করে কোনো লাভ নেই। যখন দেখা যাবে যে যারা ভদ্র-তদ্র শিক্ষিত সমীচীন, তারাও গোলমাল করছে, তখন অবিশ্যি চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। কিন্তু তারা কিছু করবে না। সত্যিই শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করে দেশটাকে সব দিক দিয়ে উন্নত সভ্য করে তোলবার জন্যে তাঁদের চেষ্টা খুব আন্তরিক, তা আমি জানি।'

'কিন্তু দুপুরবেলা ভদ্রবৌদের ঘরে ঢুকে বিয়ের সম্বন্ধ পাড়া—এটা চৌধুরী সাহেবকে জানালেই ভাল হত।'

'মোনতাজদের হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে, কিন্তু আর-এক দল আছে মোনতাজ গনির চেয়ে বেশি ভারে কাটে, বুদ্ধিও আছে খানিকটা, কিন্তু বিশেষ কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই; হোসেন সাহেব চৌধুরী সাহেবদের মত বিজ্ঞতা প্রবীণতা নেই, তারা যদি একটু বেসামাল হয়ে উঠতে থাকে তা হলে চৌধুরী সাহেব, আমির আলি সাহেব, শাহাদাৎ হোসেন সাহেবকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। গনির কাছে বিড়ি ছিল? খেলে খাটে বসে-বসে?'

'দেশলাই চেয়েছিল আমার কাছে।'

'কে, গনি?'

'হ্যাঁ গনি আর চাঁদ মিঞা।'

'চাঁদ মিঞা?' হারীত একটু ভেবে বললে, 'ওঃ, দপ্তরির দোকান আছে চক বাজারে। কী এক্তেলা ছিল এদের তোমার কাছে?'

'দু-দফা ছিল। এক হচ্ছে নরেনের রক্ত নিতে হবে—'

'চাঁদ মিঞাও তা চায়?' কেমন একটু কৌতুক বোধ করে বললে হারীত।

'চাঁদ মিঞা, গনি,ইসমাইল, সুজন খাঁ সব্বাই তাই চায়।'

'কেন, এতে তাদের কী স্বার্থ?' হারীত কোনো কিনারা না পেয়ে সুমনার ডান হাতের মুঠোর দিকে তেরছা চোখে তাকিয়ে থেকে বললে।

'নরেন, বরেন, চাঁদ মিঞা, বরকত আলি, সুজন খাঁ, গনি ওদের একটা দল তো। নরেনের কোনো অমান্যি হলে ওদেরও অমান্যি, দোলো ব্যাপার; এত দিন পলিটিক্সে থেকে সে তোমার বোঝা উচিত ছিল হারীত। দশের খাতিরে এসেছিল ওরা সব।'

'রক্ত দেওয়াটা একটা মানের ব্যাপার; না দিলে অমান্যি হয়? মান-অপমানের বেশ চেকনাই বেরুচ্ছে নরেনের—সুজন খাঁ, চাঁদ মিঞা, আশু দত্ত, নিমাই হালদারদের সঙ্গে মিশে।'

'মেলা চেঁচিও না হারীত। আগের সে দেশ-গাঁ নেই, কিন্তু লোক বদলেছে, হাওয়া বদলেছে। তুমি শত্রু বানাচ্ছ খুব হারীত।'

'বানাচ্ছি, তা তো দেখছিই। কী করতে হবে? যা ভাল বুঝি তাই তো করি। কারু সাতে-পাঁচে অনিষ্টে থাকি না। মানুষের ইষ্ট করতে চেষ্টা করছি, দু জাতের মানুষেরই। আমাকে নাকে ধরে ঘুরিয়ে দেখাবে নাকি নরেন, আশু দত্ত, চাঁদ মিঞা, সুজন খাঁ?'

'আঃ, কী করছিস, ঝামেলা কেন করছিস হারীত। ওদের আক্রোশ, তুই জুলেখাকে হাত করতে চেষ্টা করছিস। কেন করছিস? কী দরকার তোর? আমার গা-ছুঁয়ে বল, যাবি না আর জুলেখাদের ওখানে।'

'কেন যাবে না জুলেখাদের ওখানে হারীত?' বললে অর্চনা; এই মাত্র কখন ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে অর্চনা টের পায় নি হারীত। সে বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছিল, দেখছিল, খুঁজছিল খুব উঁচু শিমূল গাছটার হাজার-হাজার বাতাসি পাতারাশির ভেতর থেকে সেই উড়ন্ত বুলবুলি দুটোকে; নেই এদিকে তারা; কোথায় চলে গেছে; জামরুল বনের ভেতর দিয়ে ওড়া একটা মাছ-রাঙা যদি রেডিওতে পাখির স্বর নেওয়া হত, তেমন একটা তালের সুস্থতা দিয়ে শুরু করে, সমস্ত মেশিনের এরিয়ালের অতীত কী একটা প্রাকৃতিক নিবিড় শব্দের অনন্তের ভেতর দিয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল।

'বসো অর্চনা,' সুমনা বললে।
'জুলেখাদের বাড়ি গিয়েছিল হারীত?'
'হ্যাঁ, সমস্তটা দুপুর সেইখানে।'
'আজ প্রথম গেল বুঝি?' জেনেশুনেও জিজ্ঞেস করল অর্চনা।
'না, ক দিন ধরেই তো যাচ্ছে। যাওয়াও যাওয়া, সমস্তটা দুপুর সেখানে মেরে দিয়ে চারটে সাড়ে-চারটের সময় ভাত খেতে আসা হয়।
হারীত অর্চনার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে বলেছিলাম, কিন্তু তুমি তো যেতে চাইলে না।'
'তোমার সঙ্গে গেলে এক রকম ছিল ভাল, কিন্তু হারীত একা গিয়ে শত্রু বাড়াচ্ছে,' সুমনা বললে।
'কে শত্রু হল সুমনাদি?'
'নরেনরা শত্রুতা করছে। সুজন খাঁ, চাঁদ মিঞা, গনি, ইসমাইল, আশু দত্ত, গণেশ সব নরেনের দলে। আমাদের বাড়ি এসেছিল ওরা আজ দুপুরবেলা, তখন তুমি কোথায় ছিলে অর্চনা!'
'দুপুরবেলা আমি বাড়ি ছিলুম না। একটু হাসপাতালে গিয়েছিলুম। মেয়েদের হাসপাতাল কমিটির একটা মিটিং ছিল আজ। এই তো এলুম।'
'হাসপাতালে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল তোমার?'
'মজুমদারের সঙ্গে? হ্যাঁ হয়েছে।'
'নরেন কিছু বলেছে তাকে?'
'তা তো আমি জিজ্ঞেস করি নি। কিছু বলবার কথা ছিল?'
'নরেন আমাকে রক্ত দেবে কাল থেকে আবার। ঠিক হয়ে গেছে। ছেলেটাকে যাই বল তাই বল, খুব মনে ধরেছে ওকে আমার। বৌদি সম্বন্ধ পাতাল তো আমার সঙ্গে। নাঃ, ওর রক্ত ছাড়া আমার ভাল লাগবে না, ভাল হবে না। হারীতকে রাজি করিয়েছি।'
অর্চনা হারীতের মুখের দিকে তাকাল, 'রাজি হয়েছ নাকি?'
'কী করব—না হলে রুগি টেঁকে না।'
'মজুমদারও রাজি?'
'আজ জিজ্ঞেস করে আসব। বেরুতে হবে রাতে নানা কাজে।'
'এটা কেমন হল হারীত। আবার নরেন রক্ত দিচ্ছে?'

'দিচ্ছে তো। বেশি দিন দিতে হবে না।'

'কেন?'

'না। বেশি রক্ত লাগবে না আর। মা ভাল হয়ে উঠছেন। নিশীথ সেন নাকি নরেনকে ঠিক করে গেছলেন?'

অর্চনা সুমনার দিকে তাকাল। সুমনা পাশ ফিরে শুয়ে পড়েছে। চোখমুখ দেখা যাচ্ছে না তার। হয় তো ঘুমিয়ে পড়েছে, কিংবা এগিয়ে গেছে ঘুমের পথে খানিকটা দূর।

'নিশীথবাবু তাড়াতাড়ি কলকাতায় চলে গেলেন। এ দিকটার কোনো ব্যবস্থা করে যেতে পারেন নি। কিন্তু তিনি তো নরেনের ওপর বরাত দিয়ে যান নি— আমি যতদূর জানি,' অর্চনা বললে।

সুমনা এড়িয়ে-এড়িয়ে বললে, 'ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে, ঘরের মেয়ে ঘরে। এখন তোমরা দু-জনে কথা বল, আমি একটু ঘুমোচ্ছি,' বলতে-বলতে ঘুমিয়েই পড়ল সুমনা।

'জুলেখা না কি, ওর নাম?'

'ওর নাম মনোলেখা। ওর বাবা ওকে জুলেখা ডাকাত, সুলেখার সঙ্গে মিল দেবার জন্য; না কি জুলেখার সঙ্গে মিল দেবার জন্যে সুলেখা নাম রাখল ওর বোনের।'

'ওদের বাবা তো নেই এখন?'

'না, তিন-চার বছর হল মারা গেছেন।'

'ভাই-টাই নেই তো শুনেছি।'

'নেই বলেই তো জানি, মা ছাড়া কেউ নেই।'

'কী করে চলে তা হলে ওদের?'

'এখানে বাড়ি রেখে গেছেন ওদের বাবা, লাখ দেড় লাখ টাকা ব্যাঙ্কে আছে। কলকাতায়ও ওদের বাড়ি আছে শুনেছি—পার্কসার্কাসে। অনেক দিন সে বাড়িটা বেহাতের মত হয়ে ছিল, এই বারে হাতে এসেছে। ভাড়া পাচ্ছে।'

'জুলেখাদের বাড়িতে রোজই যাচ্ছ?'

'তোমাকে তো নিয়ে যেতে চেয়েছিলুম, গেলে না কেন?'

'আমার তো এক দিন যাবার কথা ছিল, রোজ তো নয়। তুমি তো'—বলতে

গিয়ে থেমে গেল অর্চনা উঁচু শিমুল গাছটার উড়ু-উড়ু পাতার দিকে তাকিয়ে। বুলবুলি দুটো আবার এসেছে বাতাসের নিরবচ্ছিন্ন প্রাণচারণার বিচরণার সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে শিমূল গাছটার ভেতরে।

'আমি তো—কী ?' হারীত বললে।

'রোজ দুপুরেই তো সুলেখাদের ওখানে কাটাচ্ছ।'

'সেটা ঠিক। আমার কাজের ক্ষতি হচ্ছে। একটা নিয়মের ভেতরেও আসতে পারছি না'—ঠিক এই জন্যে—অন্য কোনো একটা অব্যক্ত কারণেও, অর্চনার মুখোমুখি বসে একটু অস্বস্তি বোধ করে হারীত বললে।

'কী কাজ করবে ঠিক করেছ জলপাইহাটিতে ?'

'তোমাকে তো বলেছি সব। কোনো বিপ্লবের কাজ এখানে হবে না।'

'কেন, কাজের ক্ষতি হচ্ছে কেন সুলেখাদের ওখানে গিয়ে ? সুলেখা তো বেশ বড়-সড়—লেখাপড়া জানা, এবার তো বি-এ দিচ্ছে। নানা রকম ভাল সহজ মিহি পরামর্শ দিতে পারে সে।'

হারীত একটু অবাক হয়ে অর্চনার দিকে তাকিয়েই সুমনার দিকে তাকাল, ঘুমিয়ে আছে ; বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকাল ; ঘরে ঘুমিয়ে আছে লোক, কথা বলছে লোক, বাইরে অবাধ প্রকৃতি—কী গভীর আহ্লাদে অপর্যাপ্ত চৈত্র-বৈশাখ, বিকেলের শেষ রোদ-বাতাসে, ছিটে মেঘের মত উড়ন্ত শিমুল তুলোয়, বড় তুলোর মত উড়ন্ত ধূসর মেঘে, বাতাসে, আরো আকুল অনাকুল চৌষট্টি বাতাসে, সাদা কালো পাখির ডানাগুলোকে ছিটকে ফেলে। ভীমরুল উড়িয়ে, উঁচু-উঁচু গাছের বনের ভিতর কোথায় হারিয়ে গিয়ে কোথায় চলে গেছে প্রকৃতি, সময় নেই, দেশ নেই, জলপাইহাটি নেই এমন এক স্থির নিবিড় সদর্থের ভিতরে তবুও।

'রোজ যাই না আমি সুলেখার কাছে।'

'রোজ যেতে না করে নি তো কেউ তোমাকে। কেন যাবে না হারীত ?' হারীতের দিকে তাকিয়ে অর্চনা বললে।

'তুমি তো যেতে নিষেধ কর না। কিন্তু মা আমাকে তার গা ছুঁয়ে শপথ করতে বলছিল। সুলেখাদের বাড়ি যাই সেটা মা পছন্দ করে না।'

'মায়ের প্রাণ, তা তো হবেই,' অর্চনা হাত পাখাটা তুলে নিয়ে আঁচলে বাতাস লাগিয়ে বললে, 'ঘরের ছেলেকে ঘরেই রাখতে চান তিনি।'

'ছেলে থাকবে। কী হিসেবে তোমাকে ও কথাটা বললে মা? শুনেছিলে তুমি?'

অর্চনা দিই-দিই করে তবুও এ জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর দিল না—'বি-এ দিচ্ছে না সুলেখা এবার?'

'না।' হারীত বললে।

'কেন?'

'তৈরি হয় নি।'

'আসছে বার দেবে?'

'সেই রকমই তো ইচ্ছে।'

'কেন, তুমি পড়িয়ে তালিম করে দাও না। এবারই দিক। কেন মিছিমিছি একটা বছর নষ্ট করবে?'

'নষ্ট আর কী,' হারীত চিন্তিতভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওরা তো আর পাশ করে চাকরি নিচ্ছে না। বাঃ, আমি পড়াব সুলেখাকে? সে কত পড়াতে পারে আমাকে।'

'কী যে বল তুমি হারীত।'

'সত্যি বলছি তোমাকে। আমি পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছি অনেক দিন। ও তো রোজ বই কিনছে, পড়ছে।'

'কেমন লাগে সুলেখার মাকে তোমার হারীত?'

হারীত একটু বিচক্ষণভাবে অর্চনার দিকে তাকিয়ে বললে, 'সুলেখার দিদির মত দেখায় তার মাকে। বয়স বছর চল্লিশের বেশি হবে না। কিন্তু জুলেখার চেয়ে বড় মনে হয় না। আশ্চর্য সব পটের মত ওরা।' এ রকম নাকি কলকাতায়, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে কোথাও দেখে নি. কে কার চেয়ে বেশি সুন্দর হঠাৎ দেখে বলা কঠিন, আস্তে-আস্তে বুঝতে পারা যায় সুলেখাই সবচেয়ে বেশি, নাকি জুলেখা? জুলেখা আর তার মা একই রকম।

বলতে-বলতে অনেক কথা অর্চনার মত মেয়েমানুষকে বলে ফেলেছে হারীত। যা বলা দরকার ছিল তার চেয়ে বেশিই বলেছে যেন, নিজেকে সামলে নিয়ে হারীত বললে, 'সুলেখার মার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা হয় নি আমার। কেমন লোক বুঝতে পারছি না। প্রায়ই তো বাইরে থাকেন।'

'বাইরে থাকেন! কেন বাইরে থাকেন?'

'নানা কাজ নিয়ে ফেরেন। সংসারের ভার তো তাঁর ওপর। নানা রকম মেয়েদের কমিটির মেম্বার তো তিনি। হাসপাতাল কমিটিতে আছেন সুলেখার মা ?'

'না।'

'ওঁর কথা জিজ্ঞেস করলে কেন তুমি ?

'এমনিই।'

হারীত তাকিয়ে দেখল সুমনা ঘুমিয়ে আছে, ও-পাশ ফিরে আছে, ঘুমের নিশ্বাসে শরীর আস্তে-আস্তে উঠছে পড়ছে। ঘুমনো জিনিসটির দিকে তাকিয়ে হারীত বললে, 'আমি যেমন চেয়েছিলুম, আমার নিজের মাকে তেমন করে পেলাম না কোনো দিন। মার ভেতরে প্রকৃতির সরসতা, সবলতা বা মানুষের হৃদ্যতা, নিপুণতা নেই। আজকের এ যুগে খাড়া বড়ি থোড়ের ওপর খাঁড়ার ঘা পড়ছে সব সময়ই যেন মার মাথার ভেতরে, কিন্তু থোড় বড়ি খাডা হয়ে ছিটকে পড়ছে তবুও সব। তোমার ছেলে ঠিক ষোল আনা মায়ের মত করে পেয়েছে তোমায়।'

'কেন এ কথা বলছ ?' হারীতের চোখে চোখ রেখে বললে অর্চনা। অর্চনা সুমনার পাশে বসেছিল খাটের ওপর পা ছড়িয়ে—হারীত একটা কাঠের চেয়ারে বসেছিল। পা দুটো আস্তে-আস্তে টেনে নিয়ে উড়ন্ত সারসের পায়ের মত পিছনের দিকে গুটিয়ে নিয়ে বসল অর্চনা।

'এমনিই বললাম', হারীত বললে। পরে একটা নিশ্বাস ফেলল।

'তোমার বাবার চিঠি পাও নি ?'

'এখনও আসে নি তো।'

'তোমার মাকে লেখেন নি ?'

'না। তোমাকেই তো লেখবার কথা।'

'দাশগুপ্ত সাহেবের বাড়িতেই আছেন তো ?'

'থাকবার তো কথা। তোমাকে তো বালিগঞ্জের ঠিকানাই দিয়ে গেছেন। কেন চিঠি লেখ না তাঁকে তুমি।'

অর্চনা একটু ঠোঁট কাঁপিয়ে উঠতি হাসিটাকে নিভিয়ে দিয়ে বললে, 'তোমার বাবা যদি কলকাতায় চাকরি পান, তা হলে তোমরা এখানকার পাট উঠিয়ে চলে যাবে না কি হারীত ?'

'মা যাবেন। আমি থাকব।'

'থাকবে? কতদিন?'

'চুক্তি করেছিলাম তো তোমার মৃত্যু পর্যন্ত, না কি আমার মৃত্যু পর্যন্ত, ঠিক মনে পড়ছে না—'

'আমার মৃত্যু পর্যন্ত—'

'তাই করেছিলাম বুঝি, কিন্তু সেটা কি হবে? অত দিন জলপাইহাটিতে থাকতে পারবে তুমি?'

'আমার যাবার কথা উঠল? আমি থাকব না কে থাকবে?' অর্চনা তার আকাশের উড়ো সারসীর প্রণালীতে বিন্যস্ত পা-দুটো নিয়ে সুমনার একটু গা-ঘেঁষে বসে বললে।

'না, কেউই অত দিন এখানে থাকব না। আমাদের মৃত্যু জলপাইহাটিতে হবে না তো।'

'হবে না? যেন মানুষের হাতের রেখা পড়তে পার তুমি,' অর্চনার মুখ থেকে একটু ছোট্ট আবিষ্ট হাসির শব্দ বেরুল, 'মানুষের কপাল দেখেই বলে দিতে পার না কি হারীত।'

'আমার মৃত্যু ইউনিয়নে হবে—কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে। হাতের রেখা দেখতে হয় নি, কপাল দেখতে হয় নি। এটা আমি, যে বাঁচে যে মরে সেই মানুষেরই নিজ গুণে, অনুভব করেছি। পাখিরা অক্লান্তভাবে সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়তে-উড়তে অনেক দূর থেকেই মাটির গন্ধ পায়—'

'পায় বুঝি? তা পেতে পারে। কিন্তু শেষ কাজ তোমার ইউনিয়নে হবে বলছ; কেন?'

'আমি জানি কাশী মিস্তিরের ঘাটে গিয়ে আমার মাথা রাখতে হবে। ঘাটের বালিশ তৈরি হতে-হতে কুড়ি-পঁচিশ বছর কেটে যাবে।'

বালিশ পছন্দ না হলে পঞ্চাশও তো হতে পারে?'

'না। নিজের কাজ ফুরিয়ে গেলে তার পর বেঁচে থেকে কী আর লাভ। পঁচিশ বছর তো বেশ খানিকটা সময়। এর ভেতর যা হবার হয়ে যাবে।'

অর্চনা বড় বেশি ঘেঁষে বসেছে সুমনার দিকে। নিজেকে আস্তে-আস্তে খসিয়ে নিয়ে সরে বসল সে, আরো একটু সরে বসল। ঘুমের ভেতর সুমনা আস্তে আলগোছে নড়েচড়ে উঠে আগের মতন নিশ্বাসের নিয়মিত ওঠাপড়ার ভেতর

স্থির হয়ে আরো স্থিরতর হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

'তুমি আমার চেয়ে ক বছরের ছোট ?'

'তিন-চার বছরের।'

'আমি ভেবেছিলুম বেশি।'

'তিন-চার বছরের ছোট-বড়র কোনো মানে হয় না। হয় অর্চনা ?'

অর্চনা কোনো কথা বললে না।

'তোমাকে আমি অর্চনা মাসি ডাকব না।'

'ডাকবে না তো,' অর্চনা বললে, 'কিন্তু এ সব কী রকম কথা হচ্ছে হারীত। কথা বলতে-বলতে কোন শাখায় কোন পাতায় এসে পড়েছি, পাতারও আবার শিরা থাকে ; থাক, দেখে কাজ নেই ; আমি এখন উঠি।'

'বসো-বসো', হারীত বললে।

'না, না, উঠি আমি।'

'বসো।'

'না, উঠতে হয় এখন', অর্চনা উঠতে-উঠতেও বসে রইল তবু, 'সুলেখাদের বাড়ি আছে পার্কসার্কাসে—কেমন বাড়ি ?'

'বেশ বড় দোতালা বাড়ি—সুন্দর।'

'দেখেছ বুঝি ?'

'বাড়ির ফোটোগ্রাফ আমাকে দেখিয়েছে জুলেখা।'

অর্চনার মাথাটা খালি ছিল, ঘোমটা খোঁপার ওপর ঠেকেছিল অনেক ক্ষণ, সেটাকে খোঁপার থেকে খসিয়ে নিয়ে গলার আঁচলের মত অর্চনা জড়িয়ে নিল।

'পার্কসার্কাসের বাড়িটা ওদের নিজেদের ?'

'হ্যাঁ। ওদের বাবা করে গেছেন।'

'কী ছিলেন তিনি ?'

'ইঞ্জিনিয়ার।'

অর্চনা বললে, 'কলকাতায় এমন চমৎকার বাড়ি থাকতে সুলেখারা এখানে আছে যে!'

'কলকাতায় পার্কসার্কাসে গোলমাল দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছে তো অনেক দিন। এখন সব ঠাণ্ডা হয়েছে বটে। এটা নিজেদের দেশ তো সুলেখাদের।'

'কিন্তু এখন তো পাকিস্তান হয়ে গেল এ দেশ।'

তা তো হল, হারীত তাকিয়ে দেখল বাইরের পৃথিবীর থেকে আলো যেন কাক, চিল, মৌমাছির পাখা উসকে উড়িয়ে ফালি তরমুজের রঙের মত নিঃশব্দ বর্ণে এক-আধ মুহূর্ত স্থির হয়ে আছে, টনক নড়ছে না, কোনোদিকে ঠিকরাচ্ছে না কিছু, মন্ত্রসিদ্ধির মত যেন নিজেকে ধরে আছে সময় ঃ বিকেলের রোদ নেমে এসে জারুল, হিজল ঝাড়, জামরুলের বনের এই মায়াঘন তবুও সৃষ্টির অন্তিম প্রতিভায় স্বচ্ছ দেশের ভেতর।

'পাকিস্তান হয়েছে এ দেশ। মানিয়ে নিয়েছে সুলেখারা। তাদের এ জায়গাটা ভাল লাগে।'

'ভাল লাগে। কিন্তু আজ হোক, কাল হোক কলকাতায় চলেই যেতে হবে।' অর্চনা বললে।

'কী করে জানলে তুমি?'

'কী বলে সুলেখা?'

'সে তো এখানে থাকতে চায়।'

'আমিও তো থাকতে চাই। কিন্তু দুটো কি এক রকম?'

সুমনা ঘুমের মধ্যে কাতরে-কাতরে চুপচাপ হয়ে পড়ছিল আবার। হারীতের চোখের দিকে তাকিয়েছিল অর্চনা, শেষ বিকেলের ছায়ার ভেতর একটা বড় জামফলের নীলিমা, কালিমার মত যেন, অর্চনার চোখের তারায়, অর্চনার সমস্ত সত্তায়, পরিব্যাপ্ত হয়ে, ছায়া-বিকেলের জামবনানীর মত, কোনো এক নিস্তব্ধ নদীর পারের, ছেলেবেলায় সে-সব নদী, ছায়া, নীরবতা, জামের বন দেখেছিল হারীত। তার পর আর দেখে নি অনেক দিন। আছে যে তাও ভুলে গিয়েছিল। যে-জ্ঞান বিদ্যামাত্র, যে-বিদ্যা শুধুই শব্দের ব্যসন, যে-শব্দ বাক্য-প্রগতি অফুরন্ত বিশৃঙ্খলার সর্বব্যাপ্ত বুদ্ধিনাশের একটা বিরাট বিনাশ প্রস্থানের দিকে টানছে মানুষকে, কলকাতা তাকেই মনে করিয়ে দেয় শুধু ; বলে, দেশ নগর হবে ; নগর হবে কলকাতা ; কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, হারিয়ে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে, অন্ধকারের রক্তহিমানীর দিকে যাচ্ছে সব ; বলে এইই সভ্যতা, এই উপগ্রহে এইই অন্তিম অবরোহণ মানুষের। হারীত নিজেও নির্জন সন্ধ্যার নদীর পারের শাল, জামরুল, শিশু বনানীর শান্তি, সত্যতা, মহানুভবতাকে স্বীকার করে নি তো, সে কলকাতার মানুষ, সভ্যতার মানুষ, কলকাতা ভেঙে কলকাতাকে সৃষ্টি করবে আবার, এই বিষ সভ্যতাকে বিনাশ

করে নতুন সভ্যতা আনবে—যদি হয় তাও বিষ—মানুষের সৃষ্টিরই মর্মকুহরে কীট রয়ে গেছে বলে—তা হলে কী করবে সে? না, না কীট নেই, কাজ ছাড়া কোনো কথা নেই, বেশি ভাবার কোনো দরকার নেই, নদী জাম বন সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা বলে কোনো জিনিস নেই; নিশীথ সেন আর হোরুস্তেরলিন আর লুক্রেসিয়সের বিষণ্ণ নিঃশব্দতার ভেতরে নিজেকে ছেড়ে দিলে চলবে না। পৃথিবীটা মহাভারতের পৃথিবী, কিংবা দান্তের নরকের নরকাতীত একটা আশ্চর্য শুদ্ধশীল প্রবাহের অজান্তে জনতাসংস্থান, কেমন আধো আলোকিত কেমন রক্তের রাত্রির রঙে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে বিশাল দিনের রং পেতে যাচ্ছে।

'আমার কথার কোনো উত্তর দিলে না তো হারীত।'

'আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যেন।'

'দেখছিলুম তো।'

'কী দেখছিলে?'

'যেন বাইরে তাকিয়ে ঊষা-অনিরুদ্ধের আকাশ আলো দেখছ; তোমার দিকে দেখছিলুম আমি।'

'অনেকটা সময় কেটে গেছে?'

'হ্যাঁ—মিনিট পনের-কুড়ি হবে—'

'কেমন একটা তন্দ্রার মতন এসে পড়েছিল। নিজেকে কাজের মানুষ করে তুলতে চাই, অথচ কাজ ফেলে কথাই ভাবি।'

'আমিও তো ভাবি; ভেবে নিলে কাজের সুবিধে হয়।'

হারীত বললে, 'তোমার মনে হয় সুলেখারা এখান থেকে চলে যাবে?'

'তোমাকে বলে নি তারা কলকাতায় যাচ্ছে?'

'না তো। যাচ্ছে, কারো কাছে শুনেছ বুঝি?'

'অনেকেই তো চলে যাচ্ছে,' অর্চনা বললে।

'ওঃ, সেই কথা,' হারীত একটু নিস্তার বোধ করে হেসে বললে, 'না, অনেকের সঙ্গে সুলেখাদের মা তলিয়ে যাবার লোক নন। চলে যাবে হয় তো এক দিন, কিন্তু দেরি আছে। আজ নয়, কাল নয়, কথাটাই তো ওঠে নি এখন।'

'তোমার কাছে জুলেখার মা পাড়ে নি কথাটা, বলতে চাও তুমি হারীত?'

'জুলেখার মার সঙ্গে কথাবার্তা হয় না আমার—'

'তা হলে কী করে পাড়বে?'

হারীত সুমনার এককালি জ্বালানি কাঠের মত শুকনো জ্বলজ্বলে শরীরের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'তোমার কাছে বলেছে বুঝি জুলেখার মা ?'

'আমার সঙ্গে দেখা হয় না, আলাপ নেই বনলেখার সঙ্গে আমার।'

হারীত একটা নিশ্বাস ফেলে বাইরের দিকে তাকিয়ে, ঘরের ভেতরে ছায়ায় কোথায় অর্চনা বসে আছে চোখ দিয়ে তাকে খুঁজে বার করে, বললে, 'তা হবে ; মন ঠিক করতে পারে নি হয় তো এখনো। কাউকে বলছে না কিছু তাই। চলে যাবে হয় তো তিন বোন। কিন্তু তুমি তো এখানে আছ।

'তিন বোন ?' অর্চনা ঘাড় কাত করে, মুখ এড়িয়ে, মাথার মস্ত বড় খোঁপাটা ভেঙে ফেলে বললে, 'সুলেখার বোন বলছ সুলেখার মাকে ? বোন হল ? মানুষের সম্বন্ধ-টম্বন্ধ এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সব।'

হারীত তাকিয়ে দেখল আরো আবছায়া হয়ে পড়েছে জামরুল বনটা, এ দিকের ফালি আকাশটা, ও-দিকের ও আকাশটা। যারা পাখায় ভর দিয়ে উড়ছিল এত ক্ষণ সেই চিলের থেকে কুমোর পোকা অব্দি সকলেই প্রায় সোঁদা আকাশটাকে একা ফেলে চলে গেছে, চলে যাচ্ছে।

মানুষের সম্বন্ধ এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে বলেছে অর্চনা। অর্চনার দিকে তাকিয়ে হারীত বললে, 'চেয়ে দেখ বাইরে, কেমন আশ্চর্য এখন শান্তির সময়। এই সময়েই সত্য উদঘাটিত হয়। মানুষের ঠিক সম্বন্ধ স্থির হয় এই সময়—'

'কী স্থির হল ?'

হারীত কোনো কথা বললে না, একটা বোলতা বাইরের বাতাসের ভেতর মিলিয়ে যাচ্ছে—একটা দোয়েল সেটাকে ধরতে গিয়ে তাক ভুল করে সজনে গাছের ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল—তাকিয়ে রইল সেই দিকে।

'কী স্থির হল সুলেখা আর তার মার সম্বন্ধ ?'

'সুলেখার কথা বলছিলুম না।'

'তবে কার ?'

'তোমার আমার।'

'ওঃ, এইবারে আমি—সুমনাদি ঘুমের থেকে জাগল না তো, আমি উঠি এবারে।'

হারীত বাধা দিতে গেল না, সুমনার দিকে চোখ নেই তার, অর্চনার দিকে

নেই, বাইরে পাখিদের ভেতর একটা ঘুমতাড়া এসে পড়েছে, পতঙ্গদের ভেতরেও, কেমন ছায়া এসে পড়েছে, দেখছিল হারীত।

না, চলে যায় নি অর্চনা। বসে আছে। কেমন যেন বিমুগ্ধ বিষধরের মত বিড় পাকিয়ে বসে আছে কেমন ঘনিল, নিবিড়, শ্বেতাঞ্জনের মতন। কিন্তু বিষ নেই, ভেতরে সুধা আছে, সুধা ক্রমে-ক্রমে বেশি জমে উঠেছে যেন অর্চনাকে ছাপিয়ে, হারীতের আত্মাকে অতিক্রম করে, হারীতের শরীরের ভেতরেও যেন। এবং বিষ নয়, কলকাতায়, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে বিংশ শতকে, ইতিহাসের অনেক স্তরে অনেক বিষ দেখেছে সে। অমৃত উপলব্ধি করা যাক বাইরের প্রকৃতির দিকে চোখ রেখে, সে চোখ না ফিরিয়ে, আর মানুষ মানুষকে যা কোনোদিন দিতে পারে না শরীরে একটা অবাধ বিলোড়ন ছাড়া, সেই ব্যথিত সুধা, শরীরকে গ্রহণ করতে না দিয়ে চোখের ভিতরে সঞ্চিত করে।

অর্চনা বসে আছে খাটের দূরের কিনারে, সুমনা ঘুমিয়ে আছে, চেয়ারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে হারীত। যে সুধা মানুষের স্নায়ুর অবলম্বন চাচ্ছিল, তাকে আজকের এই অসুস্থ সংস্কার, কীটনষ্ট সমাজ সংস্থিত আধার, গ্রহণ করতে পারবে না বলে, মননের বৃহৎ সুস্থতার দেশে একটা প্রকাণ্ড সাদা পাখির মত সঞ্চারিত করে দিল হারীত। কেমন অদ্ভুত স্বর্গীয় বিমোহ। এ পাখির আসা-যাওয়া আত্মায় (যদি তা বলে কোনো জিনিষ থাকে); আত্মার থেকে মনে; মনের থেকে শরীর থেকেও মাঝে-মাঝে—শরীরকে ছেড়ে দিয়ে শুক্র সূর্যে আবার, অনুগত স্বচ্ছতায় স্পর্শতায়, অনন্ত যেখানে নেই তার সুধার সেই অন্তিম নির্জনতার দেশে।

'কী ঠিক হল?' অর্চনা বললে, 'কী ঠিক হল?'

'কিসের?' কোথায় ছিল যেন সে, যেখানে এখন বসে আছে সেখানে নয়, চমকে উঠে বললে হারীত।

যে খোঁপাটা ভেঙে ফেলেছিল সেটাকে ঠিক করতে-করতে, যে-কথা সোজাসুজি বলতে ইচ্ছা করছিল অর্চনার সেটাকে গড়িমসি করে, প্রায় সোজাভাবেই বললে অর্চনা, 'এখন তো শান্তির সময় বলছিলে তুমি, সত্য উদ্‌ঘাটনের সময়। মানুষের সম্বন্ধ এলোমেলো হয়ে যায় না এই সময়, বলেছিলে তুমি? সত্য সম্বন্ধ স্থির হয় বলছিলে। কী সম্বন্ধ তা হলে'—বলতে-বলতে নিজেকে শুধরে নিয়ে অর্চনা বললে, 'আচ্ছা, ঐ যে নারকোল গাছে পাখি দুটো থাকে—রাতে প্রহরে-

প্রহরে ডেকে ওঠে—ওরা কি বাজকুড়ুল ?'

'কী সম্বন্ধ ঠিক হল অর্চনা ?'

'তুমি অর্চনা ডাকলে আমাকে ।'

'হ্যাঁ, পাখি দুটো বাজকুড়ুল,' হারীত বললে, 'একশ বছর বাঁচে। এক সঙ্গে থাকে ।'

দু জনেই চুপ করে বসে রইল কিছু ক্ষণ।

পা দুটোকে বুক পালকের কাছে টেনে মরাল-সারস-বক-বাজপাখি যে-রকম আকাশ দিয়ে উড়ে যায় সেই রকম পা গুটিয়ে বসেছিল অর্চনা ; ডান পায়ের ওপর পা চড়িয়ে বসেছিল হারীত আকাশ-বাতাসের দিকে তাকিয়ে।

'তুমি এক বছর এখানে থাকা ঠিক করেছ হারীত ?'

'হ্যাঁ, ঠিক করেছি ।'

'কবের থেকে এক বছর ?'

'এই আজ থেকে—'

'তার পর, বছর ফুরিয়ে গেলে থাকবে না আর ?'

'এই তো সবে শুরু হল বছর,' হারীত বললে, 'এক বছর ফুরোবার আগে তুমিই তো এখান থেকে চলে যাবে ।'

'কে বললে ?' বিশেষ কোনো মনোযোগ না দিয়ে অর্চনা বললে।

'কলকাতায় মাস্টারি জোটাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন তো মহিমবাবু ।'

অর্চনার ঘুম পাচ্ছিল যেন, সুমনার ঘুম শেষ হচ্ছে না, বাইরে সন্ধ্যা হয়ে আসছে, ঘুম পাচ্ছে না হারীতের। কেমন সোজা খাড়া হয়ে বসে আছে সে।

'মহিমবাবু পেয়ে যেতে পারেন। তিনি তো ফার্স্ট ক্লাস। ঢাকা ইউনিভার্সিটির অবিশ্যি। হোক তা ঢাকা ইউনিভার্সিটির. ফার্স্ট ক্লাস তো ; কলেজের কর্তৃপক্ষরা ফার্স্ট ক্লাসটাই দেখে। ফার্স্ট ক্লাস থার্ড তো মহিমবাবু ? নাকি থার্ডক্লাস ফার্স্ট ? তোমার ঘুম পাচ্ছে, ঘুমিয়ে পড়ছ অর্চনা।'

'তোমার ঘুম পাচ্ছে না হারীত ?'

'না। আমার বেরুতে হবে রাতে। সারা রাতই বাইরে থাকতে হবে। বাড়িতে ফেরা হবে না বোধ হয় আজ রাতে আর।'

'কোথায় যাবে ?' ঘুমে জড়িয়ে যেতে-যেতে অর্চনা বললে।

'যাব বিরাজ সাহার আড়তে। সেখান থেকে চালের জোগাড় করে চামার-

পট্টির দিকে যেতে হবে।'

'চাল? কী চাল? আমি বলছি কত মণ চাল?'

'পনের-কুড়ি মণ।'

'কে দেবে তোমাকে অত চাল?' অর্চনা ঘুমোতে-ঘুমোতে জেগে উঠে বললে।

'ঠিক করে এসেছি।'

'কালবাজারের দরে? খুব গলাকাটা দরে ঠিক করেছ তুমি? আজকাল চাল পাওয়া যাচ্ছে না এখানে।'

'পাচ্ছি তো।'

অর্চনা চোখ রগড়াতে-রগড়াতে হেসে বললে, 'দেখ কেমন পাও—রাত-বিরেতে আড়তে-আড়তে ঘুরে। টাকা কিছু আগাম দিয়েছ? নিয়েছে টাকা কিছু?'

'না, দিই নি।'

'তা হলে আর পেয়েছ তুমি চাল।'

'না পেয়ে আমি ছাড়ব না অর্চনা। আজ রাতে কিনে আজই বিলি-ব্যবস্থা করে দিয়ে আসব সব।'

'এত চালের টাকা পেলে কোত্থেকে?'

'কলকাতা থেকে কিছু টাকা এনেছিলাম আমি, তাই দেব; বাকি-বকেয়াটা বিরাজদাকে পরে এক সময় দিলেই হবে!'

'পরে মানে কবে?'

'দিন পনের কুড়ির মধ্যেই।'

'কোত্থেকে পাবে এত টাকা এত অল্প সময়ে?'

'কেন, দরকার হলে তুমি দেবে।'

অর্চনা গায়ের থেকে আরো খানিকটা ঘুম ঝেড়ে ফেলে বললে, 'কেমন ঘুম পাচ্ছিল, ঘুম পাচ্ছিল, ভারী মিঠে বাতাস দিচ্ছে। সন্ধে হয়ে গেছে। কাদের ভেতর বিলোবে চাল তুমি?'

'চামারপট্টিতে অনেকেই আট-দশ দিন ধরে জাউ-টাউ খেয়ে আছে। তাও পাচ্ছে না। তিন-চারদিন কিছুই পাচ্ছে না। এ কিস্তিটা তাদের মধ্যে চারিয়ে দেব।'

'চালের জন্য কত টাকা দিয়েছে সুলেখা তোমাকে?'

'চাই নি সুলেখার কাছে আমি?'

'কেন, তাদের দেড় লাখ টাকা ব্যাঙ্কে আছে, পার্কসার্কাসে বাড়ি আছে, তাই বুঝি চাওয়া হল না তোমার ?'

'তোমার কিছু নেই। তোমার কাছে তো চেয়েছি। আমাকে যদি থাকতে বল এখানে তোমার মৃত্যু পর্যন্ত, তা হলে এ রকম চাইতে হবে অনেক বার আমায়। তা নয় তো, সুলেখার কাছে টাকা চেয়ে, তোমার কাছে রাতে-রাতে নিরিবিলি বৃত্তান্ত বর্ণনা করে, তোমার মৃত্যু পর্যন্ত পঁচিশটা বছর কাটিয়ে দিতে হবে জলপাইহাটিতে আমার ?'

অর্চনা ঘুমোচ্ছিল, জেগে ঘুমোচ্ছিল, ঘুমিয়ে জাগছিল—আধা শোয়া অবস্থায়। তেমনি ভাবেই জামরুল বন, জাম বন পেরিয়ে গেল তার চোখ; কোথাও লগ্ন হল না—দূর থেকে—দূরতার দিকে—আকাশ নয়—শূন্য নয়—কেউ থামাতে পারে না তাকে। তবুও ঘুমের ভিতর ককিয়ে ওঠে সুমনা, খেপে যায়। ঘুমিয়ে পড়ে আবার।

অর্চনার দিকে তাকিয়ে আছে হারীত। কী করে টের পেল অর্চনা, সে তো এ সব সময় পেরিয়ে চলে গিয়েছিল স্রোতের ভেতর—সৃষ্টির সনাতন সময়ের। উঠে বসল অর্চনা।

'আমার ঘুম একেবারে ভেঙে গেছে,' অর্চনা বললে, 'এই রাতের বেলা বেশ ঘুম আসে। খোকা আর উনি ফিরেছেন টের পেয়েছ ?'

'না তো। কোথায় গেছেন মহিমবাবু ?'

'কলেজের ছেলেরা একটা থিয়েটার করছে। রাত দশটার আগে ফিরবেন না হয় তো। এখন কটা রাত ?'

'সাতটা হয় তো। কলেজে থিয়েটার হচ্ছে। অবনী খাস্তগিরের লেকচার আছে মতিজেদ হলে। রাত-বিরেতে সাহাপট্টির থেকে চামারপট্টি, চামারপট্টি থেকে সাহাপট্টি, পায়ে হেঁটে মেরে দিতে হচ্ছে আমাকে। বাইরের দিকে তাকালে মনে হয় মফস্বল শহরটা যেন চিতে নিবিয়ে খেংড়াখেংড়ির শ্মশানে থুবড়ি খেয়ে পড়ে আছে রাত দুপুরে। কিন্তু তবুও বেশ জম-জম করছে, বেশ মরে বেঁচে আছে টাউনটা, যাই বল তুমি অর্চনা। মরতে-মরতেও যে-জিনিস মরে না সেটাকে খুব ভাল লাগে আমার, খুব ভাল লাগে বাঁচাতে সে জিনিসকে —আশার আলোয় লক্ষ্মীমন্ত করে তুলতে।'

'উনি আর আমি কলকাতায় চলে যাব, মাথায় ঢুকেছে তোমার ?'

'উনি কাজ নিয়ে কলকাতায় গেলে তুমি যাবে না ?'

'উনি কলকাতায় যাবার আগে তুমিই তো জলপাইহাটি ছেড়ে চলে যাবে হারীত ?'

'কোথায়, পরলোকে ?' বলতে-বলতে উঠে দাঁড়াল হারীত।

'উঠলে ?'

'হ্যাঁ, বেরিয়ে পড়ছি আমি। সারা রাত আমার কাজ অনেক দিকে আজ। বাড়ি ফেরা হবে না আজ রাতে আর। তোমাদের ঘরদোর বন্ধ করে এসে মার কাছে একটু বসে থাকো তুমি। আজ রাতে মার সঙ্গেই শুয়ো। তোমার কর্তা ফিরে এলে তাঁকে সেটা বুঝিয়ে বলবার দরকার হবে না,' জুতো আঁটতে-আঁটতে বললে হারীত, 'এক কথায়ই বুঝে যাবেন তিনি।'

হারীত অর্চনার দিকে হাসির স্বচ্ছ শুশ্রুষায় তাকিয়ে অন্ধকারের ভেতর বেরিয়ে গেল।

মিনিট পনের পরেই হারীত ফিরে এসে দেখল, অর্চনা তেমনি হাঁটু ভেঙে গুটিয়ে চুপচাপ বসে আছে। শরীরের সমস্ত সাদা শাড়িটা বাতাসে কাঁপছে উড়ছে ঃ এখুনি যেন একটা বড় পাখির মত উড়ে যাবে অর্চনা রাত্রির আকাশের অভিজিৎ, লুব্ধক, সপ্তর্ষি নক্ষত্রগুলোর দিকে।

'তুমি ফিরলে যে ?'

'পিছু ডাকলে, না ফিরে কী করি ?'

'টাকা ফেলে গেছ তো ?'

'কী করে বুঝলে তুমি ?'

'যাবার বেলায় তোমাকে টাকা নিতে দেখলাম না তো।'

'সে টাকা ট্যাঁকে বেঁধে রেখেছি ভেবেই তো রওনা দিয়েছিলাম। খানিক পথ গিয়ে দেখি টাকা নেই—'

অর্চনা একটু ঠিক হয়ে বসে বললে, 'ট্যাঁকে যে টাকা নেই তা তো আমি দেখছিলাম—'

'তুমি দেখছিলে ? কী করে দেখলে ?'

'ঐ যে সুমনাদির বালিশের নীচে নোটের তাড়া, বালিশ সরে গেছে, নোটগুলো বেরিয়ে আছে ; ঘণ্টাখানেক ধরে তো এই রকম। তোমার চোখে পড়ে নি ? তুমি যে দেখ নি, তা কী করে বুঝব আমি ?'

'আমি দেখি নি, তুমি দেখেছ। বেরিয়ে যাবার সময় আমাকে বললে হত না অর্চনা ?'

'তোমাকে কি আমি বেরিয়ে যেতে বলেছি ?'

বালিশের নীচের থেকে নোটের তাড়া খসিয়ে এনে সাজিয়ে নিচ্ছিল হারীত।

'টাকাটা গুনে দেখো।'

'আবার কি গুনব ?'

'টাকার ব্যাপার, গুনে দেখবে না ?' অর্চনা মুখ আঁটোসাঁটো করে স্নিগ্ধ চোখে বললে।

না গুনে নোটের তাড়া পকেটে রেখে হারীত বললে, 'সব টাকাই বাক্সে ছিল, মা যখন বিকেলে তাঁর টাকাটা ফিরিয়ে দিতে বললেন, তখন সব টাকাই বের করেছিলাম, মার টাকা মাকে দিয়ে চালের টাকাটা বালিশের নীচে রেখে দিয়েছি।'

'বেরুবার সময় কী ভেবেছিলে ?'

'ভেবেছিলাম টাকা সঙ্গে নিয়েছি।'

অর্চনা হেসে বললে, 'এ রকম ভুল বড়-বড় বিষয়ী মানুষেরও হয়। মনটা এলোমেলো হয়ে থাকলে এ রকম হয়।'

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে এলোমেলো হয়ে উঠল বুঝি আমার মন ? বেশ, শাস্তির সময় তো এসেছিল আজ সন্ধের সময়। জানা গেল সত্যি কী। তোমার সঙ্গে তো স্থির সম্বন্ধই পাতানো হল। তারপরেও এলোমেলো হয়ে থাকে কী করে আমার মন ?'

'একটা কথা হারীত—'

'কী, বলো ?'

'সত্যিই তোমার-আমার স্থির সম্বন্ধ—'

অর্চনাকে থেমে যেতে দেখে হারীত বললে, 'তোমার সুমনাদির কাছে যা পেলাম না, সুলেখা যা আমাকে দিতে পারবে না, তার চেয়ে স্থির।'

'স্থির ?' অর্চনা চারিদিকে একবার তাকিয়ে বললে, 'রাত হয়েছে, কেউ কোথাও নেই। চলো আমার ঘরে—সেখানে বেশি অন্ধকার।'

কিন্তু হারীত নিজের ঘরেই বসে রইল। হারীতকে বসে থাকতে দেখে বসে রইল অর্চনা।

'আমার ভাঙা শরীরটাকে একটু তালি মেরে ঠিক করে দেবে তুমি ?' হারীত বললে, 'জলপাইহাটিতে ছোটখাট নানা রকম কাজে আমাকে সাহায্য করবে— টাকার সাহায্য চাই না, পরামর্শ দেবে তুমি। যদি বল আমাকে, তা হলে এক বছর পেরিয়ে গেলেও এখানে থাকব আমি—তুমি বলছ থাকব— কেন দরকার তা জিজ্ঞেস করব না—এই সব স্থিরতা।'

হারীতকে নিয়ে নিজের অন্ধকার ঘরে যেতে চেয়েছিল অর্চনা। বোকার মতন চেয়ারে বসে থেকে বেকুবের মত কথা বলছে হারীত। সমস্ত মন গ্লানিতে ভরে গেল অর্চনার; উঠে চলে যেতে ইচ্ছা করছিল; কিন্তু চুম্বকে আটকে আছে যেন তার প্রকৃতির দৃঢ় মিহি সব স্নায়ু এই ঘরেরও অন্ধকারের ভেতর। কিন্তু যে-আলো এসেছিল, আস্তে-আস্তে কেটে যেতে লাগল, মনের অস্তিত্ব ফিরে পেতে-পেতে আর-এক রকম ভাবে ভাল লাগল তার। নিস্তার অনুভব করে, শান্তি অনুভব করে, তবুও সৃষ্টির অন্ধকারের অন্তর্লীন সোমরসের দিকে আর-এক বার তাকিয়ে অর্চনা বললে, 'কে জানবে আমাদের সম্বন্ধের কথা ?'

'কাউকে জানাবার দরকার নেই। নিশীথবাবুকে জানাতে চাও অর্চনা ?'

'তাঁকে চিঠি লিখে দেব ?'

'সেটা দরকার মনে কর ?' ঘরের ভেতর হাঁটতে-হাঁটতে হারীত বলল।

অর্চনা কিছু ক্ষণ সুমনার দিকে তাকিয়ে রইল। কী রকম অকাতরে ঘুমুচ্ছে। কী মনে করে নিশীথ সেনকে বিয়ে করেছিল এক দিন এই স্ত্রীলোকটি— হারীতের জন্ম দিয়েছিল ?

'না,' অর্চনা বললে, 'নিশীথবাবুকে জানাবার মত আশ্চর্য কিছু ঘটে নি তো। কোনো দরকার নেই তাঁকে জানাবার।'

'আশ্চর্য জিনিস ছাড়া তিনি আর-কিছু জানতে চান না ?'

'তাঁর ছেলের শরীর সারিয়ে দেব, তাঁর ছেলেকে বলে কয়ে এক-আধ বছর জলপাইহাটিতে রেখে দেব, এ শুনে খুশি হবেন তিনি। কোনো সংবাদ দিয়ে তিনি তো আমাকে খুশি করেন নি, কেন খুশি করতে যাব তাঁকে আমি। নাঃ, এ নিয়ে তাঁকে চিঠি লিখব না আমি,' অর্চনা বললে, 'এ রকম ব্যাপার নিয়ে নিশীথবাবুকে চিঠি লিখে তাঁর কাছে নিজেকে সুমনাদির মত ভাল মানুষ বানিয়ে তুলে কোনো লাভ নেই।'

হারীত টের পেল অর্চনার সঙ্গে যে-স্থির সম্বন্ধ ঠিক করেছে সে, সেটাকে অর্চনা

সম্বন্ধ বলে স্থির বলে মনে করে নিতে পারছে না, স্থিরতর কিছু চায়, জিনিসটার নিজের গুণের জন্যেই খানিকটা হয় তো, খানিকটা নিশীথ সেনকে আহত করবার জন্যে। খানিকটা সুলেখাকেও ব্যাহত করবার জন্যে হয় তো। তেমন স্থির জিনিস অর্চনাকে দিতে পারবে কি হারীত?

হারীত জুতোর ফিতে খুলতে-খুলতে বললে, 'আজ রাতের কাজটা থাক, আজ থাক। কী বল অর্চনা?'

'কেন, সাহাপট্টির দিকে যাবে না?'

'ইচ্ছে করছে না। শরীরটা ভাল লাগছে না', হারীত বললে।

'এই তো বেশ বেরিয়ে পড়েছিলে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শরীর খারাপ হয়ে গেল?'

হারীত জুতোর ফিতে খুলে জুতো দুটো ঠেলে সরিয়ে রেখে বললে, 'কাল রাত একটার সময় বাড়ি ফিরেছি, সকাল বেলার থেকে রাত বারটা অব্দি ঢাউস ঘুড়ির নাটাইয়ের মত পাক খেয়েছি চামারপট্টি, কামারপট্টি, সাহাপট্টি, চকবাজার, খ্যাংড়াখেংড়ির শ্মশান—অনেক জায়গায়। নানা রকম সুরাহা হয়েছে কাল। কিন্তু ঘুম হল না আর রাতে।'

'দিনের বেলা ঘুমুলে পারতে আজ।'

'গেলুম সুলেখাদের ওখানে।'

'তোমার মায়ের পাশ দিয়ে শুয়ে পড় এখানে হারীত। খেয়েছ?'

'বাতিটা জ্বেলে দেবে?'

বাতি জ্বেলে সলতেটা ডিম করে তেপয়ের ওপর রেখে দিয়ে অর্চনা বললে, 'কী খাবে তুমি?'

'পেঁপে দিয়েছ তো তুমি। সেটা কেটে খাওয়া যাবে কিছু, গরম দুধ খাব এক পেয়ালা। এখন নয়, রাত দশটা-এগারটায়। বসো তুমি।'

'টেম্পারেচার ওঠে তোমার মুখে আজকাল কিছু?' নিজের জায়গায় বসে পা গুটিয়ে নিয়ে অর্চনা বললে।

'উঠত রোজই। একশ, একশ পয়েন্ট চার, ছয়। তবে বগলে ওঠে নি।'

'কাল তো সারারাত বাইরে ছিলে, দেখলে কখন?'

'থার্মোমিটার আমি সঙ্গে নিয়ে ফিরি।'

'তুমি তো কাজে ঘোর। থার্মোমিটার তো না শুয়ে-বসে নেওয়া যায় না।

কাজের ধাঁধাঁয় ঘুরতে-ঘুরতে থার্মোমিটার জিভে সাঁটাবার ফিকিরটা কী তোমার হারীত ?'

'দেখে নিই টুক করে !' হারীত অল্পে সেরে দিয়ে বললে, 'পরশু জ্বর হয় নি। পরশু রাতে বাড়ি ছিলুম আমি।'

হারীত একটু ভেবে বললে, 'বাবাকে লিখে দিতে পার; তোমার ছেলের শরীর মেরামত করে দিচ্ছি আমি'—অর্চনার দিকে তাকিয়ে হারীত বললে, 'কিন্তু কোনো ভেলকি না ঘটলে বাবাকে তো তুমি চিঠি লিখবে না : এ চেয়ারে তো বাবার বসবার কথা ছিল, আমি বসে তোমার সঙ্গে কথা বলছি এর চেয়েও বড় ভানুমতীর খেলা চাও তুমি ?'

বলে হারীতের মনে হল অপূর্ণ কথা বলেছে সে, কথাটাকে সম্পূর্ণ করে দেওয়া উচিত ছিল। অর্চনা হারীতের থেকে তিন-চার বছরেরই বড় নয় শুধু, এক শতাব্দীর বড় যেন ; কী করে সে তৃপ্ত হবে সম্পূর্ণ জিনিস ছাড়া ? কিন্তু তবুও যে-কথাটা বলেছে সে, সেটাকে চাপা না দিয়ে অর্চনার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, কী বলে সে তাই শুনবার জন্যে। তাকাতে-তাকাতে হারীতের মনে হল ভেঙে যায়, বদলে যায়, নতুন হয়ে ওঠে সব, অর্চনার চেয়ে হারীত নিজেই বড় যেন ; হয় তো এক শতকেরই ; দিদিমার মত মনে হয়েছিল অর্চনাকে এক সময়, তার পর মাসির মত, বোনের মত, তার পর কেমন নাতনির মত মনে হচ্ছে, শিশুর মত তাকিয়ে আছে, থই পাচ্ছে না যেন পৃথিবীতে, কী ভয়াবহ সরল দৃষ্টিতে সুমনার দিকে একবার, হারীতের দিকে একবার, তাকিয়ে দেখছে। মনটাকে ঝাড়া দিয়ে বাস্তব পৃথিবীতে হারীত ফিরে এল ; ঠিক আছে ; অর্চনা ঠিকই আছে। দিদিমা, মাসিমা, নাতনি নয়—নিজের প্রতিভা ফিরে পেয়েছে অর্চনার মুখ, দৃষ্টি, আঁচল, কাল বেণীর খোঁপা তার।

'আমি চেয়েছিলুম তুমি বরাবর এখানে থাকবে।'

'বরাবর ? আমার কলকাতার বিপ্লবের কাজগুলো কে করবে তা হলে ?'

'কলকাতায় গিয়ে বিপ্লব করবার কোনো দরকার নেই তোমার।'

'কেন ?'

'ও-সব জিনিসে কিছু হয় না কোনোদিন। বুখারিন, বরোডিন, কামেনেভ, রাইকভ তো মাঝপথে সরে গেল। স্ট্যালিন শেষ পর্যন্ত রইল, কিন্তু আমেরিকা বোমা দিয়ে সমস্ত রাশিয়া শেষ করে ফেলবে, না, রাশিয়া সমস্ত আমেরিকাটাকে

উৎখাত করে দেবে এতেই এসে দাঁড়াল তো সব বিপ্লব। ওতে নেই, কিছু নেই।'
হারীত শার্টের পকেট থেকে নোটগুলো বের করে খাটের তোশকের নীচে ঠেলে দিতে-দিতে বললে, 'পলিটিকসের কথা বলো না তুমি। ও-সব তোমার মুখে শুনতে চাই না। সমস্ত পলিটিকসের থেকে তোমাদের কাছে আসি, ওরা যা পারে না, তুমি তাই দিতে পার বলে। তুমি তা দিতে পার বলে বরাবর জলপাইহাটিতে থাকব আমি।'
হারীত দরজার ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে চোখের স্নায়ুগুলোকে একবার ঘুরিয়ে এনে ঘরের ভেতরে ছেড়ে দিল, স্নায়ুর অতীত দৃষ্টির আলোর ভেতর।
'বাবা আর ফিরে আসবেন না জলপাইহাটিতে।'
'এ কলেজে তিনি আর কাজ করবেন না। আসতে পারেন তোমার মাকে নিয়ে যেতে। কলকাতায় চলে যাবার সময় আমাকে বলেছিলেন, সুমনাদি যদি মারা যান তা হলে শ্রাদ্ধশান্তি করতে এখানে ফিরতেও পারেন তিনি, নাও পারেন।'
আকাশের একরাজি শান্ত নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে হারীত বললে, 'আশ্চর্য, আমি দেখেছি তো, তোমরা পরস্পরকে কী রকম শ্রদ্ধা করতে। তার পরে কী করে একজনকে ফেলে আর-একজন এ রকম ভাবে চলে যায়। বাবা তো তুখোড় রসিক মানুষ, জ্ঞানীও, জ্ঞানপাপীও—বোকা তো নয়, স্থূল ওঁচা রক্তাক্ত তো নয়—একটা আধা ভুয়ো বিপ্লবীর মত! আশ্চর্য, ফিরবেন না আর?'
'না!'
'তুমিও যাবে না, মহিমবাবু যদি কলকাতায় চাকরি পান তা হলে নিশীথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে?'
'হ্যাঁ, সোম গ্রহে মানুষ যদি থাকে, তা হলে যেতে হবে সেখানে এক দিন পৃথিবীর মানুষকে। সোম বলছি—আমি মঙ্গল বলতে চাইছিলুম হারীত।'
হারীত আকাশের তারাগুলোর দিকেই তাকিয়েছিল, একটু হেসে কোথায় মঙ্গল তারাটি আছে আস্তে-আস্তে চোখ ঘুরিয়ে খুঁজে নেবার চেষ্টা করছিল এমনিই। কিন্তু জানালা-দরজা দিয়ে যে-খণ্ড আকাশ দেখা যায় তাতে সে গ্রহ খুঁজে পাওয়া গেল না।
'বাবা ফিরে আসবেন এ দেশে।'
'কে বললে?'

'আমি জানি।'

'যেন তোমাকে ট্রাঙ্ককল করে জানিয়ে দিয়েছেন হারীত.' রাতের বাতাসের ভেতর অর্চনার নিশ্বাস মিশে গেল। অন্ধকারের ভেতর এই সব মানুষের নিশ্বাস মেদুর করে রাখছে রাতের বাতাসকে; অনুভব করছিল হারীত; কিন্তু থাকছে না কিছু; দূর অন্ধকার অনন্তের দিকে চলে যাচ্ছে মানুষের নিশ্বাস, মানুষের বসে থাকা, রাতের বাতাস।

'ফিরে আসবেন এ দেশে।'

'কে?'

'নারকেল গাছে বাজকুড়ুল পাখি ডাকছে। শুনছ অর্চনা?'

'শুনেছি। কটা পাখি?'

'দুটো।'

'অনেক দিন থেকেই ওদের ডাক শুনছি।'

'একশ বছর বাঁচে। এক সঙ্গে থাকে।'

'একশটা শীত ঋতু? খুব গভীর তো হারীত।'

'খুব গভীর।'

'যাবে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে তুমি?'

'কে, আমি?' হারীত বললে, 'না। আমি আছি এখানে।'

'এক বছর? তার পর?'

'তার পরেও থাকব।'

'কত দিন থাকবে? বাজকুড়ুলের মত এক শ বছর?' অর্চনা হাসতে-হাসতে বললে।

'মা আজকের রাতের মতন ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

'তোমার চোখে আলো লাগছে। বাতিটা নিভিয়ে দিই। এই যে নিভিয়ে দিয়েছি।'

'এখন বেশ অন্ধকার। শান্তি।'

চার দিক ঘিরে অন্ধকার, মাইলের পর মাইল, পৃথিবীতে মৃত্যু ঘটে প্রতিফলিত হয় যে অমৃত্যুর দূর অপৃথিবী লোকে, সেই নিবিড় নিস্তব্ধতা ও শান্তি।

'এখন ঘুমোও—আমি চললাম—'

'কোথায়? ওরা তো কেউ আসে নি। আজ রাতে আসবে না।'

'হারীত,' অনেক ক্ষণ পরে অর্চনা বললে।

'আর এক বছর কেটে গেল?'

'হ্যাঁ, বাজকুড়ুল ডাকছে। যেন একশ বছরের ভেতর চলে গেছি আমরা।'

রাত আড়াইটায় মহিমবাবু আর তাঁর ছেলে ফিরে এলে, সুমনার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে, তাকে ঘর-দোর বন্ধ করতে বলে, অর্চনাকে জানান দিয়ে, বেরিয়ে গেল হারীত সাহাপট্টির দিকে।

টেরই পেল না সুমনা, কোথায় চলে যাচ্ছে হারীত। আটটা সাড়ে আটটার সময় ঘুমের থেকে জেগে উঠেছে তো সুমনা, তার পর খেয়েদেয়ে ওষুধ খেয়ে রাত দুটো-আড়াইটে অব্দি ঘুমিয়ে, একটু জেগে, আবার ঘুম পেয়ে গেছে তার। কী বলছে হারীত, কোথায় যাচ্ছে, ঘুমের চোখে, জ্ঞানচেতনারও কেমন একটা বিহ্বলতায় বুঝে উঠতে পারছিল না কিছু সুমনা। হারীত চলে গেল। অর্চনা দুটো দরজা একটা জানালা আটকে দিয়ে, বাতাসের আসা-যাওয়ার জন্য দুটো জানালা খোলা রেখে, চলে গেল। খেয়ে এসে সুমনাদির সঙ্গে সে শোবে।

'হারীত আজ রাতে আর ফিরবে না এই কথাই তো বলে গেল অর্চনা! 'বলে গেল না?' জিজ্ঞেস করল সুমনা কেমন যেন অজ্ঞানে আবছায়ায় ডুবে যেতে-যেতে। ব্যথা-ভর্ৎসনা-অচেতনার অন্ধকার আঁকিবুকির ভেতর স্বপ্ন দেখতে লাগল সুমনা ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে—তারপর স্বপ্নেরাও সরে গেল তার মাথা আর রক্তের ভেতর থেকে কেমন একটা জড়িবড়ির মত বহতা ঠাণ্ডার দেশে।

এ রকম চার-পাঁচ রাত কেটে গেল সুমনার, হারীতের, অর্চনার, তার পর আরো এক রাত বাইরে-বাইরেই কাটিয়ে দিল হারীত।

পর দিন বেলা বারটার সময় হারীত ফিরল। হারীতের দিকে তাকিয়ে সুমনার মনে হচ্ছিল সারা রাত কড়িকাঠে ফাঁসিতে ঝুলে, মরে, হেজে, অনেক বেলায় প্রাণ পেয়ে ফিরে এসেছে ছেলেটা।

'কোথায় ছিলে তুমি সারা রাত? এতটা বেলা?'

'খুন করে এসেছি নরেনকে, আশুকে, গনিকে, মোনতাজকে, সুজন খাঁকে।' হারীত হাসতে-হাসতে বললে।

'খুন করেছিস বেশ করেছিস, চার হাত-পা নিয়ে ফিরেছিস তো বাড়িতে। এখন একটু চান করে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়।'

'আগে রান্নাটা সেরে নিই—'

'তোমার জন্যে বসে আছে রান্না। সব হয়ে গেছে—যা এখন চট করে চান করে আয়। অবিনাশবাবুদের দিঘিতে যাস নি ; সে দূর পাল্লা। মহেশসাগর থেকে চান করে আয়।'

'কে রেঁধেছে ?'

'অর্চনা, আবার কে ?'

'কী রেঁধেছে ?'

'পাঠ মুখস্থ করে রেখেছি আমি। খেতে বসে দেখবি।'

হারীত মাথায় তেল মাখতে-মাখতে বললে, 'কেন আবার তাকে রাঁধতে বললে তুমি—'

'বলার দরকার করে না। আটটার মধ্যেও তুমি বাড়িতে ফিরলে না দেখে নিজেই তো মাছ-তরকারি বঁটি নিয়ে বসল।'

হারীত চান করে ফিরে এসে দেখল সুমনা কেমন দাঁত বার করে হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। বাতাস নেই, দু-একটা মাছি তাড়না করছে। কপালে আস্তে একটা টোকা দিতেই জেগে যাবে মা। কিন্তু থাক, জাগিয়ে দিয়ে লাভ নেই। বিশ্রাম চাচ্ছে হয় তো—পাচ্ছে হয় তো শরীর। দিন নেই, রাত নেই, কেবলই যে ঘুমিয়ে পড়ছে মানুষটা। এ জিনিস ভাল কি খারাপ, জাগিয়ে দেয়া উচিত না ঘুমোতে দেয়াই ঠিক, ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে দেখবে সে, ভাবতে-ভাবতে সন্দিগ্ধ মনে রান্নাঘরের দিকে গেল।

অর্চনা কোথায়, নেই বুঝি বাড়িতে। কিংবা গরমের ছুটিতে নিরালা দুপুরে মহিমবাবুর কবলে আছে হয় তো।

রান্না ঘরে ঢুকে ঠিকঠাক করে গুছিয়ে নিয়ে ধীরে সুস্থে খেল সে। নানা রকম জিনিস রেঁধেছে অর্চনা, নিজের পয়সা খরচ করে নিশ্চয়ই, ভাল রেঁধেছে, ঝাল কম দিয়ে ভাল করেছে ; বেশ ক্ষিধে আছে আজ হারীতের। অনেক কিছু খেল সে, খুব বেশি করে খেল। হারীতের সাড়া পায় নি অর্চনা হয় তো, ঘুমিয়ে আছে, বাড়িতে নেই বোধ হয়। অনেক ক্ষণ বসে খেল যদিও হারীত, কিন্তু তার খাওয়ার ভেতর হঠাৎ এসে পড়ল না সুমনা কিংবা অর্চনা তদারক করবার জন্যে। ভালই হয়েছে। যখন ক্ষিধে পায় একা খেতে ভাল লাগে, নিজের ক্ষিধের রাক্ষসটাকে অন্যের কাছে ফলাও করে না দেখানো ভাল ; যখন ক্ষিধে থাকে না, কেউ কাছে থাকুক, দেখুক মানুষটা কেমন কঠিন, কেমন

সাত্ত্বিক ঃ ভাবতে-ভাবতে দেবতাদের থেকে অনেক দূরে গড়িয়ে সত্যিই বেশ সেঁটে-সাপটে রাক্ষসের খোরাক খেয়ে ফেলল যেন সে।

হারীত তার ক্যাম্প খাটে তার বাবার ঘরে গিয়ে শুল—দরজা-জানালা খুলে দিয়ে এক দিককার এই বোশেখ দুপুরে পৃথিবীর নিরবচ্ছিন্ন স্বর্গচারী বাতাসের ভেতর।

একেবারে পাঁচটার সময় ঘুমের থেকে উঠে—কেমন অসাড় অনিঃশেষ ঘুম পেয়ে বসেছিল তাকে, নড়ে নি চড়ে নি, একবারও ঘুম ভাঙে নি, স্বপ্ন দেখে নি কিছু, কোনো অভাব-আক্ষেপ, ব্যথা-খিঁচ অনুভব করে নি ঘুমন্ত শরীর তার—পাঁচটার সময় ঘুম থেকে উঠে, হারীত তাকিয়ে দেখল, ক্যাম্প খাটের কাছেই তার বাবার কাঠের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে, বাঁ পায়ের ওপর জয়পুরী চটি মোড়া ডান পা চড়িয়ে দিয়ে, একটা খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে চলেছে জুলেখা। জুলেখা? কখন এসেছে? জুলেখা, তাদের বাড়িতে? হারীত চোখ রগড়াতে-রগড়াতে ভাল করে তাকিয়ে দেখছিল; হারীতের যে ঘুম ভেঙেছে টের পায় নি জুলেখা। হারীতের খাট থেকে হাত-তিনচার দূরে ক্যাম্প খাটের সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে বসে আছে। মুখের পাশের দিকটা দেখা যাচ্ছে তার; খাড়া নাক আরো খাড়া মনে হচ্ছে; খোঁপা দেখা যাচ্ছে; মুখের সামনেটা দেখা যাচ্ছে না। জুলেখা ঘুরে না বসলে হারীতের সঙ্গে চোখাচোখি হয় না।

নিশীথবাবু তো জুলেখাদের মাস্টার ছিলেন, কিন্তু তাঁর আমলেও দু-চার দিনের বেশি এ বাড়িতে আসে নি জুলেখারা। অবিশ্যি কয়েক বছর এখানে ছিল না হারীত। তখন কী রকম এসেছে না এসেছে জানে না সে। আসে নি হয়তো, আসেই নি। আজ হঠাৎ এ রকম এসে পড়েছে যে সে? কী করবে হারীত? ঘুমের নিকেশ হয় নি তার—আরো ঘুম চাইছে শরীর। ঘুমোবে? পাশে এক জন বিশেষ দরকার নিয়ে বসে আছে বলে ঘুম যদি না আসে হারীতের চোখে, তা হলে মটকা মেরে পড়ে থাকবে? জুলেখা যেন খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে একটু আলতো ঝাকুনি দিয়ে হারীতের দিকে মুখ ফেরাবার উপক্রম করল, অমনি চোখ বুজে ফেলল হারীত। চোখ বুজে সে ভাবছিল, বড় অতিথি এসেছে তার ঘরে অথচ কাছে তার কেউ নেই, সুমনা নেই, অর্চনা নেই; সামান্য একটু সৌজন্য দেখাবার জন্যেও ওরা কেউ আসতে পারল না এ ঘরে, কাছে এসে বসতে পারল না ওর—ভাবতে-ভাবতে চোখ মেলে হারীত

বললে, 'তুমি!'

'হ্যাঁ আমি। আরো ব্রোমাইড চাই তোমার হারীত?'

'ব্রোমাইড়? বড্ড বেশি ঘুমিয়ে পড়েছি আজ', হারীত বালিশের থেকে তুলে ডান হাতের ওপর মাথাটা রেখে দিয়ে বললে।

লেডিজ ব্যাগের থেকে একটা শিশি বার করে জুলেখা বললে, 'এর ভেতর ঘুমের ওষুধ আছে, ব্রোমাইডের চেয়ে অনেক ভাল, জার্মান ওষুধ, বেশ কনসেনট্রেটেড। তুমি কাল সন্ধের থেকে আজ পাঁচটা অব্দি ঘুমোলে। কিন্তু এ ওষুধ খেলে আর ডানে-বাঁয়ে না তাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকতে পারবে চার-পাঁচ দিন।'

'এতই কি ঘুমোবার দরকার তোমার জুলেখা?'

'কেন, আমার কেন? আমার কথা বলছি?'

'ব্যাগে তো ঘুমের ওষুধ সঙ্গে-সঙ্গে নিয়ে ফিরছ তুমি। নিজের জন্যে নয়? মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে বেড়াবার জন্যে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাকে ঘুমতাড়ানি বুড়ি ঠাওরালে না কি। সে হব এক দিন যখন দেখব সকলেই ঠাণ্ডা মেরে ঘুমিয়ে আছে। আজ কাল অনেকেই জেগে ঘুমোচ্ছে, ইউনিয়নে, পাকিস্তানে কোথাও কলকে পাচ্ছে না—আহা বেচারি সব!...আমি তাদের ঘুমের মাসি।'

'কলকে তোমরা আমাকে না দিয়ে ছাড়বে না জুলেখা—পাকিস্তানে যখন এসেই পড়েছি', হারীত বিছানায় উঠে বসে বললে, 'কখন এলে তুমি?'

'ঘণ্টাখানেক হল।'

'বাবা, তা হলে তো এসেছই। মার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ হয়েছে। খুব অসুস্থ দেখলাম তাঁকে। কী, অ্যানিমিয়া বুঝি? বেশি কথা-টথা বলতে পারলেন না। শুয়ে আছেন। খুব খারাপ দেখলাম তো শরীর।'

'কী কথা বললেন?'

'না, বললেন না কিছু।'

'কিছুই না?'

'এক-আধটা কথা কী বলতে গেলেন—জিভ জড়িয়ে গেল। বড্ড এলিয়ে পড়েছে শরীর দেখলাম তোমার মার। কে দেখছে?'

'মজুমদার নিজেই দেখছে।'

'ভাল ডাক্তার তো মজুমদার, এই দিককার সব চেয়ে বড় ডাক্তার—কোনো উপকার হচ্ছে না ?'

'হচ্ছে কিছু-কিছু। যা দেখেছ তুমি, এর চেয়ে খারাপ ছিল।'

'খুব তো খারাপ দেখলাম আমি,' জুলেখা খবরের কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, 'আজকের স্টেটসম্যান কিনেছিলুম। পড়েছ আজকের স্টেটসম্যান, হারীত ? পড়ে দেখ। রেখে গেলুম তোমার জন্যে। তোমার মার পার্নিশাস অ্যানিমিয়া মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, তাই বলেছে তো ডাক্তার। চেঞ্জে গেলে ভাল হত। রক্ত দেওয়া হচ্ছে।'

'খুব দরকার রক্তের,' জুলেখা ঘর-দোরের বেশি বাতাসের ভেতর শাড়ির আঁচলটা আঁট করে জড়িয়ে নিয়ে বললে, 'কে দিচ্ছে রক্ত ?'

'দিচ্ছিল তো নরেন মিত্তির। মাঝখানে তো আর-এক জনকে ঠিক করেছিলাম। আবার নরেন দেবে। আজ দেবার কথা ছিল, ডাক্তার বললেন আজ নয়, কাল নেয়া হবে।'

'নরেন মিত্তির ?' জুলেখা কেমন একটু চমকে নিজেকে সামলে নিয়ে আস্তে-আস্তে বললে, 'ছেলেটি কেমন যেন—শুনেছি।'

'আমিও শুনেছি, দেখেছিও। কিন্তু তার রক্ত পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছেন ডাক্তার। ভাল আছে, মার কাজে লাগবে।'

'বড্ড খারাপ রোগ অ্যানিমিয়া—এই পার্নিশাসগুলো মার একবার হয়েছিল। দশ-বার হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল বাবার। পুরীতে নিলেন, রাঁচিতে নিলেন, শেষে মুসৌরি পাহাড়ে গিয়ে ভাল হল।'

হারীতের দিকে তাকিয়ে জুলেখা বললে, 'নিশীথবাবু কোথায় ?'

'তিনি তো কলকাতায়।'

'সুলেখা আমাকে বলছিল। পনের-কুড়ি দিন হয় গিয়েছেন শুনলুম। কলেজ তো ছুটি হয় নি। ছুটি নিলেন প্রফেসর সেন ?'

'না, কাজ ছেড়ে গেছেন।'

কাজ ছেড়ে ? শুনেছিল জুলেখা বটে, কিন্তু অন্য লোকের কাছে। হারীতের মুখে শোনে নি, একটু বেটাল ধাক্কা খেয়ে বললে, 'ছেড়ে দিয়ে গেলেন ! হাতের

ব্যাগটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুরিয়ে সেটা টেবলের ওপর রেখে দিয়ে হারীতকে বললে, 'কোনো কাজ পেলেন কলকাতায় ?'

'না।'

'এটা ছেড়ে গেলেন কি এদেশ পাকিস্তান হয়ে গেছে বলে ? ইউনিয়নে যেতে চান ?'

'না, বোধ হয় তা নয়, ইউনিয়নে যাবার জন্যে নয়।' চার-পাঁচ বছর ধরেই কলকাতায় কাজ খুঁজছেন তো তিনি, ভাবছিল হারীত, কিন্তু মুখে কিছু বললে না। চুপ করে রইল।

'কে ভেবেছিল এ রকম পাকিস্তান আর ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন—এত সব হবে। হয়ে পড়ল তো সব। ভালই হল। অনেকে মনে করছে নিশীথবাবু ছেড়ে গেলেন, আমাদের একটু জিজ্ঞেস করে গেলেন না।'

'কী করতে তোমরা ?'

'রেখে দিতাম তাঁকে।'

'কে, তুমি আর অবনী খাস্তগির ?'

খাস্তগিরকে নিয়ে হারীতও টিটকিরি দিচ্ছে তাকে, কিন্তু মিছেই দিচ্ছে। গায়ে মাখতে গেল না জুলেখা ; ভাল মনে হেসে বললে, 'হ্যাঁ আমি, ওয়াজেদ আলি, মকবুল চৌধুরী, ইদরিশ, ইয়ুসুফ—'

জুলেখা অনেক দূরের একটা সিসু গাছের ওপরের ডালপালার ভেতর পাখি, পাতা, বাতাস, বিভুঁয়ের সূর্যোজ্জ্বল লুটোপুটির দিকে তাকিয়ে থেমে গেল।

'আমাদের চার বছর তো পড়িয়েছেন নিশীথবাবু এ কলেজে। বেশ ভাল পড়াতেন তিনি। নিশির ডাকে একটা স্নিগ্ধ তনুবাত পরিমণ্ডলের দিকে চলেছিলুম যেন সে চার বছর। ওপরের কথাটা কিন্তু নিশীথবাবুর মুখে শুনেছিলুম। ঠিক এই রকম বলেছিলেন ? না, বলতে গিয়ে অদল-বদল ভুল করে ফেললুম। আমাকে শুধরে দাও তো হারীত।'

'ঠিক আছে।'

'আজকাল তো অনেক বই কিনছি-পড়ছি—দেখছি-শুনছি। কিন্তু এই তো দু-এক বছর আগে কলেজ জীবনের যে পাট ফুরিয়ে গেল, সব চেয়ে সেইটাই ভাল ছিল। একটা পুরোপুরি জীবনবেদের মত, সে আর আসছে না।'

সেই সিসু গাছটার দিকেই তাকাল আবার জুলেখা। এ ঘর থেকে নিম, জাম,

জামরুল বনটা দেখা যায় না। তা দেখতে গেলে সুমনার ঘরে যেতে হয়। কিন্তু একটা আশ্চর্য তেপান্তর, বেশ সুন্দর সরবতি লেবুর ঝাড়, চার-পাঁচটা বৃন্তনিবিড় তালগাছ, দেখা যায় এ ঘর থেকে—অনেক দূরের উঁচু-উঁচু গাছগুলো দেখা যায়।

'একটা অন্যায় করেছেন নিশীথবাবু।'

'অন্যায় অনেকগুলো করে ফেলেছেন তিনি,' হারীত বললে।

'তোমার মাকে এ অবস্থায় ফেলে চলে যাওয়া ঠিক হয়-নি তাঁর।'

'আমার ওপর ভার দিয়ে গেছেন।'

'ভার দিয়ে গেছেন। কবে ফিরবেন ?'

'তিনি ফেরবার আগে তোমরা কলকাতায় চলে যাবে।'

হারীতের কথা শুনে জুলেখার মুখ সংকল্প সক্রিয়তায় ভরে উঠতে লাগল ; সে বললে, 'আমরা কলকাতায় যাব কে বলেছে তোমাকে ? আমরা তো মানুষদের এ দেশে থাকতে বলছি। আমাদের কথা শুনছে না, অনেকেই চলে যাচ্ছে। হারীতদা, তুমি ক-দিন থাকছ জলপাইহাটিতে ?'

'বাবা বলে গেছেন আমাকে মার শ্রাদ্ধশান্তি অব্দি এখানে থাকতে।'

হারীতের মুখে না হোক, অন্যদের মুখে এ ধরনের কথা শোনার অভ্যেস আছে জুলেখার। তবুও কথাটা সুবিধের লাগল না তার। এ রকম কথা হারীত না বললেই পারত, ভেবেছিল জুলেখা।

'নিশীথবাবুকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি,' জুলেখা বললে, 'কিন্তু আমার দুটো নালিশ তাঁর কাছে।'

বাইরে তালপাতার দিকে তাকিয়েছিল হারীত, দুটো প্রজাপতি উড়তে-উড়তে সেই সবুজ নীলিমার ভেতরে ঢুকে পড়ছিল প্রায় ; বাতাসের ঝটকায় কোথায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

'হারীতদা, তিনি স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে সত্যিই চলে গেলেন! যার সঙ্গে জীবনের পঁচিশ-ত্রিশটা বছর কাটল তাঁকে এ রকম অবস্থায় ফেলে চলে যায় বটে কেউ-কেউ, কিন্তু—চলে গেলেন প্রফেসরের মতন মানুষও। এটা কি তাঁর অপরাধ, এ দেশের অপরাধ, না কি এ যুগেরই—ঠিক বুঝতে পারছি না আমি। ঢের রক্ত, গ্লানি, বিশৃঙ্খলায় ভরে আছে এ যুগ, এ যুগে প্রফেসর সেনের মতন ও-রকম মানুষকেও হয়তো তাই এই রকম হতে হয়।'

জুলেখা আলোড়িত মুখে হারীতের দিকে তাকাল, খুব আন্তরিকতা না থাকলে মানুষের মুখ, চোখ, মূল্যবিনাশের চেতনায় নিপীড়িত হয়েও এ রকম স্পষ্ট, স্নিগ্ধ দেখায় না, মনে হচ্ছিল হারীতের।

'ঠিকই বলেছ জুলেখা, এ শতাব্দীটা ব্যাধিতে ভরে আছে, মানুষ কী করে সুস্থ থাকবে। কিন্তু তোমাদের মাস্টারমশাই স্ট্রেচারে বেড়াচ্ছেন মনে হয় না ; সমুদ্রে শোয়া অভ্যাস আছে, সম্প্রতি শিশিরে শুয়েছেন। স্ত্রীকে ছেড়ে চলে গেছেন বলে মনে হয় না। তোমাদের জলপাইহাটি কলেজটাই ওঁকে মেরেছে ; ভেতরের খবর সুলেখার কাছে জিজ্ঞেস কোরো। যে মানুষ আজীবন দর্শনের মত করে, তার চেয়েও বেশি ধর্মের মত করে একটা কলেজ সংস্থান নিয়ে কাটাল সেটা যে বাস্তবিকই কোনো সত্য দর্শন প্রস্থান নয়, তাতে ঠাণ্ডা থাকে না, মনের খাদ্য নেই, পেটের খোরাকও পাওয়া যায় না, মনের চেয়ে পেটের দাবিই বেশি হয়ে ওঠে, এত যে মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে, এই সব অধঃ-পতনের থেকে সরে পড়বার জন্য তিনি চলে গেছেন, মাকে—ডাক্তার-অর্চনা-মহিমবাবুর কাছে রেখে গেছেন ; ঠিক ফেলে গেছেন বলতে পারা যায় না।

পর দিনও জুলেখা এল।

কথায়-কথায় নিশীথের কথা এসেছে আবার।

জুলেখার দিকে তাকিয়ে হারীত বললে, 'বলতেও পার নিশীথবাবু তাঁর স্ত্রীকে ফেলে চলে গেছেন। আজীবন গোলকধাঁধাঁয় ঘুরে তার পর যখন সত্যি একটা বেরুবার পথ খুঁজে পাওয়া গেল তখন তিনি তাজ্জব কাণ্ডই করলেন, বেরিয়েই গেলেন দেশ থেকে, কলেজ থেকে, স্ত্রীর কাছ থেকে। বেরুবার পথ খুঁজে পেলেও অনেকে তো গোলকধাঁধায় ঢোকে আবার,' হারীত জুলেখার দিকে ভাল করে তাকিয়ে বললে, 'কিন্তু সেনমশাই বাজকুড়ুলের মত দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে চলে গেলেন।'

'তার মানে ?'

'মানে জীবনের একশটা বছর কেটে গেছে তার। ফুরিয়ে গেছে—ব্যস।'

'তাঁর স্ত্রীও কি গোলকধাঁধাঁর মতন ছিল ?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'বাপকে সাফাই করবার জন্যে বলছ তুমি ?'

'না, আমি জেনেই বলছি, আমি তো তাঁর স্ত্রীর ছেলে।'

'ও, দক্ষিণ সমুদ্রে যাবে পুরুষ কোড়াল, আর কোড়ালি পিছে পড়ে থাকবে। স্ত্রীরা কি গোলকধাঁধাঁর মত ?'

'সব স্ত্রীরা ?' হারীত বাঁ চোখটা প্রায় বুঁজিয়ে ডান চোখ দিয়ে জুলেখার দিকে তাকিয়ে বললে, 'না তো। তা কী করে হয়। স্ত্রী-বিদ্বেষী নই আমি। স্ত্রীলোকের প্রতি বিদ্বেষে পুরুষ মানুষকে সমর্থন করা হয়েছিল, তাই বুঝি মনে করেছ তুমি। না, তা নয়। আমি স্ত্রীলোকের ভক্ত। আমার বাবা খুব সম্ভব আমার চেয়েও বেশি ভক্ত, কিন্তু তবুও টিঁকতে পারলেন না তিনি।'

জুলেখা তার ব্যাগের ভেতর থেকে একটা কৌটো বের করে কয়েকটা খুব ছোট-ছোট পিল খেয়ে নিল।

হয় তো ক্যাকটিনা পিল খাচ্ছে, হারীত ভাবছিল। বেশ সুস্থ তো দেখায় জুলেখাকে, হার্টের একটু-আধটু অসুখ আছে হয় তো। বসে থাকে না বড় একটা, খুব দৌড়ঝাঁপ করে ; আজ গুটিয়ে বসে আছে দেখছি। না, ওগুলো ক্যাকটিনা পিল নয়, কেমন একটা সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে।

'খাবে হারীতদা ?' কৌটোটা এগিয়ে দিয়ে জুলেখা বললে।

'কী জিনিস ?'

'এলাচি দানার মত, কিন্তু আরো অনেক মসলা মেশান হয়েছে। পাকিস্তান থেকে বের করেছে। ওয়াজেদ আলি সাহেব দিলেন সে দিন।'

কয়েকটা দানা মুখে দিয়ে হারীত বললে, বেশ তো লাগছে।'

'ভাল লাগছে ? কৌটোটা রেখে গেলাম তোমার টেবিলে।'

'কেন ?'

'খাবে তুমি।'

'হ্যাঁ, তা রেখে যাও জুলেখা। স্বচ্ছন্দে। যখনই দরকার হয় খাব, বিলোব, বেশ বড় কৌটো তো। এটা রূপোর কৌটো মনে হচ্ছে।'

'জার্মান সিলভার।'

'এ জিনিস পাওয়াই তো যায় না আজ কাল। কবে কিনেছিলে ?'

'আমাকে মহম্মদ ইদরিশ সাহেব দিয়েছিলেন।'

'কে সাহেব ? ঠিক পেলুম না।'

'পাকিস্তানের এক জন বড় অফিসার। কৌটোটা নাও তুমি। ওটায় করে দানা খেতে ভাল লাগবে।'

'ইদরিশ তো তোমাকে দিয়েছিল।'

'আমি তোমাকে দিলুম।'

'কিন্তু আমি কাউকে দেব না। সুলেখাকে দিতে পারি।'

'তা হলে তো ইদরিশের কাছেই ঘুরে যাবে জিনিসটা আবার।'

'কেন ?' তেরছা চোখে একবার জুলেখার দিকে তাকিয়ে নিয়ে হারীত বললে।

হারীতর চকিত ভাবটা লক্ষ্য করছে জুলেখা ; ভেবে দেখছিল সে, সুলেখা টানে বুঝি হারীতকে ? টানুক, ভালই তো, কোনো ঈর্ষা নেই তার মনের ভেতর। নিজে কি টানে হারীতকে সে ? কী রকম টানে ? কিন্তু এ সব বিষয়ে বেশি কথা ভাববার ইচ্ছা ছিল না তার। অনেক কাজ তার হাতে ! সুলেখার মত ভাবুনে মেয়েমানুষ সে নয়।

'তা দিয়ে দিতে পারে ইদরিশকে। যে যে-রকম জিনিস দেয় সেই জিনিসই তাকে ফিরিয়ে দেবার অভ্যেস ওর। যারা নতুন, অভ্যাগত, দূরের, তাদের এটা-ওটা-সেটা না দিয়ে পারে না। যারা একটু কাছের হয়ে গেছে, কিছু দেয় না তাদের। বাপের মেয়ে ও। আমি এ বিষয়ে মায়ের মেজাজ পেয়েছি।'

'তা হলে আমি এই কৌটোটা তোমার মাকে দেব।'

'আমার মাকে ? তাঁর সঙ্গে তোমার কথাবার্তা হয় ? হাসছ কেন হারীত ?'

'কথাবার্তা হলে ভাল হত। এ কৌটোটা সুমনাকে না দিয়ে বনলেখা দেবীকে দিতাম আমি। এ বিষয়ে আমি আমার বাড়ির মেজাজ পেয়েছি জুলেখা।'

শুনে ঘাড় কাত করে হারীতের ড্যাঁটো রসিকতায় একটু গলা ছেড়ে হেসে নিল জুলেখা।

'আচ্ছা মানুষই তুমি হারীত ! নিশীথবাবুর বিরুদ্ধে আমার প্রথম নালিশটা তেমন টিঁকল না। টিঁকেছে কিছু। বৌও যদি মানুষের গোলকধাঁধাঁ হয়, তা হলেও বৌয়ের এত বড় অসুখে জলপাইহাটিতে থেকে একটা কিছু হয়ে-টয়ে গেলে তার পর তিনি চলে গেলে ভাল করতেন। কিন্তু আমার দ্বিতীয় নালিশটার কী উত্তর দেবে হারীত ?'

'কী তোমার নালিশ ?'

'এ দেশ পাকিস্তান হতে না-হতেই তিনি ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে চলে গেলেন

কেন ?'

'তোমরাও তো চলে যাচ্ছ।'

'আমরা যাচ্ছি ? কে বললে ? কলকাতায় আমাদের বাড়ি আছে তবুও যাচ্ছি না।'

'বাড়ির ভাড়াটেদের তাড়াতে পেরেছ ?'

'কেন, তাড়াতে যাব কেন ?'

'ইউনিয়নে ভাড়াটে তাড়ানো অসম্ভব। তাড়াতে পার নি, কী করে নিজেদের বাড়িতে গিয়ে থাকবে কলকাতায় ?'

'সেই জন্যেই আমরা কলকাতায় যাচ্ছি না, এখানেই থাকছি, কে বলে তোমাকে এ সব কথা? অবনীবাবুরা অর্গানাইজ করেছিলেন, আমি তো তিন দিন সে সব মিটিঙে সবাইকে বলেছি তোমরা এ দেশ ছেড়ে যেও না, বাড়িতে-বাড়িতে গিয়ে বলেছি। এত সব বলা-কওয়া, সবাইকে ধোঁকা দিয়ে কলকাতায় পালিয়ে যাবার জন্যে ? কী খাচ্ছ আজ কাল তুমি হারীত ? কোন ঘানির তেল খাচ্ছ ?'

'এত সব বলা-কওয়ার পর অবনীবাবু তো চলেছেন।'

'তিনি তো এখানকার লোক নন।'

'এখানকার লোক নন, তা হলে ওপর-পড়া হয়ে ইয়ার্কি দিতে আসেন কেন ? কে শুনতে চায় তাঁর কথা। মানুষ দেখতে চায় তার কাজ।'

জুলেখা একটু কাঁধ নাচিয়ে হেসে বললে, 'তাঁর বাড়ি, ঘর, ব্যবসা, সব ইউনিয়নে। সব ছেড়ে দিয়ে তিনি এখানে বসে থাকবেন এটা আশা করা অন্যায় ; কিন্তু এ দেশের লোক হয়ে, একটা নেতার মত মানুষ, নিশীথবাবু চলে গেলেন কেন ইউনিয়নে ?'

হারীত জুলেখার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি ও-দিক ফেরো, একটা কথা বলব তোমাকে জুলেখা।'

'বল।'

'নিশীথবাবু যে পাকিস্তান ছেড়ে ইউনিয়নে চলে গেছেন এটা আমাদের আবিষ্কার, তিনি নিজে জানলেন না যে তিনি ইউনিয়নে গেছেন, তিনি যে পাকিস্তানে ছিলেন সে ধারণাও তাঁর নেই। পাকিস্তান বা ইউনিয়ন বা কোনো পলিটিকস নয়, অন্য জিনিস তাঁকে বায়ুভূত করেছে। পাকিস্তান সৃষ্টি

হবার অনেক আগে গত চার-পাঁচ বছর ধরেই তিনি কলকাতায় কাজের চেষ্টায় আছেন। তাঁর কলেজ তাঁকে তাঁর প্রাপ্য দেয় নি, তাঁর পরিবারও তাঁকে ঠকিয়েছে, এ সব বিষয়ে শেষের দিকে তিনি খুব হৃদ্দ হয়ে উঠেছিলেন। কলকাতায় কেউ তাঁর ঢেঁকি কলে পাড় দিতে আসবে না—পড়ে থাকবে ঢেঁকিটা। এখানে বসে আমরা তাঁকে ইউনিয়নের শ্রীখোল মনে করে তবলায় চাঁটি মারছি। এ সব মানুষ আজকের পৃথিবীতে প্রাপ্য তো দূরের কথা কোনো পথই খুঁজে পান না। কী ধারণা ছিল নিজের দাবিদাওয়া সম্বন্ধে নিশীথবাবুর? দেড়শ টাকা মাইনে পাচ্ছিলেন, দুশ টাকা চাচ্ছিলেন, সাতশ টাকা দাবি করতে পারলেন না? কী দোষ হত তাতে? কিন্তু তবুও পৃথিবীর দেনেওয়ালারা সব সময়েই ভালমানুষ। তাই তাঁকে দেড়শ টাকাই দেওয়া হচ্ছিল তো; ছেলেমানুষি করে এত বড় টাকাটা ফেলে তিনি ইউনিয়নে চলে গেলেন আরো বেশি টাকা পাবার আশায়? না কি কম পেয়ে বেশি মর্যাদা চাইছেন বলে?'

'কী ঠিকানা নিশীথবাবুর?'

'চিঠি লিখবে তাঁকে তুমি?'

'এ কলেজে তাঁর জন্যে অবিলম্বেই বেশ ভাল পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা করে তাঁকে জানাতে হয়।'

'কে ব্যবস্থা করবে?'

'আমরাই।'

'তোমরা? ওয়াজেদ আলি সাহেবরা। হরিলালবাবুদের তো কলেজ।'

'সে হবে। দুশ টাকা চাচ্ছিলেন তো? সে ব্যবস্থা করা হবে। তুমি ঠিকানা দাও তো ওঁর। তিনশ চারশ পেলেই তো ঠিক হত আমাদের দেশে; ও-দেশে হলে হাজার-দেড় হাজার পাওয়া যেত, বেশিও পাওয়া যেত হয় তো। ইস, কি বিশ্রী মাইনে প্রফেসরদের।'

ব্যাগের ভেতর থেকে একটা ছোট নোট বুক আর ছোট চেকনাই আমেরিকান পেনসিল বের করে জুলেখা বললে, 'প্রফেসরদের এই রকম। আমি অনেক দিন থেকেই ভেবে আসছি অসামাজিক বেসামাজিক কাজ ইংরেজের আমলে হয়ে গেছে। এখনো যদি কর্তৃপক্ষরা কিছু না করে তা হলে মাস্টার-প্রফেসরদের খুব শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন গড়া দরকার।' নোট বুকটা কোলের ওপর

রেখে পেনসিলটা বাগিয়ে নিয়ে জুলেখা বললে, 'আমাকে ঠিকানা দাও নিশীথবাবুর—'

'কিছু হবে না।'

'কেন, মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হবে তাঁর।'

'তিনি আসবেন না আর এ কলেজে।'

'যা চাচ্ছিলেন তাই তো দেওয়া হবে তাঁকে।'

হারীত কোনো উত্তর দিল না, নোটবুক-পেনসিল ধরে খুব বিশেষ আগ্রহে বসেছিল জুলেখা, কিন্তু ঠিকানা জানাবার মত কোনো তাগিদ ছিল না হারীতের।

'সত্যিই আসবেন না?'

'অর্চনাকে বলে গেছেন আসবেন না আর।'

'অর্চনা কে?' জিজ্ঞেস করল জুলেখা, 'ও, বুঝেছি, চিনি আমি।'

'প্রফেসর ঘোষালের স্ত্রী।'

'হ্যাঁ, জানি,' জুলেখা বললে, 'ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করতে হয়। কলেজ তা করছে না বলেই এই সব হচ্ছে।'

'কলেজের গভর্নিং বডিতে তুমি গিয়েছ না কি জুলেখা?' হারীত বললে, 'মনে হচ্ছে কলেজ কমিটিতে ঢুকেছ তুমি। কর্তৃপক্ষের কানে কিছু জল ঢুকবে তুমি থাকলে।'

জুলেখা মাথা নেড়ে বললে, 'ওয়াজেদ আলিরা আছেন। তাদের দিয়ে একটা কিছু করানো যেতে পারত। না, আমি নেই কলেজ কমিটিতে। ঢুকে পড়তে পারা যায় হরিলালের এক জন নমিনি হয়ে, কিন্তু সে রকম ভাবে গিয়ে কোনো লাভ নেই, হাত-পা বাঁধা থাকবে। কেমন পেটে-পেটে কচ্ছপের মত যেন হরিলাল, পিঠের খোলা চিড়িয়ে রোদে আরাম খাচ্ছে, পাশে-পাশে গুগলি শামুকদের নিচ্ছে সব, হিমাংশু চক্কোত্তি, অন্তিম দত্ত। গার্জেনদের প্রতিনিধি হয়ে ঢুকতে পারা যায় কলেজের গভর্নিং বডিতে, কিন্তু?' জুলেখা একটু থেমে বললে, 'আমার হাতে এমনিই ঢের কাজ, ও-দিকে যাব না আমি আর'—হারীতের দিকে তাকিয়ে জুলেখা বললে, 'ঠিকানাটা তবু তুমি দাও আমাকে।'

'লিখতে পারবে না তাঁকে যে আমার কাছ থেকে ঠিকানা পেয়েছ।'

'ক্ষ্যাপা তুমি হারীত, সে কথা সেধে তাঁকে লিখতে যাব কেন?'

হারীত চোখ ছোট করে নিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে ভাবতে-ভাবতে বললে, 'মনে পড়ছে না ঠিকানা, সুলেখাকে জিজ্ঞেস করো তুমি, সে জানে।'

'তুমি জান না? চিঠি লেখেন না তোমাকে নিশীথবাবু?'

'না।'

'তুমি লেখ না তাঁকে?'

'না। কী লিখব?'

'অর্চনা লিখছে?'

'বুঝতে পারছি না।'

'অর্চনার কাছে চিঠি এসেছে তাঁর?'

'দেখি নি তো? চেন তো তুমি অর্চনাকে! মুখ চেনা শুধু? না কি মেলামেশি হয়েছে বেশ?'

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে জুলেখা বললে, 'শুনেছি অর্চনা নিশীথবাবুকে খুব শ্রদ্ধা করে। কিন্তু নিশীথবাবুর বিশেষ কোনো ভাব নেই স্ত্রীলোকটির ওপর।'

'শুনেছ?'

জুলেখা শুনেছে, আরো অনেকে হয় তো, কিন্তু সে নিজে বিশেষ কিছু শোনে নি অনুভব করে আস্তে-আস্তে বললে হারীত।

'শুনেছি তো। কাদের কাছে শুনেছি সেটা তোমাকে জানাতে পারি, কিন্তু জানবার আগ্রহ নেই তোমার।'

খুব আস্তে-আস্তে কথা চলছিল তাদের। ইচ্ছে করে নয়, চেষ্টা করে নয়, স্বাভাবিকভাবে নিচু ঠাণ্ডা গলায় জুলেখা কথা বলে, তেমনি গলায় উত্তর পাচ্ছিল হারীতের কাছ থেকে।

'অর্চনা মাসি বাবাকে শ্রদ্ধা করে এটা আর এমন-কি আশ্চর্য ঘটনা জুলেখা।'

'অর্চনা—মাসি বল না কি তাকে তুমি?'

'হ্যাঁ, অর্চনা মাসি বলে ডাকি।'

'কেন, বেশি বয়স তো নয় অর্চনার। তোমার সমান তো অর্চনা। না তোমার চেয়ে ছোট?'

'অর্চনা মাসি বলেই তো ডাকি আমি', হারীত মুখ ভারী করে দূর সিসুবনের দিকে তাকিয়ে বললে।

'শুধু শ্রদ্ধা করে বলেই তো নয়'—ঝাউ সিসুবনের দিকে জুলেখাও তাকাতে-তাকাতে বললে, 'অর্চনা নিশীথবাবুকে কী যেন করে—কী বলব তোমাকে হারীত—জিনিসটা একটু আশ্চর্য ঠেকেছে অর্চনার কাছে।'

কাঠের চেয়ারটা ছেড়ে দিয়ে, নিশীথবাবুর একটা ভাঁজ করা ক্যানভাসের ডেক চেয়ার খুলে, দামি শাড়ির আঁচল দিয়ে ক্যানভাস ঝেড়ে নিয়ে, জুলেখা বললে, 'বসো তুমি এখানে হারীত। কিছু ক্ষণ বসো তুমি এখন ওটায়, পরে দরকার হলে আমি বসব।'

'আমি এখন তোমার চেয়ারটাতে বসছি জুলেখা।'

ডেক চেয়ারটাকে তেপান্তর মুখে ঘুরিয়ে নেওয়া হল, চেয়ারটাকেও খানিকটা, কিন্তু তবুও প্রায় মুখোমুখিই বসল দু-জনে। প্রায় আড়াআড়িভাবে মুখোমুখি।

'অনেকের কথা বলছ। অনেকেরই চোখে পড়েছে বাবা আর অর্চনার ব্যাপার?'

'খুব বেশি ছড়িয়ে পড়ে নি হারীত, তবে ব্যাপারটা একটু দশ কান ঘুরেছে বটে।'

'সুলেখা শুনেছে?'

'জানি না আমি। কিন্তু এমন তো কিছু খারাপ জিনিস নয়, অর্চনা ভাল-বেসেছে নিশীথবাবুকে—দরজাটা আবজে দিচ্ছ কেন? কেউ আড়ি পাতবে?'

'না, ও-ঘরে মা শুয়ে আছেন।'

'ঘুমুচ্ছেন তো তিনি।'

'পাতলা ঘুম, মার কান খুব পরিষ্কার। আরো ও-দিকে অর্চনা মাসিরা আছে।'

'তাদের কান খুব নিশপিশ বুঝি, এতদূর থেকে শুনে ফেলবে? কানের চেয়ে মনের টেলিপ্যাথিই বেশি, দরজা আটকালে কী হবে—'

'দরজাটা তবুও খিল এঁটে আটকে ডেক চেয়ারে ফিরে এসে বসল জুলেখা।

'দরজা বন্ধ করে ফেললে?'

'আবজে রেখেছিলে তো তুমি। খুলতে দেবে না যখন—ভেবে দেখলুম একে-বারে আটকে ফেললেই ঠিক হবে।'

'আমি একটা সিগারেট খাব। অর্চনা মাসি ভালবেসেছে নাকি বাবাকে?'

'সেটা মাসিকে জিজ্ঞেস করো। আমি যা শুনেছি তাই বলছি।'

টেবিলের দেরাজের থেকে সিগারেটের বাক্স-দেশলাই বের করে নিয়ে হারীত

বললে, 'নাম খারাপ হয়েছে নিশীথবাবুর এ জন্যেই।'

'নিশীথবাবু তো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে চলে গেছেন।'

'ইউনিয়নে চলে গেলেই মানুষের সুনাম বাড়ে?' সিগারেট ঠোঁটে আটকে নিয়ে হারীত মুখের আনাচে-কানাচে ভেঙে একটু হেসে বললে। সিগারেটটা পকেটে রেখে দিল সে, রেখে দিল টেবিলের ওপর দেশলাইটা, বাক্সটা।

'ইউনিয়নে চলে গেছেন, ভুলে গেছে মানুষ। তা ছাড়া এতে নাম-খারাপের কী আছে। একটু ঘুরপথের মানুষ নিশীথবাবু। ভালবাসেন। কিন্তু কাকে ভালবাসেন বোঝা কঠিন। হয় তো যাকে ভালবাসেন, সে নারীকে দেখেন নি এখনো। না-দেখে আপসোসও নেই, খুব অশান্তিও নেই মনে, বিশেষ শান্তিও নেই। যাকে ভালবাসে, সে পুরুষকে দেখেছে বটে অর্চনা; সোজাসুজি চলেছে, কাজ করেছে, কথা বলেছে। কেমন লাগে অর্চনাকে তোমার হারীত?'

হারীত আকাশের চার-পাঁচটা সাদা ঝলমলে উড়ন্ত বকের দিকে তাকিয়ে, সেগুলো অনেক দূরে প্রায় মিলিয়ে গেলে, জুলেখার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললে, 'আমাকেও তো ভালবাসে অর্চনা।'

'তোমাকেও? অর্চনা?'

'বাবার মতন অতটা নয়, কিন্তু', হারীত শব্দ খুঁজে পাচ্ছিল না।

'আমি বুঝেছি হারীত, তোমাকে ভালবাসে তোমার বাবার কান টেনে তাঁর মাথাটাকে খুঁজে বার করবার জন্যে', জুলেখা হাসতে লাগল।

'সেই জন্যে?' হারীত চোখের সামনে, শূন্যে, এক ফিনকি রোদের ভেতর এক আধটা মাছির ওড়া-উড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'ও-ছাড়া এমনিই টানে; এমনিই টান আছে।'

'আছে। কিন্তু কী মূল্য—কী রকম—পেতে চাও তুমি তোমার মাসির কাছ থেকে?'

'আমার মাসি নয়।'

'অর্চনামাসি তো।'

'ডেকেছি তাকে মাসি আমি, কিন্তু আজকাল আর ডাকি না।'

'ডাক না? এই তো খানিক আগে বলছিলে ওকে। আমার সঙ্গে খেলা

চলেছিল কথা চেপে রেখে ?' জুলেখা খানিকটা নিভৃত হয়ে বললে, 'চেপে রাখলেই ভাল করতে হয় তো হারীত, কিন্তু তুমি তো সব বলে ফেল।'

অনেকটা দূরে একটা গাছের কোটরে একটা পেঁচাকে নিয়ে কাকগুলো মেতে উঠেছে, সে দিকে চোখ ফিরিয়ে জুলেখা বললে, 'অর্চনাকে ভাল লেগেছে তোমার ; এ ঘাটে, সে ঘাটে, তার ঘাটেও কথা বাঁধছ হারীত ?'

কাকগুলো উড়ে চলে যাচ্ছে, নিজের নীড় খুঁজে পেয়েছে ঠোকর-খাওয়া পাখিটা হয় তো ; দেখছিল দু-জনে।

'তা হবে,' হারীত বললে, 'কথা যদি বেনেতি হয়, তা হলে বেনেতি জিনিসের মতই তার চার দিকে ঝরতি-পড়তি হবে।'

পকেট থেকে সিগারেট বার করে টেবিলের থেকে দেশলাই হাতড়ে নিয়ে জ্বালতে গিয়ে না-জ্বালিয়ে হারীত সরিয়ে রাখল দেশলাই, পকেটে সিগারেট রেখে দিল।

'সিগারেট খাবে ?'

'তুমি বসে আছ তো সামনে।'

'ওঃ, বসে আছি,' জুলেখা একটু হেসে বললে, 'এ সব ধুনোর গন্ধ রপ্ত হয় নি বুঝি অর্চনা মাসির ? কিন্তু সুমনা মাসির ছেলে তো চাঁদ সদাগর'—

'চাঁদ তো বটেই,' হারীত হেসে বললে, 'কিন্তু ধুনোর গন্ধে কিছুই বলে না সনকা। তুমি মিছেই বদনামটা করলে জুলেখা।'

জুলেখা একটু ঠাট্টা করে বলতে চেয়েছিল, অর্চনা কালী মনসার মত ; হারীত অর্চনাকে একেবারে সনকা বানিয়ে ফেলেছে তাই। হারীতের কথাগুলো কানেই গেল না জুলেখার—উম্মার কথা বলেছে হারীত, অন্তরের থেকে নয়। উপলব্ধি করে, অবিচলিত মনে বাইরের অনন্তব্রহ্মাণ্ডের ওপর দিনের আলোর অসৎ আবরণীর দিকে সোজা সাদা চোখে তাকিয়ে রইল জুলেখা।

'খেলে না সিগারেট ?'

'না।'

'আমি বসে আছি—তাই ?'

'না, এমনিই ইচ্ছে করছে না।'

'মনসা আর চাঁদের কথা বলছিলাম—একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে ?'

'হ্যাঁ, সনকার কথা পেড়ে আমিই ছেড়েছিলাম। কিন্তু, জিনিসটা ও-রকম ঠিক

নয়। কী রকম—তুমি বুঝবে জুলেখা। শেষ পর্যন্ত তোমাকেই সব কথা বলি —আর কাউকে নয়।'

'অর্চনার কথাটা বল নি ?'

'কাকে ? সুলেখাকে ?' বাইরে তালপাতার ব্যজনের শব্দ হচ্ছিল, আকাশ-বাতাস তালবৃন্তের দিকে হারীত চোখ চালিয়ে নিয়ে বললে, 'না।'

'অর্চনাকে বলেছ সুলেখার কথা ?'

'ভাবে-প্রকারে বুঝে নিয়েছে কিছু হয় তো, আমি খুলে বলি নি।'

নীল তালপাতাগুলোর দিকে জুলেখা তাকিয়ে ছিল, শুনছিল কেমন বাতাসে নড়ে-চড়ে পাতাগুলো দিকবিদিকের কথা বলে, দৃষ্টি ঘরের ভেতর ফিরিয়ে এনে, আবার বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে বললে, 'কী চায় তোমার কাছে অর্চনা ?'

'সে আমাকে এখানে থাকতে বলে।'

'বেশ ভাল কথাই তো। আমরাও তো সবাইকে থাকতে বলছি। কিন্তু অর্চনা শুধু তোমার বাবাকে থাকতে বলেছিল, তিনি চলে গেলে তোমাকে শুধু থাকতে বলছে। আমাদের মিটিং-ফিটিঙে আসে না তো অর্চনা। ইউনিয়নে যেও না, পাকিস্তানে থাকো, পাকিস্তানে কাজ করো, ঠিক এটাই যে তার লক্ষ্য আমার তা মনে হয় না।'

'মৃত্যু পর্যন্ত সে এখানেই থাকবে ঠিক করেছে। আমাকেও থাকতে বলছে ; আর সঙ্গে-সঙ্গে থেকে কাজ করতে বলছে।'

'মৃত্যু পর্যন্ত ?' জুলেখা ভুরু তুলে হেসে বললে, 'এ বড় দুর পাল্লা দাবি, যাই বল হারীত। কে কবে মরবে—পঁচিশ-ত্রিশ-চল্লিশ বছর পরে'—বলতে-বলতে গম্ভীর হয়ে হারীতের দিকে তাকিয়ে জুলেখা বললে, 'ঠিক বলেছে অর্চনা। যেন দেখেছি আমি সব মনে হয়, তোমাদের মৃত্যু হল, তার পর আমার মৃত্যু হল এই জলপাইহাটিতেই।'

শুনে কেমন যেন লাগল হারীতের, বললে, 'জিনিসটাকে তুমি বড় বাড়ের ভেতর নিয়ে চলেছ।'

'অর্চনার খেইটা তো বড় হারীত। তার চেয়ে বড় ভাবছি তাকে ?'

'না, ওরটা বড় নয়, যে-রকম হাত ছড়িয়ে তুমি মেঘনার এ পার ও-পার ধরছ—সে রকম নয়, অন্য রকম। তোমারটা বড়।'

জুলেখা একটু হেসে বললে, 'আমারটা বড় ? কে-কে আর আমার বড় চৌহদ্দির ভেতর ? অর্চনার একেবারে ছোট, তারই-বা কে আছে ?'

সাঁই-সাঁই সোঁ-সোঁ শব্দ হতেই হারীত আর জুলেখা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, অনেক ওপরে মেঘেরও ওপরে, যেন কী রকম বিদ্যুতের গতিতে অসংখ্য পাখি। হয় তো হরিয়াল, বুনো হাঁস, নানাশির, মরালী, ছুটে চলেছে।

পাখিগুলো শূন্যে মিলিয়ে গেলে জুলেখা বললে, 'আমার মনে হয় অর্চনা তোমার বন্ধুর মত নয় হারীত।'

'কী করে বলছ ?'

'আমি টের পাচ্ছি।'

'পাখিদের মত বুঝি ?'

'কুবাতাস দেখতে পায় তারা দূর থেকে বুঝি ?'

'হ্যাঁ, সে আকাশ ছেড়ে দিয়ে চলে যায় তারা।'

'তুমিও ছেড়ে দিয়ে চলে যাও হারীত।'

হারীত দুটো বোলতার আপ্রাণ ওড়াউড়ি ছোটাছুটির দিকে তাকিয়েছিল। এক বার ঘরে ঢুকে বাতাসে উৎক্ষিপ্ত হয়ে হয় তো, এমনিই, বিদ্যুতের গতিতে সমস্ত ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা যে-পথ দিয়ে ছুটছে-ঘুরছে সে সব স্থান নির্দেশ করে যদি আলোর রেখা টেনে দেয়া যেত, তা হলে আশ্চর্য বিদ্যুতের আঁকি-বুঁকিতে সমস্ত ঘরটা কী রকম ঝলমল করে উঠত। বাইরে ছুটে যাচ্ছিল বোলতাগুলো, সরবতি লেবুর ঝাড়ের ভেতর ঢুকে সাঁ করে করমচা বনের দিকে —তেপান্তরের পানে।

'মেয়েমানুষের কর্তৃত্বপ্রীতি নিয়ে সে তোমাকে আত্মস্থ করেছে হারীত। যে-সব ছেলেরা দূর বিদেশ থেকে অবসন্ন হয়ে ফিরে আসে তারা মাকেই আগে ভালবাসে, বন্ধুকে পরে। সুমনা মাসি বিশেষ কেউ নয় নিশীথবাবুর কিংবা তোমার জীবনে। অর্চনা অনেকটা দ্রৌপদীর মত হতে চাচ্ছিল নিশীথবাবুর, হতে পারে নি ; অনেকটা মায়ের মত সে তোমার, তবুও মুনির বৌটি অনেকটা অহল্যার মত, হারীত।'

বোলতাগুলো তেপান্তর থেকে, করমচা বন থেকে, সরবতি লেবুর ঝাড়জঙ্গলের ভেতর থেকে, অনির্বচনীয় হলুদ জিনিসের মত ঝট করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে আবার ; কিন্তু বোশেখের পড়ন্ত বিকেলের শেষ আলো-বাতাসের

ভেতর বসে থেকে প্রকৃতির সে সব ছোট্ট শ্রীমতীদের দিকে ফিরে তাকাতে গেল না এবারে আর হারীত ; যে-মেয়েটি তার ঘরের ভেতরে এসে বসেছে সে সব সময়ই এখানে বসে থাকবে, সব সময়ই তাকে কাছে পাওয়া যাবে, মনে ভেবে হারীত নিজের চিন্তার ও প্রকৃতির আলো-নিরালোর ভেতরে চলতে-চলতে জুলেখার থেকে অনেকখানি দূরে যেন সরে গিয়েছিল ; তাড়াতাড়ি ফিরে এসে জুলেখার কথা শেষ না হতে—তার ঠোঁট-মুখ-চোখের ইঙ্গিত, জিহ্বা ও দাঁতের পরিষ্কার নির্ঝরের মত উচ্চারণের দিকে, শরীরের দিকে মেয়েটির, বিমুগ্ধ হয়ে ঝুঁকে রইল যেন খানিক—তার মনের ভেতরে প্রবেশ করতে-করতে।

জুলেখা তাড়াহুড়ো করে কথা বলবার দরকার অনুভব করে নি, যদিও কাজের মানুষ সে। এখন, কাজের মানুষ ও অবসরের মানুষ একই সঙ্গে, একটি মধ্য-রাত্রির নক্ষত্রের মত, অকৃত্রিমভাবে।

কথা শেষ করে থেমে থেকে জুলেখা হারীতের দিকে তাকাল ; বিকেল শেষ হয়ে আসছে, এ যুগের জীবনও বিকেলের বড় ছায়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

'অর্চনা আমার চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড়, তুমি আমার চেয়ে ঠিক যেটুকু দরকার ততটুকু ছোট। আমাদের দেশে পুরুষের সঙ্গে মেয়েমানুষের সম্পর্কের দিক দিয়ে অর্চনার চেয়ে তুমি ভাল জায়গায় দাঁড়িয়ে ভাল কথা বলছ। তোমার কথা ভাল লাগছে আমার।'

যে-বোলতাগুলো প্রকৃতির ভেতর হারিয়ে গেছে তাদেরই এক-আধটা হুল যেন হারীতের কথার ভেতর জুলেখাকে বিঁধবার জন্যে, হয় তো নিজের মনের সব চেয়ে আন্তরিক কথাগুলো হুলেবিষে জড়িয়ে পড়ে হারীতের এমনিই ভেবে দেখছিল জুলেখা।

'তোমার মা কে, চিনেছ তো তাকে তুমি ?'

হারীত সচকিত হয়ে জুলেখার দিকে তাকাল। সুলেখার ঈষৎ মোলায়েম নাকের তুলনায় কী তীব্র উন্নত নাক জুলেখার, থুতনি কড়ির মত সাদা, কঠিন। কিন্তু স্নেহগুণ সব সময়ই ছিল, বাইরের বাতাস পেয়ে আস্তে-আস্তে স্নিগ্ধই হয়ে উঠছে। কেমন বিচিত্র বিতিকিচ্ছিরি কথা প্রয়োগ করবার পরও কী রকম আশ্চর্য সরসতা ; পৃথিবীর সব দিকেই তো রাত এখন—তবুও যেন ভোর হল এমনই আলোকপ্রসবী আলোর মতন মুখ।

'মাকে চিনেছি জুলেখা। কিন্তু চোদ্দ-পনেরতে এই মাকে তো পাওয়া উচিত ছিল আমার। এখন বয়স আমার ত্রিশের কাছাকাছি, অর্চনারও কাছাকাছি ত্রিশের, কী করে পাব আমি অর্চনাকে?'

শুনে কোনো কথা বললে না জুলেখা। কথা বলবার কোনো আয়োজন নেই তার হৃদয়ে—কেমন একটা অস্পষ্ট ঝোঁক লেগে ছিল জুলেখার মুখে—স্বাভাবিক হয়ে গেছে চোখমুখ—বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে।

'আমাকে পথ দেখিয়ে দিতে হবে,' হারীত বললে।

'আমার হাতে কোনো পথ নেই।'

'পাকিস্তানে আমার এক বছর থাকার কথা ছিল। অর্চনা বলেছিল আরো অনেক দিন থাকতে। কিন্তু ইউনিয়নে যাদের আমি জড়ো করেছিলাম তারা তো ছিটকে পড়বে চার দিকে, আমি এত দিন এখানে পড়ে থাকলে। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে। সেখানে গিয়ে—দশ-পনের বছর পরে সফল হলেও—এখন থেকেই কাজকর্মের আয়োজন করতে হবে আমাকে।'

'তা হবে। কিন্তু নিশীথবাবু সরে যেতে না যেতেই যা ফেঁদেছ তোমরা দু-জন—আগে তার মীমাংসা না হলে কী করে বিপ্লব করবে তুমি।'

'আমার বিপ্লবে আসবে তুমি?'

'কোথায়? ইউনিয়নে? না, আমি এখানকার মানুষ, আমি কোনো বড় রেভল্যুশনের প্রয়োজন দেখছি না এখন, কংগ্রেসও তা চাচ্ছে না।'

'আমি কম্যুনিস্ট নই।'

'জানি, কিন্তু আমি কংগ্রেসের। কোনো মরণান্ত রেভল্যুশনের দরকার দেখছি না আমরা।'

'কংগ্রেস তো পাকিস্তানে থাকছে না?'

'তাই বলে ইউনিয়নে গিয়ে আমি তোমার সঙ্গে বিপ্লব করব? কেন, ও-দেশে চিঁড়ে খেতে কালীঠাকুরের দল ছাড়া আর কেউ নেই?' একটু নিশ্বাস নিয়ে জুলেখা বললে, 'তুমি ইউনিয়নে গিয়ে রেভল্যুশন করছ, আর এখানে জলপাইহাটিতে এসে যা তোমার দরকার নয়, যে-জিনিস তোমার বাবা পর্যন্ত ভয় করতেন তার ভেতর জড়িয়ে পড়ছ। তোমার মাকে চিনেছ তুমি হারীত।'

'ও-রকম অধীর হয়ে তুমি কথা বলছ, একটু থেমে থাক, ভাল করে ভেবে দেখ,' আস্তে-আস্তে বললে হারীত। জুলেখার দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ বুজতে গিয়ে, মেলে দিয়ে, মাথা নাড়তে গিয়ে অনড় হয়ে থেকে তবু হারীত বললে, 'মাকে চিনেছি আমি। কিন্তু চিনে ফেলে বুঝতে পেরেছি যে তার জীবনে যে-রকম বিপত্তি এসেছে আমার জীবনে তা তো আসে নি।'

'কেন, তোমার জীবনেই তো বেশি সঙ্কট।'

'কী করে জুলেখা?' হারীত ঘরের ভেতর পায়চারি করতে-করতে বললে। তার পর ঘাড় হেঁট করে দু-চার পা এগিয়ে দূরে একটা জানালার গরাদের কাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি তো আমার সঙ্কটে তোমার অমূল্য পরামর্শ পাচ্ছি, অর্চনা কী পাচ্ছে?'

'আমার অমূল্য জিনিস নিয়ে আমি তোমাদের বাড়ি ঢোকবার আগে নিশীথবাবুকে চিঠি লিখেছে তো অর্চনা। জান না তুমি?'

'হ্যাঁ, সব চিঠিই পাশ করে দিই আমি। কিন্তু এটা ধরা পড়ে নি,' হারীত চোয়ালের থেকে হাতের মুঠো সরিয়ে নিয়ে আস্তে-আস্তে বললে, 'কী লিখেছে?'

'লিখেছে হারীতকে নিয়ে পারছি না আমি আর, তুমি এসে একটা ব্যবস্থা করো।'

হারীত ঘাড় হেঁট করে পায়চারি করতে-করতে এক জায়গায় থেমে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে বাইরের উড়ন্ত পাখিদের সাদা-কাল-খয়েরি-খইরঙা ডানাগুলোর দিকে অবহিত হয়ে থেকে অনেকটা সময় কেটে গেলে ঘরের বেশি আবছায়ার ভেতর জুলেখার খাড়া নাকটাকে প্রথম দেখতে পেয়ে তার চোখের দিকে তাকাল তারপর।

'অর্চনার সঙ্কট হচ্ছে এই যে নিজের দায়ে সে তো আসে নি, তা সে আসতও না কোনোদিন, হয় তো নিশীথবাবুর দিকে তেমনি ভাবে গিয়েছিল, কিন্তু আমি তাকে আমার দিকে তাড়িয়ে এনেছি, কলকাতার থেকে এসে কেমন অব্যবস্থিত হয়ে ছিল জীবন যেন। সে পরে সাড়া দিয়েছে; বেশি সাড়া দিচ্ছে এখন। কিন্তু ঠিকই বলেছ—তৃতীয় পাণ্ডবের দ্রৌপদীই সে; তাদের জন্যে তৈরি হতে-হতে অর্চনার যখন উপচে উঠবার সময় তখন তারা কেউ নেই, আমি দৈবক্রমে উপস্থিত।'

বলতে-বলতে চেয়ারে এসে হারীত দু-এক মুহূর্ত বসে রইল। উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতর হাঁটতে-হাঁটতে হারীত বললে, 'কিন্তু নিজেরই পথ ধরে যা ত্রিগঙ্গা, তার ভোগবতীর জলও আমার ভাল লাগে। সে জিনিস সহজে নিজের টানে চলে আসে এ রকম কিছু—এ রকম কোনো জল'—

জুলেখা আবছায়ার ভেতর নিজের ডান হাতটা ছড়িয়ে দিয়ে সে দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'ভোগবতীর জলও—'

হারীত ফিরে তাকাল জুলেখার দিকে, জুলেখা চোখ ফিরিয়ে নিল, নীল-কালো তালপাতাগুলোর ওপর অনেক অঝোর বাতাসের দিকে—প্রকৃতির ধ্বনির নানা রকম সব আশ্চর্য নিমিত্তের পানে।

'কোনো বিবাহিত পুরুষকে কোনো দিন তোমার নিজের দিকে টেনে নিতে চেষ্টা করেছ ?'

'এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছ তুমি ?'

হারীত পায়চারি করতে-করতে জানালার কাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'তা থাকলে আমার ব্যাপারটা বুঝতে পারবে তুমি।'

'ঘরটা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।'

'বাতি জ্বালাতে হবে।'

'ল্যাম্প কোথায় এ ঘরে ?'

'মার কোঠায় আছে।'

'তা হলে দরজা খুলে ও কামরায় যেতে হবে ? থাক। এখন আটকানো থাক। আমি চলে গেলে খুলে দিও।'

'অন্ধকারে থাকবে ?'

'আমাদের তো কোনো দলিল পড়বার দরকার নেই।'

'আমার জীবনটাকে খুলে ধরেছি তোমার সামনে, অর্চনার কথা বলেছি তোমাকে, সুলেখাকে বলি নি, কাউকেই বলি নি, সুলেখার কথা বলেছি তোমাকে, অর্চনাকে বলি নি ; তোমার জীবনের পুরুষদের কথা আমাকে বললে না তো তুমি—'

'আমার জীবনে কোনো অর্চনা নেই। থাকলে কোনো জুলেখা আগাগোড়া সব নাড়ী টিপে বুঝে নিয়ে আমার জীবনে এসে পড়ত, হারীত ?'

'কারো স্বামী-টামিকে ভাঙিয়ে তোমার দিকে টেনে নাও নি তুমি, তারা এমনিই

তোমার দিকে গিয়েছে ?'

'ওরা তো বয়সে আমার চেয়ে ছোট নয়।'

'ওরা সকলেই তোমার চেয়ে বয়সে বড় বুঝি ? কিন্তু—'

'আমার চেয়ে বয়সে ছোট কোনো ভাগনে বা ভাইপো,' জুলেখা বলতে আরম্ভ করেছিল।

'বুঝেছি,' হারীত বললে, 'তাদের মাসি তুমি, যেমন অর্চনা আমার মাসি —সেই হিসেবে ভালবেসেছে। স্ত্রীলোকের মন নিয়ে ভালবাসনি সে সব পুরুষকে।'

'অর্চনার তো স্ত্রীলোকের মন তোমার সম্পর্কে ?'

হারীত বললে, 'এক-এক জন স্ত্রীলোকের মনের প্রসার খুব বেশি। সেই হিসেবে। না হলে আমি কে ?'

'তোমার কি পুরুষের মন জেগে উঠেছে ?'

তালপাতার টড়-টড়-টড়ক-টড় শব্দ হচ্ছিল আবার অফুরন্ত বাতাসের ভেতর ; বড়-বড় ছড়ানো প্রাণঘন বৃন্তগুলোর দিকে চোখ তুলে তাকাল হারীত।

'তোমার পুরুষের মন ?' জিজ্ঞেস করল জুলেখা।

হারীত চিন্তিত মুখে কিন্তু তবু যেন খানিকটা নিস্তার বোধ করে বাইরের কীট-পতঙ্গ আকাশ-বাতাসের দিকে তাকিয়ে কোনো কিছুকেই গ্রহণ না করে জুলেখার প্রশ্নের সৎ উচ্চারণের বলয়স্পর্শে বিমুগ্ধ হয়ে চুপ করে রইল।

'কে জাগিয়েছে তোমার মন তা হলে ?'

কোনো উত্তর দিল না হারীত।

চলন্ত আত্মস্থ একক মেঘের মত বেশি আলোর দিকে এগিয়ে হারীত বললে, 'সরবতি নেবুর ফুলের ভেতর কারা নিবিষ্ট হয়ে আছে সেই ভোরবেলার থেকে, দেখেছ জুলেখা ?'

'ওরা তো মৌমাছি। ওগুলো মৌমাছি নয় হারীত ?'

'হ্যাঁ, মৌমাছিই তো। এতদিন জলপাইহাটির কোলে মানুষ হয়ে তুমি মৌমাছি চিনছ না ?'

'চিনেছি তো, বলেছিই তো মৌমাছি।'

হারীত একটু হেসে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, 'কতকগুলো কালো মেঘে বাইরেটা অন্ধকার হয় গিয়েছিল, ঘরের ভেতরটা এত বেশি অন্ধকার

দেখাচ্ছিল, ভেবে ছিলাম সন্ধে হয়ে গেছে, বাতি জ্বালবার কথা বলছিলাম। মেঘগুলো সরে গেছে। বাইরে আলো কী রকম দেখেছ জুলেখা ?'
'ঘরের ভেতরেও তো আলো। এ আলো নিভে যাবে শীগগিরই। বোলতাগুলো কোথায় চলে গেল।'
বোলতাগুলো কোথায় চলে গেল খুঁজছিল দু-জনে ; কোথাও নেই বোলতা, বাতাস নেই ; ছায়া জমছে। এতক্ষণ আকাশ ছিল চার দিক ঘিরে। আকাশ মুছে যাচ্ছে। তার পর নেমে এসেছে আকাশ—সময়ের দেয়াল—যেন অনবরত দেয়াল ও অবাধ পরিসরের ভেতর দু-জনকে নিবিষ্ট করে রেখে।
এইবার অন্ধকার হচ্ছে। মৌমাছিরা উড়ে যাচ্ছে। কিন্তু মধু নিয়ে চলে গেল, ওরাই তো মৌচাক সৃষ্টি করবে। আজকাল যে সব স্টেট গড়ছি আমরা, উড়িয়ে দিচ্ছি, তার চেয়ে বেশ স্নিগ্ধ, পরিষ্কার। বেশ প্রিয় জিনিস মানুষের জ্ঞানের চেয়ে প্রকৃতির সফলতা, সাধ বেশি উজ্জ্বল হল তো—
'কোথায় উড়ে গেছে মৌমাছিরা ?'
'কালো মেঘ নেই কোথাও আর। কিন্তু তবুও অন্ধকার হয়ে আসছে।'
'এইবারে সন্ধে হল। বাতি জ্বালানো হবে ?'
'কোথায় হ্যারিকেন তোমার ? তোমার মার ঘরে ? দরজা খুলে নিয়ে আসি আমি হারীত।'
'থাক, খুলো না দরজা, বন্ধ থাক।'
'না, এখন আর আটকানো থাকবে না, আমি খুব একটা নিস্তার বোধ করছি। খুব ভাল লাগছে আমার।' জুলেখা বাতি জ্বালিয়ে নিয়ে এল।
আমাদের পৃথিবীতে অনেক দিন আগে, অনেক সাগর ঘুরে তার পর সমুদ্র প্রবাসীদের জাহাজ অন্ধকারে ধর্মাশোকের নির্জন চক্রস্নিগ্ধ সৈকতে—ঢের দূরে প্যালেস্টাইনের পাশে স্বাতী পুনর্বসু নক্ষত্রের নীচে এসে থামত। রাতের বাতাসের ভেতর বসে থেকে তেমনি একটা আশ্চর্য শান্তি অনুভব করছিল হারীত।
কিন্তু তাই বলে হারীত অতীত পৃথিবীর মানুষ নয়—আজকের পৃথিবীর অশান্তি ও অপশান্তির চেয়ে আগেকার পৃথিবীর কোনো-কোনো সময়ের শান্তি অনেক ভাল হলেও প্রবীণোত্তর কল্যাণ ও শান্তির মর্ম পাওয়া যায় কি না, ভাবছিল সে নিজের, নিকট সাময়িক পৃথিবীর জন্যে।

'আমার খুব ভাল লাগছে ; কেমন নিশব্দ হয়ে আছে মানুষের পৃথিবী এখন। মানুষ মানুষের ভাল চাচ্ছে যেন, এমনই গভীর সহানুভূতি, শান্তি, এই রাত্রির বাতাসে হারীত—'

'কোনো অতীত পৃথিবীর কথা মনে পড়ছে তোমার ?'

'অতীতে এ রকম শান্তি ছিল বুদ্ধদেবের সময়—আমাদের দেশের কোনো-কোনো জায়গায়। তারো আগে—চীনে। জেরুজালেমে—'

'এখনকার পৃথিবীর চেয়ে সে সব দেশ বিদ্যায় পিছিয়ে থাকলেও জ্ঞানে বড় ছিল, বেশি শান্তি ছিল তাই—'

'পৃথিবী তো এখন বিদ্যায়ও পিছিয়ে পড়ছে—চালাকি বেড়ে যাচ্ছে।'

'এই রকমই কি থাকবে মনে হয় তোমার ?'

'কিছু কাল থাকবে,' বাতাস ও রাত্রির অন্ধকার স্নিগ্ধতার দিকে তাকিয়ে থেকে জুলেখা বললে।

চমৎকার এই রাত্রির বাতাস। দুঃখ লোপ করা কঠিন, হয় তো অসম্ভব। কিন্তু দুঃখবাদ—হারীত অন্ধকার ও বাতাসের অক্লান্ত অমিতাভ নৈরাজ্যের দিকে তাকিয়ে রইল ; অসাধ্য সাধনের যুগ পৃথিবীর থেকে অন্তর্হিত হয়েছে কি না অবাক হয়ে ভাবছিল।

জুলেখা মনে-মনে ভাবছিল, কী অনির্বচনীয় এই রাত্রির বাতাস, আমি অদিতি যেন—অনেক দেবতার মা, হাতে অনেক কাজ আমার, আমার প্রেমিকের, আমার সন্তানদের, আমাদের পৃথিবীর।

'পৃথিবী আমাদের চেয়ে বড়, সময় আরো বড়, তবুও আমরা আছি, চিন্তা করছি, ভাল চাচ্ছি।'

স্নিগ্ধ বাতাসের ভেতর বসে থেকে নিরবচ্ছিন্ন আকাশের অনেক তারার ভেতর কাকে খুঁজছিল জুলেখা ? স্বাতীর দিকে যেন তাকিয়ে আছে হারীত ; অত বড় আকাশের পথে জীবনের অকিঞ্চিৎকর কণিকার মত স্বাতী তারাটাকে খুঁজে পেয়েছে হারীত ?

মানব সফল হতে চাচ্ছে বলেই মানুষকে সফল করবার জন্যে আছে একটা ইচ্ছা, চেষ্টা, জুলেখা বললে, 'খুব সম্ভব হাজারে এক জন কি দু-জন হলেও এটা চাচ্ছে মানুষ, আমাদের মতন এ রকম ভয়ঙ্কর পতনের যুগেও। ওরা দু-এক জন হতে পারলে বাকি আরো অনেকে হতে পারবে হারীত ?'

'অনেকে ? যা হচ্ছে তার চেয়ে বেশি হবে। দেরিতে হবে। সময় দেরি করিয়ে দেয় মানুষকে। কিন্তু সময় ঢের বড় হলে সুসময়ের সাধ রয়েছে মানুষের হৃদয়ে'—হারীত খানিক ক্ষণ চুপ করে থেকে তার পর বললে, 'সেটা খুব সম্ভব সময়ের চেয়ে বড়।'

বলে মনকে চোখ ঠার দিচ্ছে মনে হল হারীতের। মানুষের ভেতরের চেহারা তো আবছা, খুব সম্ভব সেখানে কোনো আলো নেই ; এইই বলা উচিত ছিল, সত্য তো এই। কিন্তু আজকে এ রকম রাতে জুলেখাকে এ ধরনের কথা বলতে চাইল না হারীত।

'মানুষের ভেতরের আলো ঘিরে মাছি অনেক, হারীত। আজকাল ঢের বেশি মাছি পড়ছে—'

'মাছি ?'

'হ্যাঁ। অন্ধকার হয়ে পড়ছে আমাদের এ দিনকালের মানুষদের ভেতর-বার-সব—'

'ও !' বললে হারীত।

ঘোর কেটে যাবে, তবুও, জুলেখা বললে, 'মানুষদের কথা আর বলতে গেল না কেউ তার পর—রাত্রি, নক্ষত্র, বাতাসের ভেতর বসে থেকে। বাতাস আসছে,' জুলেখা বললে, 'প্রান্তরের থেকে, প্রান্তরের ওপরের এক সমুদ্রের থেকে। কেমন গভীর, গভীর।'

'বাইরে কে হোঁচট খেল অন্ধকারে, শব্দ হল না জুলেখা ? কে মানুষ এই রাতে। কে ?' অনেক ক্ষণ পরে বললে হারীত।

'আমি নিশীথ এসেছি—ওঃ, তুমি হারীত,' ঘরের ভেতরে ঢুকে নিশীথ বললে।

'কলকাতার থেকে এলে বাবা ?'

'ভানু মরে গেছে। তোমার মা কেমন আছে ?'

'এইমাত্র মারা গেছেন,' অন্ধকারের ভেতর থেকে বললে অর্চনা, নিশীথের দিকে তাকিয়ে। মারা যাবার পর খবর হারীতকে দিতে এসেছিল সে, এসে দেখল নিশীথ এসেছে।

'জুলেখা তুমি এইখানে ?' রাস্তার দিকের দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে বললে।

'আমার খোঁজে কী করে এখানে এলে তুমি ?'

'আমার সঙ্গে ওয়াজেদ আলি সাহেবও এসেছেন। আমি তাঁকে মত দিয়েছি। কথাটা তোমাকে জানাতে এসেছি আমরা।'

'আচ্ছা, বাড়ি যাও,' জুলেখা আস্তে-আস্তে বললে, 'আমি যাব না। আমার এখন এ বাড়িতে অনেক কাজ।'

সুলেখারও এ বাড়িতে খুব কম কাজ ছিল না, কিন্তু অর্চনাকে, হারীতকে—হঠাৎ নিশীথের মতন এক জন প্রামাণিক মানুষকে, চোখের সামনে দেখতে পেয়ে হক-চকিয়ে উঠে এক কোণায় সরে দাঁড়িয়ে, তার পর আস্তে-আস্তে চলে গেল সুলেখা।

'সুলেখা ওয়াজেদ আলিকে বিয়ে করছে ?' নিশীথ জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

'আমাকেও তো বিয়ে করতে পারত,' একটু হেসে বললে নিশীথ, 'এই তো মরে গেল আমার স্ত্রী।'

'আশ্চর্য মানুষ আপনি নিশীথবাবু'—রাতের বাতাস খুব বেশি শব্দ করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ছে শুনতে-শুনতে জুলেখা খুব নিচু গলায় বললে।

নিশীথের কথা শুনতে পেল সুলেখা, দরজা পেরিয়ে অন্ধকারে যাব কি না-যাব করছিল সে। ফিরে এল।

'ওয়াজেদ আলি সাহেবকে আর রাত করতে দিলুম না। সাহেবকে চলে যেতে বলেছি। আজকেই সৎকার হবে ?' নিশীথের দিকে তাকিয়ে সুলেখা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, আজ রাত্রেই। থাকবে তুমি ?'

'হ্যাঁ, আমি আলি সাহেবকে দাঁড় করিয়ে রাখলুম না আর।'

'তা হলে আমি বাড়ি যাই সুলেখা—মা একা আছেন,' জুলেখা বললে।

নিশীথের কাছে এগিয়ে গিয়ে বসল সুলেখা, জুলেখা বাড়ি গেল না। অর্চনা দাঁড়িয়ে রইল।

এ সব জিন-পরীদের ব্যাপার দেখবার জন্য ঘরানা মেয়ে সুমনা কোথাও নেই—নিশীথ নিবিষ্ট হয়ে ভাবছিল। খুবই নিবিষ্ট হয়ে ভাবছিল—তাকিয়ে দেখল ওয়াজেদ আলি সাহেব পাশে দাঁড়িয়ে আছে নিশীথের ; সারা রাতই হয় তো ; দরকার হলে চির রাত। কে কার জন্যে থেকে যাচ্ছে সেটা বলা কঠিন, কিন্তু এরা সকলেই যেন সময়েব শেষ হিরণ্যগর্ভ রাত অব্দি রয়ে যেতে পারে এ ঘরে

—জীবনের মানে নিয়ে। সুমনাও।

নিশীথ সুমনাকে দেখবার জন্যে ভেতরে ঢুকে গেল। নিশীথের সঙ্গে-সঙ্গেই সুলেখাকে ভেতরে চলে যেতে দেখে অর্চনা বাইরের ঘরেই দাঁড়িয়ে রইল। হারীত এ ঘরে—এক কিনারে; কেমন যেন লেপটে রয়েছে জুলেখা আছে বলে—টের পেয়ে সে নীরবাসীন গাছের দিকে তাকাতে গেল না আর অর্চনা। যেন চেনা সময়ের মৃত্যু হচ্ছে অন্ধকার পৃথিবীতে; কিন্তু তবুও রাতের বাতাসে সারাৎসার তারার আলো উজ্জ্বল, চোখ বুঁজে মহিমান্বিত দার্শনিকের মত ওজাজেদ আলি সাহেব দাঁড়িয়ে।

# গল্প

# আকাঙ্ক্ষা-কামনার বিলাস

শুভেন্দু উঁকি দিয়ে বললে, 'ঢুকতে পারি কি প্রমথ ?'

কল্যাণী বললে, 'আসুন—'

প্রমথ অবাক হয়ে তাকালে।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে শুভেন্দু বললে, 'অমন হাঁ করে থাকার কিছু নেই—, ভাবছ কল্যাণীকে আমি চিনলাম কী করে ? তা চিনি হে চিনি—দুনিয়ার নানারকম জিনিসও হয়ে যায়।'

হাসতে-হাসতে আঙুল বুলিয়ে গোঁফজোড়া সাজিয়ে নিয়ে বললে, 'আগে একে মিস গুপ্ত বলে ডাকতাম—শেষবার যখন দেখা হয়েছিল তখনো, কিন্তু এখন নাম ধরেই ডেকে ফেললাম, ডাকা উচিত, আলাপ আমাদের নিশ্চয়ই এমন ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছেছে', বলতে-বলতে শুভেন্দু থেমে গেল।

কেউ কোনো কথা বলল না।

শুভেন্দু বললে, 'তুমি রাগ কর নি কল্যাণী ?'

কল্যাণী মাথা হেঁট করে ছিল।

মুখ তুলে শুভেন্দুর দিকে একবার তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল।

শুভেন্দু বললে, 'কল্যাণী যে বিরক্ত হবে না তা আমি জানতাম—কিন্তু কেউ-কেউ হয়—তাদের সঙ্গে আমিও অত গা মাখামাখি করতে যাই না। বয়ে গেছে আমার ; মানুষ আমি চিনি হে প্রমথ ; যারা বেশি-বেশি ভদ্রতা ও সামাজিকতার ভান করে, না আছে নিজেদের ভিতরে তাদের কোনো অন্তঃসার, না আছে পরের প্রতি কোনো—'

শুভেন্দু থেমে গিয়ে দু জনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কল্যাণীর চেয়ে আমি ছ বছরের বড়।'

কল্যাণী ঈষৎ লজ্জিত হয়ে হেসে বললে, 'কৈফিয়তই তো দিচ্ছেন এসে অব্দি—কিন্তু আমরা তো কেউ চাই নি তা আপনার কাছ থেকে ; আপনি ভাল হয়ে বসুন, কেমন আছেন বলুন, অনেক দিন পরে দেখা হল সত্যি, সেই—'

একটু থেমে নিয়ে সে বললে, 'একে তুমি তো খুব চেন প্রমথদা ?'

শুভেন্দু বললে, 'কিন্তু কল্যাণীকে আমি কি করে অতখানি চিনে ফেললাম সেইটেতে তোমার খটকা বাধে হয় তো প্রমথ।'

কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে শুভেন্দু বললে, 'কিন্তু প্রমথের সঙ্গে তোমার একদিনের আলাপ এত খানি ? এও তো এক আশ্চর্য !'

কল্যাণী—'আপনার সঙ্গে সাত-আট দিনের পরিচয় শুভেন্দুবাবু। কিন্তু প্রমথদাকে সাত-আট বছরের বেশি—'

শুভেন্দু কল্যাণীকে কেটে দিয়ে স্তম্ভিত হয়ে বললে, 'সাত-আট বছর ! বল কি হে প্রমথ।'

একটু পরে হেসে বললে, 'তা হলে একে সেই ফ্রক পরার সময় থেকে দেখে আসছ।'

থেমে আবার হেসে বললে, 'বেশ, বেশ ! কিন্তু প্রমথর কথা আমাকে তুমি বল নি তো কল্যাণী।'

—'আপনাকে আমি কার কথাই বা বলেছি, ক দিনই বা আলাপ আমাদের।'

—'কিন্তু প্রমথর কথা উঠতে পারত না কি ? আমাদের দু-জনেরই এমন চেনা মানুষটা।'

সকলেই চুপ করে রইল।

কল্যাণী বললে, 'এর সঙ্গে আমার কোথায় আলাপ জান প্রমথদা ?'

শুভেন্দু বললে, 'তাও জানাও নি প্রমথকে ? তোমরা দু-জনেই তো জানতে যে প্রমথর বিয়েতে আমি আসছি অথচ আমার সম্বন্ধে তোমাদের দু-জনের ভিতরে একবারও কথা হয় নি ?'

শুভেন্দু খুব অবাক হয়ে পড়ছে।

প্রমথও বিস্মিত হয়ে কল্যাণীর দিকে তাকাচ্ছে।

বাস্তবিক, শুভেন্দুর সাথে তার এত যে পরিচয়, শুভেন্দুবাবু যে তাকে চিঠিও

লেখেন একথা প্রমথদাকে কেন সে জানায় নি? বিশেষ কোনো বাধায় নয় নিশ্চয়ই, খেয়াল হয় নি বলে, মনেই ছিল না বলে, শুভেন্দুর পরিচয় বা চিঠিপত্র মনে করে রাখবার মত কোনো প্রয়োজন কল্যাণী বোধ করে নি বলে।

নিরপরাধ নিশ্চিন্ততায় প্রমথর দিকে তাকাচ্ছে কল্যাণী।

প্রমথ বুঝছে, এই মেয়েটির প্রতিটি মুখের ভাব, চোখের দৃষ্টির মানে সে জানে, সাত-আট বছর ধরে একে কেটে-ছিঁড়ে, এর সম্বন্ধে আজ সম্পূর্ণ বিশেষজ্ঞতায় পৌঁছে গেছে সে।

শুভেন্দুর সঙ্গে কল্যাণীর উড়ো পরিচয় মাত্র, উড়ো চিঠির ব্যবহার মাত্র, কল্যাণী আজও প্রমথেরই জিনিস—বুঝতে দিচ্ছে মেয়েটি।

প্রমথ পরিতৃপ্ত হচ্ছে।

কিন্তু কেন এ কামনা আজও? কেনই বা এ চিন্তাহীন পরিতৃপ্তি? চার দিকে বিয়ে বাড়ির হুলুস্থুল, মানুষেরা আজ স্থূল জিনিস ছাড়া অন্য কোনো কিছু উপভোগ করবার কোনো রুচিও বোধ করছে না, অবসরও না; সে সবের প্রয়োজনও নেই তাদের; দু-তিন সপ্তাহের ভেতরেই প্রমথের বধূ হয়ে যে-মেয়েটি এই বাড়িতে পা দেবে—এবং সমস্ত জীবন ভরে সমাধানের সার্থকতায়, সমস্যার প্রয়োজনীয়তায় ব্যাপৃত করে রাখবে তাকে, সেই সুপ্রভা, আজই হয় তো, এখনই, এক দিনের স্টিমার ট্রেনের পথের ওপারে কেমন একটা পুলক নিয়ে প্রমথের জন্য অপেক্ষা করছে।

কিন্তু এই সব কিছুই প্রমথ ভাবতে যাচ্ছে না কেন?

জীবনের যেন কোনো দায়িত্ব নেই তার।

কল্যাণী যখন আসতে চাইল এখানে, কেন তাকে নিষেধ করে চিঠি দিতে পারল না প্রমথ? মেয়েটিকে কেন এখানে সে ডেকে আনল? প্রমথের জীবনের জন্য এ তো নয়, কল্যাণী তাকে খুবই ভালোবাসে বটে কিন্তু তবুও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাকে প্রমথ অনেকবার উপেক্ষা করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত কল্যাণী একবারও সাহস পেল না, কেন পেল না? তেমন প্রেম এই মেয়েটির ছিল না বলেই হয় তো; কিংবা প্রেম, সে প্রেমও হয় তো ছিল, কিন্তু পৃথিবীর সামান্য উপকরণ নিয়ে পদে-পদে জীবনের তাড়া খেতে-খেতে দুটো প্রাণীকে অচিরে উচ্ছন্ন যাবার ভয়াবহ স্বপ্ন কল্যাণীকে হয় তো থামিয়ে

রেখেছে ; এ মেয়েটির সমস্ত ভালবাসার ভিতর দিয়েই পরিমাণবোধ জিনিসটা বেশ তীক্ষ্ণভাবে, তাজা হয়ে, চলে এসেছে ; এক-এক সময়ে এর মাত্রাজ্ঞানের অন্যায় কঠোরতায় কষ্ট পেয়ে মনে হয়েছে—বাস্তবিক এ ভালবাসে কি ?

ভালবাসে, ভালবাসে বটে, কিন্তু নিজের শরীরটাকে কোনো দিন প্রমথকে ছুঁতেও দিল না সে, প্রমথর বিয়েও সেই ঢের আগেই ঘটাতে পারলে ঘটাত—এখন ঘটছে যে সেই জন্য কল্যাণীই সবচেয়ে প্রসন্ন, নিজেও কল্যাণী সুবিধে পেলে আইবুড়ো হয়ে পড়ে থাকবে না যে এও প্রমথের কাছ থেকে গোপন রাখবার কোনো প্রয়োজন কোনো দিনই সে বোধ করে নি।

কল্যাণীর জীবনের এই তিনটি জিনিসকে প্রমথের স্বীকার করে নিতে হয়েছে—ওদের ভালবাসার সেই গোড়ার সময়ের থেকেই প্রায়।

বড় অদ্ভুত, বড় তামাসারই, তিনটি জিনিস ; ভালবাসা ঐ জীবনের সজাগ পরিমাপ দিয়ে খুব নিখুঁত করে গড়া।

কল্যাণীর এ ভালবাসাকে কোনো বিচক্ষণ মানুষ একদিনের বেশি সইত না, প্রমথও পারত না। অবোধ নয় প্রমথ, অনভিজ্ঞ নয়, অস্বাভাবিকতা অসাড়তা তিলমাত্র নেই তার ভিতর—জীবনের রগড় ও রসের প্রবল আকাঙ্ক্ষা একটি ফড়িং কীটের চেয়েও বেশি নয় তার, একটি নক্ষত্রের চেয়েও কম নয়—কিন্তু তবুও তো বেঁধে রেখেছে।

জীবনের কোনো স্থূল স্বাদই মেটাতে পারে নি কল্যাণী—কিন্তু চিন্তা ও ও কল্পনার ভিতরে কোনো অনুভূতিকেই জাগাতে সে বাকি রাখে নি ; নিজের শরীরটাকে ব্যবহারে না লাগিয়েও শরীরের আস্বাদেরও অনির্বচনীয় প্রয়োজন যে-প্রেমিকের—বুঝতে দিয়েছে তা ; সমস্ত পৃথিবীর ভিতর প্রেমিক যে এক জনেরই নাক-মুখ-ঠোঁট-চুল চায়—পৃথিবীর বাকি সমস্ত নারীসৌন্দর্য বা লাম্পট্য তার কাছে যে অত্যন্ত কদর্য কুৎসিত নিরর্থক, বুঝতে দিয়েছে তা।

এই বোধের ভিতর নিরাশ্রয় ব্যথা—অপরিমেয় অমৃত।

বিয়েবাড়ির সমস্ত ফ্যাসাদ-ঝঞ্ঝাট ফেলে রেখে কল্যাণীর সঙ্গে দোতলার একটা নিরিবিলি কোঠায় দুপুর বেলাটা তাই একটু গল্প করতে এসেছিল প্রমথ। বেদনা পাচ্ছিল, আনন্দ পাচ্ছিল! জীবনের সাত-আটটা বিচ্ছিন্ন, ইতস্তত ছড়ানো বছরের জিনিসগুলোকে কুড়িয়ে এনে এক-একটা মুহূর্তের মধ্যে

ভরে পাচ্ছিল যেন সে। এ সবের দরকার রয়েছে—মর্মান্তিক প্রয়োজন আজ ; একটা নিদারুণ কদাকার হাতির শুঁড়ের মত জীবনের ভবিষ্যতের গতিবিধিটা প্রতি মুহূর্তই যেন মাথার ওপরে দুলছে—কোথায় তাকে ছিটকে ফেলে দেয়, কল্যাণীকেই বা কোথায় ? কে কাকে কোথায় খুঁজে পাবে তার পর—জীবনের কুয়াশাবাতাসে দুজনেই হয় তো বিপরীত দিকে চলতে থাকবে অনন্ত কাল ধরে—কেউ যে কাউকে পাচ্ছে না এই বোধও একদিন থাকবে না এদের আর—এবং তাইতেই পরিতৃপ্তি থাকবে— ।

এই ভালবাসাটার দিক দিয়ে—তার নিজেরই অপরিহার্য নিয়মে এদের দুজনার জীবন এমন স্বাভাবিক ভাবেই অজ্ঞান হয়ে থাকবে এক দিন। এবং তাতে বেদনা তো দূরের কথা, কারুরই কোনো অসুবিধাও হবে না।

জীবনকে বরং ধন্যবাদই দেবে প্রমথও—মানুষকে সে এত স্থির হতে দিল বলে। কিংবা ধন্যবাদ দিতেও ভুলে যাবে হয় তো, নিজের সুস্থিরতা নিয়ে এতই আবিষ্ট হয়ে পড়বে সে। কিন্তু সে সব ঢের দূরের কথা।

কল্যাণী এখনও শূন্যতা নয়, কুয়াশাও নয়—পরিপূর্ণ মেয়েমানুষ। শুভেন্দু বরং এখন এখানে না এলেই পারত।

এই লোকটার মোটা কাণ্ডজ্ঞানের মেদ প্রমথকে···

কিন্তু কল্যাণী একে অত ভদ্রতা করে ডাকতেই বা গেল কেন ? ডেকে আনল তো, বসিয়েই বা রাখছে কেন ?

কিংবা প্রমথর কাছে যা এত প্রয়োজনের, কল্যাণী তার বিশেষ কোনো দরকারই বোধ করছে না হয় তো ; নিজেদের ভালবাসাকে—জীবনকে সে আর-কিছু মনে করে বসে রয়েছে ; কল্পনার একটা আজগুবি কিছু।

নিরর্থকতায় বিরক্তিতে জ্বালায় শুভেন্দুর আপাদমস্তকের দিকে তাকাচ্ছে প্রমথ। কিন্তু এই লোকটা থাকবেই।

কল্যাণীও তাতে অস্বস্তি বোধ করছে না। যেন জীবনের শেষ প্রয়োজনের শেষ রাত্রির নিভৃত মুহূর্তের কোনো গোপনতা নেই,—সেই মুহূর্তই নেই—সেই রাত্রিই নেই—সে-সবের কোনো প্রয়োজনই কারু কোথাও থাকতে পারে না যেন ; মানুষের জীবনের পাঠ এর একেবারেই অন্য রকম—ছেলেমানুষির টোকা দুধের গন্ধে মর্মান্তিক।

কিন্তু তবুও উঠতে পারা যাচ্ছে না।

বসেই থাকতে হচ্ছে—পুরুষমানুষ যে-বয়সে বাস্তবিকভাবে প্রথম ভালবাসতে আরম্ভ করে, এই মেয়েটিকে তখনই ভালবেসে এনে নিজের জীবনে বসিয়ে রাখবার সুযোগ পেয়েছিল প্রমথ—পুরুষের ভালবাসা যে বয়সে সত্যিই শেষ হয়ে যেতে থাকে, তার সীমানায়ও এই মেয়েটিকে সেই জায়গায়ই দেখতে পাচ্ছে প্রমথ—এই মেয়েটিকে নিয়েই প্রমথের জীবনের প্রধান ভালবাসার প্রথম ও শেষ; এর পর যে-সব প্রণয় ও আকাঙ্খা আসবে, জীবনে বিচারকে তা এত অভিভূত করে রাখতে পারবে না—কিন্তু এখনো জ্ঞান কিছু নয়; দৃষ্টি, বিচার সমস্তই আজও প্রেমের আচ্ছন্নতায় লিপ্ত হয়ে একটু রগড় করবারও সুযোগ পাচ্ছে না। এই মেয়েটাকে একটু ঠাট্টা দিয়ে বেঁধা, নিজেকে খানিকটা উপহাসাস্পদ করে দেখানো, শুভেন্দুর মত গরুর ঠ্যাংকে কল্যাণীর মত বিড়াল ছানার নিষ্কলঙ্ক নির্বুদ্ধির কাছে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার মত একটা বিস্তৃত তামাসা বোধের শক্তি—জীবনে এ সব কখনো আসে নি।

প্রেম এখনও; অভিজ্ঞতা ও কাণ্ডজ্ঞানের ভাঁড়ামি পরে।

কিন্তু হাতড়ে সে গুলোকে যদি এখনই পাওয়া যেত; হায়! কিন্তু যখন পাওয়া যাবে বহু অগ্রসরগ্রস্ত জীবনের স্নিগ্ধ রুচির ভিতর সেগুলোকে ব্যবহার করবার ইচ্ছে হবে না আর, নির্জনে নিজের মনকে দু দণ্ডের আমোদ দেওয়া চলবে মাত্র—

শুভেন্দু বললে, 'তুমি হয় তো অবাক হয়ে ভাবছ কল্যাণীর সঙ্গে আমার কোথায় আলাপ হল—এত খানিই বা কী করে হল—'

কল্যাণী বললে, 'আমি কী বলি নি তোমাকে প্রমথদা? আমার মনে পড়ছে না কিছু—'

শুভেন্দু বললে, 'আলাপ হল এদের বারাকপুরের বাড়িতে কল্যাণীর দিদি—, সুরমাদির বিয়েতে; সেখানে তোমাকে দেখি নি তো প্রমথ, প্রত্যাশাও করি নি, তোমার কথা মনেও হয় নি—হবেই বা কী করে? কল্যাণীদের সঙ্গে তোমার এত আলাপ কে বুঝবে বাবা বল?'

শুভেন্দু বললে, 'কিন্তু তুমি সুরমাদির বিয়েতে যাও নি কেন প্রমথ?'

কল্যাণীকে বললে, 'চিঠি দাও নি?'

—'দিয়েছিলাম'

—'তবে?'

কল্যাণী বললে, 'প্রমথদা বড় একটা যায় না কোথাও; দেখুন না, নিতান্ত নিজের বিয়ে, তাই রাজশাহি অব্দি যেতে হবে সশরীরে; কিন্তু বদলে যদি কাউকে দিয়ে কাজ চালানো যেত তা হলে এখান থেকে এক পাও নড়াতে পারতেন না প্রমথদাকে; দেখুন এও শেষ পর্যন্ত যায় কি না।'

শুভেন্দু হো হো করে হেসে উঠছে।

আমোদ পেয়ে বলছে, 'ও, সেই জন্য বুঝি যায় নি সুরমাদির বিয়েতে—'

প্রবলভাবে ঘাড় নেড়ে বললে, 'কিন্তু, আমি কিন্তু বাবা বিয়েআচ্ছা কভি নেই ছোরেঙ্গে। একেই তো নানা ঝঞ্ঝাটে মানুষের দুর্বিষহ জীবন, তার পর এই মুহূর্তগুলো, ভাই, বিয়েই হোক বা শ্রাদ্ধই হোক, জন্মদিন অন্নপ্রাশন চূড়োকরণ যাই হোক্ না কেন, আসবি তো বাবা চটপট এসে পড়, না সেই টিমিয়ে-টিমিয়ে-টিমিয়ে—তাও যদি প্রতিটিতে নেমন্তন্ন চিঠি পাওয়া যেত; এও এক বিভ্রাট—'

প্রমথর দিকে তাকিয়ে, 'বড় দয়া করেই আমাকে শ্রীহস্তে কিছু লিখে দিয়েছিল ভাই প্রমথ, শুভবিবাহের ফর্ম্যাল চিঠি পেলেই আমি যেন চলে আসি—'

হঠাৎ ( কল্যাণীর কাছে ) নিজের অতিরিক্ত বাচালতা আবিষ্কার করে ফেলে একটু থমকে গিয়ে বললে শুভেন্দু, 'সুরমাদিরা কিন্তু আমাকে চিঠি দেন নি।'

কল্যাণী বিস্মিত হয়ে বললে, 'সে কী?'

শুভেন্দু প্রমথর দিকে তাকিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, সুরমাদির বর আমার পিসতুতো ভাই—'

প্রমথ বললে, 'তোমারই ভাই?'

—'আপন পিসতুতো; সেই সূত্রেই যাওয়া; দাদার বিয়ের বরযাত্রী; যা মজাটাই মেরেছিলাম—জিজ্ঞেস করো কল্যাণীকে—'

অতিরিক্ত অন্তরঙ্গতায় কল্যাণী একটু অস্বস্তি বোধ করছিল হয় তো; কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না তার; একটু নড়েচড়ে বসে বললে, 'আমাকে কেন জিজ্ঞাসা, শুভেন্দুবাবু! আমাদের মেয়েমহলের স্ফূর্তির আপনারাও জানেন নি কিছু, আপনাদেরটাও, দুর্ভাগ্যক্রমে, কিংবা বড় সৌভাগ্যই বলতে হবে, আমরা উপভোগ করতে পারি নি—'

—'ঐ তো বুঝলে প্রমথ—শুনলে? কল্যাণী বলছে আমাদেরটা সম্ভোগ করবার তেমন সৌভাগ্য হয় নি তাদের, তারও হয় নি; ঠেস দিয়ে কথা বলতে

চাচ্ছে ; উদ্দেশ্য, উপহাস—তা হবে না ? সমস্ত বারাকপুর আমরা বরযাত্রী পুরুষের দল মাথায় করে নিয়ে ছিলাম না ! মেয়েরা সে সবের কী বুঝবে—'

—'থামুন, থামুন, নেহাত বিয়েটা ঠিক হয়ে গিয়েছিল বলে, নইলে আলিপুরের যে-দল এসেছিল বারাকপুরের বাগানে—'

এমনি করেই চলছে এদের কথা।

দুজনেই উপভোগ করছে প্রচুর।

পুরনো কথা মনে পড়ছে সব। দু বছর আগের স্মৃতিগুলো সমস্ত। এত দিন পরে হঠাৎ আজ সম্মিলিত হতে গিয়ে এদের মনের ভিতর কোথাও কোনো খোঁচ নেই যেন আর। কথায় আলাপে পরস্পরকে খোঁচা দিয়েও যথেষ্ট আরামই পাওয়া যাচ্ছে যেন, যেন এ উপভোগের থেকে অন্য কোনো অবান্তরের ভিতর সহসা এরা কেউ ডুবে যেতে চায় না, এরা রীতিমত পাচ্ছে।

প্রমথ অনেক ভেবেচিন্তে, বিয়ে বাড়ির ঢের ফ্যাকরা ছিঁড়ে, একটা নিরালা ঘর খুঁজে, আজ দুপুরবেলা যে-প্রয়োজনে কল্যাণীকে নিয়ে বসেছিল এসে মাত্র—সেই ব্যাপারটার আগাগোড়াটাকে একটা অনর্থক ঢঙে দাঁড় করাচ্ছে যেন কে ; কে ? কল্যাণী ? শুভেন্দু ? প্রমথ নিজে ?

কিছু বুঝে উঠতে পারা যাচ্ছে না।

চুরুটটা ? কিন্তু থাক।

কিন্তু কী নিয়ে থাকবে সে ?

এদের কথা শুনবে ?

কল্যাণীর কথাবার্তা মর্মাহত করছে না প্রমথকে—শুভেন্দুও তাকে পাগল করে তুলছে না, ওদের দু জনের ভিতর আর-যাই থাক, ভালবাসার কোনো অঙ্কুর নেই—কথা, গল্প, দুষ্টুমি ও ধাষ্টোমির বিমুগ্ধতা রয়েছে শুধু, বিমুগ্ধতা রয়েছে। কিন্তু যাই করা হোক না কেন, পরস্পরের সান্নিধ্যে থেকে পরস্পর বিমুগ্ধ হয়ে থাকছে তো এরা।

সেও এই বিমুগ্ধতাই চায়, কল্যাণীকে নিয়ে, নিজেকে নিয়ে, বিনা আড়ম্বরে এদের মত বিমুগ্ধ হয়ে পড়বার মত জীবনের সমারোহ আজ আর নেই যেন তার, কল্যাণীর সঙ্গে ভালবাসার কথা বলে জীবনের আড়ম্বর তৈরি করতে চায় সে, মুগ্ধতা পেতে চায়, দুই মুহূর্তের জন্যই, তাও হোক—তাও হোক। তার পর একটা দারুণ দায়িত্বপূর্ণ জীবনের চাপে কিছুরই সময় হবে না আর।

শুভেন্দু বললে, 'প্রথম তোমার সঙ্গে কী করে আলাপ হল কল্যাণী আমিই ভুলে যাচ্ছি।'

কল্যাণী বললে, 'আপনি তো সব সময়ই সকলের সঙ্গে আলাপ করছিলেন, আপনার প্রথম আর শেষ কোথায়?'

—'তোমাকে মিস গুপ্ত বলেও ডাকতাম, কী বেকুবি—'

প্রমথ বললে—'বেকুবি তোমার এখনই হচ্ছে শুভেন্দু।'

—'আমার?'

—'তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ।'

একটু দমে না গিয়ে শুভেন্দু বললে, 'বা, বৌদির বোনের সঙ্গে আলাপ করব না? আমি ওর জামাইবাবুর ছোট ভাই—'

শুভেন্দু বললে, 'সুরমাদির বিয়েতে তো তুমি যাও নি, গেলে বুঝতে এরা আমাদের সঙ্গে কী রকম ভাবে মিশেছে।'

—'এরা কারা শুভেন্দু?'

—'কেন, কন্যাপক্ষ?'

প্রমথ শুরু করলে, 'কন্যাপক্ষ তোমাদের সঙ্গে বিয়ের সময় যা খুশি করুক গে—' কিন্তু কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে থেমে যাচ্ছে প্রমথ—

শুভেন্দু বললে, 'যদি ওর নাম ধরে ডেকে আমি বেয়াদবি করে থাকি, উনিই বলুন।'

কল্যাণী বললে, 'আপনি আমাকে নাম ধরে ডাকলেও কিছু হবে না—তুমি বললেও কিছু এসে যাবে না; জামাইবাবু তো সবই করেন! দুষ্টুমি করে চুল ধরে টানেন, আমিও ওর গাল খিমচে দিতে ছাড়ি না, উনি পাল্টে নাক ডলে দেন, আমি তখন কানে হাত দেই, উনি তখন আমার দু গালের মাংস ছিঁড়ে ফেলেন কি আমি ওর ছিঁড়ি—'

প্রমথ স্তম্ভিত হয়ে বললে, 'সত্যি কল্যাণী?'

শুভেন্দু বললে, 'রগড়-তামাসা আমাদের পরিবারের রক্তে, মায়ের দিক থেকে পেয়েছি, ললিতদা পেয়েছেন তার বাপের দিক থেকে; ললিতদার ঠাকুর্দা, আমার দাদামশায়ের, ভাঁড়ামোতে সেকেলে নবাবের বাড়িতে তার খুব খাতির ছিল, বাস্তবিক ফুর্তি বোঝে মোসলমান—'

প্রমথ চুপ করে ভাবছে। কে সে সৌভাগ্যবান ললিত বাবু—কল্যাণীর চুল

ছিঁড়ে, গালের মাংস খেয়ে হয়, তো এর দুর্লভ শরীরটাকে অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে যদেচ্ছাক্রমে ব্যবহার করেও, এই মেয়েটির সবিশেষ ভদ্রতাবোধকে যে না পারছে বিন্দুমাত্র আঘাত করতে, না হচ্ছে একটুও কলঙ্কিত ব্যথিত, এই মেয়েটির শরীরের উপরও এমন অব্যাহত অধিকার যার, হায়, এর দেহের তুচ্ছাতিতুচ্ছ একটি রোমের রস উপলব্ধি করবার ক্ষমতাও তবু যার নাই। বিধাতা এমনই অপ্রার্থিত জায়গায় গিয়ে কি তার সুধার ভাণ্ড ভাঙেন ?

এক মুহূর্তের জন্য একটু তামাসা বোধ হচ্ছে প্রমথের। কিন্তু দিদির জামাইয়ের জায়গায়, নিজের জামাই যখন এর আসবে—ভাবতে গিয়েই প্রবল একটা কুম্ভীপাকের বেদনায় ঘুরপাক খাচ্ছে যেন প্রমথ।

স্বামীর সম্ভাবনা নিয়ে যে-কেউ আসবে নির্বিবাদে তো কল্যাণী তাকে দিয়ে দেবে, হয় তো সে এ শরীরের প্রতি এক মুহূর্তেরও লোভ না করতেই ; কিন্তু জীবনের ছ-সাতটা মূল্যবান বছরের দিন গুনে-গুনে যত আকাঙ্ক্ষা-কামনার বিলাস, কুহকের সূক্ষ্মতা ( কল্যাণীর শরীরের দিকটাই যদি ধরা যায় শুধু ), ওর জন্য জমিয়েছে প্রমথ, সমস্তই নিজের রক্তটাকে বৃদ্ধ করে ফেলছে তার, যৌবনটাকে অকর্মণ্য, জীবনটাকে নিরর্থক, আত্মাকে দিয়ে অপচয় করাচ্ছে শুধু, মাকড়সার পেটের নরম রোমের রাশ দিয়ে কুড়িটাকে গেলাচ্ছে শুধু, যে কুড়িটা মৌমাছিকে পেত, ফড়িঙকে, প্রজাপতিকে, আলোকে, আকাশকে।

এই মেয়েটার সমস্ত মসৃণ সুন্দর শরীরটাকে কবে সে মাকড়সার পেটের চটচটে সুতোর গুটিপাকানো ডিম মাত্র মনে করতে পারবে—তেমনই দুর্বৃত্ত, অশ্লীল, কদর্য, বীভৎস !

এখনো যে এর মোহ, মোহই বা বলে কেন প্রমথ, ধর্মের মত এর মাদকতা, দেবতার মত পবিত্রতা, ভগবানের রাজ্যের মত অনির্বচনীয়তা তার, প্রমথকে কল্যাণীর দেহ ধর্মোন্মত্ত করে তুলেছে ? ওর আত্মা কি ওর শরীরের চেয়েও পূজ্য ? কে বলে, এই সুন্দরকে দেখে নি সে তা হলে ! এর মুখের ওপর, ভুরুর ওপর, ঠোঁটের ওপর প্রমথ তার চোখের দৃষ্টিটাকে আবেগপ্রবণ চুমোর মত চেপে দিয়ে কতবার বলেছে প্রেম, সুন্দরের থেকে শরীরকে কী করে ছাড়াবে ? পৃথিবীর কোথায় কী হয় জানে না প্রমথ, কিন্তু কল্যাণীর সুন্দরী শরীরই ওর আত্মা, ওর মন, ওর অনুপম মোহের সৌন্দর্য দিয়ে গড়া, ভগবান, তাই দিয়েই গড়া শুধু, বিধাতা, পৃথিবীর এই একমাত্র মেয়েমানুষকে

এই রকম করে গড়েই ভাল করেছ তুমি।

কিন্তু এমন অনুভবের পরিপূর্ণ সময় চলে যাচ্ছে তার। দুটো বছর যাক, একটা বছর হয় তো, হয় তো অতদিনও না, চলে যাক, তার পর নিজের এই অপরূপ উপলব্ধির থেকে ঢের দূরে সরে যাবে সে।

এ অনুভবের অনেক খুঁটিনাটিই সে হারিয়ে ফেলবে—আবেগপ্রবণ এমন জীবন থাকবে না আর, না কামনার জন্য না ভালবাসার জন্য।

প্রেমের এই বিস্তৃত গভীর অর্থ সে হারিয়ে ফেলবে।

জীবনে প্রেম থাকবে না তখন আর; আকাঙ্ক্ষারও কোনো নিগূঢ় গাঢ়তা থাকবে না; স্থূল একটা ক্ষিদে মাঝে-মাঝে জেগে উঠে নিভে যাবে মাত্র; সৌন্দর্যকেও তখন মেদ বলে মনে হবে শুধু; সে বাতাসে ভালবাসা বেঁচে থাকতে পারে না।

যখন জীবন সব রকমেই তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল—কল্যাণীকে পছন্দ করতে গেল কেন প্রমথ?

একে ভালবাসতে গেল কেন? হায়, পরিপূর্ণ পাখিটাকে তৈরি করে পাঁকের ভিতর ফেলে দেওয়া? ফুলটাকে বিছের ডিম বিছের বাচ্চা দিয়ে খাওয়ানো?

কল্যাণীদের বারাকপুরের বিয়েবাড়ির বর্ণনা এখনো চলছে।

কিংবা কথাটা অন্য কোনো দিকে ঘুরে চলেছে হয় তো।

যাই হোক, এরা খুব ব্যাপৃত রয়েছে; সাংসারিক জীবনের আটপৌরে আঁট-সাঁটের কথায় কল্যাণী খুব সহজেই প্রবেশ করতে পারে—নানা দিক দিয়েই নিজের জীবনের আটপটা এ বেশ বোধ করে—বৈঠক যেমন ভাল লাগে এর, কাজও তেমন, ফুর্তিও তেমন, আমোদপ্রমোদও তেমন; শুধু চিন্তার মুখোমুখি হয়ে এ ছেলেমানুষ হয়ে পড়ে, ভাবতে চায় না, তেমন ভাবে অনুভব করতেও ভয় পায়, নিজেকে ধরতে পারে না, অপরকে ধারণা করতে গিয়ে পিছিয়ে যায়, চোখ কপালে তুলে ভাবতে বসলে একে বড় কুৎসিত দেখায়, বড় শূন্য; প্রমথের প্রতি কথায়ও তবু একে ভাবতে হয় যে। এর স্বাভাবিক জীবনের স্বচ্ছন্দতার চাবিও প্রমথের কাছে আছে বটে কিন্তু সেটাকে প্রমথ বড় একটা খাটাতে চায় না।

কল্যাণীর সঙ্গে বিয়েবাড়ির বা শাড়ির বা হাঁড়ির গল্প করে কী হবে? সে সব মানুষকে কোথাও পৌঁছিয়ে দেয় না।

সে ভালবাসার পথের যাত্রী—বাস্তবিক জীবনে যে-মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গম এত কম, যে মেয়েটি আজীবন বিদেশের প্রদেশে-প্রদেশেই কাটাল শুধু, কাটাবে শুধু, হাতের কাছে পেয়ে তাকে পাঁচাল করতে ভাল লাগে না, এর রূপের কথা শোনাতে ইচ্ছে করে একে, মানুষের জীবনে রূপের স্থান কোথায়, ভালবাসার সঙ্গে রূপের কী যোগ, নিতান্ত শরীরেরই বা কতটুকু ; ভালবাসার পথের পরিপূর্ণ অর্থটুকু কী, বাস্তবিক প্রেম কী-ই যে, এর সূচনা কোথায়, পরিণামই বা কতদূর, কোথায়ই বা ব্যথা তার, তার ঈর্ষা, হিংসা তার, তার শ্লেষ, দৌরাত্ম্য, দুরাচার, মাদকতা, উল্লাস, অমৃত, তারপর কুয়াশা, তার শীত, তার মৃত্যু।

জীবনের পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবিতা নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে! পরিবর্তনকে ভয় পায় কল্যাণী, এক-এক সময় কৌতূহল দিয়ে ধারণা করতে চায়—পরিবর্তনকে ও স্বীকার করে না, প্রমথের সন্দেহ ওকে কষ্ট দেয়, প্রমথের অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা, পরিবর্তন সম্বন্ধে হৃদয়হীন অতিচার, ওর কাছে বর্বরতা মনে হয় ; মুখে কিছু বলে না সে, কিন্তু প্রমথের সমস্ত মতামতের পরেও কল্যাণী তার একটি সত্যকেও ক্ষুণ্ণ করে বুঝে দেখতে কষ্ট পায়, কিন্তু তবুও সেই ফ্রকপরা খুকির থেকে আজ এই আঠার বছরের মেয়ের জীবনের যে-একটা গোপন ব্যবধান টের পাচ্ছে প্রমথ—তারই কুয়াশার নীচে-নীচে প্রমথের ইতস্তত ছড়ানো চিঠি ও কথার ছেঁড়া টুকরোগুলো জীবনের অঙ্কুর পেয়ে ফুঁড়ে উঠছে যেন, ওর মনকে আঘাত করে অনাবিষ্কৃত বিস্ময়ের মত তারই এক-একটা চমক অনুভব করতে এত লাগে প্রমথের।

কিন্তু তবুও অন্য কারো জন্য ওকে তৈরি করে দিয়ে গেল শুধু প্রমথ। ফসল যেদিন আসবে সে দিন চাষীকে আর পাবে না কল্যাণী ; যে [ ? ] আসবে কে জানে, সে এই সোনাকে কী রকম ভাবে উপভোগ করবে ; এগুলোকে আঁটিমাত্র মনে করবে, না রং, না রস, না অনুভূতি? ইঁদুর পেঁচা পঙ্গপাল গাড়ল শুয়ার মানুষ—জীবনের সঞ্চিত সোনার ছড়ার বিস্তৃত মানে এদের কাছ।

শুভেন্দু সাদাসিধে পাঁচালি নিয়ে বসেছে।

মেয়েটাকে তার দুর্বল জায়গায় হাত বুলিয়ে আটকে রাখছে। প্রমথও পাল্টা পাঁচালি পড়তে পারে—কমললোচন মোটর কোম্পানির—দুই গোছা দিয়েই শুরু করুক না, কল্যাণীকে নাড়ীর প্যাঁচের সঙ্গে বেঁধে রাখতে পারবে যেন, বৈঠক শুরু করলে শত শুভেন্দুরও সাধ্য নেই প্রমথকে হটায়—এই মেয়েটাকে

খসায় !

কিন্তু ধ্যেৎ !—ও-সবের জায়গা আলাদা, কল্যাণীর সঙ্গে আজ নয় অন্তত, এখন নয়। এই মুহূর্তের প্রয়োজন একেবারেই অন্য রকম—পাঁচালি মানুষকে যেই জায়গা দিয়ে শুরু করায় সেই জায়গায়ই রেখে চলে যায়, আজ পুলক চাচ্ছে প্রমথ, কল্যাণীকে বাছা-বাছা জায়গায় আঘাত করে চমক চাচ্ছে সে শুধু।

কিন্তু এরা বৈঠক অধিকার করে বসেছে ; নড়বে না।

নিস্তব্ধ প্রমথের দিকে কোনো খেয়ালও নেই এদের।

বিয়েবাড়ির কাজ বয়ে যাচ্ছে—কিংবা কাজ সামলাবার লোক যদি থেকে থাকে তো···তবুও, তা হলেও, এখান থেকে উঠে গিয়ে কোনো-এক বৈঠকে তাস হাতে তুলে শান্তি আছে।

ডেক-চেয়ার থেকে আলগোছে ( পেছনের দরজাটা দিয়ে ) সরে পড়ে যদি প্রমথ, শুভেন্দুও বুঝবে না—কল্যাণীও না।

# সঙ্গ, নিঃসঙ্গ

বাপের বাড়ি গিয়া এবার তুমি খুব কায়েমি হইয়া বসিয়াছ দেখিতেছি। অনেক দিন তোমাকে চিঠি লিখি নাই—বিবাহ আমাদের তিন বছরের পুরান—তিন বছর অবিশ্যি এমন বেশি কিছু সময় নয়—অনেকের বিবাহ দশ-পনের, কুড়ি-পঁচিশ, এমন-কি পঞ্চাশ বছর অবধি, নবীন ও সজীব থাকে। প্রতিদিন, অন্তত সপ্তাহের মধ্যে তিন-চার দিন, চিঠিপত্রের বিনিময় না হইলে তাহাদের চলে না।

কিন্তু তুমিও জান, আমিও জানি—ইহাদের মত যদি আমাদের জীবনের ব্যবস্থাও হইত তাহা হইলে এ পৃথিবীতে পলাইবার পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না।

এই যে দীর্ঘকাল তুমি আমার কোনো খোঁজ খবর নেও নাই, আমিও তোমাকে কিছু লিখি নাই—এই শূন্যতা আমার কাছে বড় গভীর পরিতৃপ্তির জিনিস। জীবনটাকে এই রকম নিস্তব্ধতা ও শূন্যতায়ই ভরিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে আমার। আমার কামনা কী জান? বইচি, ময়নাকাঁটা, বাবলা ফণীমনসা, বন-অপরাজিতার পাশ দিয়া এক-একটা সাদা ধুলা মাখা ভারী স্নিগ্ধ আঁকাবাঁকা গ্রামের পথ থাকে—তাহারই পাশে থাকে এক-একটা প্রান্তরের অপরিসীম নিশ্বাসের নিস্তার—সবুজ ঘাস আছে সেখানে, ঘাসের ভিতর শ্যামাপোকা আছে, দিয়ালিপোকা আছে, গঙ্গাফড়িং আছে, কাচপোকা আছে, সুদর্শন উড়িয়া আসে, হলুদ, কমলা, জর্দা নীল রঙের প্রজাপতি কাশফুলের ভিতর সমস্ত দুপুর ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বেড়ায়—কোথাও হয় তো

কতকগুলো পলাশ, অর্জুন গাছ, হিজল গাছ, উলুখড়ের জঙ্গল, মাছরাঙার ডানার শিরশিরানি, এমনই এক জায়গায়, ঘাসের নরম গন্ধের কাছে, প্রান্তরের এক টেরে বনের দেবতা অশ্বত্থ যেখানে অনেক দিন হইতে ছায়া রচনা করিয়া বাঁচিয়া আছেন, রাত্রি দিন শালিখ, বুলবুলি, কোকিল ও কাককে আশ্রয় দিয়া আসিতেছেন, সেইখানে, খড়ের একখানা ঘর তুলিয়া পড়ি, লিখি, চুরুট ফুঁকি, দিন কাটাইয়া দেই—
জীবনের ব্যবস্থা যদি আমি এই রকম করিয়া লইতাম, আমি জানি তুমি ইহাতে কোনো আপত্তি করিতে না। আমাকে নিঃসঙ্গ মনে করিয়া আমাকে তোমার সাহচর্য দিবার আকাঙ্ক্ষাও অনুভব করিতে না তুমি। নিজেকে সব বিষয়ের, অন্তত আমার সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ের থেকে বিদূরিত রাখিবার এই যে তোমার উদাস চমৎকার উন্মনস্কতা, ইহার কথা যখনই ভাবি, তখনই দ্রোণফুলের নিভৃত মধুর মত মাধুর্য আসিয়া আমার মনকে সিক্ত করিয়া দিয়া যায়—আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকি। চিলের সোনালি ডানা, ডালপালার ভিতর হইতে প্রসারিত হইয়া, উড়িয়া-ঘুরিয়া, নীল আকাশে কোথায় মিলাইয়া যায়—দেখিতে কী যে ভাল লাগে আমার!
তুমি জান কি না জানি না, কিন্তু আমি অনেক দিন হইতেই দেখিতেছি, ভালবাসিতে যদি-বা চাই, কেহ আমাকে ভালবাসুক, আমার কাছে আসিয়া বসুক, আত্মসমর্পণ করিয়া অষ্টপ্রহর আমার পরিচর্যা শুরু করুক, আমাকে অবলম্বন করিয়া নিজের মনোমায়ার সোনালি রূপালি কমলা রঙের তদন্তে সবুজ ঘাসের শরীর ও বুটিদার নীল আকাশকে ভরিয়া রাখুক, বিচিত্র অলৌকিক নিভৃত নীড় তৈরি করুক, এ সব ভাবিতে গেলে আমার বড় পীড়া বোধ হয়, পৃথিবীর শেষে পলাইয়া যাইতে ইচ্ছা করে আমার—
তোমার মনে আছে কি না জানি না, তুমি এখানে থাকিতেও আমার নিজের ঘরের ভিতর একটা জলের কলসী সব সময়ই রাখিতাম; তৃষ্ণা পাইলে নিজেই গড়াইয়া নিয়া জল খাইতাম, তোমাকে কোনো দিন জল ঢালিয়া দিতে অনুরোধ করি নাই। তুমিও অনুগ্রহ করিয়া ঢালিয়া দিয়াছ বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ইহাই আমার ভাল লাগিয়াছে। এখনো যখন মনে হয়, বুঝিতে পারি, তোমার সঙ্গ আমাকে গভীর নিঃসঙ্গতার নিস্তার দিয়াছিল; সেই নিস্তারের পথে এখনো চলিতেছি; চিরকালই চলিব। ইহার চেয়ে অনুপম

উপলব্ধি পৃথিবীতে আর কিছু আছে কি ?  অবিশ্যি, আট বছর আগের ধারণা আমার অন্য রকম ছিল।  তখনো আমি বিবাহ করি নাই।  মনে হইত বধূকে দিয়া পা টিপাইয়া লইব, কপালে চুল বুলাইয়া দিবে সে, পাখা দিয়া বাতাস করিবে—

আরো কত কী !

কিন্তু তুমি যখন আমার জীবনে আসিলে, দেখিলাম, এ সব কিছুই করিলে না তুমি ; আমিও চাহিলাম না। ধীরে-ধীরে হৃদয়ের ভিতর সাপ-খেলানো বাঁশির সুর কেমন যেন বাজিয়া উঠিল আমার।  বুঝিতে পারিলাম না, এ সুর কাহার নিকট হইতে আসে।  দিন-রাত্রির ভিতর হইতে, গ্রামের পথের প্রান্ত হইতে, উলুখড়ের জঙ্গল হইতে, আকাশ হইতে, নিস্তব্ধ অপরূপ দুপুর বেলার বুক হইতে, এ সুর কে যে পাঠায় ভাবিয়া-ভাবিয়া অবাক হইয়া যাইতাম। কিন্তু কেমন অচেনা গভীর ; বড় ভাল লাগিল আমার। কোনোদিন কাহাকেও ভালবাসিয়াছিলাম, হারাইয়া ফেলিয়াছি—এ কি তাহারই হ্লাদিনী ?  না, তা নয়।  এ তুমিও নও—আমিও নই ; এ শুধু দিন-রাত্রির গভীর রঞ্জনী ধ্বনি—অনন্ত অপরিসীমের দিকে চলিতে-চলিতে নারিকেলের পাতায়, চিলের ধবল গলায় খয়েরি ডানায়, ভোরের নৌকার রঙিন পালে, খর রৌদ্রে, মেঘনা-ধলেশ্বরীর স্ফীত স্তনের বন্যায়, মধুকূপী ঘাসে, কাশের সমুদ্রে, দ্রোণফুলের ভিড়ে, মৃতা রূপসীর ললাটের সিন্দুরে, গোধূলির মেঘে, শীতসন্ধ্যার কুয়াশায়, স্থবিরের বিষণ্ণ চোখের নির্জন স্বপ্নতন্তুর ভিতরে, তাহারা যে সুর বাজাইয়া যায়—এ শুধু তাহারই ধ্বনি।

এ সুর তোমার জীবনে আছে কী না জানি না ;  যদি না থাকে — আহরণ করিয়া লও, জীবনে এক গভীর অবলম্বন পাইবে।

চিঠিখানা এই পর্যন্ত লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। দুপুর বেলা। করমচা, কুল, কদমের জঙ্গলের ভিতর হইতে নিরবচ্ছিন্ন ঘুঘুর ডাক আসিতেছে—শুনিতে-শুনিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে হয়।  কলম রাখিয়া দিয়া অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম।  তার পর কলম তুলিয়া লইয়া ধীরে-ধীরে লিখিতে লাগিলাম আবার।

তুমি অনেক দিন হয় বাপের বাড়ি চলিয়া গিয়াছ বটে, কবে আসিবে জানি না, সেখানে কোনো এক ছন্দ নিশ্চয় পাইয়া বসিয়াছে তোমাকে, যাহা দিয়া বাকি জীবনটা কাটাইয়া দেওয়া চলে। আমিও ভাবিয়াছিলাম, যখন আমার সঙ্গে মিলিত হইলে এই রকম কোনো একটা ছন্দের পথ ধরাইয়া দিব তোমাকে—দেখিতেছি নিজেই খুঁজিয়া পাইয়াছ।

মাও এখানে নাই, তিনি কয়েক মাস হইল কাশী চলিয়া গিয়াছেন, সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন আমাদের সংসারের অবশিষ্ট নারী—আমার বিধবা বোন চারুকে। মার ইচ্ছা, চারুকে লইয়া অনেক দিন কাশীতেই থাকেন। বুড়া বয়সে কাশী থাকিবার সখ যে তাহার হইল, মন্দ হইল না ; কিন্তু এখানে বাবা রহিলেন—দিনের মধ্যে অনেক বার তাহার নানা রকম তত্ত্ব-তলবের দরকার ; অসুস্থ মানুষ, মনও খুব চিন্তিত, বুঝি না এ সব কাহাকে দিয়া করাইয়া লইব।

একটি চাকর আছে অবিশ্যি, ছোকরা, নাম অর্জুন, চেন তো তুমি তাহাকে? সে অবিশ্যি অর্জুনও নয়, শিখণ্ডীও নয়—মাঝামাঝি একটা কিছু। এক-এক সময় খুঁটিনাটি খানিকটা কাজ বেশ মন দিয়া গুছাইয়া করে ; কিন্তু তার পরেই আসে তার অবসাদের সময়, পালাইয়া গিয়া ছাতিম তলায় চাকরদের দলে মিশিয়া তাস খেলিয়া দিন উজাড় করিয়া দেয় সে, কিংবা মনসাতলায় নিরিবিলি অশ্বত্থ গাছের নীচে ঘুমাইয়া-ঘুমাইয়া চৈত্রের দিনটা সাঙ্গ করে। পূজা-পার্বণ বা কোথাও কথকতা-যাত্রা হইলে অর্জুনকে তিন-চার-পাঁচ দিনের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তার পর এক দিন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কাপড়ে ধূলায় ধূসরিত হইয়া দেখা দেয়।

আমি বলি না কিছু তাহাকে। বেচারার মা নাই, কেহ নাই ; পৃথিবীর মাটির জন্য টান রহিয়াছে ; পৃথিবীর পথে-পথে ঘুরিতে ভালবাসে সে। ঘুরুক। আমার যদি কোনো সন্তান থাকিত তা হলে এই রকম ঘুরিতে দেখিলেই ভাল লাগিত আমার—

দুই বিঘা জমির উপর আমাদের এ বাড়ির ঘর-দোরের পরিসর যে নিতান্ত কম নয় তাহা তো তুমি বিবাহের পর কয়েক মাস থাকিয়া দেখিয়াই গিয়াছ। বাড়ির এমন পড়ন্ত অবস্থা, এ পরিবারেরও, আমার তো মনে হয় দুই-তিন পুরুষের মধ্যেই সব ধ্বসিয়া যাইবে। তুমি দেখিয়া গিয়াছ, নোনা-ধরা

দেয়াল, ইট ফাটিয়া-চুরিয়া পাটকেল হইয়া খসিয়া পড়িতেছে, মেঝের ভিতর ফাটল, আগাছা, সেখানে ইন্দুরও থাকে, সাপও থাকে, জীর্ণ শীর্ণ খাট ভাঙিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে দিঘির জল পচিয়া ওঠে, বাড়ির চারিদিকে জঙ্গল, ভিতরের কোঠাগুলো ছেঁড়া-খোঁড়া ফাটা-টুটা বেওয়ারিশ জিনিসের ভাঁড়ার শুধু; যেখানে-সেখানে ছুঁচা ছোটাছুটি করিতে থাকে। হাঁটিতে-হাঁটিতে অতীত স্মৃতিকে মাড়াইয়া চলি শুধু, গলিত চন্দন কাঠের মত বিচিত্রতার আস্বাদ পাই কখনো; কখনো-বা গোখুরার ছোবলের মতই কেমন কী সব আঘাতে মানবাত্মা শুকাইয়া নীল হইয়া ওঠে যেন; ইহাদের মাঝামাঝি আরো কত অনুভূতি দিনরাত তাহাদের ছায়ার শরীর, ছবির শরীর, রেখা ও তন্তুর উজ্জ্বলতা ও অন্ধকার লইয়া বুদ্বুদের মত স্ফুরিয়া ওঠে—মুছিয়া মিলাইয়া যায়।

বিশ-পঞ্চাশ বছর পরে এ বাড়িতে কে থাকিবে, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না। বাড়ির চারিদিক ঘিরিয়া জঙ্গলের ভিতর শিয়ালে কাঁদিবে শুধু; আর ঐ পলাশের ডাল হইতে জামের শাখায়, সেখান হইতে হৃদয়ের প্রশাখায়, মেঘের রসের মত মলিন মধুর কামিনীর ঝোপের ভিতর, লক্ষ্মীপেঁচা, জোনাকি, নক্ষত্র-মাখা চৈত্র-বৈশাখের রাতের সমস্ত শিশির আলো আঘ্রাণ [করিয়া] ও অন্ধকার কুড়াইয়া লইয়া রহস্য সৌন্দর্যাবৃত এই জীবন ব্যাপারটাকে মানুষের চেয়ে ঢের সুব্যবহারে লাগাইয়া যাইবে। এই ভাঙা দরদালানের সেই শেষ অতিথিদের কথা ভাবিয়া বেশ ভাল লাগে আমার।

অনেক পুরুষের সুখ-দুখের আস্বাদ মাখানো এই প্রাচীন জিনিসটাকে তাহারা এক সুন্দর পরিসমাপ্তি দিবে।

কিন্তু সে দিন এখনো খানিকটা দূরে।

জানই তো, লোক নাই-নাই করিয়াও এ বাড়িতে বছরের চারটি মাস ধরিয়াই আত্মীয়-স্বজনের ভিড় নিতান্ত কম নয়। তুমি চলিয়া গিয়াছ, মা চলিয়া গেলেন, চারুও গেল বটে, এখনো পিসিমা আর ছোট কাকা ছিলেন, সুশীল ছোকরাটি ছিল, আমাদের রাঁধুনি হিমাংশুর মা ছিল—

ইহাদের লইয়া দিন চলিতেছিল মন্দ না।

মা চলিয়া যাবার পর হইতে রান্নাবান্নায় অবিশ্যি খানিকটা অসুবিধা হইয়াছিল —হিমাংশুর মা রাঁধিতে গিয়া একদম মশলা এড়াইয়া চলিত; বাটনা বাটিতে

গেলেও তাহার মাজায় রস আসে। কাজেই জলের মত তরকারি ঝোলের দিকে তাকাইয়া কত কী কথা ভাবিতাম, মার কথা মনে হইত, চারুর কথা, তোমার কথা—

ভাবিতাম অনুপমা আমার বধূ; সে যদি এখানে থাকিত তাহা হইলে এই জিনিস কি আর হইত? ভাল করিয়া স্বামীকে রাঁধিয়া খাওয়াইবার জন্যই যে তোমাদের জীবন সে কথা আমি বলিতে চাহি না। কিন্তু হিমাংশুর মার হাতে তৈরি ডাল, তরকারি ও কাদা ভাতের নমুনা যদি তুমি দেখিতে, দেখিতে যদি যে সব কিছুতেই লবণ ও কাঁচা লঙ্কা ঘষিয়া খাইতে হইতেছে তাহা হইলে দূর হইতে সহানুভূতি বোধ করিতে নিশ্চয়। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার সুব্যবস্থার জন্যই নয়, তোমার মনে সমবেদনা জাগাইবার জন্যই এক-একবার ইচ্ছা হইত তোমাকে এখানে আসিতে বলি, মনে হইত, অনুপমা আসিয়া দেখিয়া যাক, একদিন পোড়া ভাত ও একদিন ভাতের লপসি ও আঁশটে কাঁচা ট্যাংরা মাছের ঝোল দিয়া, কেমন করিয়া দিন কাটাইতেছি আমরা। কিন্তু তবুও তোমাকে, মাকে, চারুকে কিছু লিখিলাম না আর। তোমাদের সহানুভূতির মমতা লইয়া খেলা করিবার এই যে সাধ, এই যে নমনীয়প্রবণ হৃদয়, ইহার বহির্মুখিনতার কথা ভাবিয়া বড় লজ্জিত হইলাম। নমনীয়প্রবণ মন যেন হাটে-বাজারে উথলাইয়া উঠিয়া বন্যার ঝলসানি না আনে, যেন অন্ধকার শিরার ভিতর ঢুকিয়া, নিভৃত উপশিরায় লুকাইয়া, জীবনকে সজীব রাখে সবুজ রাখে—শান্তি দান করে যেন, যেন গভীর শান্তি পায়।

শুনিয়া তুমি হয় তো ঠোঁট কুঁচকাইতেছ—ভাবিতেছ, সামান্য খাওয়া-দাওয়া লইয়াই এত কথা ফাঁদিয়া বসিলাম। মার হাতের মোলায়েম রান্না খাওয়ার চিরদিনের অভ্যাস; বিবাহের আগের দিন পর্যন্তও মা কাছে বসিয়া বাতাস দিয়া সাধিয়া-সাধিয়া খাওয়াইতেন। তার পর ভাবিলেন, তুমি আসিয়াছ, তাই সরিয়া পড়িলেন। সহসা তোমাদের···হীন নিস্তব্ধ বাড়ির ভিতর হিমাংশুর মাকে আবিষ্কার করিয়া আমার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। অবিশ্যি কয়েক দিনের জন্য মাত্র। এখন স্বাভাবিক চোখ ফিরিয়া পাইয়াছি। হিমাংশুর মা যা খাইতে দেয়, তাহা পাইয়াই পরিতৃপ্তি। আমার এ নবীন তৃপ্তির কথা শুনিয়া তুমিও যে বেদনা পাইবে না, খুশিই হইবে, সেই জন্যেই এত কথা তোমাকে লিখিলাম। কথার পর কথা তোমাকে জানাইয়া সুখ আছে খুব; জানি

মমতা ও অশ্রুর আড়ম্বর লইয়া তুমি আমাকে আক্রমণ করিতে আসিবে না।
পিসিমার আলাদা চাকর। চাকরটি রাঁধিতে পারে বেশ। ভিন্ন চুলায়, ভিন্ন উপকরণে নিজের চাকর দিয়া রান্না তৈয়ার করাইয়া খান তিনি; আমরা কী খাই, না-খাই সে সব দেখিবার জন্য বড় একটা ঘেঁষেন না। শুনিয়াছি পিসেমশায় খানিকটা টাকা রাখিয়া গিয়াছেন; এই পরিমার্জিতা বিলাসিনী বিধবার দিন গুজরান হইবে মন্দ না। এক-এক সময় মনে হয়, বিলাসিতা তিনি কোথাও গিয়া করিলে পারিতেন; এই যে অষ্টপ্রহর আমাদের চোখের সামনে···। তার পর যখন আজ মাংস, পেঁয়াজ, হালুয়া, লুচির গন্ধ—কিন্তু হৃদয়কে অন্তর্মুখিন করিতে পারিলে ক্ষুধিত অন্তরেরও মাংস ও লুচির গন্ধে বিভ্রম জাগে না।
জীবনকে আমি অন্তর্মুখী করিবার একটা গভীর প্রয়াস পাইতেছি। দুপুর-বেলা ময়ূরাক্ষীর জল দেখিয়াছ? অশ্বত্থের ছায়ায় কেমন ছটা করিয়া পদ্মের নাল জড়াইয়া ঘুমাইয়া আছে—জীবনকে তেমনি স্থির ও শান্ত করিতে চাই।
সময় কাটিতেছিল মন্দ না—
পিসিমার সমারোহের দিকে তাকাইবার কোনো প্রয়োজন বোধ করিতাম না। পিসিমারও একটি বিশেষ গুণ আছে, যখন এ বাড়িতে লোকজন তেমন থাকে না, গল্প-গুজব জমাইবার সুবিধা নাই, তখন তিনি আমাদের নির্বিবাদ জীবনের কোনো কাজে আমাদিগকে বাধা দিতে আসেন না, নিজের মনের ভাবে নিজে থাকেন। আমাদিগকেও থাকিতে দেন।
সমস্ত সকালবেলা আমি আমার কোটায় বসিয়া থাকিতাম, পড়িতেই চাই, কিন্তু কী বই যে পড়িব ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতাম না। সাধক বৈষ্ণবদের পুঁথি, রসাত্মক কবি বৈষ্ণবদের বই, বাবার ভাল লাগে—যে-কোনো খবরের কাগজ—ইংরেজি-বাংলা, কি কোনো উপন্যাস পড়িবার স্পৃহাও, তাহার কম নয়—একটি বই অনেকবার পড়িবার মত বিরাট ক্ষমা ও মাধুর্য তাহার হৃদয়ের ভিতরে আছে। এ সব সম্বল আমার কিছুই নাই। যা চাই সেই রকম বইয়ের অভাবে খবরের কাগজই আমাকে পড়িতে হইত—সমস্ত সকাল চুরুট জ্বালাইয়া, জানালার কাছে চেয়ারটা টানিয়া লইয়া, একবার আমি আমের ডালপালার ভিতর হলুদ বৌ-কথা-কও পাখিটির দিকে তাকাইয়া দেখিতাম—বহু ক্ষণ অন্য-মনস্কতার পর রাইনে নাজিদের কাণ্ডকারখানা, হিটলারের বিচিত্রতা, মস্কো

ট্রায়াল, লুয়াংসির কাছে জাপানিদের অমানুষিক যুদ্ধ—এই সব দূরদূরান্ত, দিগন্তের এবং নিকটের ঘরের নানা রকম চিত্তাকর্ষক সংবাদ ও অসংলগ্ন মন্তব্য লইয়া সমস্ত সকালবেলাটা জমিয়া উঠিত মন্দ না।

সমস্ত দুপুর চোগাচাপকান পরিয়া বার লাইব্রেরি ও অশথতলায় কাটাইয়া দেই। বার লাইব্রেরিতে কম—অশথতলায় বেশি। মস্ত বড় অশ্বত্থগাছটার নীচে শান-বাঁধানো কয়েকটা বসিবার জায়গা আছে; কয়েকখানা টিনের চেয়ারও আছে। বার লাইব্রেরিতে বসিয়া-বসিয়া যখন কিছুতেই শিকার মেলে না আর—উকিলদের কাহাকেও শিয়াল, কাহাকেও শকুন, কাহাকেও দাঁড়-কাক বলিয়া মনে হয়, জীর্ণশীর্ণ উকিলের গাউনে নিজেকে কোনো এক বিগত পৃথিবীর কিম্ভূতকিমাকার জীব বলিয়া বোধ হয়, চারিদিককার আবহাওয়া অসম্ভব ও অপ্রাসঙ্গিক হইয়া ওঠে, তখন লাইব্রেরির থেকে হাত-পঞ্চাশেক দূরে অশথ গাছটার দিকে চলিয়া যাই, কোনো দিন বগলে একটা পেনাল কোড থাকে, প্রায়ই কিছু থাকে না সঙ্গে, চাপকান খুলিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে, চারি-দিক হইতে বাতাস ঘনাইয়া উঠিয়া উড়াইয়া লইয়া যাইতে চায় আমাকে, পাশের একটা পুকুরের কিনারে ঝোপজঙ্গলের ভিতর হইতে ডাহুকের শব্দ আসে, সবচেয়ে উঁচু নারিকেল গাছগুলোর মাথায় দু-একটা বাজ পাখি আসিয়া পড়ে—সাদা পেট, সাদা গলা, গলার রং খয়ের-গলা জলের মত—বেশ লাগে দেখিতে; দুপুরের চিকচিকে নারিকেল পাতার ভিতর রোদ মাথায় করিয়া অপরিসীম নীল আকাশের নীচে কাহাকে যে ডাকিতে থাকে তাহারা। চারিদিককার জীবনমৃত্যুর স্রোতের ভিতর, রহস্যবেদনাহত প্রেমিক পরমাত্মাকে ইহারা যেন নতুন করিয়া দুঃখের, বিরহের, করুণ কাতরতার, পুলকের সঙ্গীত শুনাইতে চায়। আমিও শিহরিয়া উঠি। অনেক ক্ষণ বসিয়া থাকি টিনের চেয়ারে—হাতের চুরুট নিভিয়া যায়—বাতাসে শিমূল, কৃষ্ণচূড়া ও নিম-সজিনার গুঁড়ি-গুঁড়ি হলুদ পাতা ঝরিয়া পড়ে, বিন্ধ্য-চিত্রকূটের মত বিরাট এক-এক খণ্ড সাদা মেঘ আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্তে সরিয়া যায়।

কেন যেন দণ্ডকবনের কথা মনে হয়, অশোকবনে সীতার কথা! কেন যেন নারীকে অশোকের মত রক্তিম ও সুন্দর বলিয়া মনে হয়—কোনো এক নারীকে যেন; যেন কোন সুদূর সুবর্ণরেখার তীরে, কমলা রঙের মেঘের সন্ধ্যায়,

যেন কোনো রেবার তীরে, রাবীর বালুকায়, ত্রিস্রোতার পারে, আবার ঝিলমের কিনারে ভারতের দেবীপীঠগুলোকে দেখিয়া আসিতে ইচ্ছা করে—পায়ে হাঁটিয়া কড়ির মত সাদা ধুলা গায়ে মাখিয়া, দেবীতীর্থের থেকে দেবী-তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য প্রাণ বিকালের রৌদ্রে পল্লির চিলের মত কাঁদিয়া মরে।

নীল আকাশ বাহির হইয়া পড়ে আবার। মনে হয় জীবনে যত সুর সাধিতে চাহিয়াছিলাম সব যেন জড়ো হইয়া বুকের মধ্যে তাহাদের আত্মবিহ্বল আবেদন জানাইতেছে, এত বড়…একসঙ্গে বহন করিতে পারি না আমি, কাজেই মাটির দিকে তাকাই, ছেঁড়া প্যাণ্টের দিকে নজর পড়ে, পোড়া চুরুট জ্বালাইয়া লই—এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসি আবার। পকেটের থেকে বাহির করিয়া, ভাঁজ করা খবরের কাগজের দু-একটা শিট উল্টাই, গালের খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে হাত বুলাই। ফৌজদারি আদালতটার লাল ইটের দেয়ালগুলোর দিকে তাকাইয়া, নিঃশব্দে গোঁফ চুমরাইতে থাকি। খানিকটা দূরে ঝাল-চানা-ওয়ালা বসিয়া-বসিয়া ঝিমায়, কিন্তু পয়সা খরচ করিতে যাই না আর। বেশ গরম, চারিদিকে পানিতাল-ডাব-তরমুজ ও পানিফলের অনেকগুলো হুদ্দা, অসংখ্য লোক দর কষাকষি করিতেছে, কিনিয়া খাইতেছে। ছেলেবেলা বাবা এখানে আমাকে অনেক সময় বেড়াইতে লইয়া আসিতেন—গোলাপজাম ও পানিফল কিনিয়া দিতেন—এখন কিনিয়া খাইবার দরকার নাই আর, ছেলে-মানুষ নই তো আমি। ঢের বড় হইয়া গিয়াছি। চারিদিককার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারের থেকে চোখ সরাইয়া, গরম বাতাস মাখা দূরের প্রান্তরের দিকে ফিরিয়া তাকাই—অনেকখানি নিস্তব্ধতার ভিতর কয়েকটা শকুন বসিয়া আছে দেখি। মনে হয় সমস্ত দুপুর এই প্রান্তর ও শকুনকটির দিকে তাকাইয়া কাটাইতে পারা যায়। জীবনের সমস্ত প্রেম, বিরহ, বেদনা ও স্বপ্ন দুপুরের রৌদ্রে শকুনচরা তেপান্তরের দিকে তাকাইয়া যেন অভূতপূর্ব নবজীবন পায়—কী যে হয় ভাষায় আমি কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারি না—কিন্তু মনে হয়, উহাদের দিকে তাকাইয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অভিভূত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি, চারিদিকে লেমনেড সোডা ভাঙার শব্দ, চীনেবাদামের খোসা, বাদামি গন্ধ, মজা তরমুজের আঘ্রাণ, একজন মুসলমান ফকিরের পিছনে-পিছনে একটা তিতির পাখি চিৎকার করিয়া দৌড়াইতেছে, কাঠঠোকরা

ধাঁ করিয়া উড়িয়া আসিয়া নারিকেল গাছের গায়ে ছাতকুড়ার উপর বসিল, সিভিল কোর্টের বারান্দায় চড়াই লাফাইয়া বেড়ায়, অশ্বত্থের ডালপালায় বৌ-কথা-কও, পাপিয়া, মাছরাঙা, দাঁড়কাক, ফিঙ্গার সমাবেশ ভারী সুন্দর। কত শুকসারীর দলকে ফেলিয়া যাব আমি—তিনশ বছর আগের পুরনো কথা—ও নীলকণিকার দেশ বৃক্ষের ভিতর জাগিয়া ওঠে। যে দিকে তাকাই, হৃদয়কে নরম করিয়া রাখিবার জন্য জগতে অনেক জিনিসই তো ছিল।

সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া ক্ষুধা পাইত বটে ; ইহার ব্যবস্থাও ছিল মন্দ না। হিমাংশুর মা আমাদের জন্য সুজি তৈরি করিয়া রাখিত; প্রায়ই চিনি কম হইত, কোনোদিন ঘি খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না, এক দিনও কিসমিস দিত না। হিমাংশুর মা সুজিই বা কেন রাঁধে যে রোজ, বুঝিতে পারিতাম না। হাত গড়া রুটি তৈরি করিয়া রাখিলে হয় না? লাল আটার রুটি আর খানিকটা তরকারি—বেশ জিনিস। এক-আধ দিন লুচি করিলেও তো হয় ; কিন্তু হিমাংশুর মাকে আমিই বা কী বলিব ? নিজের বিধান সে নিজেই। সে মনে করে মা ও চারু চলিয়া যাইবার পর এই সংসারে সেই একমাত্র নারী। কথাটা মিথ্যা নয়। আমরা পুরুষ, চুপ করিয়া থাকি তাই। সে চলিয়া গেলে এই সংসারটা হয় তো একেবারে লক্ষ্মীছাড়া হইয়া পড়িবে। কাজেই তাহার নারী-ধর্মে যাহা ভাল বোঝে তাহাকে তাহাই করিতে দেই। শেষ পর্যন্ত বুঝি যে নারী সে খুবই—তাহার একমাত্র অভাব এই যে, সে আনাড়ি। ইহা ক্ষমা করিয়া লওয়া যায়। যতই খারাপ জিনিস কুশ্রী করিয়া রাঁধুক না সে, খুব নিষ্ঠার সঙ্গে আসন পাতে, ভালবাসিয়া পরিবেশন করে, নিজেকে বঞ্চিত করিয়াও আমাদের খাওয়াইতে চায় সে ; আমাদের সুখ-সুবিধা খুঁজিয়া বেড়ায় ; তাহার হৃদয়ের পরিসর দেখিয়া অবাক হইয়া থাকি।

পিসিমা এক-আধদিন লুচি, পটলভাজা পাঠাইয়া দেন, কিংবা পাউরুটি টোস্ট, অমলেট—

যে-ডিশে এ সব খাবার আসে তাহাও খুব সুন্দর ; খুব সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করি। ভয় হয় পাছে ভাঙিয়া যায়। ক্বচিৎ তিনি নিজের হাতেই খাবার সাজাইয়া লইয়া আসেন। বলেন, তোমাদের রেকাবিতে সাজাইয়া লও। তিনি দাঁড়াইয়া থাকেন, সাজাইয়া লই, তাহার ডিশ ফেরত দেই—তিনি চলিয়া

যান, খাইতে শুরু করি, ভাল লাগে বটে, কিন্তু কেমন একটা আচ্ছন্নতা বোধ করি যেন—

কাছারির থেকে সন্ধ্যার সময় টলটল করিয়া ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে চুপ-চাপ বসিয়া খাইতেছি। সমস্ত ঘরে ইন্দুর খচমচ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, জানলার ভিতর দিয়া চামচিকা সাঁ করিয়া ঢুকিয়া ঘরের ভিতর পাক খাইতে থাকে, একটা তেলাপোকা উড়িয়া আসিয়া খাবারের থালার উপর পড়ে, হয় তো হিমাংশুর মাই নোংরা বিধবার কাপড়, জর্জ্জরিত জীবনের জীর্ণশীর্ণ ও এক রাশ ছোট-ছোট পাকা চুলের সাদা মাথা লইয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আমার খাওয়া দেখিতেছে, কেমন যেন লাগে, আমি থালা সরাইয়া ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া যাই।

অন্ধকারে মাঠের পথে হাঁটিতে-হাঁটিতে মনে হয়, আমি এই বংশের শেষ পুরুষ—আমার কোনো সন্তান হইল না। আচ্ছা, নাই-বা হইল, কিন্তু মনে হয় অশরীরী পিতৃপুরুষেরা আমার চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, বলিতেছেন—'প্রেম, বিচ্ছেদ, বেদনা ও কাতরতা এ সব তো আমাদের অজানা জিনিস নয়; কিন্তু তুমি ইহাদের যে রূপ দিয়াছ তাহা তো আমাদের রক্তের স্রোতে কোনো-দিন ছিল না। বিধাতা প্রথম যেদিন মানুষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই হইতে আজ পর্যন্ত, গৌরবে ঐশ্বর্যে আড়ম্বরে সাংসারিকতায় আমাদের বংশ রক্ষা করিয়া আসিতে পারিয়াছি। কিন্তু তুমি, সে সব মুছিয়া দিতে চলিলে দেখিতেছি। যাও, ঘরে ফেরো, প্রাচীনদের জীবন-প্রণালীর নিয়ম আয়ত্ত করিতে শেখো, এক-একটা বটগাছ যেমন অনেক দিন বাঁচিয়া থাকে, অনেক সন্তান-সন্ততি বিলাইয়া যায়, পৃথিবীর রৌদ্র, অন্ধকার, কুয়াশা, বৃষ্টি, হিমের ভিতর হইতে বিচ্ছেদ ও অন্যতর অকৃতকার্যতা খুঁজিয়া পায় না, পায় আত্ম-বঞ্চনাহীন পরিতৃপ্ত পরিস্ফূর্ত জীবনের সরসতা ও কলরব, তুমিও তাহাই পাইবে—তুমিও তাহাই পাইবে—'

অন্ধকার জমিয়া ওঠে—এই ছায়ার দলকে আমি উড়াইয়া দেই। মাঠের পথে দূরে, আরো দূরে, হাঁটিতে-হাঁটিতে মুখোমুখি অর্জুনের সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। বলি—কোথায় ছিলি রে? এ চার-পাঁচ দিন কাজ করতে অসিস নি যে!

ছেলেটি কোনো জবাব দেয় না—বাপ নাই, মা নাই, কেউ নাই, কিছু নাই,

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারের ভিতর গ্রাম-বাড়ির ফাঁকে সেও কোথায় মিলাইয়া যায়। যাক। কেহই থাকিবে না। অশরীরী পিতৃপুরুষেরা যোগের সৌন্দর্য অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু বিয়োগের শূন্যতা ও মাধুর্য যে কত দূর তাহা তাহারা বুঝিতে পারিতেন, পল্লবিত বটগাছের দিকে না চাহিয়া, একটা দীর্ঘ অগ্নিশিখা আকৃতির ঠুঁটো মঠের দিকে নক্ষত্রমাখা নিবিড় রাতে যদি একবার তাকাইয়া দেখিতেন।

# কবিতা

## ভয় ভুল মৃত্যু গ্লানি সমাচ্ছন্ন পৃথিবীতে

ভয় ভুল মৃত্যু গ্লানি সমাচ্ছন্ন পৃথিবীতে আজ
দিন শেষ হ'য়ে যায়—রাত্রি আসে—
দিন নেমে আসে—
জ্ঞান আছে, তবু তার সে রকম প্রচলন নেই
প্রেম আছে—তবু যে প্রেরণা
কামনার চেয়ে তাকে উজ্জ্বলতায়
সকলের সাধারণ প্রয়োজনে দান করে
সেই প্রেম ফুরিয়ে এসেছে প্রায়।

একটি পৃথিবী নষ্ট হ'য়ে গেলে এবারে মানুষ
চেয়ে দেখে আরেক পৃথিবী বুঝি ধ্বংসপ্রায় ;
লোভ থেকে লোভে তবু—ভুল থেকে ভুলে
শূণ্যতার থেকে আরো অবিকল শূণ্যতার দিকে
আবর্ত ক্রমেই আরো দ্রুত হ'য়ে আসে

বেলা প'ড়ে গেলে পশ্চিমের
মেঘের ভিতরে যেই আভা লেগে থাকে কিছুক্ষণ
সেদিকে সম্পূর্ণ চোখে তাকাবার মতো লোক নেই
যে আলো ঠিকরে ওঠে ভোরে
পথে মাঠে জানালার ভাঙা কাচে
রক্তে শূণ্যে বচনে ও নিহতবচনে
তারো কোনো মানে নেই মানুষের মনে।
ক্লান্তি আছে—শীত আছে

অন্তহীন মৃত্যু র'য়ে গেছে।
বারবার দৃশ্য মুছে ফেলে
মৃত্তিকার নির্জনতাকে শুধু সাক্ষী রেখে
নতুন আভাস আলো পটভূমি জাগিয়ে জাগিয়ে
কাজ ক'রে চলেছে সময় মনে হয় ;
মৃত্যু যেন মৃত্যুর ভিতরে শুধু নির্লিপ্ত নয় ;

কেবলি ব্যক্তির মৃত্যু হয়—তবু সময়ের কাছে
মানব ও মানবতা শাশ্বত কাহিনী হ'য়ে আছে।
ওরা মরে—ফিরে আসে—নতুন চেতনা এনে দেয়
যেন তা' অনাদিকাল থেকে শুধু অগণন গ্লানি ক্ষয় শব
অন্ধকারে ব'য়ে তবু মহাজিজ্ঞাসার মর্মে উজ্জ্বল মানব।

## মহানারীপাশ

একবার [ ভালো নীল ] ভাঙা ভুল পৃথিবীর হাত থেকে বার হয়ে আমি
চ'লে যাব কোথাও হিরণ মেঘলোকে ;
তবুও তোমার দেহে রয়ে যাব—রয়ে যাব, নারি,
দেহের ভিতরে প্রাণে—প্রাণের ভিতরে মনোলোকে।

কঠিন আঘাত পেয়ে অন্ধকারে শিখার মতন
ধাতুর ভিতর থেকে জেগে উঠে আমি
সেই ব্যথা আর সেই অন্ধকার পৃথিবীধাতুকে
পরিহার ক'রে দূরে অভিযানকামী
আলোর মতন জ্ব'লে সূর্যে উড়ে যাব ;
মিশে যাব জ্যোতিষ্কের ভিড়ে ;
দেহ নেই মন নেই প্রাণ নেই অমেয় আভায়
প্রাণ মন দেহ হয়ে যাব আমি তোমার শরীরে।

## যখন দিনের আলো নিভে আসে

যখন দিনের আলো নিভে আসে আমি ক্লান্তি [ ক্লান্ত ? ]—তবুও উদয়
জ্বলন্ত তারার মত সময়ের অন্ধকার শক্তিনীলিমায় ;
আমার উৎসারী স্নেহ আলো মন প্রাণ
এখন ঠেকেছে এসে অকূলের পবিত্র সীমায়।
পৃথিবীর ধুলো নিয়ে মানুষ কি শরীরী হয়েছে ?
শরীর কি ভালবাসে নারী—নারীমন ?
রাত্রির জ্যোতির পথে প্রাণ এক পুরুষনক্ষত্র ?
কিন্তু কতক্ষণ।

কি সঙ্গীত জানা আছে প্রাণের মনের
কোথায় সে পেয়েছিল অগ্নিউৎস আলোকের জ্ঞান ?
ভোরবেলা অস্তসূর্যে রাত্রির নক্ষত্রবেলায়
পুরুষ নারীকে দান করে তবু তার প্রতিদান
পেয়েছে সৃষ্টির সত্ত্বঃ অন্ধকার ? অমেয় শীতের
শূণ্যের সংঘর্ষ থেকে নীল শিখা বুনে
আমাকে জাগাবে নারি, একদিন সৃষ্টি লোপ পেলে ,
জেনে আমি গাঢ় স্বর্ণ অনন্তের স্বর্ণকার, তোমার আগুনে।

## নক্ষত্রমঙ্গল

( ১৯৫২—৫৭ )

রাতের আঁধার বাড়লে পথে প্রান্তরে কি ঘরে
থামে এসে সারাদিনের রীতি।
সার্থবাহ নটীর হিসেব ফুরিয়ে গেলে তবে
হস্তা স্বাতী বিশাখা শতভিষা

যত না প্রিয় বাতির মতন জ্বলে বলে যেন
তাহার চেয়ে অনেক বেশি ধীকলরোল ক'রে ঃ
'সমস্ত দিন মেঘ ভেঙে কি বৃষ্টি হয়েছিল ?
কিংবা অঢেল রক্ত ঝরেছে

এক পৃথিবীর সন্ততিদের আলোড়নের থেকে ?
কালো মেঘের পিছে আকাশ ছিল কি নীল তবু ?'
'জানি না সে সব। হে গুণ, মনপবনে প্রদীপ তারা,
আমার হৃদয় মৃৎশতাব্দীশীল ;

তবুও হাতের মুখের রক্ত শিশির ঘাসে মুছে
হৃদয় আমি তারকাদের পানে
মানবসময় সরিয়ে আইনস্টাইনি লোক ভেঙে
ছড়িয়ে দিলে দিতাম অনবতুল অনবতুলে ;

কী মানে তবু নক্ষত্রদের—প্রেমের প্রতীক যদি
ক্লেদপৃথিবীর পুরুষনারীর থেকে স'রে গিয়ে

নিখিলে রেতঃ হয়ে থাকে ?  মাটি সহজ হয়
ইতিহাসের ক্ষমতাতীত রক্ত খরচ ক'রে ?'

'তবুও অর্থ রয়ে গেছে—সুপরিসর ঢের ;
ম্যামথ বা তার পাঁকের থেকে মানুষ এখন জেগে
স্বাতীতারার শিশির দিয়ে যে অনিমেষ গল্প বানিয়েছে
তাইতো প্রেম ঃ  যান নিরূপণ-জ্ঞানের প্রবলতর আবেগে।'

## রাত্রি অনিমেষ

কেমন এক পরিচ্ছন্ন গভীর বাতাস ভেসে আসে।
অঘ্রান রাত্রির অগণন জ্বলন্ত নক্ষত্রের আলোয়
সমস্ত পৃথিবী তার জলঝর্ণার—নগ্ন নারীহস্তের নির্মলতায়
নিঃশব্দে উৎসারিত হয়ে উঠছে আজ।
পৃথিবীকে আকাশের মতন মনে হয়;
আকাশকে সময়ের মতন;
কোথায়ই-বা উদয় হয় নি সে—কোথায়ই-বা যায় নি?
সমস্ত আধো আলোকিত সৃষ্টির বুকের উপরে
যেন কার দীর্ঘ নারী অঙ্গের ছায়া পড়েছে
মাঠে—খাদে—বস্তির মরণে—মিনারে—
শান্তি-অশান্তির কলরোলে—নগরীর জ্বলায়—মানুষের চোখের ঘুমে।

আকাশে তারা কম।
বাতাসে—শাদা মেঘের ফাঁকে একটি কি দুটি নক্ষত্রে আলোকিত রাত্রে
কোনো সার্থবাহের উটের পাশে কি এই ছায়া—
আমার জীবন থেমে আছে, অতএব তাকে নিমেষনিহত ক'রে?
কোনো ক্যাম্পে ঘুমিয়েছিলাম যেন সমস্ত হেমন্তকাল;
জেগে উঠে দেখলাম কোথাও কেউ নেই আর;
কোনো শব্দ নেই,
কোনো উট নেই;—উটের ছায়া রয়েছে মরুভূমির
অঘ্রানের আলোশক্তির শান্ত অপরিমাণ রাত্রে;
কি এক গভীর বাতাসে প্রতিটি নক্ষত্র নিভে নিভে নিভে
আবার জ্ব'লে উঠছে সেই নারীর হাতের নিবিড় মোমের মত।

## রবীন্দ্রনাথ

তারপর তুমি এলে
এ পৃথিবী সলের মতন তোমার প্রতীক্ষা করে বসেছিল
সলের মতন দীর্ণ ক্ষুব্ধ এই দানব পৃথিবী
শক্তিমান রাজার মতন রূঢ় রূপবান রক্তাক্ত নক্ষত্র এই আমাদের
ঝলমল আলম্বিত চোগা প'রে প্রবল উষ্ণীষ শিরে রেখে দিয়ে
কঠিন অসির 'পরে ভর ক'রে
অসীমের অনাবৃত হলঘরে ক্ষণিকের দম্ভ ভুলে ক্যাম্পের নিষ্ঠুর ধাতব বাদ্য
ইশারায় স্তব্ধ করে দিয়ে
চোখ বুঁজে অধোমুখে
এ পৃথিবী মুহূর্তের কাজ তার ভুলে গিয়েছিল
মুহূর্তের চিন্তা এসে কখন হঠাৎ তারে সচকিত শীত করে দিয়ে
চলে গিয়েছিল ব'লে
মুহূর্তের স্বপ্ন এসে লক্ষ-কোটি বছরের সম্পন্ন কাজের সমৃদ্ধির শিরস্ত্রাণ
নিজের পায়ের তলে রেখে দেয় ব'লে।
আমাদের এ পৃথিবী নিজেরে ব্যথিত বোধ করেছিল
পরাহত—পাণ্ডু—ক্ষুব্ধ ;
অবসাদে হিম নীল জর্জরিত হয়েছিল,
হয়েছিল না কি ?
তুমি এলে ?

আমাদের উপভোগ লালসার এত শক্তি সমুদ্রের মত এক ব্যথারেও বহিতে
পারে যে, বহিতেছে ;
আমরা জানি না তাহা

আমাদের অসুর পৃথিবী জানে নি ক'?
ঘাস পোকা ফড়িং হরিৎ মানুষের অবিশ্রাম জীবনের সাগরের ঢেউয়ের ভিতরে
মুহূর্তে মুহূর্তে যেই বেদনারা এশীরীয় সৈন্যদের মত বর্শা তুলে নেচে ওঠে
তারা পরাজিত হয়
ফড়িঙের পাখার ভিতরে ব্যথাঃ তার শক্তি সম্রাটের ক্রূর আঘাতের চেয়ে আরো
ঢের কঠিনতা নিয়ে বেঁচে আছে
কীটেরো জীবনে এক সহিষ্ণুতা প্রাণ পায়
পাখীরো জীবনে এক প্রেম
এক ক্ষমা—এক প্রেম মানুষের হাতের প্রতিটি কাজে বেঁচে থাকে

সৃষ্টি চলে তাই সুন্দরের দিকে

ক্ষমা প্রেম স্থিরতার পানে
নক্ষত্রের শান্তির উদ্দেশে।

এরা কি সুন্দর নয়? ব্যথার সমুদ্রে ফোটে এই সব সূর্যমুখী

সবচেয়ে আসুরিক বিজয়ের সাম্রাজ্যের থাম ভেঙে সুন্দর পাবে না তুমি কিছু
সেখানে যে সহিষ্ণুতা নাই—ক্ষমা নাই—প্রেম নাই
কোনোদিন ব্যথা ছিল নাক'—ছিল নাক' ব্যথা বোধ।

তাহাদের শক্তি ছিল—ব্যথিত ঘাসের কীট যেই শক্তি জানে ছিল তাহা
তবু তাহা সম্ভোগে অন্যায়ে জয়ে অত্যাচারে লক্ষ লাল লাম্পট্যের রাতে
রক্ত মাংস মাটি হয়ে গেছে
আর কিছু হয় নাই

এই গান গাহিয়াছ কবি তুমি
গেয়ে চলে গেছ

অবনত রূঢ় বিদ্ধ ভ্রূকুটি পীড়িত মুখে কোন্ এক দৈত্যসম্রাটের মত
আমাদের পৃথিবী—শতাব্দী তাহা শুনিয়াছে
যেমন শুনেছে সল ডেভিডের গান
একদিন
আন্দোলিত হয়েছিল এক রাত
তুমি এই পৃথিবীরে তোমার গানের সুতা দিয়ে আকাশের অন্য এক নক্ষত্রের
সাথে বেঁধে দিয়ে চলে গেছ।

আজো তাই নক্ষত্রেরা এত কাছে—সুন্দর নিকটে এত—শান্তি, প্রেম, ক্ষমা।
আজো তাই নক্ষত্রেরা এত কাছে
তাদের নৃত্যের সুর তবু থেকে থেকে ক্ষীণ হয়ে আসিতেছে
কবি, তুমি ক্রমে ক্রমে হিম হয়ে পড়িতেছ ব'লে
সুন্দর যেতেছে মরে ধীরে ধীরে
শান্তি আর থাকিবে না।

ব্যারাকে ধাতুর বাদ্যে হৃদয়ের ধাতব আঘাতে
রুপালি জলার সেই দীর্ঘদেহ গানগুলো বিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত হয়ে পড়ে রবে
মৎস্যনারীদের মৃত শরীরের মত।

ব্যথা রবে শুধু
সহিষ্ণুতা রবে
প্রেম রবে।

## হে হৃদয়, নীড় থেকে ঢের দূরে

হে হৃদয়, নীড় থেকে ঢের দূরে ধরা প'ড়ে গেছ
বিকেলে আলোর রং নিজ মনে কাজ ক'রে পাখিকে না ব'লে
ছায়ায় অঘ্রান মাঠ ঢেকে ফেলে চমকায়ে দিল
কেউ নেই—শূন্যাকাশ পটসঙ্গিনীর মত হ'লে
তার কাছে বলা যেত ঃ আমি ডানা পালকের প্যাঁকাটির মত হরিয়াল
কাউকে না পেয়ে একা চারিদিকে উপচানো রাত্রির মুফতে
ধাঁধাঁর ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা ঘুম মরণের ঢেউয়ে
প্রেমের সূর্যকে কোনোমতে
জাগায়ে জ্বালায়ে আমি উড়ে যাই ডিসেম্বর রাতে—

এই সব ভোরভাষা নীচের নগর হ্রদ বস্তি মৃত্যুকে
দান ক'রে বাতাসের ঘুরন চাকির আগে পাখি
টের পায় জীবনের ভিতরের অনুভূতিটিকে
কেলিরও চেয়ে সে ভালো অন্য এক আনন্দসাগর
সে দিকে যাবার পথে চোখ তার ভৎর্সনা বেদনা ভয় দোষ থেকে মুক্তির
মতন
আকাশ নদীর জল শ্মশান এয়োরোড্রোম ঝাউয়ের সাগরে
হঠাৎ সকলি সূর্য—নিজেও সে সূর্য একজন।

## অবিনশ্বর

তার সাথে আজ সাত আট বছর পরে—অঘ্রানে
কলকাতার এই টিউব আলো নিয়নদীপের রাতে
দু-চার মিনিট দেখা হ'ল—কথা বলা হ'ল ঃ
ঘরে ফেরার আগে কিছু সময় কাটাতে।

স্বচ্ছ ধ্রুব সহজ স্বভাব কথা
বলা হলে ভাবছি ভালো হ'ত;
কথা আরো গভীর ভাবে চেতন হ'ত যদি;
শব্দ কথা ভাষা—সবই সেই নারীকে লক্ষ্য ক'রে ব'লে
সফল হওয়া সহজ—তবু প্রতীক্ষা চাই মৃত্যু অবধি।

আজকে রাতে তোমায় আমার কাছে পেলে কথা
বলা যেত; চারিদিকে হিজল শিরীষ নক্ষত্র কাশ হাওয়ার প্রান্তর।
কিন্তু যেই নিট নিয়মে ভাবনা আবেগ ভাব
বিশুদ্ধ হয় বিষয় ও তার যুক্তির ভিতর;

আমিও সেই ফলাফলের ভিতরে থেকে গিয়ে
দেখেছি ভারত লণ্ডন রোম নিউইয়র্ক চীন
আজকে রাতের ইতিহাস ও মৃত ম্যামথ সব
অটুট নিয়মাধীন।

কোথায় তুমি রয়েছ কোন্ পাশার দান হাতে ঃ
কী কাজ খুঁজে; সকল অনুশীলন ভালো নয়;

গভীরভাবে জেনেছি যে-সব মনীষী ভাঁড় প্রেমিক পাপীদের
তারই ভিতর প্রবীণ গল্প নিহিত হয়ে রয়।

ক্রমেই বয়স বাড়ে—সবই ছড়িয়ে পড়ে নশ্বরতার দেশে।
বৃষ্টি বাতাস হলুদপাতা ছাতকুড়ো ঘুন মাকড়সাজাল এসে
বলছে ঃ 'আরো কঠিন আঁধার নেমে পড়ার আগে
আমরা এলাম ; কোথাও কিছুই নেই ;
একটি শুধু মূর্খ আছে মানব ইতিহাসে
চঙ্গে চড়ে চেয়েছে নীল আকাশ ধরবেই ;
সারাটা দিন শিমূলতুলোর মতন শত সূর্যে উড়ে তুমি
একটি বীজচিহ্ন নিয়ে মাটিরই ক্রীড়াভূমি।'

বললাম আমি ঃ 'শিশির আলো নক্ষত্র জল মনের উদ্দীপন
অন্ধকারের দিকে টানে ইতিহাস ও দার্শনিকের মন,
দেখেছি আমি ঃ তবুও স্বাদ অনেকরকম—দেখেছি মানুষ অসীম রগড়ে
উত্তেজিত হ'য়ে অপার গোলক ধাঁধাঁয় ঘোরে।
তবুও মহাজিজ্ঞাসা ও অপার আশার কালো
অকূল সীমা আলোর মতো ;—হয় তো সত্য আলো।

## শহর বাজার ছাড়িয়ে

শহর বাজার ছাড়িয়ে আমার দৃষ্টি পড়ে নক্ষত্রদের দূর আকাশের পানে
যখন আমি রাতের বেলা দেখি—
নগরীর ঐ পুরুষ নারী কী চেয়েছে কোথায় যাবে—কিছুই জানে না
চারিদিকে প্রেম ও প্রাণের আততায়ী দীক্ষা অপশিক্ষা আগুন উত্তেজনার ঢেউ
ভাঙছে আমার শতাব্দীকে—স্বাতীতারার মতন তবু কেউ
নিজের স্বচ্ছ কক্ষ থেকে একা
এই পৃথিবীর সে কোন অধম শক্তিগুলোর পরে
ভালো হবে ব'লে শিশির ফোঁটার মত ঝরে।

তোমার আসা-যাওয়া কথা আদান-প্রদান কুশীলবের দূর বলয়ের থেকে
আমার পানে নারি, তুমি আজকে রাতে আবার তাকায়েছ
কী যে কবে বলতে চেয়েছিলাম তোমায় আমি
কী যেন ঋণ—সে কোন সিঁড়ির ঘুরুনিতে মাঠে অন্ধকারে
আজকে মনে নেই—
নিয়েছিলাম? আমায় তুমি ফিরিয়ে দিয়েছিলে?
দুইটি তট; কিন্তু তবু একটি নদী দুইটি তট মিলে।

রোদ যেখানে হরিণ মেঘের মৌমাছিদের সেই পৃথিবীর তুমি
সরোবরের পথে বুকের ঐশী জিনিস ঢেকে
নীলকণ্ঠ পাখির গুঞ্জরণে চমক ভেঙে চেয়ে দেখে
আমার কণ্ঠবিষের পানে তাকিয়েছিলে
চারিদিকে রক্ত ক্ষতি গ্লানির কাছে ঋণ
লাভ ক'রে আজ শ্রীলাভ করার দিন

মানুষ ও তার আচলমান নিশ্চয় মৃত্যুর
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা—মাঝখানেতে চোরাবালি আশ্বাসে ভরপুর
আজ আমাদের পৃথিবী—এই শতাব্দী এ রকম।

তোমার কারণ ক্লান্তি তবু আমায় অভয় দিল
তোমার আলো আঁচল আভাস শরীর
নীল আকাশে শরৎ এলে সূর্য জ্যোৎস্না হরিয়ালের কথা
জাগিয়ে দিয়েছিল—
পাখি-হন্তারকের প্রাণে—কামের চেয়ে প্রেমে তাহার দু চোখ পূর্ণ ক'রে
অন্ধকারে তারা নদী সাকোরখোরার ঝিরঝিরানির মতন তোমার
চোখের মণি, চুল,
শরীর শান্ত দয়ালুতায় জেগে উঠে পরীর, মনে হয়,
জানে দয়ার মীমাংসা — দান, শরীরদান নয়।

তবুও কেন আমার পানে তাকিয়ে আছ একা
এগার বৃহস্পতি বার সূর্যে ভরা আজকে পৃথিবীতে
চারিদিকে আর্তি অব্যাহতি তলব সুখবরের দিনে
খাতক কেন আটকে পড়ে আছে তবু মহাজনের ঋণে
ক্রুর আমি? তিক্ত তুমি? কিংবা স্বীয় স্বীয়
প্রাণের বিনিময়ে সবই সত্য, স্থির ঃ কাকচক্ষু জলে কি পূরণীয়?

ঢের তাপিত জেগে উঠে ঐ মহিলার বলয়-আলোর পানে
কিশোর যুবা প্রবীণ মনে তবুও নতুন উত্তেজনা নিয়ে
কী চায়, আহা,
সে কোন্ নতুন আলোর গ্রন্থি সন্দীপনের তারা?
আমার এ সব কুশল প্রশ্নে চকিত হয়ে শচী অহল্যারা
বলছে হেসে, সেই রমণী এইখানেতেই আছে
এসো শরীর অথবা তার ব্যাধির অতীত মৃগনাভির কাছে
রাত্রিবেলা ঘাসের শিষে একটি শিশির ফোটে

চারদিকে তার নক্ষত্র ও শিশির লাখো লাখো
প্রেম কি তাদের গণিত স্থির ক'রে দেবার সাঁকো ?—
শুধাতেছে তোমার পানে তাকিয়ে মহীয়সী
সময় সূর্য সাগর পারে নতুন দিনে দণ্ডায়মান তুমি
দ্বৈপায়নের মতন অন্ধ মহাশূন্য দেখছ নাকি আলোর প্রতিসারী
প্রেম তবুও নিজের প্রতিভারই
মতন আরেক আঁধার আলো সময় বীমার শূন্য নিঃসময়
কৃষ্ণা, তোমার আঁধার ঘিরে শাড়ির মত নিজেকে মনে হয়।

## হঠাৎ তোমার সাথে

হঠাৎ তোমার সাথে কলকাতাতে সে এক সন্ধ্যায়
উনিশশো চুয়াল্লিশে দেখা হ'ল—কত লোক যায়
ট্রাম বাস ট্যাক্সি মোটর জিপ হেঁকে
যাদের হৃদয়ে বেশি কথা হাতে কাজ কম—তাদের অনেকে
পায়ে হেঁটে চ'লে যায়

কেবলি ক্লান্তিতে ধুঁকে আমাদের মুখে ঠোঁটে তবু যেই হাসি
ফুটে ওঠে স্বপ্নকে খণ্ডন করে বিষয়প্রত্যাশী
অমূল্য সংসারী সে-ই—বাজারে বন্দরে ঘোরে, মাপজোক ক'রে
হিসেবের খতিয়ানে লাভ হলে রক্তের ভিতরে
তৃপ্তি পায়—লোকসান হয়ে গেলে অন্ধকারে নিগৃহীত মনে
অনুভব করে কোনো মনিবের সংকীর্ণ বেতনে
ভৃত্যের শরীর তার—। ভৃত্যের শরীরে তার ম।
নারী আর নক্ষত্রের তবু মহাজন ?

তুমি এলে—সময়ের ঢের আয়ু শেষ ক'রে তবে
এখনো প্রদীপ জ্বলে এ রকম স্থির অনুভবে
তোমার শরীর আজো সুশ্রী নম্র—তবুও হৃদয়
সেই স্নিগ্ধ শরীরের সতীনের মত কাঁটা নয় ?
দুরু দুরু হৃদয়ের বিস্ময়ে ব্যথায় এ কথা যদি ভাবি
তবু সে ব্যথার চেয়ে আরেক শক্তির বেশি দাবি
সেই স্বাদ তুমি — আমাদের চোখে এসেছিলে ব'লে
পৃথিবীকে ভালো ক'রে পাই আমি—এ পৃথিবী অন্তর্হিত হ'লে।

সত্যই সূর্যের আলো — তবুও সূর্যের চেয়ে সুখী
তোমার গভীরভাবে ভালো শরীরের মুখোমুখি
আমার শরীরমন— ঈশ্বরেরও অনুরোধে কখনো সময়
গতি কি থামায় তার—লীন হলে অনুসৃত হয় ?
তুমি তাকে থামায়েছ—সৃষ্টির অন্তিম হিতাহিত
ভুলে আজ কলকাতার শীত রাতে কবের অতীত
বহমান সময়কে অন্ধকারে চোখ ঠার দিয়ে
নারীর শরীর নিয়ে রয়েছ দাঁড়িয়ে।

তোমার উরুর চাপে সময় পায়ের নীচে পড়ে'
থেমে আছে ব'লে মৃত তারিখকে আবিষ্কার ক'রে
ভালোবাসা বেঁচে উঠে, আহা, এক মুহূর্তের শেষে
তবুও কি ম'রে যাবে পুনরায় সময়ের গতি ভালোবেসে

অতীত তো সুজাতার শিশু ; নারি, মনীষী হৃদয়
সে শিশুক বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত নয়

হে সময়, একদিন তোমার গহন ব্যবহারে
যা হয়েছে মুছে গেছে, পুনরায় তাকে
ফিরিয়ে দেবার কোনো দাবি নিয়ে যদি
নারীর পায়ের চিহ্নে চলে গিয়ে তোমার সে অন্তিম অবধি
তোমাকে বিরক্ত করে কেউ
সব মৃত ক্লান্ত ব্যস্ত নক্ষত্রের চেয়েও অধিক
অধীরতা ক্ষমতায় ব্রহ্মাণ্ড শিল্পের শেষ দিক
এই মহিলার মত নারী চোখে যদি কেউ খুঁজে ফেরে—তবে
সেই অর্থ আমাদের এই মুহূর্তের মত হবে।

## এখন এ পৃথিবীতে

এখন এ পৃথিবীতে ভালো আলো নেই—
ভাষার বেগের বিহ্বলতার শেষ ক'রে অন্ধকার
মাঝে মাঝে জীবনের পথে আসে
আজকে সততা সত্য সুধা নেই,— কিন্তু পৃথিবীর পথে রূঢ়
রক্তাক্ত অন্যায় আলো বেনামদারের মত জেগে
নিজেকে প্রাণের সূর্য ব'লে যদি এখনো প্রচার করে তবে
সে আলোর প্রতিবাদে আজকের পৃথিবীতে অন্য আলো নেই
অন্ধকার রয়ে গেছে।

আজকের পৃথিবীর নরনারীদের
কেবলি হাতের কাছে প'ড়ে পাওয়া অন্ধকার নয়
আরেক গভীরতর ধর্মের জিনিস।

প্রকৃতিতে সূর্য আছে ; প্রকৃতিতে নয়—তার মানুষের মনে
সূর্য ভেঙে গেলে তার বুক থেকে নিঃসৃত নিস্ফল অন্ধকার
আকাশের মত বড় ব্যাপ্তির মতন
অখণ্ড অনন্ত এক
প্রাণের কামনা থেকে ইচ্ছুককে মুক্ত ক'রে নিয়ে
হৃদয়ের সব দোষ প্রক্ষালন ক'রে
কবেকার থেকে আজো ক্লান্তিহীন সময়ের সাধনার ফল অন্ধকার
মানুষের পৃথিবীতে সে অনেক শতাব্দীর আগে
ঈশ্বর স্খলিত হয়ে গেছে—তবু মানুষের স্বভাবের গভীরতা আছে

প্রেম চায়—ন্যায় চায়—জ্ঞান চায়—অথবা এ সব
আজ এই পৃথিবীর বিমূঢ় আলোয়
সকলি নিষ্ফলপ্রায় হয়ে গেলে অন্ধকার চায়
সকলি সফলকাম একদিন হয়ে যাবে ব'লে।

## সম্পাদকীয়

জীবনানন্দ দাশ-এর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত রচনার সম্ভাব্য পুনর্বিন্যাস অনিবার্যতই জটিল। কারণ, তিনি নিজেই যেন সেগুলোকে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত এই দুই ভাগে রেখে গেছেন। তাঁর অপ্রকাশিত ভাগ, আয়তনে, প্রকাশিত ভাগকে তুচ্ছ করে দেয়। মৃত্যুর অনেক পরে প্রকাশিত একটি-দুটি উপন্যাস বা গল্প এই ইঙ্গিত দিয়েছিল মাত্র যে তিনি কবিতাই লেখেন নি কেবল। এখন তাঁর যত্নরক্ষিত অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির ভাণ্ডারের দিকে মাত্র চোখ বুলিয়েই বোঝা যায়, তাঁর যে-কটি কবিতার সঙ্গে আমরা পরিচিত তা কেবল মগ্নশৈলের চূড়াটুকু, আর গল্প-উপন্যাস রচনা তাঁর কাছে কবিতা লেখার ব্রত থেকে ক্ষণিক অবকাশযাপনে দুটো-একটা লিখে ফেলার মত আকস্মিক কিছু ছিল না, এ নিশ্চয়ই ছিল তাঁর সৃষ্টিকর্মের অপরিহার্য প্রয়োজন, নইলে এত মেহনতে এত লেখা, লেখা যায় না।

তাই, জীবনানন্দের বেলায় আর এই পরিচিত ও অভ্যস্ত পদ্ধতি ব্যবহার করা যাচ্ছে না যে জীবিতকালে প্রকাশিত তাঁর সৃষ্টির যে-চরিত্র ও পরিপাটি জানা হয়ে গেছে, মৃত্যুর পরে তাঁর অপ্রকাশিত রচনা তারই সম্প্রসারণ মাত্র, যা তারই কোনো একটি বিশেষত্বকে আরো স্পষ্ট করে তোলে, বা তাঁর কোনো এক দুর্বোধ্যতার নিরসন ঘটায়। আবার, জীবনানন্দ এমন এক কবি নন যিনি মৃত্যুর পরেই মাত্র আবিষ্কৃত হচ্ছেন — তা হলে, ত সেটাও হত একবারে তাঁর সমগ্রতারই মুখোমুখি হওয়া। জীবনানন্দ তাঁর মৃত্যুর আগেই কবির সামাজিক

স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠানিক সম্মান পেয়ে গেছেন। তাঁকে নিয়ে সাহিত্যের উদ্দেশ্য-বিধেয় মেশানো রাজনীতির প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ বিতর্কও ঘটে গেছে কম নয়—সেই বিতর্কে তাঁর স্থৈর্য ও অসূয়াহীন নিরপেক্ষতা আজ বিস্মিত করে।

নেহাতই অকালে হলেও, মৃত্যু, জীবনানন্দের কবিচারিত্র্যের আধিপত্য ঠেকাতে পারে নি। যে-জীবনানন্দকে আমরা তাঁর মৃত্যুর সময় দেখেছি, তা যেন ছিল তাঁর সম্পূর্ণ বিকাশ। এবং সেই সম্পূর্ণতায় আমরা আক্রান্ত হয়ে আসছি, তাঁর মৃত্যুর পরও। কিন্তু জীবনানন্দের অপ্রকাশিত রচনা, শুধু আয়তনে নয়, সৃষ্টির মাহাত্ম্যে তাঁর প্রকাশিত রচনার সমান্তরাল হয়ে উঠতে চায় যদি এখন, তা হলে তাঁকে নতুন করে পড়ে, তাঁর রচনাগুলিকে অন্বিত করে নিয়ে নিজেদের জন্যে গড়ে তোলা যায় এক নতুন সমগ্রতা। সমান্তরাল নয়, জীবনানন্দের সমগ্রতাই জীবনানন্দকে পড়বার প্রধান দায় হয়ে ওঠা দরকার এখন আমাদের। পাঠক হিশেবে তা হলে আমরা জীবনানন্দের সমকালীন হয়ে উঠতে পারি।

'জীবনানন্দ সমগ্র'-এর পরিকল্পনা সেই দায় থেকেই।

হয় ত স্বাভাবিক ছিল, প্রথম থেকেই প্রকাশিত-অপ্রকাশিত মেশানো জীবনানন্দের রচনাগুলিকে কালানুক্রমে প্রকাশ করা। তাতে হয় ত নানা সময়ের রচনা দিয়ে তৈরি কাব্যগ্রন্থগুলিতে প্রতিষ্ঠিত তাঁর কালক্রমের বাইরে এক নতুন ধারাবাহিকতায় তাঁকে দেখা যেত ও তাঁর রচনাবলির পর্ব-পর্বান্তর সম্পর্কে ধারণার গণ্ডির বাইরেও যাওয়া যেত। কিন্তু তা হলে অপেক্ষা করতে হত পাণ্ডুলিপিগুলির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার, বিশেষত কবিতাগুলির নানা খশড়ার গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়া বুঝে ওঠা ও জীবনানন্দের কালানুক্রমিক রচনাপঞ্জি তৈরি করে তোলা পর্যন্ত। এই তিনটি কাজে প্রায় বছর দেড়েক যেটুকু এগতে পেরেছি তাতে এখন এ-কথা বলা যায় যে কাজ শেষ করে 'সমগ্র'-প্রকাশ করলে লেখাগুলি আরো অনির্দিষ্ট সময় অপঠিত পড়ে থাকবে।

তার চাইতে বরং পাঠককেও আমাদের কাজের সঙ্গী করে নেয়া যাক আর 'জীবনানন্দ-সমগ্র'-প্রকাশ হয়ে উঠুক প্রকাশ ও পাঠের মিলিত অভিযান। এই 'সমগ্র' ক-টি খণ্ডে শেষ হবে—এখনই তা আন্দাজ করা সম্ভব নয়। শেষতম খণ্ডে আমরা জীবনানন্দের রচনার কালানুক্রমিক পঞ্জি প্রকাশ করলে—পাঠক, প্রয়োজনে, এই রচনাগুলিকে সময়ানুগ সাজিয়ে নিতে পারবেন। আর, যদি,

পাঠকের সমর্থনে এই সমগ্রের শেষ খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে, বা পরেই, প্রয়োজন হয় প্রথম খণ্ডের পুনর্মুদ্রণ, তা হলে, তখন আমরা নতুন কালানুক্রমিক সংস্করণের কথাই ভাবতে পারি।

এই যে-খণ্ডটি একটি উপন্যাস, দুটি ছোট গল্প, এগারটি কবিতায় তৈরি হল, প্রধানত তার পাণ্ডুলিপিতথ্য ও প্রাসঙ্গিক আরো কিছু, এই সম্পাদকীয় অংশে থাকছে। 'জলপাইহাটি' উপন্যাসের জন্য আমরা জীবনানন্দের ভ্রাতৃবধূ শ্রীমতী নলিনী দাশের প্রস্তুত কপি থেকে মুদ্রিত মাসিক 'শিলাদিত্য' পত্রের পাঠ, মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে, ব্যবহার করেছি। তৎসত্ত্বেও এই খণ্ডের উপন্যাসটি সম্পর্কে যেমন, তেমনি গল্প-কবিতা ঘটিত সমস্ত ভুলের দায় সম্পাদকেরই একার, আর-কারো নয়।

উপন্যাস

জলপাইহাটি

ছাত্রব্যবহার্য ১০টি খাতায় উপন্যাসটি লেখা। প্রথম খাতায় জীবনানন্দের নিজের হাতে তারিখ লেখা 8. 4. 48। শেষ পাতায় 9. 5. 48। তা ছাড়াও বাকি আটটি পাতায় পরপর তারিখ দেয়া আছে—তাতে ৪৮ সালের ৮ এপ্রিল থেকে ৯ মে পর্যন্ত উপন্যাসটির হয়ে ওঠার ইতিহাস কিছুটা কল্পনা করা যায়।

পাতার এক পৃষ্ঠায় লেখা, বাঁ দিকের পৃষ্ঠা শাদা। পরবর্তী কালে এই পাতা গুলোতে পৃষ্ঠা সংখ্যা দেয়া হয়েছে।

১ থেকে ৬২ পৃষ্ঠা — প্রথম খাতা বাহাদুর এক্সারসাইজ বুক
৬৩ থেকে ১২৫ পৃষ্ঠা — দ্বিতীয় খাতা বাহাদুর এক্সারসাইজ বুক
১২৬ থেকে ১৮৭ পৃষ্ঠা — তৃতীয় খাতা ইউনিভার্সিটি এক্সারসাইজ বুক
( এর পর থেকে এই ধরনের খাতাই ব্যবহার করেছেন। )
১৮৮ থেকে ২৬০ পৃষ্ঠা — চতুর্থ খাতা
২৬১ থেকে ৩২৩ পৃষ্ঠা — পঞ্চম খাতা
৩২৪ থেকে ৩৭২ পৃষ্ঠা — ষষ্ঠ খাতা
৩৭৩ থেকে ৪১১ পৃষ্ঠা — সপ্তম খাতা
৪১২ থেকে ৪৫০ পৃষ্ঠা — অষ্টম খাতা

৪৫১ থেকে ৪৮৯ পৃষ্ঠা — নবম খাতা

৪৯০ থেকে ৫১৭ পৃষ্ঠা — দশম খাতা

এর মধ্যে দশম খাতাটিতে খাতার অতিরিক্ত কিছু পৃষ্ঠা ভিতরে পিন দিয়ে আটকানো। এই সব খাতার একটি পৃষ্ঠায় জীবনানন্দের হাতের লেখায় ২৫০টি মত শব্দ আঁটত।

জীবনানন্দ বেশির ভাগ এ রকম পাতাতেই লিখতেন। তাঁর হাতের লেখায় হরফগুলি ছোট, এক আকারেরই, ছিল। কিন্তু, তাঁর দুটো লাইনের মাঝখানে বেশ ফাঁক থাকত। লাইনকাটা কাগজে লিখলেও লাইন মেনে চলতেন না; বরং বলা যায়, তিনি দুই লাইনের মাঝখানের ফাঁকটা মেনে লিখতেন। মাঝে-মধ্যেই পাতার অনেকখানি অংশ শাদা ছেড়ে দিয়ে আবার পরের পাতায় চলে যেতেন। কবিতায় এ-রকম ত করতেনই, গল্প-উপন্যাসেও এটাই ছিল তাঁর লেখার রীতি।

'জলপাইহাটি'র খাতাগুলোতে তাঁর হাতের লেখা একই রকম কিন্তু একটু মোটা নিবের কলমে বলে হরফগুলো স্পষ্ট। কোনো পাতায় তিনি প্রায় কোনো ফাঁকই দেন নি। কোথাও লাইন ছেড়ে দেন নি। শুধু যেখানে কাহিনীগত প্রয়োজনে অধ্যায়ের মত অংশ শেষ করে নতুন অংশ শুরু করেছেন, সেখানে, প্রথম কয়েকটি খাতায় পাতার বাকি অংশ ছেড়ে দিয়ে, নতুন পাতায় গেছেন, শেষ কয়েকটি খাতায়, কয়েকটা লাইন ছেড়ে দিয়ে আবার লিখতে শুরু করেছেন।

এ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিতে কোথাও কোনো অনিশ্চয়তা নেই। জীবনানন্দ পরিকল্পিত ভাবে তাঁর উপন্যাস শুরু ও শেষ করেছিলেন।

প্রথম দিকের পাতাগুলোতে সংশোধনের সংখ্যা অনেক বেশি। সংশোধনের চেহারাতে বোঝা যায় যে লিখতে-লিখতেই কাটাকুটি করা। কারণ, কালির রং ও নিবের ধাঁচ অপরিবর্তিত। তার ওপর, এই সব কাটাকুটির জায়গায় নতুন কোনো সংযোজন নেই। তাতে মনে হয়, তিনি লিখতে-লিখতে কেটেছেন, তবে, এই কাটাকুটি জীবনানন্দের তুলনায় কম। তার মধ্যে প্রথম দিকের খাতাগুলো থেকে এই কাটাকুটি ধীরে-ধীরে কমে এসেছে।

প্রতিটি খাতারই প্রথম পাতায় জীবনানন্দ এ-রকম লিখেছেন, এও তাঁর রীতি ছিল,

Novel--I
Jibanananda Das
183 Lansdowne Road
Calcutta
8. 4. 48.

প্রত্যেক খাতাতেই খাতার সংখ্যার নম্বর সহ এ-রকম লেখা। তারিখ কোথাও এ-রকম সংখ্যায় লেখা, কোথাও মাসের নাম লেখা। তিন নম্বর খাতা থেকে রাস্তার নামটি নেই। শুধু পাঁচ নম্বরে রাস্তার নাম আছে—নম্বর নেই। চার নম্বরে রাস্তার নাম বা 'ক্যালকাটা শব্দটি নেই; নবম আর দশম খাতায় নিজের নামটি সংক্ষেপে J Das বলে স্বাক্ষর করেছেন।

উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিতে জীবনানন্দ বাঁ দিকের শাদা পৃষ্ঠায় অনেক সময় দরকারি কথা লিখে রাখতেন। এগুলো কোনো সময়েই একটা বা দুটো শব্দের বেশি নয়, তালিকার মত করে লেখা, কখনো-কখনো তালিকাটিতে কোনো-কোনো শব্দে টিক দেয়া, বা শব্দের নীচে দাগ দেয়া, বা শব্দের পাশে একটা লাইন কাটা। বোঝাতে চেয়েছেন—এই প্রসঙ্গটি ব্যবহার করা হয়ে গেছে।

বাঁ পাশের এই পাতাগুলি, হয় তো যাকে বলে ঔপন্যাসিকের নোট বই, এমন লোভ জাগায়, যেন, এগুলোর ভিতর দিয়ে উপন্যাসে কী লিখতে চেয়েছিলেন আর লিখতে-লিখতে তিনি কী ভাবছিলেন, তার আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। কোথাও-কোথাও যে এ রকম পাওয়া যায় না, তাও নয়। ১৪১ পাতার উল্টো পৃষ্ঠায়, অর্থাৎ ১৪২-এর বাঁ-হাতে অনেক লেখার মধ্যে এ-রকম কথাও আছে—

—The youth to be taken in his place

—Some sympathise

এ-রকম কিছু আছে ১৭৫ পৃষ্ঠার বাঁ হাতেও

—অনেক দিন ভরে

—What his mother did···Consequences···Doctor etc.

—Party Scandals

—বাবুকে ভয় etc.

—পৃথিবী কোনোদিনই ভালো হবে না—

২৮৮ পৃষ্ঠায় বাঁয়ে

Whether his children [ are ] bastards ( wife mix with Europeans…) Adultery with Milford impossible

৩১৯ পৃষ্ঠার বাঁয়ে শুধু দুটো লাইন

কি করে…নষ্ট হল ?

কেন তাদের নষ্ট হয় না ?

'জলপাইহাটি' উপন্যাসের যে কোনো পাঠকই মিলিয়ে নিতে পারবেন এগুলো উপন্যাসেরই নানা ঘটনার ইঙ্গিত, প্রধানত স্মারকলেখন। এত বড় উপন্যাসের সংগঠনে জীবনানন্দ যথেষ্ট সচেতন ও সাবধানী ছিলেন। তাঁর উপন্যাসের ঘটনার বা নানা সংলাপের আভ্যন্তরীন স্বয়ংসম্পূর্ণতা কোনো অনায়াস চেষ্টার ফল নয়।

'জলপাইহাটি' উপন্যাসটি ১৯৫১—৫২-র মধ্যে সতের মাস ধরে মাসিক 'শিলাদিত্য'-এ বেরয়। প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের মধ্যে আয়তনগত সাম্য ছিল না। বিশেষত, শেষ দুটি মাসে অনেক বড় বড় অংশ বেরিয়েছিল।

প্রথম সংখ্যায় জীবনানন্দের ভাই অশোকানন্দ দাশ লেখেন,

> জীবনানন্দের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত পাণ্ডুলিপি আমার হাতে আসে। বেশির ভাগ রচনা এক্সাইজ বুকে লিখিত ছিল। সে সব লেখার অধিকাংশই প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতা। কিছু অসম্পূর্ণ গল্প ও উপন্যাস ছাড়া কয়েকটি সম্পূর্ণ গল্প ও তিনটি সম্পূর্ণ উপন্যাস এই-সব রচনার অন্তর্গত ছিল। সম্পূর্ণ গল্প তিনটি অমুক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আমার বৌদি কোনো কারণে উপন্যাস প্রকাশ করবার অনুমতি দেন নি। অনেক বৎসর পর যখন তাঁর অনুমতি পাওয়া গেল, তখন প্রথম প্রকাশিত হল 'মাল্যবান'। তারপর 'সুতীর্থ' দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এখন তৃতীয় উপন্যাস 'জলপাইহাটি' প্রকাশিত হচ্ছে 'শিলাদিত্য' পত্রিকায়।
>
> এই তিনটি উপন্যাসই খুব অল্প সময়ের মধ্যে লিখিত। জীবনানন্দের অভ্যাস ছিল প্রথম লিখবার পর লেখাটি কিছুদিন ফেলে রাখতেন, আরো সুষ্ঠু ও পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করা যায় কি না পরীক্ষা করবার জন্য। ১৯৪৮ সালে লিখিত এই রচনাটি তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর জন্য পরিমার্জনা করে যেতে পারেন নি। পাঠকরা অনুগ্রহ করে এ কথা স্মরণ রাখবেন।
>
> পূর্ববঙ্গের একটি কল্পিত শহর জলপাইহাটিকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসটি লিখিত হয়েছে। তাই এই রচনার নামকরণ হল 'জলপাইহাটি'।

এই ভূমিকায় জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত যে-খবর আছে, তা হয়ত মাত্র প্রাথমিক পরীক্ষার ফল। পাণ্ডুলিপিগুলি পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা অনেক বেশি। কবিতার রূপান্তরণের প্রাক-প্রকাশ খশড়াগুলি কবিতার পাণ্ডুলিপিকে আরো জটিল করেছে।

কিন্তু এই পাণ্ডুলিপির মধ্যে 'মাল্যবান', 'সুতীর্থ', 'জলপাইহাটি' ও আরো একটি উপন্যাস আকারে এত বড় যে তাদের স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতেই হয়। এই চারটি উপন্যাসের মধ্যে আকারে 'মাল্যবান' সবচেয়ে ছোট ও 'জলপাইহাটি', বোধ-হয়, সবচেয়ে বড়, বা, এখনো অপ্রকাশিত চতুর্থ উপন্যাসটির সমান।

এই চারটি উপন্যাসই কলকাতায় লেখা, ১৯৪৮ সালে, জীবনানন্দ পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে আসার পর, ১৮৩ ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে।

'জলপাইহাটি' উপন্যাসের নামকরণ জীবনানন্দের নয়। তাঁর ভাই অশোকানন্দ দাশ কাগজে বের করার সময় এই নাম দেন। এ উপন্যাসের ঘটনা ঘটছে জলপাইহাটি গ্রামে ও কলকাতা শহরে। পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় খাতাটিতে, প্রথম পাতার উল্টোপৃষ্ঠায়, বাঁ কোণে, খুব ছোট করে, প্রায় পড়া যায় না এমন অস্পষ্ট ভাবে, জীবনানন্দ দুটো শব্দ লিখে রেখেছিলেন। 'সময়ের ঘাস' ও 'কূলকিনারা'। প্রথম শব্দটির দ্বিতীয় পদ 'ঘাস' এত দুর্বোধ্য যে আমরা ভুলও পড়ে থাকতে পারি। এই শব্দদুটো এখানে উপন্যাসের কোনো প্রসঙ্গকে মনে করিয়ে দিচ্ছে না, বা লেখকের লেখার সূত্রে রাখা কোনো লেখনও এগুলো নয়। খাতায় লেখা শুরুর সঙ্গে-সঙ্গেই যেন শব্দ দুটো একটু আলাদা ভাবে লিখে রাখা। উপন্যাসের নোট জীবনানন্দ সাধারণত করছিলেন পাতার মাঝখানে। এ দুটো কথা পাতার একেবারে কোণায় লিখে রাখা। এই সব কারণে অনুমান হয়—উপন্যাসটির জন্যে জীবনানন্দ এই নাম দুটো হয়ত ভাবছিলেন। উপন্যাসের বিষয়ের দিক থেকেও নাম দুটিতে এক অন্য তাৎপর্য আছে।

'জলপাইহাটি' এই উপন্যাসের নাম হিশেবে পরিচিত হয়ে গেছে বলে, এই সংস্করণে এই নামটিই ব্যবহার করা হল।

**গল্প**

### আকাঙ্ক্ষা-কামনার বিলাস

'বাল্যরচনা' বলে চিহ্নিত খাতাটি বাদ দিলে জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপির আদি বর্ষ, ১৯৩১। ১৯৩১-চিহ্নিত খাতাগুলির একটি কবিতার, বারটি গল্পের।

১৯৩১-এর খাতাগুলির প্রথম গল্প 'আকাঙ্ক্ষা-কামনার বিলাস'। রচনাকাল, নভেম্বর, ১৯৩১। গল্পটি এই নামে ২ মার্চ ও ১৭ মার্চ, ১৯৫৪, পাক্ষিক 'প্রতিক্ষণ'-এ প্রকাশিত হয়। গল্পের ভিতর থেকেই নামটি সংগৃহীত হয়—'গল্পের নামটি গল্পটিরই একটি লাইন থেকে আমরা বেছেছিলাম। সম্পাদক, প্রতিক্ষণ।' এখানে সেই নামটিই রাখা হয়েছে।

সঙ্গ, নিঃসঙ্গ

পাক্ষিক 'প্রতিক্ষণ'-এ ২ জুলাই ১৯৫৪ গল্পটি ছাপা হয়েছিল। তখন, গল্পের শেষে এই মন্তব্য ছিল

> গল্পটি, ১৯৩৩-এর মে মাস বরিশাল, বলে জীবনানন্দের হাতের লেখায় চিহ্নিত। গল্পের ভিতরে পেন্সিলে বেশ কিছু সংযোজন আছে—লেখার পরে গল্পটিতে লেখকের হাত পড়েছিল। দু-চার জায়গায় বিকল্প সংশোধনের ইঙ্গিত ছিল—আমাদের একটা বেছে নিতে হয়েছে। তার মধ্যে এই সংশোধনটি উল্লেখনীয়। গল্পটির শেষতম লাইনে প্রথমে লিখেছিলেন, 'ঠুঁটো তালগাছের দিকে…'। পরে, এই শব্দগুলির নীচে দাগ দিয়ে পাশে লিখে দেন, 'দীর্ঘ অগ্নিশিখা আকৃতির ঠুঁটো মঠের দিকে…'। গল্পের শেষ দিকে একটি পাতায় ওপরের অংশে খানিকটা লিখে, বাকিটা, ছেড়ে দিয়ে পরের পাতায় গেছেন। গল্পের শেষে সমাপ্তিবোধক জীবনানন্দীয় চিহ্ন ('—') আছে। গল্পটির নাম আমরা গল্পটির ভিতর থেকে সংগ্রহ করেছি।

কবিতা

সংগৃহীত এগারটি কবিতা এখন পর্যন্ত জীবনানন্দের কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। আমরা যতদূর সম্ভব খোঁজ নিতে পেরেছি—কোনো কাগজেও প্রকাশিত হয় নি। এই গুচ্ছ থেকে দুটি কবিতা—'হঠাৎ তোমার সাথে' ও 'রবীন্দ্রনাথ'—ইতিপূর্বে পাক্ষিক 'প্রতিক্ষণ'-এ প্রকাশ করা হয়েছিল, যথাক্রমে ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪ ও ২ মে ১৯৫৪ সংখ্যা দুটিতে।

১৯৩১-৩২ বলে চিহ্নিত যে-খাতাগুলি আছে, তার একটি খাতা থেকে, 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতাটি সংগ্রহ করা হয়েছিল।

জীবনানন্দ সাধারণত খাতাতেই লিখতেন, কিন্তু আলগা কাগজও কখনো-কখনো ব্যবহার করতেন, বিশেষত কোনো কাগজে দেবার সময় তো বটেই। 'রবীন্দ্রনাথ' ব্যতীত বাকি কবিতাগুলি আলগা কাগজে পাওয়া যায়, আরো কিছু কবিতার সঙ্গে।

কিছু কবিতার কাগজ-কালির ও লেখার ধরনের মিল দেখে অনুমান হয়, সেগুলি

একই সময়ে লেখা। সম্ভবত ৪৮ সালের পর, ল্যান্সডাউনের বাড়িতে। নীল প্যাডের কাগজ—রয়্যাল সাইজের, কখনো তা মাঝামাঝি ভাঁজ করা।
এই কবিতাগুলি হচ্ছে—ভয় ভুল মৃত্যু গ্লানি, মহানারীপাশ, যখন দিনের আলো, নক্ষত্রমঙ্গল, রাত্রি অনিমেষ, অবিনশ্বর, হঠাৎ তোমার সাথে।
বাকি তিনটি কবিতা—হে হৃদয় নীড় থেকে ঢের দূরে, শহর বাজার ছাড়িয়ে, এখন এ পৃথিবীতে—শাদা ক্রাউন সাইজের কাগজে লেখা।
রবীন্দ্রনাথ, মহানারীপাশ, যখন দিনের আলো, নক্ষত্রমঙ্গল, রাত্রি অনিমেষ, অবিনশ্বর—এই ছটি নাম কবিতার ওপরে কবির হাতে লেখা আছে। বাকি পাঁচটি কবিতার প্রথম চরণের অংশকে আমরা নাম হিশেবে ব্যবহার করেছি।
অনেকগুলো কবিতাতে কম-বেশি কাটাকুটি ও সংশোধন আছে। কোথাও কাটাটা খুব স্পষ্ট। কিন্তু অনেক জায়গাতে কবি একাধিক সংশোধন লিখে রেখেছেন, কোনোটাই কাটেন নি। সেখানে আমাদের একটি বেছে নিতে হয়েছে। বিকল্পগুলি এখানে দেয়া হল।

মহানারীপাশ চরণ ১ 'ভালো নীল', 'ভাঙা ভুল' ব্র্যাকেট দেওয়া — মনে হয় সংশোধনের ইঙ্গিত।

চরণ ২ মূলে 'ধূসর'-এর নীচে দাগ দিয়ে ওপরে পেন্সিলে 'মেরুন' লিখে অনেকবার গোল এঁকে 'হিরণ' লেখা।

চরণ ৩ 'রয়ে যাব' পেন্সিলে বন্ধনী দিয়ে কেটে দেয়া।

চরণ ৮ 'পলায়নকামী' কেটে পেন্সিলে ওপরে লেখা, 'অভিযানকামী'।

নক্ষত্রমঙ্গল 'ধীকলরোল', 'হে গুণ, মনপবনে প্রদীপ তারা,' ''মৃৎশতাব্দীশীল', 'অনবতুল অনবতুলে', 'ক্লেদ পৃথিবীর', 'রেতঃ হয়ে', 'সুপরিসর', 'অনিমেষ', 'নিরূপণ', 'প্রবলতর আবেগে' — শব্দগুলির নীচে পেন্সিলের দাগ দেয়া।

রবীন্দ্রনাথ চরণ ২৪ 'কীট'-এর বদলে 'ঘাস'

অবিনশ্বর বেশ কিছু জায়গায় পরিষ্কার ভাবে লাইন কেটে সংশোধন করা আছে।

শেষ দুটি লাইন

নেশার বিচিত্রতা ভালো—জীবন ভালো ; তবুও মৃত্যু ভালোঃ
মানবপ্রেমে নেমে এসে নিভিয়ে ফেলে আলো

কালিতে কেটে বর্তমান লাইন দুটি অন্য হাতের লেখায় আছে।

হঠাৎ তোমার সাথে চরণ ৭ 'বিচ্ছিন্ন'-র বদলে 'খণ্ডন', 'জিনিস'-এর বদলে 'বিষয়'

চরণ ৩৫ পরে ফাঁক

চরণ ৩৬ 'ফিরে এসো'র বদলে 'একদিন'

চরণ ৩৭ প্রথম 'একদিন' বন্ধনী দেয়া, 'তারে'র বদলে 'তাকে'

চরণ ৩৮ 'ফিরায়ে'-র বদলে 'ফিরিয়ে'

চরণ ৩৯ 'নারীমুখ নিয়ে কেউ'-এর বদলে 'নারীর পায়ের চিহ্নে চলে গিয়ে'

চরণ ৪০ 'তবে' কেটে 'কেউ'

কবিতাটির শেষে আমরা মূল চরণ দুটি রেখেছি। চরণ দুটি নিয়ে অনেক কাটাকুটি ও সংশোধন আছে — প্রায় দশ লাইনের মত — কিন্তু কোনো সংশোধনই কবি গ্রহণ করেন নি, মূল চরণ দুটি কাটেন নি। শুধু উপান্ত্য চরণে একটা দ্বিতীয় বন্ধনী দিয়েছেন। সংশোধনের খশড়া দেখে মনে হয় এই উপান্ত্য চরণটিরই ভিন্ন-ভিন্ন পাঠ খুঁজছিলেন। এ-রকম কয়েকটি লাইন —

১। মা-মরা বৎসের মত গাঢ় চোখে

২। বেতের ফলের মত ম্লান চোখে

৩। অগ্নির চুম্বনে লীন করে দিতে পারে যদি তবে

৪। নতুন সৃষ্টির অগ্নি-বাষ্পেরে মলিন করে দিতে পারে যদি কেউ তবে

এই সব সংশোধনও দ্বিতীয় বন্ধনী দিয়ে ঘেরা। এর ভিতরে ও বাইরে আরো অনেক সংশোধন লিখে কেটে দেয়া।

১৭ জানুয়ারি, ১৯৮৫ দেবেশ রায়